বার মাসের
আমল ও ফযিলত

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি

আরবি প্রভাষক
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮১৭-২৩২৩৬৪

বার মাসের আমল ও ফযিলত
হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি
প্রকাশক : আলহাজ্ব রশিদ আহমদ
গ্রন্থস্বত্ব : সংকলক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ৩, ২০১৫ ঈসায়ী
চিশ্‌তি প্রকাশনী, বালুচরা, বায়েজীদ, চট্টগ্রাম।
সহযোগিতায়: আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ মুরশেদুল হক
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
কম্পোজ : এট্যাচ এ্যাড, আন্দরকিল্লা।
প্রচ্ছদ : মোহাম্মদ ইব্রাহিম, আন্দরকিল্লা।
মূল্য : (৩০০/-) তিনশত টাকা মাত্র

Baromasher Amol o Fazilat
by Hafez Mawlana Mohammad Osman Gani
Published by Chishty Prokashoni, Baluchara, Bayzid
Chittagong, Bangladesh. Price: 300/- only, US$ 10

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী পিতা-মাতা
যথাক্রমে-মরহুম আহমদ জরিফ
মরহুমা আলহাজ্বাহ্ আনোয়ারা বেগম
ও
প্রকাশকের জান্নাতবাসী পিতা
মরহুম তোফায়েল আহমদ

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রাব্বুল আলামীন'র জন্য, যিনি জ্বিন-ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন তাঁরই ইবাদত করার জন্যে। অসংখ্য দুরূদ-সালাম পেশ করছি সেই মহামানবের প্রতি, যিনি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন মানব জাতির শিক্ষক রূপে। স্মরণ করছি সেসব মহাপুরুষদেরকে যারা নবীর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে স্রষ্টার বন্দেগী করে তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়েছেন।

সাধারণত মানুষ আশায় কিংবা ভয়ে কোন কাজ করে থাকে। অর্থাৎ হয়তো পুরুস্কারের আশায় আমল করে থাকে অথবা শাস্তির ভয়ে। কোন আমলে কী পুরস্কার তা না জানলে আমলের প্রতি আগ্রহী হয় না পক্ষান্তরে কী কাজে শাস্তি আছে তা জানা না থাকলে তা থেকে বিরত থাকার প্রয়োজন অনুভব করে না। তাই নেক আমলের ফযিলত এবং বদ আমলের শাস্তি সম্পর্কে অবহিত ও জ্ঞাত হওয়া প্রত্যেক সচেতন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এবং রাসূল ﷺ হাদীস শরীফে নেক আমলের আকর্ষণীয় প্রতিদান আর বদ আমলের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অসংখ্য স্থানে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

আরবী, ফার্সী, উর্দূসহ বিভিন্ন ভাষায় এ বিষয়ের উপর বহু গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। এ সব গ্রন্থ হতে কিছু কিছু বাংলা ভাষায় অনূদিতও হয়েছে তবে তা পাঠকের প্রয়োজন ও চাহিদার তুলনায় স্বল্প। উপরে বর্ণিত বিভিন্ন ভাষায় প্রণীত সর্বজনগৃহীত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সমূহ থেকে অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ নির্বাচিত করে সংকলন করেছেন– বিশিষ্ট লেখক হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি। এই সংকলনের নাম রাখা হয়েছে 'বার মাসের আমল ও ফযিলত'। পাঠকের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে গ্রন্থখানা প্রকাশ করে বিজ্ঞ পাঠক মহলকে উপহার দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

আশা করি গ্রন্থখানা হাতে পেয়ে পাঠক সমাজ আনন্দিত হবেন আর অধমের জন্য দোয়া করবেন।

পরিশেষে সকলের সহযোগিতা ও ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে নিবেদন যেন তিনি সকল মুসলমানকে নেক আমল বাস্তবায়ন করার এবং বদ আমল পরিহার করার তৌফিক দেন। আমীন, বে উসীলাতে খাতামিন নাবিয়্যীন।

আলহাজ্ব রশিদ আহমদ
হিলভিউ, হামজারবাগ
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

সংকলকের কথা

সকল প্রশংসা'র অধিকারী মহান আল্লাহ, যিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁরই ইবাদতের জন্যে। সহস্র দুরূদ-সালাম প্রেরণ করছি মানবতার অগ্রদূত মহানবী মুহাম্মদ ﷺ'র প্রতি যাঁর ইবাদত ও আমল সমগ্র জগতবাসীর জন্য মডেল।

মুসলমানের দিবা-রাত্রির প্রতিটি কর্মই ইবাদত, যদি তা আল্লাহ ও রাসূল ﷺ'র নির্দেশিত পন্থায় কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়। এমনকি বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানও যদি কুরআন-সুন্নাহ মতে হয় তবে তাও ইবাদত হিসাবে পরিগণিত হয়।

পক্ষান্তরে আল্লাহ, রাসূল এবং কুরআন-সুন্নাহ'র বিপরীত নিজস্ব চিন্তা-ভাবনায় কোন কাজ বা আমল করলে তা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং ইসলামে আমল ও ইবাদতের জন্য কুরআন-সুন্নাহ'র প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ দলীল-প্রমাণ ও সমর্থন প্রয়োজন।

মানুষের স্বভাব হল লাভ বা উপকারিতা না দেখলে কোন কাজের প্রতি আগ্রহী হয় না। আর ক্ষতি ও অপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত না হলে ক্ষতিকারক কার্যক্রম পরিত্যাগ করতে চায় না। তাই আল্লাহ ও রাসূল ﷺ কুরআন ও হাদিসে ভাল আমলের ইহকালীন ও পরকালীন উপকারিতা আকর্ষণীয়ভাবে এবং মন্দ কাজের উভয় জগতের অপকারিতা ও পরিণতি ভয়ঙ্কর রূপে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দিয়েছেন।

ইসলাম চর্চার সূচনা থেকে আরবি ভাষায় নেক আমলের উপকারিতা ও বদ আমলের অপকারিতা বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলা ভাষায়ও কিছু গ্রন্থ পরিলক্ষিত হয়। তবে এগুলোতে তথ্য-উপাত্তের স্বল্পতা পরিদৃষ্ট হয় বিধায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস মোতাবেক কুরআন-সুন্নাহ'র মজবুত দলীল-প্রমাণ সহকারে এ বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছি। মুসলমানের ধর্ম-কর্ম যেহেতু প্রায়ই আরবি মাসের সাথে সম্পৃক্ত সেহেতু গ্রন্থখানা সাজানো হয়েছে আরবি মাসের ভিত্তিতে। তাই এর নাম রাখা হয়েছে 'বার মাসের আমল ও ফযিলত'।

এই গ্রন্থখানা দ্বারা আলিম-উলামাসহ সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হবেন বিশেষত মসজিদের সম্মানিত খতীবগণ উপকৃত হবেন বেশী।

গ্রন্থখানা নিখুঁত ও নির্ভুল করতে চেষ্টার ত্রুটি ছিলনা। তবে মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিই কাম্য। ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদেরকে অবহিত করলে কৃতজ্ঞ হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে প্রকাশকসহ যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হল সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল এবং মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা রইল যেন অধমসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উভয় জগতের সফলতা নসীব হয়। আমীন, বেহুরমতি রাহমাতুল লিল আলামীন।

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
মুহার্‌রম	
▪ আশুরার দিনের ফযিলত	২২
▪ আহ্‌লে বাইতে রাসূল ﷺএর পরিচয় ও ফযিলত	২৯
▪ আহলে বাইয়াতকে ভালবাসা উম্মতের উপর ওয়াজিব	৩১
▪ আহলে বাইতের প্রতি বিশ্ববরেণ্য মনীষীদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা	৩৮
▪ হযরত হোসাইন (রা.)'র জন্ম ও শাহাদত	৪১
▪ ইমাম হোসাইন (রা.) মক্কার অভিমুখে রওয়ানা	৪৩
▪ মুসলিম (র.)'র দু'পুত্রের শাহাদত	৪৬
▪ ইমাম হোসাইন (রা.)'র ইরাক যাত্রা	৪৭
▪ কারবালায় আগমনকারী আহলে বাইতের সংখ্যা	৫০
▪ ইয়াযিদ বাহিনীর মক্কা মদীনায় হামলা ও নির্যাতন	৫৪
▪ আহলে বাইতকে শাহাদতকারীদের পরিণাম	৫৫
▪ ইয়াযিদ সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামের অভিমত	৫৫
▪ এ মাসে ওফাত প্রাপ্ত মনীষীগণ	৫৮
সফর	
▪ রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ	৫৯
▪ রোগ গুনাহের কাফ্‌ফারা	৬০
▪ রোগীর সেবা করার ফযিলত	৬৩
▪ রোগীর সেবকের জন্য ফেরেশ্‌তার মাগফিরাত কামনা	৬৪
▪ জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ	৬৫
▪ জান্নাত লাভ	৬৫
▪ আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হয়	৬৫
▪ রোগের কারণে মৃত্যুবরণ করলে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ	৬৫
▪ বিধর্মী রোগীর সেবা	৬৬
▪ রোগীর কাছে দোয়া চাওয়া	৬৬
▪ রোগীকে সান্ত্বনা দেওয়া	৬৬
▪ মৃত্যু	৬৭

- মৃত্যুর সময় নির্ধারিত ৬৯
- মৃত্যুর স্মরণ উপকারী ৭০
- যেসব কাজ মৃত্যুর স্মরণে সহায়ক ৭২
- মৃত্যুরও মৃত্যু হবে ৭২
- মৃত্যুর ফযিলত ৭৩
- মৃত্যু কামনা নাজায়েয ৭৫
- আল্লাহর অনুগত দীর্ঘজীবন উত্তম ৭৭
- তালকীন ৭৭
- ফেতনায় লিপ্ত হওয়ার আশংকায় মৃত্যু কামনা করা বৈধ ৭৯
- মৃত্যু যন্ত্রণা ৮০
- পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া মৃত্যু যন্ত্রণা বৃদ্ধির কারণ ৮২
- হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)'র সাথে শত্রুতা পোষণ করলে তাঁদের বিরোদ্ধাচরণ করলে মৃত্যুকালীন ঈমান নসীব হয়না ৮৩
- জানাযা নামায ৮৩
- জানাযা বহন করা ৮৫
- কবর ও কবর আযাব ৮৬
- যেসব কারণে কবর আযাব হয় ৯২
- কবর আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় ৯৪
- ঈছালে সাওয়াব ৯৭
- কিয়ামত ও পুনরুত্থান দিবস ১০৬
- শাফায়াত ১০৯
- নবী ছাড়া অন্যদের শাফায়াত ১১৩
- শাফায়াতের প্রকারভেদ ১১৪
- কিয়ামত দিবসে শানে মোস্তফা ১১৫
- আমলনামা ১১৬
- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য প্রদান ১১৮
- মীযান ও হিসাব নিকাশ ১১৯
- হাউযে কাউসার ১২০
- পুলসিরাত ১২১
- জান্নাত ও জাহান্নাম ১২৩
- এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ ১৩১

রবিউল আউয়াল

- নূরে মুহাম্মদী ﷺ 'এর সৃষ্টি ১৩২
- হযরত মুহাম্মদ ﷺ সকল সৃষ্টির উৎস ও উসিলা ১৩৬
- নূরে মুহাম্মদী ﷺ সর্বদা পবিত্র পাত্রে আমানত ছিল ১৩৮
- রাসূল ﷺ আমেনার গর্ভে আগমন ও দুনিয়াতে শুভাগমন ১৩৯
- রাসূল ﷺ'র শুভাগমণের তারিখ ১৪৩
- রাসূল ﷺ শুভাগমণের রাতের ফযিলত ১৪৩
- মীলাদুন্নবী ﷺ উদ্‌যাপন করা সুন্নতে এলাহী ও সুন্নতে মোস্তফা ১৪৪
- নবীর শুভাগমণে খুশী (ঈদ) উদযাপন করতে আল্লাহর নির্দেশ ১৪৮
- মীলাদুন্নবী উপলক্ষে খুশী উদ্‌যাপনে কাফিরের আযাবে হ্রাস ১৪৯
- মীলাদুন্নবী উদযাপন সম্পর্কে প্রখ্যাত মনীষীদের অভিমত ১৫১
- মীলাদুন্নবীর ফযিলত সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীদের অভিমত ১৫৪
- মসজিদে হারামে মীলাদুন্নবী ﷺ ১৫৭
- আল্লাহ ও রাসূল ﷺকে ভালবাসা ১৫৯
- এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ ১৬২

রবিউস সানি

- দুরূদ শরীফ ১৬৩
- দুরূদ পাঠের ফযিলত ১৬৩
- দুরূদ শরীফ পাঠকারীর উপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়: ১৬৩
- দুরূদ দ্বারা গুনাহ মার্জনা হয় ১৬৬
- দুরূদ শরীফ নেকীর পাল্লা ভারী করবে ১৬৭
- দুরূদ শরীফ দ্বারা আযাব থেকে মুক্তি লাভ ১৬৮
- দুরূদ পাঠকারী কিয়ামত দিবসে আল্লাহর আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবে ১৬৮
- মুনকার-নকীরের সাওয়ালের জবাব ১৬৯
- উদ্দেশ্য সফলের জন্য দুরূদ পাঠ ১৭০
- দুরূদ শরীফ আল্লাহর নৈকট্য লাভের উসিলা ১৭০
- দুরূদ শরীফ দ্বারা রাসূল ﷺ'র সুপারিশ নসীব হয় ১৭১
- দুরূদ শরীফ পাঠ হজ্ব ও জিহাদ থেকে উত্তম ১৭৩
- দুরূদ পাঠের দ্বারা অন্তর নিফাক মুক্ত হয় ১৭৩

- দুরূদ শরীফ দ্বারা পরকালে মুক্তি লাভ ১৭৪
- দুরূদ শরীফ পাঠ দ্বারা দীদারে মুস্তফা নসীব হয় ১৭৫
- দুরূদ শরীফ পাঠ দ্বারা প্রয়োজন পূরণ হয় ১৭৬
- দুরূদ পাঠকারী গরীব হয় না ১৭৬
- দুরূদ পাঠের বরকতে ঋণ পরিশোধ হয় ১৭৬
- দুরূদ শরীফ দ্বারা গীবত থেকে মুক্তিলাভ ১৭৭
- দুরূদ পাঠের দ্বারা ফেরেশ্‌তাদের ইমামতি করার ফযিলত ১৭৭
- দুরূদ পাঠকারীর জন্য সমগ্র সৃষ্টির দোয়া ১৭৮
- রাসূল ﷺ ও জিব্রাইল (আ.)'র বদদোয়া থেকে পরিত্রাণ লাভ ১৭৯
- যে দুরূদ পাঠ করেনা সে বড় কৃপণ ১৮০
- দুরূদ শরীফ দ্বারা মাহর আদায় ১৮১
- দুরূদ শরীফ পুলসিরাত পারে সহায়ক হয় ১৮১
- দুরূদ শরীফ দ্বারা রোগমুক্তি ১৮২
- হেকমত ১৮২
- দুরূদ পাঠের দ্বারা কারামত লাভ ১৮৩
- তুফান থেকে মুক্তিলাভ ১৮৪
- দুরূদ শরীফ পাঠ না করার পরিণতি ১৮৪
- সভা-সমাবেশে দুরূদ পাঠ করা ১৮৬
- দুরূদ পড়তে ভুলে গেলে জান্নাতের রাস্তা ভুলে যাবে ১৮৬
- নবী করিম ﷺ দুরূদ পাঠকারীকে চিনেন এবং পঠিত দুরূদ শুনেন ১৮৭
- এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ ১৮৯

জমাদিউল আউয়াল

- ঈমান, ইসলাম ও ইহসান ১৯০
- আল্লাহ ১৯৪
- আল্লাহর যিক্‌র ১৯৬
- যিক্‌রের ফযিলত ১৯৭
- যিক্‌র দ্বারা শয়তান বিতাড়িত হয় ২০১
- সর্বোত্তম যিকর ২০১
- যিকরের ফযিলত ২০২
- শির্‌ক ২০৩
- কবীরা গুনাহ ২০৪
- আল্লাহর দয়া ২০৬

- আখলাক ২১১
- লজ্জা ২১৩
- খোদাভীতি ২১৫
- ধৈর্য ও সহমর্মিতা ২১৬
- শোকর বা কৃতজ্ঞতা ২১৭
- কোমলতা বা নম্রতা ২১৯
- সত্য ও সত্যবাদিতা ২২০
- ক্ষমা ২২১
- তাওয়াক্কুল ২২২
- আদল তথা ন্যায়পরায়নতা ২২৫
- আমানত রক্ষা করা ২২৬
- ওয়াদা রক্ষা করা ২২৭
- এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ ২২৮

জমাদিউস সানি

- সাহাবায়ে কিরাম ২২৯
- সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ ও রাসূল ﷺ'র মনোনীত ২৩০
- সাহাবায়ে কিরামের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট ২৩০
- হাদিস শরীফের আলোকে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা ২৩১
- সাহাবায়ে কিরাম উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষ ২৩১
- সাহাবীগণ হলেন উম্মতের নিরাপত্তা স্বরূপ ২৩২
- সাহাবীগণ তারকারাজির ন্যায় ২৩২
- সাহাবায়ে কিরামের মতবিরোধ উম্মতের জন্য রহমত ২৩৩
- সাহাবায়ে কিরামকে মন্দ বলা নিষেধ ২৩৪
- সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে মনীষীদের অভিমত ২৩৬
- চার খলীফার ফযিলত ২৩৮
- হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র ফযিলত ২৪০
- নাম ও নসব ২৪০
- ইসলাম গ্রহণ ২৪১
- উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ২৪৪
- খলীফাতুর রাসূল ﷺ ২৪৬
- হযরত আবু বকর (রা.)'র সাহাবী হওয়া কুরআন দ্বারা প্রমাণিত ২৪৯

- শ্রেষ্ঠ মুত্তাকী ২৫০
- রাসূল ﷺ'র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি ২৫১
- রাসূল ﷺ'র প্রতি ভালবাসা ২৫২
- ইসলামের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ ২৫৪
- সৎকাজে অগ্রগামী ২৫৬
- রাসূল ﷺ'র প্রতি অগাধ বিশ্বাস ২৫৭
- জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া ২৬০
- আমীরে হুজ্জাজ ২৬১
- কুরআন সংকলন ২৬১
- যুদ্ধে অংশগ্রহণ ২৬২
- কারামাত ২৬২
- খেলাফত ও ওফাত ২৬৪
- হযরত আবু বকর (রা.)কে ভালবাসা উম্মতের উপর ওয়াজিব ২৬৫
- হযরত ওমর (রা.) ২৬৫
- নাম ও নসব ও উপনাম, পিতার নাম, মাতার নাম ২৬৫
- ফারুক উপাধি লাভ ২৬৬
- ইসলাম গ্রহণ ২৬৬
- ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি ২৬৮
- হিজরত ২৬৮
- হযরত ওমর (রা.)'র ফযিলত ২৬৯
- শয়তান হযরত ওমর (রা.)কে ভয় করে ২৬৯
- তাঁর অন্তর ও জিহ্বা সত্যের প্রকাশস্থল ২৭১
- ওমর (রা.)কে মহব্বত করা রাসূল ﷺকে মহব্বত করা ২৭২
- আল্লাহর মতের সাথে হযরত ওমর (রা.)'র ঐক্যমত ২৭২
- হযরত ওমর (রা.)'র শ্রেষ্ঠত্ব ২৭৫
- জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া ২৭৬
- হযরত ওমর (রা.)'র জ্ঞান ও দ্বীন ২৭৭
- রাসূল ﷺ'র সাথে গভীর সম্পর্ক ২৭৮
- সিদ্দিকে আকবর (রা.)'র ভালবাসা ২৭৯
- ন্যায়পরায়ণতা ২৭৯
- রাসূল ﷺ'র প্রতি ভালবাসা ২৮০

- সফল খলীফা ২৮২
- হযরত ওমর (রা.)এর কারামত ২৮৪
- খেলাফত ও শাহাদাত ২৮৭
- হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)'র যৌথ ফযিলত ২৮৮
- জান্নাতে উচুঁ মর্যাদালাভ ২৮৮
- কিয়ামত দিবসে উভয়ই রাসূল ﷺ'র পাশে থাকবেন ২৮৮
- হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)'র অনুসরণের নির্দেশ ২৮৯
- পৃথিবীতে রাসূল ﷺ'র উযীর ২৮৯
- উম্মতের শ্রেষ্ঠ দুই ব্যক্তি ২৯০
- হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)'র প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার পরিণাম ২৯০
- হযরত ওসমান (রা) ২৯৫
- নাম ও বংশ, উপনাম, পিতার নাম, ইসলাম গ্রহণ ২৯৫
- যুননুরাইন উপাধি লাভ ২৯৫
- হিজরত ২৯৬
- ইসলামের জন্য ধনসম্পদ উৎসর্গ ২৯৬
- জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া ২৯৬
- ফেরেশ্তারা লজ্জা করেন ২৯৭
- ইহ ও পরকালে রাসূল ﷺ'র বন্ধু ২৯৮
- পরকালে সুপারিশ ২৯৮
- খিলাফত লাভ ২৯৮
- বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও উপস্থিতিদের অন্তর্ভুক্ত ৩০০
- বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ না করার কারণ ৩০০
- হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা.)'র যৌথ ফযিলত ৩০২
- কারামত ৩০৩
- শাহাদাত ৩০৫
- শাহাদতের বর্ণনা ৩০৬
- হযরত আলী (রা.) ৩০৯
- জন্ম, নাম ও বংশ ৩০৯
- ইসলাম গ্রহণ ৩০৯
- হিজরত ৩১০
- বিবাহ ৩১০

- উভয় জগতে রাসূল ﷺ'র ভাই হওয়ার মর্যাদা লাভ ৩১০
- আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় ৩১১
- হযরত আলী (রা.)'র প্রতি মু'মিনের ভালবাসা ৩১২
- আলী (রা.)'র অনুসরণ স্বয়ং রাসূল ﷺ'র অনুসরণ ৩১৩
- হযরত আলী (রা.)'র দর্শন ও আলোচনা ইবাদতে শামিল ৩১৪
- আলী (রা.) আরবের সর্দার ৩১৪
- অস্তমিত সূর্য পুনঃ উদিত হওয়া ৩১৪
- বীরত্ব ৩১৫
- জ্ঞান ৩১৬
- হযরত আলী (রা.)কে ভালবাসার প্রতিদান ৩২০
- অন্যান্য ফযিলত ৩২১
- খিলাফত ও শাহাদাত ৩২৩
- কারামত ৩২৪
- দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত ৩২৪
- অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান ৩২৫
- ফুরাত নদীর আনুগত্য ৩২৬
- সূর্য পুনঃ উদিত হওয়া ৩২৬
- হযরত আলী (রা.)'র বিরোদ্ধাচরণের পরিণাম ৩২৭
- জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর ফযিলত ৩২৯
- এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ ৩৩০

রজব

- মি'রাজ ৩৩৪
- মি'রাজের ঘটনায় بعبده বলার কারণ ৩৩৫
- সশরীরে মিরাজের দলীল ৩৩৬
- পবিত্র কুরআনে মি'রাজকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সীমারেখা নির্ধারণের কারণ ৩৩৭
- মি'রাজের ঘটনার বর্ণনা বিভিন্ন হওয়ার কারণ ৩৩৭
- মি'রাজের ধারাবাহিক ঘটনা ৩৩৮
- বাইতুল্লাহ থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণকাহিনী ৩৪১
- মুজাহিদগণের সাক্ষাত ৩৪২
- বে-নামাযীদের সাক্ষাত ৩৪২

- যাকাত অনাদায়কারীর সাক্ষাত ৩৪৩
- ব্যভিচারীদের দেখা ৩৪৩
- লোভীর দর্শন ৩৪৩
- আমলবিহীন অসৎ বক্তার দর্শন ৩৪৩
- অশ্লীল ভাষীর দর্শন ৩৪৩
- জান্নাতের আওয়ায শ্রবণ ৩৪৪
- দোযখের আওয়ায শ্রবণ ৩৪৪
- ইহুদী-নাসারা এবং দুনিয়ার আহবান ৩৪৪
- সূদী ব্যক্তিদের দর্শন ৩৪৫
- ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণকারীর দর্শন ৩৪৫
- ব্যভিচারিণীর দর্শন ৩৪৫
- চোগলখোরের দর্শন ৩৪৫
- বাইতুল মোকাদ্দাসে পৌঁছা ৩৪৫
- আম্বিয়ায়ে কিরামগণ কর্তৃক আল্লাহর প্রশংসা ৩৪৬
- বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে সপ্ত আসমানে ভ্রমণ ৩৪৬
- সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছা ৩৪৭
- রাসূল ﷺএর আগে-পরের সকল জ্ঞান অর্জন ৩৪৯
- রাসূল ﷺ আল্লাহর সকল গুণে গুণান্বিত হওয়া ৩৫০
- মি'রাজের প্রমাণ ৩৫০
- দীদারে এলাহী ও আল্লাহর দর্শন লাভ ৩৫২
- সালাত বা নামায ৩৫৫
- নামাযের বিধান ৩৫৬
- নামায ফরয হওয়ার দলীল ৩৫৭
- নামাযের গুরুত্ব ও ফযিলত ৩৫৮
- নামায উত্তম আমল ৩৫৮
- নামায ঈমানের নিদর্শন ৩৫৮
- নামায নামাযীকে যাবতীয় অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে ৩৫৮
- নামায দ্বারা গুনাহ মাফ হয় ৩৫৯
- নামায বালা-মুসিবত দূরীভূত করে ৩৬১
- কিয়ামত দিবসে সবাগ্রে নামাযের হিসাব নেয়া হবে ৩৬২
- নামায মু'মিনের জন্য মি'রাজ ৩৬৩

- নামায বেহেস্তের চাবিকাঠি ৩৬৪
- নামায নামাযীর জন্য নূর, দলীল ও নাজাত ৩৬৪
- ফজর ও আসর নামাযের ফযিলত ৩৬৫
- নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার ফযিলত ৩৬৬
- নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযিলত ৩৬৮
- জামাআতে নামায পড়ার ফযিলত ৩৬৮
- জামাআত পরিত্যাগ করার পরিণতি ৩৭০
- জামাআত পরিত্যাগকারীর মৃত্যুর পর বিষাক্ত সাপের আযাব ৩৭১
- নামায তরক করার পরিণতি ৩৭২
- নামাযে খুশু-খুযূ তথা বিনয় ও একাগ্রতা ৩৭৪
- নামাযে অলসতা প্রদর্শন করা মুনাফেকীর আলামত ৩৭৫
- ধীর-স্থিরভাবে নামায আদায় করা ৩৭৬
- মসজিদ ৩৭৭
- মসজিদের সংজ্ঞা: ৩৭৮
- মসজিদ নির্মাণ, পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ ৩৭৮
- মসজিদের আদব ৩৮০
- এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ ৩৮২

শাবান

- শাবান মাসের ফযিলত ৩৮৩
- মন্দ কাজ ৩৮৪
- হাসাদ ৩৮৫
- রিয়া ৩৮৭
- রিয়াকারী প্রতারক ৩৯০
- রিয়াকারীর জন্য বেহেশ্ত হারাম ৩৯০
- রিয়া থেকে বাঁচার উপায় ৩৯১
- অহংকার ৩৯২
- অহংকারের কুফল ৩৯৩
- অহংকারের কারণ ৩৯৫
- অহংকার প্রতিকারের উপায় ৩৯৫
- উজব ৩৯৬

- আত্মম্ভরিতা থেকে বাঁচার উপায় ৩৯৭
- রাগ ৩৯৭
- রাগ শয়তানের পক্ষ হতে আসে ৩৯৮
- রাগ ধ্বংসের কারণ ৩৯৮
- ক্রোধ বড় শত্রু ৩৯৯
- রাগ ঈমানের পরিপূর্ণতার অন্তরায় ৪০০
- রাগ দমনের উপায় ৪০০
- জিহ্বার হেফাজত ৪০০
- জিহ্বা সংযত করা মুক্তির উপায় ৪০১
- জিহ্বাই সবচেয়ে ভয়ংকর ও সর্বনাশের মূল ৪০২
- অভিশাপ ও অশ্লীলতা ৪০২
- লা'নত এর শরয়ী বিধান ৪০৪
- মিথ্যা ৪০৫
- ঘটনা ৪০৬
- গীবত ৪০৮
- গীবতের পরিচয় ৪০৮
- গীবতের পরিণাম ৪১১
- গীবতের কাফ্ফারা ৪১২
- চোগলখোরী ৪১৩
- চোগলখোরের কবর আযাব ৪১৪
- ঘটনা ৪১৫
- মদ ও জুয়া ৪১৬
- এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ ৪১৯

মাহে রমযান

- মাহে রমযানের ফযিলত ৪২০
- রমযান শব্দের বিশ্লেষণ ৪২২
- রহমত, মাগফিরাত ও নাযাতের মাস ৪২২
- মাহে রমযান গুনাহের কাফ্ফারা ৪২৪
- রমযান শ্রেষ্ঠমাস ৪২৪
- মাহে রমযানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ৪২৫

- মাহে রমযানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতিদান ৪২৬
- ঘটনা ৪২৭
- মাহে রমযান নাজাতের মাস ৪২৭
- তারাবীহ'র বর্ণনা ৪২৮
- জামাতে তারবীহ পড়া সুন্নাত ৪২৯
- তারাবীহর ফযিলত ৪৩০
- তারাবীহর মাধ্যমে খত্‌মে কুরআন করা সুন্নত ৪৩২
- তারাবীহ'র জন্য হাফিয সাহেব নির্বাচন ৪৩৩
- সাহ্‌রী ও ইফতার ৪৩৪
- রোযাদারকে ইফতার করানোর ফযিলত ৪৩৬
- রোযা ৪৩৭
- রোযার ফযিলত ৪৩৯
- হাদিস শরীফের আলোকে ৪৪০
- ঘটনা ৪৪২
- রোযা ভঙ্গের পরিণাম ৪৪৭
- বদর যুদ্ধ ৪৪৭
- ই'তিকাফ ৪৪৮
- ই'তিকাফের শর্তাবলী ৪৪৮
- ই'তিকাফ ভঙ্গের কারণ ৪৪৯
- ই'তিকাফের ফযিলত ৪৪৯
- লায়লাতুল ক্বদর ৪৫০
- শানে নুযুল ৪৫০
- লায়লাতুল ক্বদরের অর্থ ৪৫১
- লায়লাতুল ক্বদরের ফযিলত ৪৫১
- লায়লাতুল কদর রমযানের শেষ দশ রাতে নিহিত ৪৫২
- লায়লাতুল কদর ২৭ তারিখ রাতে নিহিত ৪৫২
- ফেরেশ্‌তাদের ঈদ ৪৫৩
- যাকাত ৪৫৪
- যাদের উপর যাকাত ফরয ৪৫৭
- যাকাতের হকদার ৪৫৭
- যাকাত আদায় না করার পরিণাম ৪৫৮

- জুমুআর দিনের ফযিলত ৪৬০
- নামকরণ ৪৬০
- জুমআর দিন দোয়া কবুল হয় ৪৬৩
- জুমার দিন বেশী করে দুরূদ পড়ার নির্দেশ ৪৬৪
- জুমআর দিনে মৃত্যুর ফযিলত ৪৬৫
- জুমআর দিনে করণীয় ৪৬৫
- জুমআর দিন সর্বাগ্রে মসজিদে যাওয়ার ফযিলত ৪৬৬
- জুমআর নামাযের গুরুত্ব ৪৬৭
- জুমআর নামায না পড়ার পরিণাম ৪৬৮
- আল্‌-কুরআন ৪৬৯
- আল্‌-কুরআন স্থায়ী মু'জিযা ৪৭০
- আল্‌-কুরআন সংরক্ষণ করেন স্বয়ং আল্লাহ ৪৭০
- কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত ৪৭২
- কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা আল্লাহর রহমত নাযিল হয় ৪৭৪

- হাফেজে কুরআনের পিতা-মাতার আযাব হ্রাস ৪৭৫
- কুরআন মু'মিনের জন্য শেফা ও রহমত ৪৭৫
- আল্‌-কুরআনের চ্যালেঞ্জ ৪৭৬
- কুরআনের ফযিলত ৪৭৭
- কুরআন সুপারিশকারী ৪৭৮
- এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ ৪৭৯

শাওয়াল

- ঈদের দিনের ফযিলত ৪৮০
- ঈদ উদ্‌যাপন ৪৮১
- সাদকায়ে ফিতর ৪৮২
- সাদকায়ে ফিতরের পরিমাণ ৪৮৩
- সাদ্‌কাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় ৪৮৩
- ঈদুল ফিতরের দিন করণীয় কাজ ৪৮৩
- ঈদের নামাযের নিয়ম ৪৮৪
- ছয় রোযা ৪৮৫
- পিতা-মাতার হক ৪৮৬
- শরয়ী বিধান ৪৯০

- পিতা-মাতার খেদমতের উসিলায় বিপদ মুক্ত হয় ৪৯৩
- সদাচরণের জন্য পিতার চেয়ে মাতা অগ্রগণ্য ৪৯৪
- মায়ের অসন্তোষের পরিণাম ৪৯৬
- মায়ের বদদোয়া অন্যায়ভাবে হলেও কবুল হয়ে যায় ৪৯৭
- প্রতিবেশীর হক ৪৯৮
- আত্মীয়ের হক ৫০১
- স্বামী -স্ত্রীর অধিকার ৫০৩
- সতী সাধ্বী স্ত্রীর গুণাবলি ৫০৮
- এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ ৫১০

যিলকদ

- যিলকদ মাসের বৈশিষ্ট্য ৫১১
- চল্লিশ এর গুরুত্ব ৫১২
- তাক্ওয়ার সংজ্ঞা ৫১২
- তাক্ওয়ার স্তর ৫১৩
- তাক্ওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ৫১৪
- তাক্ওয়া মর্যাদার মাপকাঠি ৫১৫
- তাকওয়া সাফল্যের চাবিকাঠি ৫১৬
- তাকওয়া জান্নাত পাওয়ার উপায় ৫১৭
- তাক্ওয়া মাগফিরাতের উপায় ৫১৮
- তাক্ওয়া অর্জনের উপায় ৫১৯
- তাক্ওয়া ও মুত্তাকীর আলামত ৫১৯
- তাক্ওয়ার উপমা ৫২০
- উপসংহার ৫২১
- দোয়া ৫২২
- যাদের দোয়া অধিক কবুল হয় ৫২৪
- দোয়ার আদব ৫২৫
- সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ ৫২৮
- অন্যায় প্রতিরোধ না করার উপমা ৫৩০
- সৎকাজের আদেশ দানের পদ্ধতি ৫৩১
- সৎ কাজের আদেশে পাঁচটি বিষয় প্রয়োজন ৫৩১
- অন্যায়কে ঘৃণা না করা সমর্থন করার আলামত ৫৩৩

- পর্দা ৫৩৪
- ইস্তেগফার ও তাওবা ৫৩৮
- এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ ৫৪৫

যিলহজ্জ

- আরফা দিবস ৫৪৮
- হজ্ব ৫৫১
- হজ্বের ফযিলত ৫৫১
- হজ্ব সর্বোত্তম আমল ৫৫২
- হজ্ব দ্বারা গুনাহ মাফ হয় ৫৫২
- তাড়াতাড়ি হজ্ব করার তাগিদ ৫৫৪
- হজ্বে বদল ৫৫৫
- হজ্ব পরিত্যাগ করার পরিণাম ৫৫৬
- কুরবানীর দিনের ফযিলত ৫৫৮
- আদম (আ.)'র দুই পুত্রের কুরবানীর ঘটনা ৫৫৯
- কুরবানীর উদ্দেশ্য ৫৬৪
- আইয়্যামে তাশরীক ৫৬৪
- নামকরণ ৫৬৪
- পরিশিষ্ট
- নফল নামাযের ফযিলত ৫৬৫
- তাহিইয়্যাতুল উযূর নামায ও নিয়্যত ৫৬৭
- তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায ও নিয়্যত ৫৬৮
- চাশতের ও ইশরাকের নামায ৫৬৯
- ইশরাকের নামাযের নিয়্যত ৫৭১
- চাশতের নামাযের নিয়্যত ৫৭১
- হাজতের নামায ৫৭১
- নিয়্যত ৫৭৩
- ইস্তিখারার নামায ৫৭৪
- নিয়্যত ৫৭৫
- আওয়াবীন নামায ৫৭৫
- নিয়্যত ৫৭৬

- সালাতুত তাসবীহ ৫৭৬
- নিয়্যত ৫৭৭
- তাহাজ্জুদের নামায ৫৭৭
- নিয়্যত ৫৭৯
- আইয়্যামে বীযের রোযার ফযিলত ৫৭৯
- আইয়্যামে বীযের নামকরণ ৫৮১
- সাপ্তাহিক দিন-রাতের নফল নামায ৫৮৩
- শনিবার দিনের নামায ৫৮৩
- শনিবার রাতের নামায ৫৮৩
- রবিবার দিনের নামায ৫৮৪
- রবিবার রাতের নামায ৫৮৪
- সোমবার দিনের নামায ৫৮৫
- সোমবার রাতের নামায ৫৮৬
- মঙ্গলবার দিনের নামায ৫৮৭
- মঙ্গলবার রাতের নামায ৫৮৭
- বুধবার দিনের নামায ৫৮৭
- বুধবার রাতের নামায ৫৮৮
- বৃহস্পতিবার দিনের নামায ৫৮৮
- বৃহস্পতিবার রাতের নামায ৫৮৯
- জুমাবার দিনের নামায ৫৮৯
- জুমাবার রাতের নামায ৫৯০
- এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ ৫৯১
- গ্রন্থপঞ্জি ৫৯২

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

মুহার্‌রম

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট আল্লাহর কিতাবে গণনার মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত।"[১]

আরবী হিসাব অনুযায়ী মুহার্‌রম মাস হলো বছরের প্রথম মাস। আর যিলহজ্ব হলো সর্বশেষ মাস। এ দু'মাসই হলো সম্মানিত মাস। এ মাসগুলোতে জাহেলী যুগেও যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। মুহাররম মাস দিয়েই হিজরি নববর্ষ আরম্ভ হয়। সুতরাং ইসলামে এ মাসের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাছাড়া এ মাসের দশ তারিখকে বলা হয় আশুরা। এ দিনের ফযিলত সম্পর্কে অসংখ্য সহীহ হাদিস রয়েছে। এ মাসকে شَهْرُ اللهِ তথা আল্লাহর মাস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ "রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- মাহে রমযানের পরে সর্বোত্তম রোযা হলো আল্লাহর মাস মুহাররম মাসের রোযা আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হলো কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদের নামায।[২]

হযরত কাতাদাহ (র) বলেন- সূরা ফজরের শুরুতে আল্লাহ তা'আলা যে ফজরের শপথ করেছেন তা হল মুহাররম মাসের প্রথম ফজর যা দিয়ে নতুন বছর আরম্ভ হয়।[৩]

বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

---

১. সূরা তাওবা আয়াত: ৩৬

২. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি.), মুসলিম শরীফ, হাদিস নং- ২৬৬৫, ইমাম তিরমিযী (র.) ২৭৯ হি.), তিরমিযী শরীফ, ৩/১০৮), ইমাম নাসাঈ (র.), নাসাঈ শরীফ, ২/১৭১

৩. ইবনে রজব হাম্বলী (র), (৭৯৫ হি.) লাতায়িফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ. ৪৫

'রাসূল ﷺ প্রথমে আশুরার দিনে রোযা পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরে যখন রমযানের রোযা ফরয করা হলো তখন যার ইচ্ছা আশুরার রোযা পালন করত আর যার ইচ্ছা করত না।[৪]

বুখারী শরীফে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন-

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

রাসূল ﷺ মদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন যে, ইহুদীগণ আশুরার দিন রোযা পালন করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? তোমরা এ দিনে রোযা রাখ কেন? তারা বলল- এটি একটি উত্তম দিন, এ দিনে আল্লাহ তায়ালা বনী ইস্রাঈলকে তাদের শত্রুর কবল হতে মুক্তি দান করেন, ফলে এ দিনে মুসা (আ.) রোযা পালন করেন। রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন, আমি তোমাদের অপেক্ষা মুসার অধিক হকদার। এরপর তিনি এদিন রোযা পালন করেন এবং অন্যদেরকেও রোযা পালনের নির্দেশ দেন।[৫]

ইবনে আব্বাস (রা.) এর অপর হাদিসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ আমি রাসূল ﷺকে আশুরার দিনের রোযার উপর অন্যকোন দিনের রোযাকে প্রাধান্য দিতে দেখিনি এবং এ মাস তথা রমযান মাসের উপর অন্য কোন মাসকে প্রাধান্য দিতে দেখিনি।[৬]

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী করিম ﷺ'র দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে বলুন- আমরা রমযান মাসের পর সব চেয়ে বেশী রোযা রাখবো কোন মাসে? উত্তরে তিনি বলেন- إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمْ الْمُحَرَّمَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ وَفِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى آخَرِينَ তোমরা যদি রমযানের পরে কোন মাসে রোযা রাখতে চাও, তবে মুহাররম মাসে রোযা রাখ। কেননা এটি আল্লাহর মাস এবং এক মাসে এমন একটি দিন রয়েছে যেদিন আল্লাহ তায়ালা এ সম্প্রদায়ের তাওবা কবুল করছে এবং পরবর্তীদের তাওবাও কবুল করবেন।[৭]

৪. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬ হি.), বুখারী শরীফ, হাদিস নং- ১৮৭৫
৫. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র:) (২৫৬হি.) বুখারী শরীফ, হাদিস নং ১৮৭৮
৬. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.), বুখারী শরীফ, হাদিস নং- ১৮৮০
৭. ইমাম আহমদ (র.) ২৪১ হি. আল মুসনাদ, ১/১৫৪-১৫৫), ইমাম তিরমিযী (র.), ২৭৯ হি., তিরমিযী শরীফ, ৩/১০৮-১০৯

হযরত আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত: ان رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن صِيَامُ عَاشُورَاءَ فقال أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ'র কাছে আশুরার দিনে রোযা পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বলেন- আমি আশা করি এইদিন রোযা রাখলে আল্লাহ তায়ালা পূর্বের এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।[৮]

অপর হাদিসে হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে- ان النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَدعُ صِيَامَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ নবী করিম ﷺ কখনো আশুরার রোযা, যিলহজ্জ মাসের প্রথম নয় দিন এবং প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা থেকে বিরত থাকেননি।[৯]

মোটকথা, হলো রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা ওয়াজিব ছিল। কিন্তু যখন রমযানের রোযা ফরয হলো তখন থেকে এটি নফল রোযা হিসেবে বহাল রয়েছে। তবে কেবল আশুরার দিন একদিন রোযা রাখলে ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। তাই এর আগে বা পরে একদিন মিলিয়ে রোযা রাখলে সাদৃশ্যতা দূরীভূত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন:- حِينَ صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَنَا بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ যখন রাসূল ﷺ আশুরার রোযা রাখেন এবং রাখার আদেশ দিলেন, তখন সাহাবাগণ আরয করলেন এইদিনকে তো ইহুদী এবং নাসারাগণও ইজ্জত ও সম্মান করে থাকে। তখন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- আগামী বছর আসলে ইনশাল্লাহ নয় তারিখও আমরা রোযা রাখবো। বর্ণনাকারী বলেন- আগামী বছর আসার পূর্বেই রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেছেন।[১০]

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا তোমরা আশুরার দিন রোযা রাখ, তবে ইহুদীদের বিরোধীতা কর। তোমরা আশুরার আগে একদিন অথবা পরে একদিন রোযা রাখ।[১১]

৮. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি.), মুসলিম শরীফ, হাদিস নং- ২৬৪২, ইমাম আবু দাউদ (র.) (২৭৫ হি. আবু দাউদ শরীফ, ২/৩৩৩
৯. ইমাম আহমদ (র.) (২৪১ হি.) আল মুসনাদ, ৬/২৮৭, ইমাম নাসাঈ (র.) (৩০৩ হি.) নাসাঈ শরীফ ২/১৩৫
১০. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি., মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ২৫৬২, ইমাম আহমদ (র.), ২৪১হি. আল-মুসনাদ, ১/২২৪-২৪৫), ইমাম আবু দাউদ (র.),২৭৫হি. আবু দাউদ শরীফ, ২/৩৩৯-৩৪০
১১. ইমাম আহমদ (র.) (২৪১হি.) আল মুসনাদ, ১/২৪১

হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা আরবী বছর আরম্ভ করেছেন সম্মানিত মাস দ্বারা আর শেষ করেছেন সম্মানিত মাস দ্বারা। রমযানের পরে আল্লাহর নিকট মুহাররম মাসের চেয়ে অধিক সম্মানিত কোন মাস নেই। এ মাসকে شهر الله الاصم তথা আল্লাহর বধির মাস বলে নামকরণ করা হয়েছে।[১২]

যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের শেষে ও মুহাররম মাসের শুরুতে রোযা রাখল সে বিগত বছর শেষ করল আনুগত্যের মাধ্যমে এবং নতুন বছরও শুরু করল আনুগত্যের মাধ্যমে। এতে আশা করা যায় যে, তার আমলনামায় উভয় বছরের আনুগত্য লিখা হবে। কারণ সে বছরের শেষ ও শুরু উভয়টি আনুগত্য তথা ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করল।[১৩]

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি যিলহজ্জের শেষ দিন এবং মুহররমের প্রথম দিন রোযা রাখল সে যেন বিগত বছরকে রোযার মাধ্যমে শেষ করল। অর্থাৎ সে যেন বিগত পুরো বছর রোযা রাখল এবং আগামী বছরকেও রোযা দিয়ে শুরু করল। আল্লাহ তায়ালা তার ঐ রোযাকে তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহের কাফ্ফারা করে দেবেন।[১৪]

আশুরার দিন জঙ্গলী জীব জন্তুও রোযা রাখে। খতীব বাগদাদী (র.) তার তারীখে লিখেছেন, হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে মারফু হাদিসে বর্ণিত আছে যে, انَّ الصَّرْدَ اوَّلُ طَيْرٍ صَامَ عَاشُوْرَاءَ সারদ নামক পাখিই সর্বপ্রথম আশুরার রোযা রাখে।

হযরত ফাতাহ ইবনে শাখরাফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: كُنْتُ اَفَتُّ للنمل الْخُبْزَ كُلَّ يَوْمٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَاكُلُوْهُ আমি প্রতিদিন পিপিলিকাকে রুটি টুকরা টুকরা করে খেতে দিতাম। যখন আশুরার দিন আসত তখন তারা তা আহার করতনা।[১৫]

আবু মুসা মাদীনি স্বীয় সূত্রে কায়েস ইবনে উবাদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আমি জানতে পেরেছি যে, আশুরার দিন জঙ্গলী জানোয়ারও রোযা রাখে। তিনি স্বীয় সূত্রে জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন- লোকটি আশুরার দিন জঙ্গলে গমন করল। সে দেখল যে, এক সম্প্রদায় কিছু জন্তু যবেহ করল। সে তাদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তারা তাকে সংবাদ দিল যে, জীব-জন্তুরা রোযাদার। তারা বলল, তুমিও চল আমাদের সাথে, আমরা তোমাকে দেখাবো। তারা তাকে নিয়ে একটি

১২. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫হি.), লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী পৃ:-৪৪
১৩. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫হি.), লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী পৃ:-৪৫
১৪. আব্দুল কাদের জিলানী (র:) (৫৬১ হি.), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দূ, পৃ:-৪২৮
১৫. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী পৃ:-৭৭

বাগানে গিয়ে থামল। সে বলে- যখন আসরের পর হলো তখন চতুর্দিক থেকে জীব-জন্তুরা আসতে লাগল। এরা মাথা আসমানের দিকে উঁচু করে বাগানের চতুর্দিকে সমবেত হল। কিন্তু তারা বাগান থেকে কিছুই খাচ্ছেনা। যখন সূর্য অস্ত গেল তখন তারা সবাই দ্রুত খাওয়া আরম্ভ করল।[১৬]

হযরত কায়েস ইবনে উবাদা (র.) বলেন, আশুরার দিন জঙ্গলী জানোয়ারও রোযা পালন করে।[১৭]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলে- مَنْ صَامَ عَاشُوْرَاءَ فَكَانَّمَا صَامَ السَّنَةَ وَمَنْ تَصَدَّقَ فِيْه كَصَدَقَةِ السَّنَة. যে ব্যক্তি আশুরার দিন রোযা রাখে সে যেন পুরো বছর রোযা রাখল আর যে ব্যক্তি ঐদিনে সাদকা করে, সে যেন সারা বছর সাদকা করল।[১৮]

ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, مَنْ وَسَّعَ عَلَىَ عِيَالِه يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ لَمْ يَزَلْ فِىْ سِعَةٍ سَائِرِ سَنَةٍ যে ব্যক্তি আশুরার দিন স্বীয় পরিবারের পানাহারে প্রশস্ত করবে সারা বছর তার রুযি-রিযিক প্রশস্ততা থাকবে।[১৯]

ইমাম মানসুর (র.) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, مَنْ وَسَّعَ عَلَىَ اَهْلِه يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْه سَائِرِ السَّنَة. এই হাদিসটি কি আপনি শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি। হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা জাফর আহমার এর সূত্রে হযরত ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুনতাসির (র.) থেকে বর্ণনা করেন, যিনি তাঁর সমকালের বড় বুযর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, আমি অবহিত হলাম যে, যে ব্যক্তি আশুরার দিন স্বীয় পরিবারের জন্য অধিকহারে ব্যয় করে এবং রিযিক বৃদ্ধি করে আল্লাহ তায়ালা সারা বছর তাকে রিযিক প্রশস্ত করে দেবেন। ইবনে উয়াইনা (র.) বলেন- جَرَّبْنَاهُ خَمْسِيْنَ سَنَةً اَوْ سِتِّيْنَ سَنَةً فَمَا رَاَيْنَا الاَّ خَيْرًا আমি পঞ্চাশ বা ষাট বছর ধরে এটি পরীক্ষা করে দেখেছি, সর্বদা কল্যাণই পেয়েছি।[২০]

হাফিয যাইন ইরাকী (র.) ইমাম বায়হাকী (র.)'র সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে রাসূল ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনা করেন যে, আশুরার দিন যে ব্যক্তি স্বীয় পরিবার পরিজনকে পরিতৃপ্ত করে পানাহার করাবে আল্লাহ তায়ালা সারা বছর তার রুযি-রিযিকে বরকত দান

১৬. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫হি.), লাতায়েফুল মাআরিফ, আবরী পৃ:-৭৭
১৭. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১হি.), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দূ, পৃ:-৪২৮
১৮. জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আদ দুরুল মনসূর, ৪/৫৪০), ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫হি.) লাতয়েফুল মাআরিফ, আবরী পৃ:- ৭৯
১৯. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.) খুতবাতে মুহাররম পৃ:-৪১৬
২০. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১হি.), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দূ পৃ:-৪২৮ ও ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫হি.), লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী পৃ:-৭৯-৮০

করবেন। ইবনে হিব্বান (র.)'র মতে হাদিসটি হাসান। হাফিয আবুল ফযল মুহাম্মদ নাসের (র.) অন্য সূত্রে হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।[২১]

আশুরার নামকরণঃ عاشوراء শব্দটি عاشر থেকে গঠিত, যার অর্থ হলো দশম। আর يوم عاشوراء অর্থ দশম দিন। মুহররম মাসের দশম তারিখকে আশুরার দিন বলা হয়। কোন কোন ওলামায়ে কিরাম এর নামকরণের কারণ হিসেবে বলেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ দিন দশজন নবীকে এক একটি বিশেষ নিয়ামত দান করেছেন। ফলে মোট দশজন নবীকে দশটি নিয়ামত প্রদান করা হয়েছিল বলেই ঐদিনকে আশুরার দিন বলা হয়। যেমন (১) হযরত আদম (আ.) এর তাওবা এই দিন কবুল হয়েছিল, (২) হযরত ইদ্রিস (আ.)কে আসমানে উত্তোলন করা হয়েছিল, (৩) হযরত নূহ (আ.)'র নৌকা ঐ দিনই জুদী পাহাড়ে অবতরণ করেছিল, (৪) এই দিনেই হযরত ইব্রাহীম (আ.) জন্মলাভ করেছিলেন, এই দিনেই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে খলীল বানিয়েছিলেন এবং নমরূদের আগুন থেকে রক্ষা করেছিলেন। (৫) এই দিনে হযরত দাউদ (আ.)'র তাওবা কবুল করেছেন এবং হযরত সোলায়মান (আ.)'র ছিনিয়ে নেওয়া রাজত্ব ফেরত পেয়েছিলেন, (৬) এই দিনেই হযরত আইয়ুব (আ.) রোগ থেকে মুক্তি লাভ করেন, (৭) এই দিনে হযরত মুসা (আ.)কে নদীতে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন এবং ফেরাউনকে পানিতে নিমজ্জিত করেছেন, (৮) এই দিনে হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, (৯) এই দিনে হযরত ঈসা (আ.)কে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছিলেন এবং (১০) এই দিন হযরত মুহাম্মদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (কোনো কোনো বর্ণনায় আছে রাসূল ﷺ'র মাগফিরাতের ঘোষণা এই দিন দেওয়া হয়)[২২]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত ওমর (রা.) রাসূল ﷺ'র নিকট আরয করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আশুরা রোযার সাথে আমাদের বড় ফযিলত দান করেছেন। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন হ্যাঁ, কেননা, এই দিন আল্লাহ তায়ালা আরশ-কুরসী, তারকারাজি ও পাহাড় সৃষ্টি করেছেন। লাওহ, কলম, জিব্রাইল সহ অন্যান্য ফেরেশ্তাদেরকে আশুরার দিনে সৃষ্টি করেছেন। হযরত আদম ও ইব্রাহীম (আ.) কে এই দিনে সৃষ্টি করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে নমরূদের আগুন থেকে এই দিনে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তাঁর সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ.)কে ফিদয়া এই দিনেই দিয়েছিলেন। ফেরাউনকে আশুরার দিনে নদীতে নিমজ্জিত করা হয়েছিল।

২১. আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) (১০৫২হি.), মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ, উর্দূ পৃ:-২২-২৩
২২. আব্দুল কাদের জিলানী (র.), (৫৬১হি.), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দূ.পৃ:- ৪২৯, গোলাম রাসূল সাঈদী, শরহে সহীহ মুসলিম, (আইনীর উদ্ধৃতি দিয়ে) খণ্ড-৩, পৃ:-১২৮

হযরত ইদ্রিস (আ.)কে এই দিনে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল, হযরত আইয়ুব (আ.)'র রোগ মুক্তি এবং হযরত ঈসা (আ.)কে আসমানে এই দিনে তুলে নেয়া হয়েছিল। ঈসা (আ.)'র জন্মও এদিন হয়েছিল। হযরত আদম (আ.)'র তাওবা কবুল, হযরত দাউদ (আ.)'র ত্রুটি ক্ষমা, হযরত সোলাইমান (আ.)'র বাদশাহী এই দিনে লাভ করেছিলেন। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা স্বীয় আরশে এই দিন সমাসীন হয়েছিলেন। কিয়ামত আশুরার দিনেই সংঘটিত হবে। আসমান থেকে সর্বপ্রথম বৃষ্টি এদিন অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আসমান থেকে সর্বপ্রথম রহমত নাযিল হয়েছিল এ দিনে। যে ব্যক্তি আশুরার দিন গোসল করবে সে মৃত্যুরোগ ব্যতীত অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হবে না। যে ব্যক্তি আশুরার দিন পাথরের সুরমা চোখে লাগাবে সারা বছর সে চোখের রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি এ দিন কোন রোগীর সেবা করবে সে যেন সকল বনী আদমের সেবা করল, যে ব্যক্তি আশুরার দিন কাউকে এক ঢোক পানি পার করাবে সে যেন মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর নাফরমানী করেনি।[২৩]

আশুরার দিনের নামাযঃ যে ব্যক্তি আশুরার দিন চার রাকাত নামায এভাবে পড়বে, প্রতি রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা এবং পঞ্চাশ বার সূরা ইখলাস পড়বে- আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির বিগত পঞ্চাশ বছরের এবং আগত পঞ্চাশ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন, আর জান্নাতে তার জন্য নূরের সহস্র প্রাসাদ নির্মাণ করে রাখবেন। অন্য এক হাদিসে আছে চার রাকাত দুই সালামে পড়বে। অর্থাৎ দু'রাকাত করে পড়বে। আর প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা, সূরা যিলযালাল, সূরা কাফেরূন ও সূরা ইখলাস একবার করে পড়বে এবং নামায শেষে সত্তরবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। হাদিসখানা হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।[২৪]

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে- **من صلى يوم عاشوراء اربع ركعات يَقْرَأُ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله احد احدى عشرة مرةً غفر الله ذنوب خمسين عامًا وبُنِىَ لَهُ منبرًا من نورٍ.** যে ব্যক্তি আশুরার দিন চার রাকাত নামায পড়বে এবং প্রতি রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা ও এগারবার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন আর তার জন্য নূরের মিম্বর নির্মাণ করবেন।[২৫]

২৩. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.) গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দূ পৃ:- ৪২৭
২৪. আব্দুল কাদের জিলানী (র.), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দূ পৃ:- ৪২৭), আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) (১০৫২হি.), মা ছাবাত বিস সুন্নাহ উর্দূ পৃ:- ২৭
২৫. আব্দুর রহমান সফুরী (র.) (৮৯৪হি.), নুযহাতুল মাজালিস, খণ্ড-১, পৃ:-১৮১

আহ্লে বাইতে রাসূল ﷺ এর পরিচয় ও ফযিলত

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا হে আহলে বাইআতগণ! আল্লাহ চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণভাবে পুত-পবিত্র রাখতে।[২৬]

আহলে বাইত দ্বারা কারা উদ্দেশ্য তা নিয়ে ওলামাগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন আহলে বাইত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আহলে আবা তথা রাসূল ﷺ হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (রা.)। যাদেরকে পঞ্জেতন পাকও বলা হয়। তারা দলীল হিসেবে মুসলিম শরীফে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস পেশ করেন। তিনি বলেন: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الايَةِ نَدْعُ اَبْنَائَنَا وَاَبْنَائَكُمْ دَعَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيًا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَ حُسَيْنً فَقَالَ اَللهُمَّ هٰؤُلآءِ اَهْلُ بَيْتِى. যখন আয়াতে মুবাহালা নাযিল হলো তখন রাসূল ﷺ হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (রা.)কে ডেকে এনে বললেন, হে আল্লাহ! এরা আমার আহ্লে বাইত।[২৭]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} একদিন নবী করিম ﷺ সকাল বেলা বাড়ী থেকে বের হলেন। এ সময় তাঁর উপর একটি কালো রঙের রুমী চাদর জড়ানো ছিল। তখন হযরত হাসান, হোসাইন, ফাতেমা ও আলী (রা.) একের পর এক আগমন করেন এবং তিনি তাঁদের সকলকে স্বীয় চাদরের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে নেন আর إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ আয়াত তিলাওয়াত করেন।[২৮]

এ ঘটনায় আরো বর্ণিত আছে- উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) চাদর উঠিয়ে তিনিও তাঁদের সাথে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে রাসূল ﷺ তাঁর হাত থেকে চাদর টেনে নিলেন। এতে উম্মে সালমা (রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও

২৬. সূরা আহযাব, আয়াত-৩৩
২৭. শায়খ ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) (৭৪০ হি.), মিশকাত শরীফ, পৃ:-৫৬৮
২৮. শায়খ ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) (৭৪০হি.), মিশকাত শরীফ, পৃ:-৫৬৮), ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি.) মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ৬১৩৯

আপনাদের সাথী হতে চাই। উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন- اِنَّكَ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خَيْرٍ তুমি নবীর স্ত্রীগণের অন্তর্ভুক্ত, কল্যাণের উপর আছ।

ইবনে আব্বাস (রা.) ও ইকরামা (র.)'র মতে আহলে বাইত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উম্মাহাতুল মু'নিনীন। কেননা উক্ত আয়াত এদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

তবে জমহুর ওলামাগণের অভিমত হলো আহলে বাইত দ্বারা পঞ্জেতনপাক ও উম্মাহাতুল মু'মিনীন উভয় উদ্দেশ্য। তবে কেউ এদের সাথে হযরত আব্বাস, জাফর ও হামযা (রা.)কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু শায়খ আব্দুল হক মুহদ্দিস দেহলভী (র.) বলেন- বিশেষভাবে যখন আহলে বাইত বলা হয় তখন কেবল হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (রা.) এই চারজনকেই বুঝায়। কেননা আহলে বাইত শব্দটি এই চারজনের জন্যেই ব্যবহার হয়।[২৯]

উপরে বর্ণিত আয়াত শরীফে আহলে বাইতের ফযিলত ও মর্যাদা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন স্বয়ং মহান আল্লাহ তায়ালা। কারণ স্বয়ং আল্লাহই তাঁদেরকে যাবতীয় নাপাকী তথা পাপাচার ও গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। আর আল্লাহ যাদেরকে হেফাযত করেন তাদেরকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না।

আহলে বাইতের ফযিলত সম্পর্কে অসংখ্য সহীহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম শরীফে হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন রাসূল ﷺ মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জুহ্ফা নামক স্থানে গদীরে খুম এর নিকটে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং লোকদেরকে ওয়ায নসীহত করেন। তিনি বলেন- اَمَّا بَعْدُ اَلَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَأُجِيبُ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي আম্মাবা'দ! হে লোক সকল! আমি মানুষ। অচিরেই আমার কাছে আমার প্রভূর দূত তথা আজরাঈল (আ.) আমার মৃত্যুর জন্য আগমন করবে আর আমি মৃত্যু কবুল করব। আমি তোমাদের নিকট দু'টি অতি মূল্যবান জিনিস রেখে যাচ্ছি, প্রথমটি হলো কিতাবুল্লাহ, যাতে রয়েছে হিদায়েত ও আলো। তোমরা কিতাবুল্লাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর এবং এর উপর আমল কর। তিনি কিতাবুল্লাহর প্রতি লোকদেরকে উৎসাহিত করেছেন। এরপর বললেন- দ্বিতীয়

২৯. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি.), আশয়াতুল লুমআত, খণ্ড ৪, পৃ:-৬৮১

মূল্যবান বস্তু হলো আমার আহলে বাইত। আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বাইত সম্পর্কে আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। একথাটি তিনি বারবার বলেছেন।[৩০]

তিরমিযী শরীফে হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي حَجَّته يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَته الْقَصْوَاء يَخْطُبُ فَسَمعْتُهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ به لَنْ تَضلُّوا كتَابَ اللَّه وَعتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي আমি রাসূল ﷺকে বিদায় হজ্জে আরফার দিন তাঁর কাসওয়া নামক উটনীর ওপর বসে ভাষণ দিতে দেখেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি- হে লোক সকল! আমি তোমাদের মধ্যে এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধর তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবেনা। একটি হলো কিতাবুল্লাহ অপরটি হলো আমার আওলাদ, আমার আহলে বাইত।[৩১]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) স্বীয় মুসনদে হযরত আবু যর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- اَنَّهُ قَالَ وَهُوَ آخذٌ بِبَاب الكَعْبَة سَمِيْتُ النَّبِىَ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ اَلاَ انَّ مِثْلَ اَهْلِ بَيْتِى فِيْكُمْ مِثْلُ سَفِيْنَة نُوْحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا اَهْلَكَ. হযরত আবু যর (র.) কা'বা শরীফের দরজা ধরে বললেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি- সাবধান! তোমাদের মধ্যে আমার আহলে বাইতের দৃষ্টান্ত হলো হযরত নূহ (আ.)'র নৌকার ন্যায়। যারা নৌকায় আরোহণ করবে তারা মুক্তি পাবে আর যারা বিমুখ থাকবে তারা ধ্বংস হবে।

আহলে বাইয়াতকে ভালবাসা উম্মতের উপর ওয়াজিব

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ'র ভালবাসা সমস্ত প্রিয় বস্তুর উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনে পাকে বলা হয়েছে- قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান- যাকে তোমরা পছন্দ

[৩০]. শায়খ ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) (৭৪৯হি.), মিশকাত শরীফ, পৃ:-৫৬৮

[৩১]. শায়খ ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) (৭৪৯হি.), মিশকাত শরীফ, পৃ:-৫৬৯

কর- আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর আযাব আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেননা।[৩২]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবেনা যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সকল লোক থেকে অধিক প্রিয় হই।[৩৩]

উপরোক্ত কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক মু'মিনের উপর রাসূল ﷺ'র ভালবাসা ওয়াজিব। এজন্য ইমাম মুসলিম (র.) মুসলিম শরীফে ১৫ নম্বর বাবে বলেছেন- وُجُوبُ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ স্বীয় পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, পরিবারের সকলের চেয়ে এমনকি সকল লোকের চেয়ে রাসূল ﷺকে অধিক ভালবাসা ওয়াজিব।

অতএব প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ এবং রাসূল ﷺকে ভালবাসা প্রত্যেক মু'মিনের উপর ওয়াজিব। আর আল্লাহ এবং রাসূল ﷺকে ভালবাসা প্রমাণিত হবে তাঁরা যাদেরকে ভালবাসেন তাদেরকে ভালবাসার মাধ্যমে। যেহেতু আল্লাহ ও রাসূল ﷺ আহলে বাইয়াতে রাসূলকে ভালবাসেন সেহেতু আহলে বাইয়াতকে ভালবাসা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য আবশ্যক। আরবীতে প্রবাদ আছে محبوب المحبوب محبوب প্রিয়জনের প্রিয়বস্তুও প্রিয় হয়।

তিরমিযী শরীফে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ بِه مِنْ نِعْمَةٍ، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّه، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي» . রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, কেননা, তিনি তোমাদেরকে নেয়ামত প্রদান করেন, আর আমাকে ভালবাস আল্লাহর ভালবাসার কারণে এবং আমার আহলে বাইতকে ভালবাস আমার ভালবাসার কারণে।[৩৪]

[৩২]. সূরা তাওবা, আয়াত-২৪

[৩৩]. শায়খ ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) (৭৪০হি.) মিশকাত শরীফ, পৃ:-১২

[৩৪]. ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) (৭৪০হি.), মিশকাত শরীফ, পৃ:-৫৭৩

এই হাদিসের ব্যাখ্যা হলো তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, কারণ তিনি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, আর আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে আমাকে ভালবাস কেননা আমার ভালবাসার মাধ্যমে আল্লাহর ভালবাসা অর্জিত হয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে- قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহর ভালবাসা চাও তবে আমার অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। আর তোমরা আমার ভালবাসা পেতে চাইলে আমার আহলে বাইতকে ভালবাস। কারণ যারা তাঁদেরকে ভালবাসবে আমিও তাদেরকে ভালবাসি।

তাছাড়া রাসূল ﷺও উম্মত থেকে আহলে বাইতের ভালবাসা কামনা করেছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى হে নবী! বলুন, আমি আমার ইসলামের দাওয়াতের বিনিময়ে কিছুই চাইনা কেবল চাই আমার নিকটতম আত্মীয়দের প্রতি তোমাদের ভালবাসা।[৩৫]

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূল ﷺ'র খেদমতে আরয করলেন- يا رسولَ الله مَنْ قرابتُكَ هؤلاءِ الذينَ وجبتْ علينا مودَّتُهم؟ قالَ عليٌّ وفاطمةُ وولداهما হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকটতম আত্মীয় কারা যাঁদেরকে ভালবাসা আমাদের উপর ওয়াজিব হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন- এরা হলো আলী ও ফাতিমা এবং তাদের দু'সন্তান।[৩৬]

হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ, হযরত হাসান ও হোসাইন (রা.)'র হাত ধরে এরশাদ করেন- مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসবে এবং এ দু'জনকে ও এঁদের পিতা-মাতাকে ভালবাসবে, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে আমার মর্যাদায় থাকবে।[৩৭]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي যে হযরত হাসান ও হোসাইনকে

৩৫. সূরা শূরা, আয়াত-২৩

৩৬. জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.), তাফ্সীরে দূররে মনসূর, খণ্ড-৬, পৃ:-৭, ইবনে হাজার মক্কী (র.) (৯৭৪ হি.) আস-সাওয়ায়েকে মুহাররকা, পৃ:-১৬৮), আল্লামা যুরকানী (র.) (১১২২হি.) শরহে মুআহিবুল লাদুনী খণ্ড-৭, পৃ:-৩০

৩৭. তিরমিযী সূত্র: আল্লামা শফী উকাড়বী (র.), সফীনায়ে নূহ (আ.), ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.) আশ শরফুল মুআব্বাদ, পৃ:- ৮৬

ভালবাসবে সে মূলত আমাকে ভালবাসবে। আর যে তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে সে মূলত আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করে।[৩৮]

হযরত সালমান ফার্সী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি- হযরত হাসান ও হোসাইন আমার সন্তান।

مَنْ أَحَبَّهُمَا أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا أَبْغَضَنِي، وَمَنْ أَبْغَضَنِي أَبْغَضَهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ النَّارَ»

যে এ দু'জনকে ভালবাসবে সে আমাকে ভালবাসে। আর যে আমাকে ভালবাসবে তাকে আল্লাহ ভালবাসবেন। আর আল্লাহ যাকে ভালবাসেন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন। পক্ষান্তরে যে হাসান ও হোসাইনের সাথে শত্রুতা পোষণ করে সে আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করল, আর যে আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করে আল্লাহ তার সাথে শত্রুতা পোষণ করবেন। আর আল্লাহ যার সাথে শত্রুতা পোষণ করেন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[৩৯]

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺকে হযরত হাসান ও হোসাইন (রা.)কে নিয়ে বলতে শুনেছি- هَذَانِ ابْنَايَ وَابْنَا ابْنَتِيَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا এ দু'জন আমার এবং আমার কন্যার সন্তান। হে আল্লাহ! আমি এদেরকে ভালবাসি আপনিও এদেরকে ভালবাসুন এবং যারা এদেরকে ভালবাসে আপনি তাদেরকে ভালবাসুন।[৪০]

হযরত ইয়ালা ইবনে মুররাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, হোসাইন আমার আর আমি হোসাইনের। যে হোসাইনকে ভালবাসবে আল্লাহ তাকে ভালবাসবেন।[৪১]

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَبْغَضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ» শপথ সেই সত্তার, যার হাতে আমার

৩৮. ইবনে মাজাহ (র.) (২৭৩হি.), ইবনে মাজাহ শরীফ, খণ্ড-১, পৃ:-৬৪ সূত্র- আল্লামা শফী উকাড়বী (র.) সফীনায়ে নূহ (আ.), পৃ-১৬)

৩৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ হাকেম (র.) (৪০৫হি.) আল মুস্তাদরাক, খণ্ড-৩, পৃ:-১৬৬

৪০. ইমাম তিরমিযী (২৭৯হি.) তিরমিযী শরীফ, বাবুল মানকীব।

৪১. তিরমিযী শরীফ, সূত্র মিশকাত শরীফ, পৃ:-৫৭১)

প্রাণ; যে কেউ আমার আহলে বাইতের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[৪২]

তাবরানী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- «لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَتَكُونَ عِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ، وَيَكُونَ أَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَتَكُونَ ذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ» কোন বান্দাহ পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে আমাকে তার প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবাসবে। আর আমার আওলাদগণকে নিজের আওলাদের চেয়ে, আমার পরিবারকে নিজের পরিবারের চেয়ে, আমার সত্তাকে নিজের সত্তার চেয়ে বেশী ভালবাসবেনা, সে পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না।[৪৩]

ইমাম তাবরানী ও হাকেম (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَعِدَ بَيْنَ الرُّكْنِ، وَالْمَقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ، ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ النَّارَ কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফের এবং মাকামে ইব্রাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে নামায-রোযায় লিপ্ত হয়। অতঃপর আহলে বাইতে রাসূল ﷺ'র সাথে শত্রুতা পোষণ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৪৪]

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- معرفة ال محمَّد صلّى الله عليْه وَسلَّم برائة من النار وحُبُّ ال محمد جواز على الصراط والولاية لال محمد امانٌ من العذاب. নবী করিম ﷺ'র পরিবার পরিজনের পরিচিতি লাভ করা ও তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়। আর তাঁদের সাথে ভালবাসা পোষণ করা পুলসিরাত পার হওয়ার দলীল বা অনুমতিপত্র এবং আলে মুহাম্মদ ﷺ'র দোস্তি আযাব থেকে মুক্তির গ্যারান্টি।[৪৫]

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (র.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে তাফসীরে কাশ্‌শফের উদ্ধৃতি দিয়ে قل لا اسئلكم عليه اجرًا الا المودة فى القربى আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে একটি লম্বা হাদিস বর্ণনা করেছেন। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন:

৪২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হাকেম (র.) (৪০৫হি.), আল মুস্তদরাক, খণ্ড-৩, পৃ-১৫০) ও আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (র.) (৯৭৪হি.) আস সাওয়ায়েকুল মুহাররাকাহ্ পৃ:- ১৭২

৪৩. আল্লাম ইউসূফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), আশ শরফুল মুআবাদ, পৃ:-৮৫

৪৪. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), আশ শারফুল মুআব্বাদ, পৃ:-৯২

৪৫. কাযী আয়ায (র.) (৫৪৪হি.), শেফা শরীফ, খণ্ড-২, পৃ:-৩৫

من مات على حب ال محمَّدٍ مات شهيدًا الا من مات على حب ال محمَّدٍ مات مغفُوْرًا له الا ومن مات على حبِّ ال محمَّدٍ مات تائبًا الا ومن مات على حبِّ ال محمَّدٍ مات مؤمنًا مستكمل الايمان الا ومن مات على حب ال محمَّدٍ بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير الاومن مات على حب ال محمَّدٍ يزف الى الجنة تزف العروس الى بيت زوجها الا ومن مات على حبِّ ال محمَّدٍ فُتِحَ له فى قبره بابان الى الجنة الا ومن مات على حب ال محمَّدٍ جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة الا ومن مات على حب ال محمَّدٍ على السنة والجماعة الا ومن مات على بغض ال محمَّدٍ جاء يوم القيامة مكتوبًا بين عينه أئسٌ من رحمة الله الاومن مات على حب ال محمدٍ مات كافرًا الاومن مات على بغضِ ال محمَّدٍ لم يشمَّ رائحة الجنة.

যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদ'র ভালবাসা নিয়ে ইন্তেকাল করবে সে শহীদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। সাবধান, যে আলে মুহাম্মদ'র ভালবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। সাবধান, যে আলে মুহাম্মদ'র ভালবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে তাওবাকারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করল। সাবধান, যে আলে মুহাম্মদ'র ভালবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে পরিপূর্ণ মু'মিন হয়ে মৃত্যুবরণ করল। সাবধান, যে আলে মুহাম্মদ'র ভালবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে তাকে আজরাঈল (আ.) এবং মুনকার-নাকীর ফেরেশ্‌তা জান্নাতের সুসংবাদ দেবেন। সাবধান, যে আলে মুহাম্মদ'র ভালবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তাকে এমনভাবে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে যেভাবে দুলহাকে দুলহানের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সাবধান, যে আলে মুহাম্মদ'র ভালবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তার কবরে জান্নাতের দিকে দু'টি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সাবধান, যে আলে মুহাম্মদ'র ভালবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তায়ালা তার কবরকে রহমতের ফেরেশ্‌তাদের সাক্ষাতস্থল বানিয়ে দেবেন। সাবধান, যে আলে মুহাম্মদ'র ভালবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে মসলকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপরই মৃত্যুবরণ করল। পক্ষান্তরে যে আলে মুহাম্মদ'র প্রতি শত্রুতা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আগমন করবে তার দু'চোখের মধ্যখানে লিখা থাকবে "আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত"। সাবধান, যে আলে মুহাম্মদ'র শত্রুতা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। সাবধান, যে আলে মুহাম্মদ'র প্রতি শত্রুতা পোষণ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।[৪৬]

৪৬. ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (র.) (৬০৬হি.), তাফসীরে কবীর, খণ্ড-৭, পৃ:-৩৯০

হযরত উজরাহ (রা.) বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র কাছে জিজ্ঞাসা করলাম- كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার আহলে বাইতের উপর কিভাবে দুরূদ পড়া হবে? কেননা আল্লাহ তায়ালা কিভাবে আপনাকে সালাম দেবো তা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা এভাবে বল হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং আলে মুহাম্মদ'র উপর দুরূদ প্রেরণ করুন যেভাবে আপনি ইব্রাহীম ও আলে ইব্রাহীমের উপর দুরূদ প্রেরণ করেছিলেন।[৪৭]

এই হাদিস দ্বারা নামাযের তাশাহ্হুদের দুরূদ পড়ার সময় আলে মুহাম্মদকেও অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক বলে প্রমাণিত হয়। তাছাড়া নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- لا تصلوا عليَّ الصلوة التبراء فقالوا وما الصلوة التبراء؟ قال تقولون اللهم صل على محمّدٍ وتمسكون بل قولوا اللهم صل على محمدٍ وعلى ال مُحَمَّد. তোমরা আমার উপর কর্তিত দুরূদ প্রেরণ করিও না। তারা আরয করলেন, কর্তিত দুরূদ কি? উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা শুধু বল اللّٰهُمَّ صلِّ على محمَّد বরং এরূপ বল اللّٰهُمَّ صلِّ على محمد وعلى ال محمد অর্থাৎ আহলে বাইতকে বাদ দিয়ে দুরূদ পড়লে তা কর্তিত দুরূদ আর তাদের উপর সহ দুরূদ পড়লে তা পূর্ণ ও মকবুল দুরূদ।[৪৮]

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ হযরত হাসান ও হোসাইন (রা.) হলেন জান্নাতের যুবকদের সর্দার।[৪৯]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, أَيُّ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার আহলে বাইতের মধ্যে আপনার কাছে অধিক প্রিয় কে? উত্তরে তিনি বললেন, হাসান ও হোসাইন।[৫০]

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- الْحَسَنُ أَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ হাসান (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বক্ষ মোবারক থেকে মাথা মোবারক পর্যন্ত অধিক সাদৃশ্য আর হোসাইন নবী করিম (সা:)'র নিম্নভাগের অধিক সাদৃশ্য ছিলেন।[৫১]

৪৭. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র, মিশকাত শরীফ, পৃঃ-৮৬
৪৮. আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (র.) (৯৭৪হি.) আস সাওয়ায়েকুল মুহাররকাহ, পৃঃ-১৪৪
৪৯. তিরমিযী, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃঃ-৫৭০
৫০. ইমাম তিরমিযী শরীফ, সূত্রঃ- মিশকাত শরীফ, পৃঃ-৫৭১
৫১. ইমাম তিরমিযী, তিরমিযী শরীফ, সূত্র, মিশকাত শরীফ, পৃঃ- ৫৭১

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন হযরত হোসাইন (রা.)'র মস্তক মোবারক উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট আনা হলো তখন কর্তিত মস্তক মোবারক একটি পাত্রে রাখা হয়। অতঃপর উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ লাঠি দিয়ে তাতে আঘাত করতে লাগল আর হযরত হোসাইন (র.)'র সৌন্দর্য সম্পর্কে কটাক্ষ করতে লাগল। তখন হযরত আনাস (রা.) বলেন- فقلت والله انه كان اشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبًا بالوسمة. আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! তিনি (হযরত হোসাইন (র.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সাথে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্য ছিলেন। আর তাঁর মস্তকে ওসামার খিযাব ছিল।[৫২]

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হোসাইন (র.)কে ডানে এবং স্বীয় পুত্র হযরত ইব্রাহীম (র.) কে বামে বসানো অবস্থায় ছিলেন। এ সময় জিব্রাইল (আ.) এসে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তায়ালা এদের উভয়কে আপনার কাছে রাখবেন না বরং এদের একজনকে আল্লাহ তায়ালা নিয়ে নেবেন। আপনি উভয় থেকে যাকে ইচ্ছে আপনার কাছে রাখতে পারেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যদি হোসাইন চলে যায় তাহলে আলী ও ফাতিমার মনে কষ্ট পাবে এবং আমিও কষ্ট পাবো। পক্ষান্তরে যদি ইব্রাহীম ওফাত প্রাপ্ত হয় তবে সর্বাপেক্ষা আমিই কষ্ট পাবো। তাই আমি আমার কষ্টকে পছন্দ করলাম। অর্থাৎ তিনি হোসাইন (র.) কে গ্রহণ করলেন আর নিজরে প্রিয় সন্তানকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করলেন। এর তিনদিন পর হযরত ইব্রাহীম (র.) ইন্তেকাল করেন।

এরপর যখনই হযরত হোসাইন (র.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র খেদমতে আসতেন তখন নবী করীম করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে বলতেন আমি হোসাইনের উপর আমার সন্তান ইব্রাহীমকে উৎসর্গ করেছি।[৫৩]

আহলে বাইতের প্রতি বিশ্ববরেণ্য মনীষীদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الى ان اصل قرابتى. আল্লাহর কসম! আমার নিকট আমার আপনজনের চেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র আপনজনের মহব্বত ও ভালবাসা বেশী।[৫৪]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর (রা.)'র খেলাফতকালে মাদায়েন বিজয়ের পর মসজিদে নববীতে তিনি গণীমতের মাল বণ্টন করছিলেন। এ সময় হযরত হাসান (রা.) এসে তাঁর প্রাপ্য প্রদানের আবেদন করলে তিনি তাঁকে এক হাজার দিরহাম প্রদান করেন। এরপর হযরত হোসাইন (রা.) এসে অনুরূপ আবেদন

৫২. বুখারী শরীফ, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃঃ- ৫৭২
৫৩. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন্নবুয়াত, পৃঃ- ৩০৫
৫৪. বুখারী শরীফ, সূত্রঃ সফীনায়ে নূহ (আ.) পৃঃ-১৯

করলে তিনি তাঁকেও এক হাজার দিরহাম প্রদান করেন। অতঃপর তাঁর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এসে আবেদন করলে তিনি তাঁকে পাঁচশত দিরহাম প্রদান করেন।

এতে ইবনে ওমর (রা.) আরয করলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি রাসূল ﷺ'র যুগের যুবক ছিলাম। তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম অথচ হোসাইন তখন ছিল শিশু। আপনি তাঁদেরকে দিলেন হাজার দিরহাম করে অথচ আমাকে দিলেন পাঁচশত দিরহাম। তখন হযরত ওমর (রা.) বলেন, বাবা! আগে ঐ ফযিলত ও মকাম অর্জন কর তারপর হাজার দিরহাম দাবী করিও। তাঁদের পিতা আলী, মা ফাতিমা, নানা রাসূলে খোদা ﷺ, নানী খাদীজা, চাচা জাফর তাইয়্যাব, ফুফু উম্মেহানী, মামা ইব্রাহীম ইবনে রাসূল, খালা রুকাইয়্যা, উম্মে কুলসুম, যয়নাব। একথা শুনে আব্দুল্লাহ চুপ হয়ে গেলেন।[৫৫]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- **حُبّ ُ ال محمدٍ صلى الله عليه وسلم خيرٌ من عبادة سنة** আহলে বাইতে রাসূল ﷺ'র ভালবাসা এক বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।[৫৬]

বর্ণিত আছে যে, যখন খলীফা জাফর ইবনে সুলায়মান হযরত ইমাম মালিক (র.) কে বেত্রাঘাত করেছিলেন তখন তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে আসলে উপস্থিত লোকদেরকে তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করে বলতেছি আমাকে প্রহারকারীকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। তাঁর কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমার ভয় হয় যে, আমার মৃত্যুর পর যখন আমি রাসূল ﷺ'র সম্মুখে উপস্থিত হবো আমার কারণে রাসূল ﷺ'র কোন আত্মীয় আসামী হোক তা আমি চাইনা। এতে আমি লজ্জাবোধ করি।

বর্ণিত আছে যে, খলীফা মনসূর যখন ইমাম মালিক (র.)কে বললেন, আমি জাফর থেকে আপনার প্রতিশোধ নেবো। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর আশ্রয়, আপনি তা করবেন না। খোদার শপথ, যখন চাবুক আমার শরীর থেকে উত্তোলন হতো তখনই আমি তাকে নবী করিম ﷺ'র আত্মীয়তার খাতিরে ক্ষমা করে দিয়েছি।[৫৭]

---

৫৫. আল্লামা শফী উকাড়বী (র.) সাফীনায়ে নূহ (আ.) পৃ:-২০
৫৬. আল্লামা ইউসূফ নাবহানী (র.) (৩৫০হি.), আশ শারফুল মুআব্বাদ, পৃ:-৮৫
৫৭. বরাকাতে আলে রাসূল (স) পৃ:-২৬২, সূত্র: খুত্বাতে মুহররম, পৃ:- ২৩৭

ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন,

يَا اَهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ حُبُّكُمْ + فَرَضٌ مِنَ اللهِ فِى القُرْاٰنِ اَنْزَلَهُ

হে আহলে বাইতে রাসূল! আপনাদের প্রতি ভালবাসা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনে ফরয করে দেয়া হয়েছে।

يكفيكم من عظيم القدر انكم + من لم صل عليكم لاصلوة له

আপনাদের সম্মান ও মর্যাদার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, যারা নামাযে আপনাদের উপর দুরূদ পাঠ করবেনা, তাদের নামাযও হবেনা।

اذا نحن فضلنا عليًا فانّنا + روافض بالتفصيل عندذى الجهل

যখন হযরত আলী (রা.)'র ফযিলত বর্ণনা করি তখন অজ্ঞ লোকেরা আমাকে রাফেযী বলে আখ্যায়িত করতে লাগল।

قالوا ترفضت قلت كلا + ما الرفض دينى ولااعتقادى

সে সব অজ্ঞ লোকেরা বলল, তুমি রাফেযী হয়ে গিয়েছ, আমি বলবো, না, কখনো আমার দ্বীন ও বিশ্বাস রাফেযীদের ন্যায় ছিল না।

لكن توليت غيرشك + خيرامام وخيرهادى

তবে নিঃসন্দেহে আমি সর্বোত্তম ইমাম ও সর্বোত্তম পথ প্রদর্শকের সাথে মহব্বত রাখছি।

ان كان رفضًا حبُّ ال محمد + فليشهد الثقلان انى رافض

আলে মুহাম্মদ ﷺ'র সাথে ভালবাসা ও সম্পর্ক রাখার নাম যদি রিফিয হয় তবে উভয় জগতকে সাক্ষী করে বলতেছি আমি রাফেযী।[৫৮]

শায়খে আকবর মুহিউদ্দিন ইবনে আরবী (র.) বলেন-

فلا تعدل باهل البيت خلقًا + فاهل البيت هم اهل السيادة

তোমরা আহলে বাইতের সাথে কোন মাখলুখকে সমকক্ষ করিওনা, কেননা আহলে বাইতই হলেন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

فبغضهم من الانسان خسرٌ + حقيقىٌّ وحُبُّهُمْ عِبَادَةٌ

তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা মানবজাতির জন্য বাস্তবিক পক্ষে ক্ষতিকর আর তাঁদেরকে মহব্বত করা হলো ইবাদত।[৫৯]

---

৫৮. সীরাতে শাফেঈ (র.), পৃ:-২২, সূত্র: সফীনায়ে নূহ (আ.), পৃ:-৩০
৫৯. নূরুল আবসার, পৃ:-১২৮, সূত্র: সফীনায়ে নূহ (আ.), পৃ:-৩২

মুজাদ্দিদে আলফেসানি (র.) বলেন, এ ধারণা কিভাবে করা হয় যে, আহলে সুন্নতের অনুসারীরা আহলে বাইতকে মহব্বত করেননা? অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীদের মতে আহলে বাইতকে ভালবাসা ঈমানের অংশ এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করা তাঁদের প্রতি ভালবাসার উপরই নির্ভরশীল। আহলে বাইতকে ভালবাসা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিদর্শন।[৬০]

হযরত হোসাইন (রা.)'র জন্ম ও শাহাদত

শহীদদের সর্দার, জান্নাতী যুবকদের সর্দার, ফাতিমা (রা.)'র কলিজার টুকরা হযরত আলী (রা.)'র নয়নমণি, রাসূল ﷺ'র প্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরি চতুর্থ সালে ৫ শা'বান জন্মলাভ করেন। রাসূল ﷺ তাঁর কানে আযান দেন, মুখে লালা মোবারক লাগিয়ে দিয়ে তাঁর জন্য দোয়া করেন এবং সপ্তম দিন তাঁর নাম রাখেন আর আকীকা করেন। নাম হোসাইন, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, উপাধি "সিবতে রাসূল" ও "রায়হানে রাসূল"। হাদিস শরীফে আছে, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, হযরত হারুন (আ.) তাঁর সন্তানদের নাম রাখেন শিব্বির ও শাব্বির আর আমি আমার সন্তানদের নাম রাখলাম তাদেরই নামে হাসান ও হোসাইন।[৬১]

এ কারণে এদেরকে শিব্বির ও শাব্বির নামেও ডাকা হয়। কেননা শব্দ দু'টি সুরিয়ানী ভাষা। আরবীতে এর অর্থ হয় হাসান ও হোসাইন। হাদিস শরীফে আছে- الحسنُ والحسين اسمان من اهل الجنَّة হাসান ও হোসাইন জান্নাতীদের দু'টি নাম। আরবের জাহেলী যুগে এ নাম দু'টি ছিলনা।

হযরত উম্মে ফজল বিনতে হারিস (রা.) যিনি রাসূল ﷺ'র চাচী এবং হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালিবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি একদিন রাসূল ﷺ'র খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমি এমন এক স্বপ্ন দেখেছি, যাতে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছি। রাসূল ﷺ বললেন, আপনি কি স্বপ্ন দেখেছেন? তিনি বললেন, এমন কঠিন স্বপ্ন দেখেছি যা বর্ণনা করতে সাহস পাচ্ছিনা। তিনি বললেন, নির্বিঘ্নে বলুন। উম্মে ফজল (রা.) বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আপনার শরীর মোবারক থেকে গোশত কেটে আমার কোলে রাখা হয়েছে। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- رأيت خيرًا تلد فاطمة ان شاء الله غلاما يكون فى حجرك আপনি উত্তম স্বপ্ন

৬০. মকতুবাত শরীফ, খণ্ড-২, পৃ:-৩৬, সূত্র:- সফীনায়ে নূহ (আ.), পৃ:-৩৫
৬১. ইবনে হাজার মক্কী (র.) (৯৭৪হি.) আস সাওয়ায়েকে মুহাররকাহ, পৃ:-১১৮

দেখেছেন, ইনশাল্লাহ, ফাতিমা একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে আর সে সর্বপ্রথম আপনার কোলেই হবে। অতএব ঠিক এরূপই হয়েছে।[৬২]

ইমাম হোসাইন (রা.) জন্মলাভের সাথে সাথেই তাঁর শাহাদতের সুসংবাদ এমনকি কোথায় বা কোন স্থানে কিভাবে শাহাদত বরণ করবেন তাও সকলের নিকট প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েছিল। হযরত উম্মে ফজল বিনতে হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, হোসাইন (রা.)'র জন্মলাভ সম্পর্কিত হাদিসের শেষ ভাগে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (উম্মে ফজল) বলেন, একদিন আমি নবী করিম ﷺ'র খেদমতে হাযির হয়ে ইমাম হোসাইনকে তাঁর কোলে দিলাম। তারপর দেখলাম যে, তাঁর দু'চোখ বেয়ে লাগাতার অশ্রুজল প্রবাহিত হচ্ছে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক, আপনার একি অবস্থা? অর্থাৎ আপনি এভাবে অঝোর নয়নে কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন- اتانى جبرئيل عليه السلام فاخبرنى ان اُمَّتِىْ سَتَقْتُلُ ابنى فقلت هذا قال نعم واتانى بتربة من تُرْبَتِه حمراء. আমার নিকট জিব্রাইল (আ.) এসে সংবাদ দিলেন যে, আমার উম্মত আমার এই সন্তানকে শহীদ করবে। আমি বললাম, একেই কি শহীদ করবে? জিব্রাইল (আ.) বললেন, হ্যাঁ, একেই শহীদ করবে। অতঃপর জিব্রাইল (আ.) হোসাইনের শাহাদত স্থলের লাল রঙের মাটিও আমার নিকট এনেছেন।[৬৩]

ইমাম বায়হাকী (র.) দালায়েলুন নবুয়্যত গ্রন্থে এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) স্বীয় মুসনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে একদিন ঠিক দুপুর বেলায় ঘুম থেকে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছি। এ সময় তাঁর চুল মোবারক ছিল এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত এবং ধুলি-বালি মিশ্রিত। আর তাঁর হাত মোবারকে ছিল একটি শিশির যার মধ্যে ছিল তাজা রক্ত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনার হাতে এটি কি? তিনি বললেন- هذا دم الحسين واصحابه ولم ازل النقطة منذ اليوم فاُحصى ذالك الوقت فاجدُ قُتِلَ ذالك الوقت এটি হযরত হোসাইন ও তার সাথীদের রক্ত যা আমি ঐ দিন সংগ্রহ করেছি। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি ঐ (স্বপ্নের) সময়কে হিসেব করে দেখছি যে, ঐ সময়ই হযরত হোসাইন (রা.)কে শহীদ করা হয়েছে।[৬৪]

৬২. শেখ ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (৭৪০হি.), মিশকাত শরীফ, পৃ:-৫৭২
৬৩. শেখ ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.), (৭৪০হি.), মিশকাত শরীফ, পৃ:-৫৭২
৬৪. শেখ ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) (৭৪০হি.), মিশকাত শরীফ, পৃ:-৫৭২

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, বৃষ্টির দায়িত্ববান ফেরেশ্‌তা আল্লাহর অনুমতিক্রমে একদিন রাসূল ﷺ'র সাক্ষাতে আসেন। এ সময় হযরত হোসাইন (রা.) এসে রাসূল ﷺ'র কোলে বসে গেলেন। তখন তিনি তাঁকে চুমু খেয়ে আদর করতে লাগলেন। ফেরেশ্‌তা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি হোসাইনকে খুব ভালবাসেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ফেরেশ্‌তা বললেন, ان امَّتُكَ سَتَقْتُلَهُ আপনার উম্মত তাঁকে অচিরেই শহীদ করবে। যদি আপনি চান তবে তাঁর শাহাদত স্থলের মাটি আপনাকে দেখাতে পারি। অতঃপর ফেরেশ্‌তা এক মুষ্টি লাল রঙের মাটি এনে দিয়েছেন যা হযরত উম্মে সালমা (রা.) স্বীয় কাপড়ে নিয়ে নিলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল ﷺ বললেন, হে উম্মে সালমা! যখন এই মাটি রক্তে পরিণত হবে তখন বুঝবে আমার সন্তান হোসাইনকে শহীদ করা হয়েছে। হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন, আমি ঐ মাটিগুলোকে একটি শিশিরে ভরে যত্ন করে রেখে দিয়েছি যা হযরত হোসাইন (রা.)'র শাহাদতের দিন রক্তে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।[৬৫]

জামেউল উসূল গ্রন্থে তিরমিযী শরীফের হাদিসে বর্ণিত আছে যে, একজন আনসারী মহিলা সালমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন হযরত উম্মে সালমা (রা.)'র খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখি তিনি কান্নাকাটি করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমি এই মাত্র স্বপ্নে রাসূল ﷺ কে কাঁদতে দেখলাম, তাঁর দাড়ি ও চুল মোবারক ধুলি-বালি মিশ্রিত ছিল। তাঁর এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কাঁদছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি এখনই হোসাইনকে শহীদ হতে দেখছি।[৬৬]

ইমাম হোসাইন (রা.) মক্কার অভিমুখে রওয়ানা

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) ওফাতকালে তাঁর পুত্র ইয়াযিদকে খলীফা নির্বাচিত করে যান এবং আহলে বাইত সহ সকল বনি হাশিমের সাথে সদাচারণের ওয়াসীয়ত করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে ইয়াযিদ চতুর্দিকে চিঠি লিখে পাঠায় যেন সবাই তার বাইয়াত গ্রহণ করে। তখন মদীনার গভর্ণর ছিলেন ওয়ালিদ ইবনে উকাবা। তাঁর নিকট ইয়াযিদ পত্র লিখল যে, আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) ইন্তেকাল করেছেন এবং মদীনার আম-খাস সকলের থেকে আমার বাইয়াত গ্রহণ কর। প্রথমে হোসাইন ইবনে আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বাইয়াত গ্রহণ কর আর এ ব্যাপারে কাল বিলম্ব করিও না।

---

৬৫. ইবনে হাজার মক্কী (র.) (৯৭৪হি.), আস সাওয়ায়েকে মুহাররকাহ, পৃ:-১১৮

৬৬. শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস (র.) (১০৫২হি.), মা ছাবাতা বিস্‌সুন্নাহ উর্দূ পৃ:- ৩২

ওয়ালিদ পরামর্শের জন্য মারওয়ান ইবনে হাকামকে ডাকলে সে পরামর্শ দিল যে, আপনি এক্ষুণি তাঁরা তিনজনকে ডেকে বাইয়াত গ্রহণ করুন অন্যথা তাদের হত্যা করুন। ওয়ালিদ ইমাম হোসাইন (রা.)কে ডেকে বাইয়াতের অনুরোধ করলে তিনি ভদ্রতার সাথে তা প্রত্যাখান করে চলে আসার সময় মারওয়ান বলল, আপনি যদি হোসাইনকে বাইয়াত গ্রহণ ব্যতীত চলে যেতে দেন তাহলে আর কখনো তাঁকে বশে আনা যাবে না বরং তাঁকে হত্যা করুন। কিন্তু ওয়ালিদ ছিলেন শান্ত প্রকৃতির লোক। তাই তিনি ফেতনা-ফাসাদে জড়িয়ে পড়েন নি।

হোসাইন (রা.) রাতের বেলায় নানাজীর কবর যিয়ারত করে প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। ৬০ হিজরি সনে ৪ শা'বান তিনি মদীনা ত্যাগ করে মক্কার অভিমুখে সপরিবারে রওয়ানা হন। তিনি মক্কায় পৌঁছে নিরাপদে বসবাস করতে লাগলেন।

এদিকে কূফা থেকে হযরত হোসাইন (রা.)'র নিকট চিঠি আসল যে, আমাদের এখানে কোন ইমাম নেই। আপনি আমাদের এখানে তাশরীফ আনুন। আল্লাহ তায়ালা আপনার বরকতে আমাদেরকে সত্যের পক্ষে সাহায্য করবেন। দামেস্কের গভর্ণর নু'মান ইবনে বশীর এখানে আছেন তবে আমরা তার সাথে জুমার জমাতে শরীক হইনা। কূফাবাসীদের পক্ষ থেকে এই প্রথম চিঠি ৬০ হিজরি ১০ রমযান মক্কায় পৌঁছে। এভাবে দু'দিনের মধ্যে ৫৩টি পত্র আসল।

অবশেষে ইমাম হোসাইন (রা.) কূফার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য হযরত মুসলিম ইবনে আকীলকে কূফায় প্রেরণ করেন। তাঁর সাথে তাঁর দু'পুত্র মুহাম্মদ ও ইব্রাহীমকেও সঙ্গে নিলেন। তিনি কূফায় পৌঁছলে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে বার হাজার লোক তাঁর হাতে ইমাম হোসাইন (রা.)'র উপর বাইয়াত গ্রহণ করে। আব্দুল্লাহ হাযরামী নামক একজন ইয়াযিদী ইয়াযিদের নিকট পত্র লিখল যে, এখানে মুসলিম ইবনে আকীল আগমন করে হোসাইনের পক্ষে সবাইকে বাইয়াত করাচ্ছে। নু'মান ইবনে বশীর এদেরকে দমনে দূর্বলতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। আপনি অতি সত্ত্বর একজন কঠোর প্রকৃতির লোককে হাকেম নিয়োগ দিয়ে পাঠান। আম্মারাহ ইবনে উকবা ও উমর ইবনে সা'দও অনুরূপ পত্র লিখলে ইয়াযিদ ওবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে গভর্ণর বানিয়ে পাঠায় আর নু'মান ইবনে বশীরকে পদচ্যুত করে দেয়। পত্র পাওয়া মাত্র উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তার ভাই ওসমানকে বসরার দায়িত্ব দিয়ে কূফা রওয়ানা হয়। সে কাদেসীয়া পৌঁছে সৈন্যদেরকে সেখানে রেখে মাত্র বিশজনকে সঙ্গে নিয়ে হেজাজী পোশাক পরিধান করে হেজাজী পথ ধরে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে চেহারা

ডেকে প্রতারণার সাথে কূফায় প্রবেশ করে। কূফাবাসীরা তাকে ইমাম হোসাইন মনে করে আনন্দ উল্লাসে লিপ্ত হয়ে তাকে স্বাগত জানাল।

সকালে ইবনে যিয়াদ গভর্ণর হাউজ থেকে ভাষণ দিয়ে বলল, যারা আমার আনুগত্য প্রকাশ করবে তাদের সাথে সদাচারণ করা হবে, আর যারা অবাধ্য হবে তাদেরকে হত্যা করা হবে। এরপর সে কূফার বড় বড় গোত্রের নেতাদের গ্রেফতার করল এবং তাদের থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি নিল যে, তারা যেন কোন বিরোদ্ধবাদীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় না দেয়। এতে খুব দ্রুত কূফাবাসী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং তাদের মত পরিবর্তন হয়ে গেল।

ইতিপূর্বে মুসলিম (র.) ইমাম হোসাইন (রা.)'র নিকট কূফার অবস্থা অনুকূলে বর্ণনা করে কূফায় আগমণের পত্র প্রেরণ করেন। এদিকে ইবনে যিয়াদ ঘোষণা দিল যে, যারা মুসলিমকে আশ্রয় দেবে তাদের সপরিবারে হত্যা করা হবে এবং তাদের যেসব নেতা বন্দী আছে তাদেরকে হত্যা করা হবে। এ ঘোষণা শুনে কূফাবাসীরা ভীত হয়ে পড়ল। মাগরীবের নামায ইমাম মুসলিম (র.) যখন আরম্ভ করেন তখন মসজিদে তাঁর পেছনে প্রায় পাঁচশত লোক ইকতেদা করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি নামায শেষ করলেন, তখন তাঁর সাথে একজনও অবশিষ্ট ছিলনা। বরং ইবনে যিয়াদের ভয়ে সবাই চলে গেল। যারা ইতিপূর্বে তাঁকে তাদের ঘরে নিয়ে মেহেমানদারী করার অধিক আগ্রহী ছিল তারাও আজ তাদের ঘরের দরজা বন্ধ কর দিল। যিনি কূফার জমিনে একটু পূর্বে অতি সমাদৃত ছিলেন, আজ তিনি হয়ে গেলেন অসহায়। তিনি ইমাম হোসাইন (রা.) কে কূফায় আগমনের যে পত্র লিখেছেন তার জন্য মনে মনে লজ্জিত হলেন এবং এজন্য নিজেকে অপরাধী ভাবলেন। তিনি তাউয়া নামক এক মহিলার ঘরে আশ্রিত হন। ঐ মহিলার ছেলের মাধ্যমে এ সংবাদ ইবনে যিয়াদের নিকট পৌঁছলে সে মুহাম্মদ ইবনে আসআস এর নেতৃত্বে সৈন্য পাঠিয়ে তাঁকে ধরতে পাঠায়। অবশেষে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করার পর ইবনে যিয়াদ বাহিনী অপারগ হয়ে মিথ্যা নিরাপত্তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুসলিম (র.)কে ইবনে যিয়াদের নিকট নিয়ে গেল। ইবনে যিয়াদ তাঁকে অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে শহীদ করে শরীর সহ মাথা মোবারক গভর্ণর হাউজ থেকে নীচে নিক্ষেপ করল। এ ঘটনা ৬০ হিজরি সনের ৩ যিলহজ্ব তারিখে সংঘটিত হয়েছিল।[৬৭]

হযরত মুসলিমের শাহাদতের পর কূফাবাসীরা এত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, তাদের সগোত্রীয় ব্যক্তি হানী নিজের প্রাণরক্ষার শত আবেদন করলেও কেউ সাহায্যের

[৬৭]. নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী (র.) (১৩৬৭হি.) সাওয়ানেকে কারবালা, সূত্র: খুতবাতে মুহররম, পৃ. ৩৮০ পৃ: ৯৪

জন্য এগিয়ে আসেনি। অতঃপর হযরত মুসলিমকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে তাকেও নির্মমভাবে শহীদ করা হলো।

মুসলিম (র.)'র দু'পুত্রের শাহাদত

ইমাম মুসলিম (র.) তাউয়ার ঘরে অবস্থানকালে তাঁর দু'পুত্র মুহাম্মদ ও ইব্রাহীমকে কাযী শুরাইহ'র হেফাযতে রাখেন। ইবনে যিয়াদ তাদেরকে কেউ আশ্রয় না দেওয়ার ঘোষণা দিল এবং বলল- যে তাদেরকে ধরে নিয়ে আসবে তাকে পুরুস্কৃত করা হবে। কাযী শুরাইহ এই ঘোষণা শুনে হতভম্ব হয়ে পড়েন এবং স্বীয় পুত্র আসাদকে বললেন, বাবুল ইরাকীন দিয়ে একটি কাফেলা মদীনার দিকে যাত্রা করবে, তুমি তাদেরকে নিয়ে ঐ কাফেলার সাথে মদীনায় পাঠিয়ে দাও। দূর্ভাগ্যবশত পুত্ররা আপ্রাণ চেষ্টা করেও ঐ কাফেলা ধরতে পারেনি। তারা গ্রেফতার হয়ে জেলখানায় অবস্থান করতে লাগল। জেলের দারোগা আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী ছিলেন। তিনি বাচ্চা দু'জনকে ঘরে নিয়ে আদর যত্ন করে পানাহার করায়ে নিদর্শন স্বরূপ একটি আংটি দিয়ে কাদেসিয়ার রাস্তায় দিয়ে আসেন এবং বললেন- এই পথে গিয়ে কাদেসীয়ায় পৌঁছে সেখানকার কোতোয়ালকে এই আংটি দেখালে তিনি তোমাদেরকে মদীনা পৌঁছিয়ে দেবে। কারণ তিনি আমার ভাই। কিন্তু ভাগ্যে যাদের শাহাদত লিখা আছে তাদেরকে রক্ষা করবে কে? তারা সারারাত পথ চলার পর সকালে দেখে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল তারা সেখানেই রয়েছে।

অতঃপর একজন দাসীর মাধ্যমে আরেক আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী মহিলার নিকট তারা আশ্রিত হলো। এদিকে ইবনে যিয়াদের নির্দেশে মাশকুর দারগাকে তাদেরকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়ার অপরাধে নির্মমভাবে বেত্রাঘাতের মাধ্যমে শহীদ করা হয়। ওদিকে মহিলা দু'পুত্রকে অতি আদর যত্নের মাধ্যমে রাতে পানাহার করায়ে ঘরের পৃথক একটি কামরায় ঘুম পাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তার স্বামী হারেস ছিল একজন লোভী ব্যক্তি। সে পুরস্কারের লোভে সারাদিন ঐ দু'পুত্রকে খুঁজতে খুঁজতে তার ঘোড়াটিও মরে গেল। স্ত্রী এই চিন্তা বাদ দিতে বললেও সে হতভাগা লোভ সংবরণ করতে পারেনি। অর্ধরাতে দু'পুত্র একটি দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করে উঠলে হারেস পৃথক রুমে দেখল যাদের খুঁজে তার ঘোড়া পর্যন্ত মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে তারা তার ঘরে আরামে নিদ্রা যাচ্ছে। সে রাতের বেলায় দু'ভাইকে বেঁধে রাখল এবং স্ত্রীর শত অনুরোধ উপেক্ষা করে সকাল বেলা ফুরাত নদীর পাড়ে নিয়ে ধারাল ও বিষযুক্ত তরবারীর আঘাতে উভয়কে শহীদ করে লাশ ফুরাত নদীতে নিক্ষেপ করে মস্তক দু'টি ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে আসল পুরস্কারের জন্য। ইবনে যিয়াদ ঘটনা শুনে রাগান্বিত হয়ে বলল, তাদেরকে হত্যা করার আদেশ তোমাকে কে

দিল? আমি তো তাদের জীবিত আমার কাছে নিয়ে আসতে বলেছি। কারণ আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযিদকে আমি বলেছি যে, তারা আমার কাছে বন্দী আছে। এখন তিনি যদি তাদেরকে জীবিত তার নিকট প্রেরণ করতে বলে আমি কি জবাব দেবো। তারপর ইবনে যিয়াদ মুকাতিল নামক এক ব্যক্তিকে ডেকে বলল- এই হতভাগার গর্দান উড়িয়ে দাও। এভাবে হারেসও নিহত হলো।[৬৮]

ইমাম হোসাইন (রা.)'র ইরাক যাত্রা

হযরত মুসলিম ইবনে আকীল (র.)'র পত্র পেয়ে ইমাম হোসাইন (রা.)'র নিকট কূফীদের আবেদন প্রত্যাখান করার কোন যৌক্তিক কারণ থাকলনা। তাই তিনি ইরাক যাওয়ার মনস্থ করলেন। কিন্তু মক্কাবাসী বড় বড় সাহাবায়ে কিরাম যথা ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, জাবির, আবু সাঈদ খুদুরী ও আবু ওয়াকেদ লাইসী (রা.) তাঁকে ইরাক যেতে নিষেধ করেন। তারা কূফাবাসীদের অতীতের ইতিহাস তুলে ধরেন। অবশেষে সকলের বাঁধা উপেক্ষা করে ইমাম হোসাইন (রা.) ৬০ হিজরি সনে ৩ যিলহজ্ব তারিখে স্বীয় আহলে বাইতকে নিয়ে খাদেম ও মাওয়ালীসহ মোট ৮২ জন মক্কা শরীফ থেকে ইরাকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

তিনি কাফেলা নিয়ে 'সাফফাহ' নামক স্থানে পৌঁছলে ফরযদক নামক একজন বিখ্যাত কবির সাক্ষাত হল। তিনি ইমামকে কূফীদের গাদ্দারী ও দ্রুত মত পরিবর্তনের অভ্যাস সম্পর্কে অবহিত করে যাত্রা মুলতবী করার আহ্বান জানান। কিন্তু ইমাম সমস্ত কিছু আল্লাহর হুকুমের উপর বিশ্বাস ও আস্থা রেখে যাত্রা অব্যাহত রাখেন। তিনি 'মালুমে সা'লাবা' নামক স্থানে পৌঁছে মুসলিম ও হানীর মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদ পান। মকামে যাবলায় পৌঁছে তিনি কাফেলার সকলকে ওদের শাহাদতের সংবাদ দেন এবং কূফার অবস্থা পরিবর্তন সম্পর্কেও অবহিত করলেন। তিনি কাফেলার সকলকে অনুমতি দেন যে, তোমরা ইচ্ছে করলে কাফেলা ত্যাগ করে চলে যেতে পার। এতে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের উপর কোন আবশ্যকতা নেই। তাঁর বক্তব্য শ্রবণে যারা পথিমধ্যে তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিল তারা প্রায়ই কাফেলা ছেড়ে চলে গিয়েছিল কেবল তারাই অবশিষ্ট ছিল যারা তাঁর সাথে মদীনা শরীফ থেকে এসেছিলেন। ৬০ হিজরি মুহররমের প্রথম তারিখে হুর বিন ইয়াযিদ এক হাজার সৈন্য নিয়ে আগমন করল। তারা যোহর ও আসর নামায ইমাম হোসাইন (র.)'র পিছনে আদায় করেছে। হুর বলল যে, আমি ইবনে যিয়াদ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি যে, আপনাকে অনুসরণ করতে। উভয় কাফেলা 'নীনুয়া' নামক স্থানে পৌঁছলে একজন দূত এসে হুরকে একটি পত্র দিল যাতে লিখা ছিল-

[৬৮]. রওজাতুশ শোহদা, পৃ:-১৫০, সূত্র: খুতবাতে মুহররম, উর্দূ পৃ:-৩৭৪

হোসাইনী কাফেলাকে সামনে অগ্রসর হতে দিও না বরং কোন পানিবিহীন ময়দানে অবস্থান করার জন্য বাধ্য করিও। তিনি কিছু দূর অগ্রসর হলে হুর বাহিনী তাঁকে বাঁধা দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এই জায়গার নাম কি? লোকেরা বলল, কারবালা, এই নাম শুনা মাত্র তিনি ঘোড়া থেকে নেমে বললেন, এটিই কারবালা। এখানেই আমাদের উটের বসার স্থান, এখানেই আমাদের আসবাবপত্র অবতরণের স্থান আর এখানেই আমাদের শাহাদত স্থল। এটি ছিল ৬১ হিজরি মুহররম মাসের দ্বিতীয় তারিখ।

হোসাইনী কাফেলাকে কারবালায় অবরোধ করে রাখার সংবাদ ইবনে যিয়াদের নিকট পৌঁছলে সে ইবনে সা'দকে চারহাজার সৈন্য নিয়ে হোসাইনের বিরুদ্ধে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ইবনে সা'দ প্রথমে হোসাইনের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার অপারগতা প্রকাশ করলে তাকে সেনাপতির দায়িত্ব থেকে পদচ্যুত করার হুমকি দেয়। একদিন পর ইবনে সা'দ হুকুমতের লোভে হোসাইনের বিরুদ্ধে মোকাবিলার জন্য সম্মতি প্রকাশ করলেন। ইরানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতকৃত চার হাজার সৈন্য নিয়ে ইবেন সা'দ ৩রা মুহররম কারবালা পৌঁছে গেলেন।

ইবনে সা'দ ইমামের আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে ইবনে যিয়াদের কাছে পত্র লিখেন, কিন্তু ইবনে যিয়াদ উত্তরে বলল, হোসাইনকে বল, প্রথমে ইয়াযিদের বাইয়াত গ্রহণ করতে। যদি বাইয়াত গ্রহণ করে তবে যা আমরা ভাল মনে করবো তা করবো।

ইমাম হোসাইন (রা.) ইবনে সা'দের নিকট প্রস্তাব পাঠালেন যে, আজ রাত আমি তোমার সাথে আলাপ করতে চাই। এতে ইবনে সা'দ সম্মতি হলে উভয়পক্ষ থেকে বিশজন আরোহীসহ মিলিত হন। পরে ইমাম ও ইবনে সা'দ এককভাবে আলোচনা শুরু করেন। ইমাম বলেন, আমি তিনটি প্রস্তাব পেশ করছি, তোমরা যেটি চাও মনযূর করতে পার। প্রথম: আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে চলে যেতে দাও। দ্বিতীয়: আমাকে কোন সীমান্তে নিয়ে যাও, আমি সেখানে বসবাস করবো এবং তৃতীয়: আমাকে সোজা ইয়াযিদের নিকট যেতে দাও, তোমরাও সঙ্গে চল। আমি ইয়াযিদের সাথে সরাসরি আলোচনা করে সমস্যা সমাধান করবো, যেভাবে হযরত হাসান (রা.) হযরত আমীরের মুয়াবিয়া (রা.)'র সাথে করেছিলেন।

ইমামের প্রস্তাব শুনে ইবনে সা'দ খুশী হলো এবং মীমাংসার পথ উন্মুক্ত মনে করে যে কোন প্রস্তাব মেনে সংঘাত বন্ধের উদ্দেশ্যে ইবনে যিয়াদের নিকট পত্র লিখেন। ইবনে যিয়াদ পত্র পাঠ করে যে কোন একটি প্রস্তাব মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে উপস্থিত শিমার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যখন হোসাইন আপনার হাতের নাগালে এসে আপনার আয়ত্তে পৌঁছেছে তখন আপনি কি তাঁর প্রস্তাব কবুল করবেন? এবার তিনি যদি আপনার

আনুগত্য ব্যতীত চলে যান তবে কখনো তাঁকে বশে আনতে পারবেন না। শিমারের কথায় ইবনে যিয়াদের মত পরিবর্তন হয়ে গেল। সে তাৎক্ষণিক ইবনে সা'দের নিকট একটি পত্র লিখে বলল, তোমাকে হোসাইনের পক্ষে ওকালতি করতে পাঠানো হয়নি। যদি হোসাইন সহ তাঁর সাথীরা আমার আনুগত্য মেনে নেয় তবে তাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও অন্যথা তাদের মস্তক কেটে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও এবং হোসাইনের লাশের উপর ঘোড়া দৌঁড়িয়ে চুরমার করে দাও। আর যদি তুমি এতে সম্মতি না হও তবে আমার পত্র বাহক শিমারকে তোমার দায়িত্ব অর্পণ করে দাও। শিমারকে মৌখিকভাবে বলে দিল যে, যদি ইবনে সা'দ আমার আদেশ মোতাবেক কাজ না করে তবে প্রথমে তুমি তার মস্তক কেটে আমার নিকট প্রেরণ করবে।

অবশেষে এই পত্র পেয়ে ইবনে সা'দ খুবই মর্মাহত হন কিন্তু হুকুমতের কারণে নিজেই হোসাইনী কাফেলায় হামলা করার নির্দেশ দেন। এটি বৃহস্পতিবার দিবাগত সন্ধ্যা বেলায়। এরপর ইমাম হোসাইন (রা.) কাফেলার সকলকে একত্রিত করে একটি হৃদয় বিদারক ভাষণ দেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন, তোমরা পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম সাথী ও উত্তম পরিবার। আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমি নিশ্চিত যে, এই দুশমনদের হাতে আগামীকাল আমাদের শাহাদত হবে। আমি তোমাদের সকলকে খুশী মনে অনুমতি দিচ্ছি যে, তোমরা রাতের অন্ধকারে যার যেখানে খুশী চলে যাও। এরা আমাকে হত্যা করতে চায়, আমার কারণে তোমরা শহীদ হও তা আমি চাইনা। তাঁর বক্তব্য শুনে কাফেলার একের পর এক সবাই দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা কি এজন্য চলে যাবো যে, আপনার শাহাদাতের পর আমরা জীবিত থাকবো? আল্লাহ আমাদেরকে এরূপ দিন যেন না দেখান। তারা আরো জোশে এসে বললেন, আমরা হাজার বার শহীদ হয়ে হাজার বার জীবত হয়ে পুনরায় হাজার বার শহীদ হলেও আপনাকে ত্যাগ করে চলে যাবো না। আমরা বেঁচে থাকতে আপনার শরীরে একটি আঘাত লাগতেও দিবনা। আমাদের প্রাণ দিয়ে আপনাকে হেফাযত করবো। এরপর কাফেলার সকলেই সারা রাত তাওবা, ইস্তেগফার, নামায ও দোয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত করেন।

১০ মুহররম ফজরের নামায সকলে জামাতে আদায় করেন। অবুঝ মাসুম শিশু সহ সপরিবার ও আশেকে আহলে বাইতসহ মাত্র ৮২ জনের কাফেলার জন্য ইয়াযিদ পক্ষের মোট বাইশ হাজার সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। ইবনে সা'দ আক্রমণের জন্য অগ্রসর হলে হুর বলল, হে ইবনে সা'দ! তোমরা কি সত্যিই যুদ্ধ করতে অগ্রসর হচ্ছ? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ। হুর বলল, ইমামের দেয়া একটি প্রস্তাবও কি গ্রহণযোগ্য নয় কি? উত্তরে ইবনে সা'দ বলল, আমি বাধ্য হয়েছি, আমার ক্ষমতা থাকলে আমি অবশ্যই

গ্রহণ করতাম। তখন হুরের সমস্ত শরীরে কম্পন সৃষ্টি হলো। মুহাজির ইবনে আউস হুরকে বলতে লাগল- তোমার একি অবস্থা? তুমি এত ভয় কেন পাচ্ছ? অথচ কূফায় তুমি সবচেয়ে বাহাদুর ও সাহসী লোক। আজ তুমি এত সন্ত্রস্ত কেন? উত্তরে হুর বলল, এটি রাসূলের দৌহিত্রের সাথে যুদ্ধ, স্বীয় পরিণামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এই মুহূর্তে আমি দোযখ ও জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু কোন কিছুর বিনিময়ে আমি জান্নাত হাতছাড়া করতে চাইনা- এই বলে ঘোড়া দৌঁড়িয়ে ইমামের কাফেলায় যোগ দিয়ে বলে- আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে এই স্থানে অবতরণের জন্য বাধ্য করেছি। আমি বুঝতে পারিনি যে, ঘটনা এতদূর চলে যাবে। আমি তাওবা করছি আর আমার প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গ করে দেবো।

অতঃপর ইবনে সা'দ যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলে হুর সহ আহলে বাইতের একে একে সকলই যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। অবশেষে দুধের শিশু হযরত আলী আসগরের ক্ষুধার কান্না সহ্য করতে না পেরে ইমাম তাকে কোলে নিয়ে ইয়াযিদ বাহিনীর কাছে মাসুম বাচ্চার জন্য সামান্য পানি তলব করলেন। কিন্তু বদবখ্ত হারমালা ইবনে কাহেল এমনভাবে তীর নিক্ষেপ করল তা আলী আসগরের গলা বিদ্ধ করে ইমামের বাহু ছেদ করে বেরিয়ে গেল। ইমাম রক্তাক্ত সন্তানকে নিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আপনি এর কুরবানীও কবুল করুন।

পরিশেষে ইমাম যুদ্ধের পোশাক পরিধান করে 'যুলফিকার' তলোয়ার হাতে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করে অনেক ইয়াযিদী সৈন্যকে ধরাশয়ী করে বীরত্বের পরিচয় দেন। তখন ইবনে সা'দ সম্মিলিতভাবে এক যোগে আক্রমণ করার নির্দেশ দিলে চতুর্দিক থেকে একই সাথে ইমামকে লক্ষ্য করে তীর আসতে লাগল। তীর, নীযাহ ও তরবারীর ৭২টি আঘাতের পর ইমাম সিজদায় পড়ে শাহাদত বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন। ৬১ হিজরি সনের ১০ মুহররম, জুমার দিন, ৬৮০ খ্রিস্টাব্দ। ইমামের বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর পাঁচ মাস পাঁচ দিন। নদ্দর ইবনে খারশা তাঁর মস্তক মোবারক শরীর থেকে দ্বিখণ্ডিত করতে উদ্যত হলেও কিন্তু সাহস পাচ্ছিল না। তার হাত কেঁপে উঠল তরবারী হাত থেকে পড়ে গেল। অতঃপর হতভাগা খুলী ইবনে ইয়াযিদ, সিনান, ইবনে আনাস, শাবল ইবনে ইয়াযিদ অথবা শিমার ইমামের মস্তক শরীর থেকে পৃথক করে নিল।

কারবালায় আগমনকারী আহলে বাইতের সংখ্যা

ইমাম হোসাইন (রা.)'র তিন পুত্র- হযরত যয়নুল আবেদীন ২২ বছর বয়স ও অসুস্থ ছিলেন। ১৮ বছরের ছেলে আলী আকবর। তৃতীয় ছেলে আলী আসগর

দুধপানকারী মাসূম শিশু ছিলেন। এরা দু'জনই কারবালায় শাহাদাত বরণ করেন। ইমামের কন্যা হযরত সকীনা বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। ইমামের দু'জন স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন। একজন শহরবানু অপরজন হলেন আলী আসগরের মাতা। ইমাম হাসানের চারপুত্র হযরত কাসেম, হযরত আব্দুল্লাহ, হযরত ওমর ও হযরত আবু বকর (রা.)। এরা সবাই কারবালায় শাহাদত বরণ করেন।

হযরত আলী (রা.)'র পাঁচ সন্তান- হযরত আব্বাস ইবনে আলী, হযরত ওসমান ইবনে আলী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আলী, হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী ও হযরত জাফর ইবনে আলী (রা.), এরাও শাহাদত বরণ করেন।

হযরত আকীলের পুত্রদের মধ্যে মুসলিম (র.) প্রথমেই কূফায় শহীদ হন। বাকী তিনজন হযরত আব্দুল্লাহ, হযরত আব্দুর রহমান ও হযরত জাফর ইমামের সাথে গিয়ে কারাবালায় শাহাদত বরণ করেন। হযরত জাফর তাইয়্যার (রা.)'র দু'পৌত্র ও আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের পুত্র হযরত মুহাম্মদ ও হযরত আউন (রা.) ইমামের সাথে ছিলেন এবং শাহাদতবরণ করেন। আর হযরত জয়নুল আবেদীন, ওমর ইবনে হাসান, মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে আলী এবং অন্যান্য অল্প বয়স্ক-সাহেবজাদাগণকে বন্দী করা হয়েছিল।[৬৯]

শাহাদতে হোসাইন (রা.)'র পর সাতদিন যাবৎ পৃথিবী এমন অন্ধকরাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল যে, দেওয়ালের উপর সূর্যের আলোর রঙ হালকা হলুদ মনে হতো। সাতদিন যাবৎ আকাশের তারা ভেঙে পড়েছিল। শাহাদতের দিন ১০ই মুহররম সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। ইমামের শাহাদতের পর ছয়মাস পর্যন্ত আসমানের রঙ লাল ছিল। অতঃপর ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে তা-স্বাভাবিক হয়েছিল। আসমানের কিনারায় আদৌ যে লাল রঙ পরিলক্ষিত হয়, তা শাহাদতে হোসাইন (রা.)'র পূর্বে মোটেও ছিলনা।

কেউ কেউ বলেন, হোসাইন (রা.)'র শাহাদতের দিন বাইতুল মোকাদ্দাস শহরে যে পাথর উল্টানো হতো তার নীচে তাজা রক্ত দেখা যেতো। ইরাকী ও কূফী সৈন্যদের যে সব হলুদ রঙের ঘাস ছিল তা রঙহীন হয়ে গেল। ইরাকী সৈন্যবাহিনী খাবার জন্য কোন উট যবেহ করত তখন গোশতে আগুন পরিলক্ষিত হতো। যখন গোশত রান্না করত তখন তা টক হয়ে যেতো। একদিন জনৈক ব্যক্তি হযরত হোসাইন (রা.) সম্পর্কে কটুক্তি করলে আল্লাহর হুকুমে আসমান থেকে তারকা ভেঙ্গে পড়ল, যার ফলে তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে।[৭০]

[৬৯]. নঈম উদ্দিন মোরাদাবাদী (র.) (১৩৬৭ হি.), সাওয়ানেহে কারবালা, সূত্রঃ খুতবাতে মুহররম, পৃ. ৩৮০

[৭০]. আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি.), মা ছাবাত বিস সুন্নাহ, উর্দূ, পৃ:- ৪১

রাসূল ﷺ'র দৌহিত্র ও নিরাপরাধ আহলে বাইতকে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করার পরও ইয়াযিদ বাহিনী ক্ষান্ত হয়নি বরং ইমামের শরীর থেকে জামা-কাপড় খুলে তাঁর উপর ঘোড়া চালিয়ে লাশ মোবারকের হাড্ডি পর্যন্ত চুরমার করে দিয়েছে। তাঁবুতে যারা ছিলেন তাঁদের সমস্ত কিছু ছিনিয়ে নেয় এবং পর্দানশীন মহিলাদের চাদর টেনে নিয়ে পুড়ে ছাই করে দিয়েছিল।

ইমামের মস্তক মোবারক খুলী ইবনে ইয়াযিদ এবং অন্যান্য শহীদগণের মস্তক কায়েস ইবনে আশআস ও শিমারের মাধ্যমে ইবনে যিয়াদের নিকট প্রেরণ করা হলো। ইবনে সা'দ ঐদিন কারবালায় অবস্থান করে ১১ মুহররম সকালে স্বীয় বাহিনীর যারা নিহত হয়েছিল তাদেরকে একত্রিত করে নামাযে জানাযা পড়ে কাফন-দাফন করল। কিন্তু ইমাম বাহিনীর শহীদগণ খোলা আকাশের নীচে বিনা কাফন-দাফনে পড়ে রইল এবং ইমাম জয়নুল আবেদীনসহ বাকী আহলে বাইতও খোলা আকাশের নীচে রাত কাটালেন। পরের দিন তাদেরকে বন্দী করে কূফার দিকে রওয়ানা হল ইবনে সা'দ।

ইমামের মস্তক মোবারক কূফায় ইবনে যিয়াদের নিকট পৌঁছলে, সে উপস্থিত সকলের সামনে ইমামের মস্তক মোবারক একটি পাত্রে রেখে হাতে লাঠি নিয়ে ইমামের ঠোঁট ও দাঁত মোবারকে আঘাত করতে লাগল। সেখানে উপস্থিত বৃদ্ধ সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) এই বেয়াদবী দেখে সহ্য করতে না পেরে কেঁদে কেঁদে বললেন, হে ইবনে যিয়াদ! লাঠি সরিয়ে নাও। খোদার শপথ, আমি দেখেছি যে, রাসূল ﷺ এ ঠোঁট ও দাঁতে চুমু খেয়েছিলেন। ইবনে যিয়াদ বলল, তুমি যদি বৃদ্ধ না হতে তবে তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। তখন তিনি ইবনে যিয়াদকে ভর্ৎসনা করতে করতে সেখান থেকে চলে যান।[৭১]

তারপর ইবনে যিয়াদ ইমামের মস্তক মোবারক কূফার বাজারে প্রদর্শন করে, যাতে কেউ ইয়াযিদের বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস না পায়। এরপর আহলে বাইতের মস্তক সহ বন্দীদেরকে শিমারের মাধ্যমে অত্যন্ত অপমানের সহিত তাঁদের মস্তকগুলোকে তীরের মাথায় বিদ্ধ করে জনবহুল এলাকা দিয়ে ইয়াযিদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

পথিমধ্যে রাত হলে তারা এক পাদ্রীর ঘরে আশ্রয় নেয়। পাদ্রী আহলে বাইতের এ করুণ কাহিনী শুনে তার হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। পাদ্রী তাদেরকে প্রস্তাব দিল যে, এই মস্তক মোবারক আমার কাছে এক রাতের জন্য আমানত রাখ, বিনিময়ে তোমাদেরকে দশ হাজার দিরহাম প্রদান করবো। লোভীরা প্রস্তাবে সম্মতি হলে দিরহাম প্রদান করে পাদ্রী ইমামের মস্তক মোবারক নিয়ে স্বীয় খাস কামরায় অতি যত্ন ও আদব সহকারে রেখে চেহারা মুবারক থেকে ধুলি-বালি পরিস্কার করল। অতি সম্মানের সহিত

[৭১]. তাবারী, খণ্ড-২, পৃ-২৮৭

মস্তক মোবারক সামনে রেখে যিয়ারত করতে লাগল। হঠাৎ পাদ্রী দেখতে পেল যে, মস্তক মোবারক হতে আসমান পর্যন্ত নূরের আলোয় আলোকিত হয়ে গেল। মস্তক মোবারকের এই কারামাত দেখে পাদ্রী কালিমায়ে তায়্যেবা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন এবং সকালে মস্তক মোবারক তাদের হাতে অর্পণ করে দিলেন। তারা পরবর্তী মনযিলে গিয়ে দিরহামের থলে খুলে দেখে সব দিরহাম পাথরের টুকরা হয়ে গেল। এসব টুকরার এক পিঠে লিখা আছে কুরআনের আয়াত: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُون।- যালিমদের কার্যক্রম সম্পর্কে আল্লাহকে অনবহিত মনে করোনা।[৭২]

আর দ্বিতীয় পিঠে লিখা আছে- وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ - যালিমরা অচিরেই জানতে পারবে যে, তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়?[৭৩]

ইমাম হোসাইন (রা.)'র শাহাদতের সংবাদ ইয়াযিদের নিকট সর্বপ্রথম নিয়ে আসল যাহর ইবনে কায়েস। এরপর শিমার ও মুহাদ্দর ইবনে সা'লাবা সকলের মস্তক নিয়ে ইয়াযিদের সামনে আসলে ইয়াযিদ প্রথমে খুশী হয়। পরে রাজনৈতিক পলিসি অবলম্বন করে দুর্নাম ও তিরস্কার থেকে বাঁচার জন্য হোসাইনের হত্যাকারীদেরকে ভর্ৎসনা করল। কিন্তু এজন্য কাউকে কোন শাস্তি প্রদান করেনি। বরং ইমাম হোসাইন (রা.)'র মস্তক মোবারক এক পাত্রে রেখে ঠোঁট ও দাঁতে লাঠি রেখে বলতে লাগল, আমাদের এবং এদের উদাহরণ হলো এমন, যেমন কবি হোছাইন ইবনে হাম্মাম বলেছেন, আর তা হলো, আমাদের সম্প্রদায় ইনসাফ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন কিন্তু এই তরবারী সমূহ ইনসাফ করে দিয়েছে, যা থেকে এখনো রক্ত ঝরছে।

এ সময় হযরত আবু বারযাহ (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, হে ইয়াযিদ! তুমি স্বীয় লাঠি হোসাইনের ঠোঁট ও দাঁতে লাগাচ্ছ অথচ এগুলোকে রাসূল ﷺ চুসতেন। শুন, কিয়ামতের দিন তোমাদের হাশর ইবনে যিয়াদের সাথেই হবে এবং হোসাইন (রা.) আল্লাহর রাসূলের সাথে থাকবেন। এই বলে তিনি সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন।[৭৪]

পরে ইয়াযিদ আহলে বাইতের বন্দীগণকে হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা.)'র নেতৃত্বে ও হেফাযতে সসম্মানে মদীনায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে। হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা.) আহলে বাইতের ২৫ জনকে নিয়ে মদীনায় পৌঁছলে মদীনাবাসীরা বেদনা বিদূর নয়নে তাদেরকে স্বাগতম জানালেন। তারা সোজা নবীর রওযা মোবারকে গিয়ে যিয়ারত করে মদীনায় কালাতিপাত করেন।

---

৭২. সূরা ইব্রাহীম, আয়াত-৪১

৭৩. সূরা আশ-শোআরা, আয়াত:-২২৬

৭৪. তাবারী, খণ্ড-২, পৃ:২৯৬, সূত্র খোতবাতে মুহররম, উর্দূ পৃ:৪৩৮

ইয়াযিদ বাহিনীর মক্কা মদীনায় হামলা ও নির্যাতন

ইমাম হোসাইন (রা.)'র শাহাদতের পর ইয়াযিদের দুর্বৃত্ত ও দুস্কর্ম আরো বেড়ে গেল। ব্যভিচার, সমকামিতা, হারাম কাজ, ভাই-বোনে বিবাহ, সুদ, মদ ইত্যাদি প্রকাশ্যে প্রচলন হয়ে গেল। নামাযের পাবন্দি উঠে গেল। এমনকি মুসলিম ইবনে উকবার নেতৃত্বে ১২/২২ হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা ও মক্কায় হামলার জন্য প্রেরণ করে। এই সৈন্যবাহিনী মদীনায় যুলুম-অত্যচার, হত্যা-লুন্টন করেছে। শত শত নিরাপরাধ সাহাবীকে শহীদ করে। তাবেয়ীদের প্রায় দশ হাজারের বেশী মানুষ শহীদ করেছে। সেখানখার পুত-পবিত্র মহিলাদেরকে তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত নিজেদের উপর হালাল করে নিয়েছিল। রাসূল ﷺ'র রওযা মোবারকের পবিত্রতা নষ্ট করেছে। মসজিদে নববীতে ঘোড়া বেঁধেছে, এগুলোর মল-মূত্র মসজিদের মিম্বরে পড়েছিল। তিনদিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে কেউ নামায পড়তে পারেনি। কেবল সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা.) পাগল বেশে মসজিদে উপস্থিত ছিলেন।

এক মায়ের সন্তানকে তারা হত্যা করলে সন্তানের মা উম্মে ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল্লাহর কসম খেয়েছেন যে, যদি আমি সমর্থ হই তবে এই যালিম মুসলিম ইবনে উকবাকে জ্বালিয়ে ফেলবো।

এই যালিম যখন মদীনা ধ্বংস করার পর মক্কার দিকে রওয়ানা হল, তখন পথে সে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করল। ইয়াযিদের আদেশে হোছাইন ইবনে নুমাইরকে সেনাপতি নিয়োগ করা হয়। মুসলিমকে সেখানে দাফন করে তারা মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হল। ঐ মহিলা মুসলিমের মৃত্যু সংবাদ শুনে কয়েকজন লোক নিয়ে এসে মুসলিমের কবর খনন করল। দেখল একটি বিরাট সাপ তার গর্দান পেঁচিয়ে তার নাকে দংশন করছে। লোকেরা বলল, আল্লাহ তার শাস্তি তাকে দিচ্ছেন, সুতরাং আপনি তাকে ছেড়ে দেন। মহিলা বলল, না আমাকে শপথ পূর্ণ করতেই হবে। তোমরা পায়ের দিকে তার কবর খনন করে তাকে বের করে আন। ওদিক থেকে মাটি সরানোর পর দেখা গেল সেদিকেও একটি সাপ বিদ্যমান। কিন্তু মহিলা নাছোড় বান্দা, মহিলা উযূ করে দু'রাকাত নামায পড়ে হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি ভাল করেই জান যে, এর সাথে আমার রাগ শুধু তোমার সন্তুষ্টির জন্যে। আমাকে শক্তি দাও, যাতে আমি আমার শপথ পূর্ণ করতে পারি। এই প্রার্থনা করে মহিলা একটি লাঠি দিয়ে সাপের লেজে আঘাত করা মাত্র সাপ নীরবে চলে গেল আর মহিলা মুসলিমের লাশ কবর থেকে বের করে জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলল।[৭৫]

---

৭৫. আল্লামা শফি উকাড়ভী (র) শামে কারবালা

মুসলিম ইবনে উকবার মৃত্যুর পর হোছাইন ইবনে নুমাইর সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে মক্কা শরীফে পৌঁছে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। মক্কাবাসীরা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)'র নেতৃত্বে ইয়াযিদ বাহিনীর মোকাবিলা করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ করছিল। কিন্তু তারা জয়ের মুখ দেখেনি। তারা দ্বিতীয় দিন জবলে আবু কুবাইস নামক পাহাড় থেকে 'মিনজনীক' নামক মেশিনের মাধ্যমে পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে হেরম শরীফের ময়দান পাথরে ভরে গেল এবং হেরম শরীফের দেয়াল, স্তম্ভ ও ছাদ ভেঙ্গে পড়ল। তারা পাথরের সাথে সাথে আগুনের স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করত। ফলে কা'বা শরীফে আগুন লেগে কা'বার গিলাফ পুড়ে গেল এবং হযরত ইব্রাহীম (আ.)'র প্রদত্ত কুরবানীর পশুর শিং তাবাররুক হিসেবে কা'বা শরীফে এতদিন যাবৎ সংরক্ষিত ছিল তাও পুড়ে গেল। প্রায় দু'মাস পর্যন্ত এ যুদ্ধ স্থায়ী ছিল। এ যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই ১৫ই রবিউল আউয়াল ৬২ হিজরি সনে ৩৯ বছর বয়সে ইয়াযিদ মৃত্যুবরণ করল। এ সংবাদ সর্বপ্রথম আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর জানতে পারেন। অবশেষে ইয়াযিদ বাহিনী এ সংবাদ শুনে মনোবল হারিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। এভাবে মক্কাবাসী ইয়াযিদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

আহলে বাইতকে শাহাদতকারীদের পরিণাম

ইবনে সা'দ খুলী ইবনে ইয়াযিদ, শিমার, ইবনে যিয়াদ সহ সকল হত্যাকারীদের শেষ পরিণাম ছিল অত্যন্ত খারাপ। মুখ্তার সকফী নামক একজন ব্যক্তি কূফার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করল যে, হোসাইন হত্যাকারীদের একজনকেও আমি জীবিত রাখবো না। সে হত্যাকারীদের কাউকে আগুনে পুড়ে চাই করেছে, কাউকে হত্যা করে কুকুরকে খেতে দিয়েছে। এক একজনকে এক এক রকম করে শাস্তি দিয়ে হত্যা করেছে। যারা তার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে জীবিত ছিল তারাও মৃত্যুর পূর্বে কোন না কোন খোদায়ী শাস্তিভোগ করে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়ে নিমর্মভাবে মৃত্যুবরণ করেছে।

ইয়াযিদ সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামের অভিমত

শায়খুল মুহাক্কিক আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভীর (র.) বলেন, কোন কোন ওলামা হতভাগা ইয়াযিদের উপর লা'নত করার ব্যাপারে নীরবতা পালন করেছেন আবার কেউ কেউ সীমালঙ্ঘন করে বলে ইয়াযিদ যখন মুসলমানদের ঐক্যের ভিত্তিতে খলীফা হয়েছিল তখন ইমাম হোসাইন (রা.)'র উচিত ছিল আনুগত্য প্রকাশ করা। এই মত ও আক্বীদা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। ইমাম হোসাইন (রা.) থাকা অবস্থায় সে ইমাম হলো কিভাবে এবং মুসলমানদেরও ঐকমত্য হলো কখন? সে সময়ে জীবিত

সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁদের সন্তানগণ তার আনুগত্য করেন নি। তবে হ্যাঁ একদল সাহাবী বাধ্য হয়ে তার নিকট গিয়েছিলেন সে তাদেরকে পুরস্কৃত করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু যখন তার অনিষ্ট ও দুচ্চরিত্র দেখতে পেলেন তখন তাঁরা পুনরায় মদীনায় ফেরত এসেছিলেন এবং বলেছেন, সে আল্লাহর দুশমন। সে মদ্যপায়ী, নামায পরিত্যাগকারী, ব্যভিচারী, ফাসিক, মুহরিম মহিলাদেরকে হালালকারী। যারা বলে ইয়াযিদ ইমাম হোসাইনকে হত্যার আদেশ দেয়নি এবং তাঁর শাহাদতে খুশী হয়নি- এটি ভ্রান্ত কথা। কেননা সে রাসূল ﷺ'র আহলে বাইতের সাথে শত্রুতা পোষণ করত, তাদের শাহাদতে খুশী হয়েছিল, তাদেরকে লাঞ্ছনা-বঞ্চনা করার বর্ণনা মুতাওয়াতিরভাবে সাব্যস্ত। কোন কোন আলিম বলেন, ইমাম হোসাইন (রা.)কে হত্যা করা কবীরা গুনাহ। কেননা মুসলমানকে হত্যা করা কবীরা গুনাহ, কুফরী নয়। আর লা'নত কাফেরের সাথে খাস। তারা নবীর ঐসব হাদিসের কি জবাবে দেবে? যাতে বলা হয়েছে- হযরত ফাতিমা ও তাঁর আওলাদগণের সাথে শত্রুতা পোষণ করা স্বয়ং নবী করিম ﷺ'র সাথে শত্রুতা পোষণ করার শামিল। আর নবী করিম ﷺকে কষ্ট দেওয়া কুফরী এবং স্থায়ী শাস্তির উপযোগী। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺকে কষ্ট দেয়, তাদের উপর ইহকাল ও পরকালে আল্লাহর লা'নত এবং আল্লাহ তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।[৭৬]

আবার কেউ কেউ বলেন, ইয়াযিদের শেষ পরিণাম সম্পর্কে আমরা অনবহিত। হতে পারে সে কুফর ও গুনাহ থেকে তাওবা করে নিয়েছে। ইমাম গাজ্জালী (র) এই মত পোষণ করেন। তবে অনেক মুতাকাদ্দিমীন ওলামা- যেমন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.), আল্লামা ইবনে জওযী প্রমুখ তার উপর লা'নত করেছেন। কেউ কেউ নীরবতা পালন করেছেন। আবার কেউ কেউ সরাসরি লা'নত করতে নিষেধ করেছেন।

সারকথা হলো, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অভিশপ্ত ছিল। যে কাজ সে করেছে অন্য কেউ তা করেনি। সে ইমাম হোসাইন (রা.) কে হত্যা করেছে, আহলে বাইতকে অপদস্ত করেছে, মদীনা শরীফকে ধ্বংস করেছে, মক্কা মুয়ায্যমাকে ধ্বংস করার দৃঢ় সংকল্প করেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)কে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে, এ অবস্থায় সে জাহান্নামে চলে গিয়েছে। তার তাওবা করে ফিরে আসার ব্যাপারটি আল্লাহই ভাল জানেন।[৭৭]

---

৭৬. সূরা আহযাব, আয়াত-৫৭

৭৭. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি.), তাকমীলুল ঈমান, পৃ-৭০-৭১) সূত্র গোলাম রাসূল সাঈদী, শহরহে সহীহ মুসলিম, খণ্ড-৩, পৃ-৬৩৩

আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী (র.) বলেন, ইয়াযিদ মূলত মুসলমান। আমরা এই মতই পোষণ করি। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত অকাট্য দলীল দ্বারা তার কুফরী সাব্যস্ত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মুসলমান থেকে খারিজ করা যাবে না। বিশ্লেষকগণের একদল বলেছেন, ইয়াযিদের ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হলো তাওয়াক্কুফ অবলম্বন করা অর্থাৎ কোন মন্তব্য না করা বরং তার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়া। কেননা তিনিই গোপনীয়তা সম্পর্কে ভাল জানেন। এ কারণেই আমরা ইয়াযিদকে কাফের বলা থেকে বিরত থাকি, এতেই রয়েছে নিরাপদ। অতএব আমরা বলি- সে মুসলমান ছিল তবে ফাসিক, অসৎ ও যালিম ছিল।[৭৮]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.) বলেন, ইয়াযিদ নাপাক। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐক্যমত হলো ইয়াযিদ ফাসিক, ফাজির ও স্থায়ী কবীরা গুনাহকারী। কেবল তাকে কাফির বলা যাবে কিনা কিংবা তাকে লা'নত দেয়া যাবে কিনা তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এবং তাঁর অনুসারীরা তাকে কাফির বলেন এবং নির্দিষ্ট করে নাম ধরে তার উপর লা'নত করেন। তারা দলীল হিসেবে কুরআনের আয়াত পেশ করেন: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবতঃ তোমরা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেন। অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।[৭৯]

নিঃসন্দেহে ইয়াযিদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে দিয়েছিল, হারামাঈনে তায়্যেবাইনের বে হুরমতি করেছিল। তিনি তার সমস্ত অপকর্ম তুলে ধরে অবশেষে বলেছেন যারা তার এতগুলো অপকর্মের পরেও তাকে অভিশপ্ত বলে মনে করবেনা তারাও অভিশপ্ত। তবে ইমাম আযম আবু হানিফা (র.) সতর্কতা অবলম্বন করে ইয়াযিদকে কাফির বলা থেকে নিরবতা পালন করেছেন।[৮০]

সারকথা হলো সতর্কতা অবলম্বনমূলকভাবে ইমাম আবু হানিফা (র.) ইয়াযিদকে কাফির বলেননি বরং নিরবতা পালন করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.), ইবনে জাওযী (র.) ও আল্লামা তাফতাযানী (র.) বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দিয়ে ইয়াযিদের উপর লা'নত করেছেন। তারা পবিত্র কুরআনের সূরা মুহাম্মদের ২২-২৩ নম্বর আয়াত ও মুসলিম শরীফে মদীনাবাসীর উপর ভীতি প্রদর্শন কারীর উপর আল্লাহ, ফেরেশ্তা ও সকল মানুষের লা'নত সম্পর্কীয় বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করেন। ইবনে হাজর মক্কী (র.) বলেন ইয়াযিদকে নাম ধরে নির্দিষ্টভাবে লা'নত করা বৈধ নয়। তবে সাধারণ ভাবে এভাবে বলা যাবে, যাদের মধ্যে এসব অপকর্ম পাওয়া যাবে তাদের উপর

৭৮. আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (৯৭৪হি.), আস সওয়াফেকুল মুহাররাকা, পৃ-২২১

৭৯. সূরা মুহাম্মদ, আয়াত-২২-২৩)

৮০. ইমাম আহমদ রেযা (র.) (১৩৪০ হি.), ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ, খণ্ড-৬, পৃ- ১০৭, সূত্র শরহে মুসলিম, কৃত, গোলাম রাসূল সাঈদী

আল্লাহর লা'নত হোক। অথবা এরূপও বলা যাবে- যে বা যারা হোসাইন (রা.)কে হত্যা করেছে বা হত্যার নির্দেশ দিয়েছে কিংবা হত্যাকে বৈধ সাব্যস্ত করেছে এবং যারা তাঁর হত্যায় সন্তুষ্টি হয়েছে তাদের উপর আল্লাহর লানত হোক। কেননা কুরআন ও হাদিসে নামের কথা উল্লেখ নেই। এটিই হলো সতর্কমূলক মত।[৮১]

নওফল ইবনে ফুরাত বর্ণনা করেন, হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযিয (র.)'র নিকট আমি বসা ছিলাম। এ সময় কোন এক ব্যক্তি ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়া (রা.)'র আলোচনা করতে গিয়ে তাকে আমীরুল মু'মিনীন বলেছে। তখন খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযিয (র.) বললেন, হে ব্যক্তি! তুমি ইয়াযিদকে আমীরুল মু'মিনীন বলেছ; এটাই তোমার অপরাধ। খলীফা ঐ ব্যক্তিকে এ অপরাধের শাস্তিস্বরূপ বিশটি বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেন।[৮২]

এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ

▪ হযরত ওমর ফারুক (রা.)	১ মুহররম ২৪ হিজরি
▪ হযরত শেহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (র.)	১ মুহররম ৬৩৪ হিজরি
▪ হযরত মারুফ কারখী (র.)	২ মুহররম ২০০ হিজরি
▪ হযরত হাসান বসরী (র.)	৪ মুহররম ১১০ হিজরি
▪ হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশেকর (র.)	৫ মুহররম ৬৭০/৬৬৪ হিজরি
▪ হযরত ফুযাইল ইবনে আয়ায (র.)	৭ মুহররম ১৯৬ হিজরি
▪ হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)	১০ মুহররম ৬১ হিজরি
▪ হযরত ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (র.)	১০ মুহররম ১৯৭ হিজরি
▪ হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.)	১০ মুহররম ৪৬৫ হিজরি
▪ হযরত আদম (আ.)	১১ মুহররম
▪ মুফতিয়ে আ'যম হিন্দ (র.)	১৩ মুহররম ১৪০২ হিজরি
▪ ইমাম জয়নুল আবেদীন (র.)	১৮ মুহররম ৯৩ হিজরি
▪ হযরত বেলাল (রা.)	১৯/২০ মুহররম ২০ হিজরি
▪ হযরত মখদুম আশরাফ জাঁহাগীরী (র.)	২৭/২৮ মুহররম ৮০৮ হিজরি
▪ হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ (র.)	২৯ মুহররম ১১৭৬ হিজরি।

সফর

৮১. ইবনে হাজর মক্কী (র.) (৯৭৪হি.), আস সাওয়ায়েকুল মুহাররকাহ, পৃ: ২২৩; সূত্র: শরহে মুসলিম, কৃত, গোলাম রাসূল সাঈদী

৮২. আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) (১০৫২হি.), মা ছাবাতাবিস সুন্নাহ, উর্দূ পৃ-৩৪

আরবী হিসাবে সফর মাস দ্বিতীয় মাস। জাহেলী যুগে এ মাসকে অকল্যাণের ও দুঃখ -দুর্দশার মাস মনে করা হত। মনে করা হত এ মাসে রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ বেশী পরিমাণ হয়। তবে এ ধারণা সঠিক নয়। মাসের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই।

রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সুখ ও দুঃখ দিয়ে পরীক্ষা করেন। তাই প্রত্যেক মানুষের উচিত সুখের সময় অতি উৎফুল্ল ও অহংকারী না হয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এতে আল্লাহ তাঁর নিয়ামত ও সুখ আরো বৃদ্ধি করে দেন। পক্ষান্তরে দুঃখের সময় হা-হুতাশ, আক্ষেপ ও অস্থির না হয়ে বরং ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর কাজে সন্তুষ্ট থেকে তকদীরের উপর বিশ্বাস রাখা উচিত।

পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন- مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ "আপনার যে কল্যাণ হয়, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা আপনার নিজের কারণে।[৮৩]

অপর আয়াতে বলেন- مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا "পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই কিতাবে অর্থাৎ লওহে মাহফুযে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ আছে।[৮৪]

এখানে পৃথিবীর বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানী, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, আপনজন বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ তোমাদের উপর যেসব বিপদাপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি (আল্লাহ) তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন।[৮৫]

আল্লামা নাসির উদ্দিন বায়যাভী (র.) বলেন, এ আয়াত বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের দ্বারা গুনাহ সংঘটিত হতে পারে। নবীগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। এভাবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা ও উম্মাদ ব্যক্তি দ্বারা কোন গুনাহ হতে পারে না। তারা যদি

৮৩. সূরা নিসা, আয়াত ৭৯
৮৪. সূরা আল হাদীদ, আয়াত: ২২
৮৫. সূরা আশ্‌শূরা, আয়াত, ৩০

কোন কষ্ট ও বিপদাপদে পতিত হয়, তবে তারা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কষ্টের অন্যান্য কারণ ও রহস্য থাকতে পারে। যেমন মর্যাদা উন্নীত করা ইত্যাদি।

রোগ গুনাহের কাফ্‌ফারা

عَنْ عَامِرٍ الرَّامِ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْقَامَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ عَافَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أُعْفِيَ كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ يَدْرِ لِمَ أَرْسَلُوهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْأَسْقَامُ وَاللَّهِ مَا مَرِضْتُ قَطُّ فَقَالَ قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا –

"হযরত আমের আররাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একদিন রোগ সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন- মু'মিন যখন অসুস্থ হয় অতঃপর সুস্থ হয় তখন তার রোগ গুনাহের কাফ্‌ফারা হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতের জন্য তা উপদেশ হয়। পক্ষান্তরে মুনাফিক যখন অসুস্থ হয় অতঃপর ভাল হয় তখন তার দৃষ্টান্ত হলো সেই উটের ন্যায় যেটিকে তার মালিক বেধে রেখেছিল তারপর খুলে দিয়েছিল। কেন খুলে দিল এবং কেন বেধে রেখেছিল তার মধ্যে সে জ্ঞান নেই। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি আরয করল- হে আল্লাহর রাসূল! রোগ কি? আমি কখনো অসুস্থ হইনি। রাসূল ﷺ বললেন- আমাদের কাছ থেকে উঠে যাও, তুমি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নও।[৮৬]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا مِنْ الْعَمَلِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالْحُزْنِ لِيُكَفِّرَهَا عَنْهُ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- যখন কোন মু'মিন বান্দার গুনাহ বেশী হয়ে যায় এবং তার এমন কোন আমল নেই যা তার গুনাহের কাফ্‌ফারা হতে পারে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে দুঃখ-কষ্টে পতিত করেন যাতে এর দ্বারা তার গুনাহের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়।[৮৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ أَوْ الْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- কোন মু'মিন নারী-পুরুষের সম্পদ ও

৮৬. আবু দাউদ (র.) (২৭৫ হি.) সূত্র মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৭
৮৭. ইমাম আহমদ (র.) (২৪১ হি.), সূত্র, মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৮

সন্তান-সন্ততির উপর যখন বালা-মুছিবত আসে তখন এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।[৮৮]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ السَّلَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنْ اللَّهِ

মুহাম্মদ ইবনে খালিদ তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যখন বান্দার জন্য আল্লাহর ইলমে কোন মর্যাদা নির্ধারিত থাকে কিন্তু সে আমল দ্বারা ঐ মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনা তখন আল্লাহ তায়ালা তার শরীরে বা তার সম্পদে কিংবা তার আওলাদদেরকে বালা-মুছিবতে পতিত করেন। অতঃপর তিনি তাকে ধৈর্য্য প্রদান করেন। ফলে সে সেই মর্যাদায় পৌঁছে যায় যা আল্লাহর ইলমে ছিল।[৮৯]

عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ

হযরত সুলায়মান ইবনে সুরাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি পেট ব্যাথায় মৃত্যু বরণ করবে তাকে কবরে আযাব দেওয়া হবে না।[৯০]

عَنْ أَوْسِ بْنَ شَدَّادَ وَالصُّنَابِحِيُّ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى رَجُلٍ مَرِيضٍ يَعُودُنَهُ أَنَّهُ فَقَالَا لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ قَالَ أَصْبَحْتُ بِنِعْمَةٍ قَالَ شَدَّادٌ أَبْشِرْ بِكَفَّارَاتِ السَّيِّئَاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِذَا انَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنْ الْخَطَايَا وَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارك وَتَعَالَى أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي وَابْتَلَيْتُهُ فَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ

হযরত আওস ইবনে শাদ্দাদ এবং সুনাবিখী (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমরা উভয়ে এক রুগ্ন ব্যক্তির ঘরে তার সেবা করার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করলাম। তাকে বললাম, তুমি কোন অবস্থায় সকাল করেছ? উত্তরে সে বলল, নিয়ামতের উপর সকাল করেছি। হযরত শাদ্দাদ (রা.) বলেন- তোমার জন্য সুসংবাদ তোমার গুনাহ ক্ষমা ও ভুল-ত্রুটি মার্জনা হওয়ার কারণে। কেননা আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি- নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বলেন- যখন আমি কোন মু'মিন বান্দাকে কোন রোগে আক্রান্ত করি এবং রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বান্দা আমার প্রশংসা করে তখন সে রোগের বিছানা থেকে এমনভাবে

[৮৮]. ইমাম তিরমিযী ও ইমাম মালিক (র.), সূত্র, মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৬
[৮৯]. ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু দাউদ (র.), সূত্র মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৭
[৯০]. ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরমিযী (র.), সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৭

গুনাহ থেকে পাক-পবিত্র হয়ে উঠে যেন তার মা তাকে আজই নিষ্পাপ প্রসব করেছে। আর আল্লাহ তায়ালা বলেন- আমি আমার বান্দাকে বন্দী করেছি এবং মুছিবতে পতিত করেছি, হে ফেরেশ্তারা! তোমরা ঐ আমল তার আমলনামায় লিখ যা তার সুস্থ অবস্থায় লিখতে।[৯১]

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا ابْتَلَاء الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ قِيْلَ لِلْمَلَكِ اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَلَهُ وَرَحِمَهُ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যখন কোন মুসলমান শারিরীক কোন মুছিবতে পতিত হয় তখন দায়িত্ববান ফেরেশ্তাকে বলা হয় তুমি তার আমলনামায় এমন আমল লিখ যা সে সুস্থ অবস্থায় করত। যদি সে রোগ থেকে ভাল হয় তখন তার গুনাহ ধুয়ে পবিত্র হয়ে যায় আর মৃত্যুবরণ করলে তাকে ক্ষমা ও দোয়া করা হয়।[৯২]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- আমি রাসূল ﷺ'র নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলাম তিনি প্রচণ্ড জ্বরে কাঁপছেন। আমি তাঁর শরীর স্পর্শ করে বললাম-আপনি তো প্রচণ্ড জ্বরে কাঁপছেন। তিনি বললেন- হ্যাঁ, আমি তোমাদের দু'জনের সমান জ্বরে কাঁপছি। আমি বললাম- তা কি এজন্য যে, আপনার দ্বিগুণ সাওয়াব হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যার হাতে আমার জীবন, সেই সত্ত্বার নামে শপথ করে বলছি, পৃথিবীতে যে কোন মুসলমানের রোগ কিংবা অন্য কোন মুসিবত হয়, তার বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহ সমূহ এমনভাবে ঝরিয়ে দেন যেভাবে বৃক্ষ তার পাতা ঝেড়ে পেলে।[৯৩]

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) বলেন- আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর মু'মিন বান্দাকে অসুখে ফেলেন, তখন তিনি বান্দার বাম দিকের ফেরেশ্তাকে বলেন- তার উপর থেকে কলম উঠিয়ে রাখ অর্থাৎ তার গুনাহ লিখবে না। আর ডানদিকের ফেরেশ্তাকে বলেন- আমার বান্দা সুস্থ থাকতে সবচেয়ে সুন্দররূপে যেমন আমল করত সেরূপ আমল লিখে যেতে থাক। কেননা সে আমার বন্ধনে আবদ্ধ।

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- অসুস্থ ব্যক্তির কাতরানো তাসবীহ পাঠের তুল্য, তার চিৎকার কালেমার যিকির করার তুল্য, তার চড়া শ্বাস সদকা তুল্য, তার নিদ্রা ইবাদত তুল্য, তার এপাশ থেকে ওপাশ ফেরা আল্লাহর পথে জিহাদতুল্য এবং সে সুস্থ অবস্থায়

[৯১]. ইমাম আহমদ (র.) (২৪১ হি.), সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৭
[৯২]. শায়খ অলি উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) (৭৪০ হি.), মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৬, ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দি (র.) (৩৭৩ হি.) তাম্বীহুল গাফেলীন, বাংলা, পৃ. ১৫৬
[৯৩]. ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দি (র.), (৩৭৩ হি.) তামীহুল গাফেলীন, বাংলা, পৃ. ৫৫৫

সবচেয়ে সুন্দর যেরূপ আমল করত সেরূপ আমলের সাওয়াবের ন্যায় সাওয়াব তার জন্য লিখা হতে থাকে।[৯৪]

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- যে বান্দাকে আমি দয়া করতে চাই, তাকে আমি দুনিয়া থেকে নিয়ে আসার পূর্বেই তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবো শরীরে কোন রোগ কিংবা জীবিকায় সংকীর্ণতা দিয়ে। যদি এরপরও কিছু গুনাহ থেকে যায়, তাহলে আমি তার মৃত্যু যন্ত্রণা তীব্র করি দেই। ফলে সে আমার নিকট সদ্য প্রসূত সন্তানের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে আসে। আর আমি যদি কোন বান্দাকে আযাব দিতে চাই, তাহলে তাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে আসার পূর্বেই তার ভাল কাজের পূর্ণ প্রতিদান দিয়ে দেই তার শারীরিক সুস্থত কিংবা জীবিকার সচ্ছলতা প্রদানের মাধ্যমে। যদি এরপরও কিছু নেকী থেকে যায় তাহলে তার মৃত্যু যন্ত্রণা লাগব করে দেই। ফলে সে যখন আমার নিকট আসে, তখন তার আর কোন নেকী থাকে না।[৯৫]

রোগীর সেবা করার ফযিলত

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ

হযরত আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- তোমরা ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, রোগীর সেবা কর এবং বন্দী মুক্ত কর।[৯৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে। ১. সালামের উত্তর দেওয়া ২. রোগীর সেবা করা, ৩. জানাযায় অংশগ্রহণ করা ৪. দাওয়াত কবুল করা ও ৫. হাঁচির উত্তর দেওয়া।[৯৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ يَا رَبِّ

[৯৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭
[৯৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৮
[৯৬]. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি.), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৩
[৯৭]. ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৩

وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবসে বলবেন- হে বনী আদম! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমার সেবা করনি। বান্দা বলবে- হে আমার প্রভু! কিভাবে আপনার সেবা করবো? আপনি সমগ্র জগতের পালনকর্তা! আল্লাহ বলবেন তুমি কি জাননা? আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল তুমি তার সেবা করনি। জেনে রাখ, তুমি যদি তার সেবা করতে তাহলে তুমি আমাকে তার কাছে পেতে। হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি। বান্দা বলবে- হে প্রভু! আমি কিভাবে আপনাকে খাবার খাওয়াবো? আপনি সমগ্র জগতের পালনকর্তা। আল্লাহ বলবেন- আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাওনি। যদি তুমি তাকে খাবার খাওয়াতে তবে তুমি এর প্রতিদান আমার কাছে পেতে। হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। বান্দা বলবে হে প্রভু! আপনি তো সমগ্র জগতের পালনকর্তা, আপনাকে কিভাবে পানি পান করাবো? আল্লাহ বলবেন- আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পানি পান করাওনি। যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে তাহলে তার প্রতিদান আমার নিকট পেতে।[৯৮]

রোগীর সেবকের জন্য ফেরেশ্তার মাগফিরাত কামনা

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি- কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমান রোগীর সকাল বেলা সেবা করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশ্তা তার জন্য মাগফিরাত কামনা করে। আর যদি সন্ধ্যা বেলা সেবা করে তাহলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশ্তা তার জন্য মাগফিরাত কামনা করে। আর তার জন্য রয়েছে জান্নাতে বিস্তৃত বাগান।[৯৯]

[৯৮]. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি.), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৩
[৯৯]. ইমাম তিরমিযী ও আবু দাউদ (র.), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৫

জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيفًا

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি উত্তমভাবে উযূ করে এবং তার অসুস্থ মুসলমান ভাইয়ের নিষ্ঠার সাথে সেবা করে তাকে জাহান্নাম থেকে ষাট বছরের রাস্তা পরিমান দূরে রাখা হবে।[১০০]

জান্নাত লাভ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّتَ مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যখন কোন ব্যক্তি কোন রোগীর সেবা করতে রওয়ানা হয় তখন আসমান থেকে আহ্বানকারী আহ্বান করে বলেন- তুমি খুবই উত্তম, তোমার চলা উত্তম এবং তুমি জান্নাতের একটি মনযিলকে নিজের ঠিকানা করে নিয়েছ।"[১০১]

আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হয়

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ الرَّحْمَةَ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যখন কোন ব্যক্তি কোন রোগীর সেবা করতে যায়, তখন সর্বদা সে আল্লাহর রহমতে প্রবিষ্ট থাকে। অতঃপর যখন বসে তখন আল্লাহর রহমতের সাগরে ডুবন্ত থাকে।[১০২]

রোগের কারণে মৃত্যুবরণ করলে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا أَوْ وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنْ الْجَنَّةِ

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রুগ্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল সে যেন শহীদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল অথবা

১০০. ইমাম আবু দাউদ (র.) (২৭৫ হি.), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৫
১০১. ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) (২৭৩ হি.), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৭
১০২. ইমাম মালিক ও আহমদ (র.), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৮

তাকে কবরের ফিত্না থেকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং তাকে সকাল-সন্ধ্যা জান্নাতের রিযিক প্রদান করা হবে।[১০৩]

বিধর্মী রোগীর সেবা

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ইহুদী বালক রাসূল ﷺ'র খেদমতে হাযির হতো। সে অসুস্থ হলে রাসূল ﷺ তার সেবার জন্য তাকে দেখতে যান। তিনি তার মাথার দিকে বসে বললেন- তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। সে তার পাশে অবস্থিত তার পিতার দিকে তাকাল। পিতা বলল, হে বৎস! তুমি আবুল কাসেমের অনুগত হও। অতঃপর বালক ইসলাম গ্রহণ করল। রাসূল ﷺ এই বলে বেরিয়ে আসলেন যে, সকল প্রশংসা সেই প্রভুর জন্য, যিনি এই বালককে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন।[১০৪]

প্রসিদ্ধ আছে যে, এক অমুসলিম বৃদ্ধা রাসূল ﷺ'র চলার পথে কাঁটা পুতে রাখত। সে বৃদ্ধা অসুস্থ হলে রাসূল ﷺ তাকে সেবার উদ্দেশ্যে দেখতে যান। রাসূল ﷺ'র উত্তম আদর্শ ও চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে সেই বৃদ্ধা কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

রোগীর কাছে দোয়া চাওয়া

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- যখন তুমি কোন রোগীর নিকট প্রবেশ করবে তখন তাকে তোমার জন্য দোয়া করতে বলবে। কেননা রোগীর দোয়া ফেরেশ্তাদের দোয়ার ন্যায়।[১০৫]

রোগীকে সান্ত্বনা দেওয়া

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَهُ فِي أَجَلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَيُطَيِّبُ نَفْسَهُ

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত,

১০৩. ইমাম ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী (র.), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৯
১০৪. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি.), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৭
১০৫. ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) (২৭৩ হি.), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৮

তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- যখন তোমরা কোন রোগীর নিকট প্রবেশ করবে তার সেবার উদ্দেশ্যে, তখন তাকে সান্ত্বনা দাও এবং তার দুঃখ-লাঘব করার চেষ্টা কর। যদিও এই সান্ত্বনা আল্লাহর হুকুমকে পরিবর্তন করতে পারবেনা কিন্তু রোগীর মনে ক্ষণিকের জন্য হলেও প্রশান্তি লাভ করবে।[১০৬]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ قَالَ عَلَى يَدِهِ فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمْ الْمُصَافَحَةُ

হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- রোগীর সেবা পূর্ণতা লাভ করে তার মাথায় হাত রেখে কিংবা তার হাতে হাত রেখে তার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করা দ্বারা আর তোমাদের সালাম পূর্ণতা লাভ করে করমর্দনের দ্বারা।[১০৭]

মৃত্যু

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে সফলকাম হবে। আর পার্থিব জীবন ধোকা তথা প্রতারণার উপকরণ।[১০৮]

মানুষের যাবতীয় কার্যক্রম জীবন মরণের সাথে সম্পৃক্ত। এ দু'টিকে হায়াত ও মওত বলা হয়। মানুষের রূহের সম্পর্ক শরীরের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে হায়াত আর সম্পর্ক চিহ্ন হলে মওত বলা হয়। মৃত্যু মানে সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়া নয় বরং এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়া। এ অর্থে মৃত্যুকে ইন্তেকালও বলা হয়। অর্থাৎ সাময়িক স্থান ত্যাগ করে স্থায়ী বাসস্থানে চলে যাওয়া।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন- قال العلماء: الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته، وحيلولة بينهما، وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار. ওলামাগণ বলেন মৃত্যু কেবল অস্তিত্বহীন এবং ধ্বংসের নাম নয়। বরং দেহ থেকে রূহের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার নাম এবং এমন একটি পর্দা যা রূহ ও শরীরের মধ্যে পৃথক করে দেয়। এক ঘর থেকে অন্য ঘরের দিকে পরিবর্তন হওয়ার নাম হলো মৃত্যু।[১০৯]

আল্লাহ তায়ালা হায়াত ও মওত সৃষ্টি করেছেন মানুষের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন- الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا যিনি

১০৬. ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ (র.), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৭
১০৭. ইমাম আহমদ ও তিরমিযী (র.), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪০২
১০৮. সূরা আলে ইমরান, আয়াত, ১৮৫
১০৯. জালাল উদ্দিন সুয়ূতীর (র.) (৯১১ হি.), শরহুস সদুর, বৈরুত, পৃ. ১২

সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন। যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ?

আল্লাহ পাক এ আয়াতে একথা বলেননি যে, কার কর্ম বেশী বরং বলেছেন কার কর্ম উত্তম, ভাল ও নিখুঁত। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর কাছে কর্ম বেশীর চেয়ে নিখুঁত ও নির্ভুল হওয়াই ধর্তব্য। এ জন্যে কিয়ামতের দিন মানুষের কর্ম বা আমল গণনা করা হবে না বরং ওযন করা হবে। এতে কোন কোন স্বল্প ও তুচ্ছ আমলের ওযন হাজারো আমলের ওযনের চেয়ে ভারী হবে।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হায়াতের পূর্বে মওতের উল্লেখ করে মৃত্যুর অনিবার্যতা ও নিশ্চয়তাকে সুদৃঢ় করেছেন। হায়াতের পূর্বেই মওত সৃষ্টি করেছেন তিনি।

পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তুর অস্বীকারকারী পরিলক্ষিত হয়। এমনকি আল্লাহর অস্তিত্ব, ক্ষমতা, ফেরেশ্তা, জান্নাত, দোযখ, নবীগণের নবুয়ত অস্বীকারকারীও কম নয়। কিন্তু এ পর্যন্ত মৃত্যুর অস্বীকারকারী কাউকে দেখা যায়নি। সুতরাং মৃত্যু সবর্জন স্বীকৃত বিষয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন- قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখামুখি হবে।[১১০]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন- أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ তোমরা যেখানেই থাকনা কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই- যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর।[১১১]

সমগ্র জগতে কেবল আল্লাহই হলেন চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব, তার মৃত্যু নেই। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ভূ-পৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। কেবল আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া।[১১২] অন্যত্র বলেছেন- كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ আল্লাহর সত্তা ছাড়া বাকী সবকিছু ধ্বংসশীল।[১১৩]

অতএব, মৃত্যু যেহেতু অনিবার্য এবং এর থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না, তাই মানুষের উচিত হলো সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা আর প্রতিনিয়ত মৃত্যুর স্মরণ করা। কার মৃত্যু কখন কোথায় কি অবস্থায় আসবে কেউ জানেনা।

১১০. সূরা জুমআহ, আয়াত: ৮
১১১. সূরা নিসা, আয়াত, ৭৮
১১২. সূরা আর রহমান, আয়াত, ২৬ ও ২৭
১১৩. সূরা কাসাস, আয়াত ৮৮

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একদিন আমার উভয় কাঁধ ধরে বললেন- তুমি এ পৃথিবীতে একজন মুসাফির অথবা পথযাত্রীর ন্যায় থাক। ইবনে ওমর (রা.) বলতেন- তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে ভোরের অপেক্ষা করোনা এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করোনা। তোমার সুস্থতার অবকাশে পীড়িত অবস্থার জন্য সঞ্চয় করে রেখো আর জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিও।[১১৪]

মৃত্যুর সময় নির্ধারিত

প্রত্যেক বস্তুর মৃত্যু নির্ধারিত সময়ে হয়। এতে বিন্দুমাত্রও আগে-পরে হয়না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে। যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে।[১১৫]

অন্যত্র বলেছেন- وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ যদি আল্লাহ লোকদেরকে তাদের অন্যায় কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূ-পৃষ্ঠে চলমান কোন কিছুকেই ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না।[১১৬]

আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অতঃপর সে বলবে- হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরো কিছুকাল অবকাশ দিলেনা

১১৪. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬ হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড ২য় পৃ. ৯৪৯, হাদিস নং ৫৯৭৪
১১৫. সূরা আল আ'রাফ, আয়াত: ৩৪
১১৬. সূরা নাহ্‌ল, আয়াত: ৬১

কেন? তাহলে আমি সদ্‌কা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় (মৃত্যু) যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে জ্ঞাত।"[১১৭]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলতেন- إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ যখন তোমার সন্ধ্যা হবে তখন তুমি সকালের অপেক্ষা করো না, যখন তোমার সকাল হবে তখন সন্ধার জন্য অপেক্ষা করোনা এবং তোমার সুস্থতার সময় অসুস্থ অবস্থার জন্য উপার্জন কর আর তোমার জীবিত সময়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।[১১৮]

রাসূল ﷺ হযরত ইবনে ওমর (রা.)কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন- خذ من صحتك لسقمك ومن شبابك لهرمك ومن فراغك لشغلك ومن حياتك لموتك لاَ تَدْرِي مَا اسْمُكَ غَدًا তোমার সুস্থ অবস্থায় অসুস্থতার জন্য যৌবনের সময় বার্ধক্যের জন্য, অবসর সময়কে ব্যস্ততার জন্য এবং হায়াতকে মওতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।[১১৯]

মৃত্যুর স্মরণ উপকারী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتَ

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুর অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।[১২০]

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, হে হাবীবে খোদা! কোন ব্যক্তি শাহাদত বরণ না করেও কি শহীদগণের মর্তবা লাভ করতে পারে? উত্তরে তিনি বললেন, দৈনিক বিশ বার মৃত্যুকে স্মরণকারী ব্যক্তি শাহাদতের মর্তবা অর্জন করতে পারে।[১২১]

ان امرة اشتكت الى عائشة رضى الله عنها القسوة فقالت اكثرى ذكر الموت يرق قَلْبَكَ

একদিন হযরত আয়েশা (রা.)'র নিকট এক মহিলা এসে তার কঠোর অন্তরের কথা ব্যক্ত

১১৭. সূরা মুনাফিকুন, আয়াত; ১০ ও ১১
১১৮. বুখারী শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৯
১১৯. তাফ্‌সীরে জিয়াউল কুরআন, সূত্র: মওত কা মানযার, পৃ. ৩১
১২০. তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৪০
১২১. ইমাম গাজ্জালী (র.) (৫০৫ হি.) কিমিয়ায়ে সায়াদাত, পৃ. ৭৩৪ ও আব্দুর রহমান সফুরী (র.) (৮৯৪ হি.) নুযহাতুল মাজালিস, পৃ. ৫১, সূত্র: মাওয়ায়েযে রেজভীয়্যাহ, খণ্ড-২ পৃ. ১৬

করলে তিনি বললেন- তুমি মৃত্যুকে বেশী করে স্মরণ করতে থাক। ফলে তোমার অন্তর নরম হয়ে যাবে।[১২২]

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) বর্ণনা করেন- রাসূল ﷺ একদল লোককে হাসতে দেখে বলেন- শোন, তোমরা যদি সকল স্বাদ নাশকারী (মৃত্যুর) স্মরণ অধিক পরিমাণে করতে, তাহলে আমি যা দেখছি তাতে তোমরা লিপ্ত হতেনা। অতঃপর তিনি বলেন- তোমরা অধিক পরিমাণে সকল স্বাদ নাশকারী (মৃত্যু)কে স্মরণ করো। তারপর তিনি বলেন- কবর হয়ত জান্নাতের একটি বাগান হবে নতুবা জাহান্নামের একটি গর্ত হবে।[১২৩]

اخرج ابن ماجه عن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي المؤمنين اكيسُ قال اكثرهم للموت ذكرًا واحسنهم لما بعده استعدادًا اؤلئك الاكياس

ইবনে মাজাহ (র.) হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি বলেন- যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে এবং মৃত্যুর পরের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এরাই হলো সর্বোচ্চ জ্ঞানী।[১২৪]

قال ابو حامد لفاف من اكثر ذكر الموت اكرم بثلاثة اشياء تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة ومن نسى الموت عوقب بثلاثة اشياء تسويف التوبة وترك الرضا بالكفافى والتكاسل فى العبادة وقال التيمى شيئانِ قطعا عنّى لذّة الدنيا ذكر الموت وذكر الوقوف بين يدى الله تعالي –

اخرجه ابن ابى الدنيا

ইবনে আবিদ দুনিয়া (র.) থেকে বর্ণিত, আবু হামেদ লাফফাফ বলেন- যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক পরিমাণ স্মরণ করবে সে তিনটি নিয়ামত প্রাপ্ত হবে। ১. দ্রুত তাওবা তাওফীক হবে ২. অন্তরে অল্প তুষ্ট নসীব হবে এবং ৩. ইবাদতে তৃপ্তি লাভ হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভুলে যাবে তার উপর তিনটি বিপদ অবতীর্ণ হবে। ১. তাওবা করতে বিলম্ব হবে ২. অধৈর্য ও অপরিতৃপ্ত হবে ৩. ইবাদতে অলসতা করবে।

হযরত তাইমী (র.) বলেন, দু'টি বিষয়ে আমাকে পার্থিব যাবতীয় সুখ-শান্তিকে অসার করে দিয়েছে। ১. মৃত্যুর স্মরণ ও ২. মহান আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া।[১২৫]

اخرج ابن ابى الدنيا عن رجاء بن حيوة قال ما اكثر عبد ذكر الموت الا ترك الفرح والحسد

ইবনে আবিদ দুনিয়া (র.) হযরত রাজা ইবনে হায়াত (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি

[১২২]. আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.) শরহুস সুদূর, বৈরুত, পৃ. ২২
[১২৩]. ফকীহ আবুল লাইস (র.) (৩৭৫ হি.) তাম্বীহুল গাফেলীন, বাংলা পৃ. ৩৭
[১২৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
[১২৫]. প্রাগুক্ত, পৃ- ২০

বলেন, যে বান্দাহ অধিক পরিমাণ মৃত্যুর স্মরণ করবে, সে উৎফুল্ল ও হিংসা পরিত্যাগ করবে।[১২৬]

اخرج الطبرانى عن طارق المحاربى قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم اِسْتَعِدْ للموت قبل الموت

তাবরানী তারিক মুহারিবী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে বলেছেন– মৃত্যু আসার আগেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাক।[১২৭]

যেসব কাজ মৃত্যুর স্মরণে সহায়ক

اخرج مسلم عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكر الموت

ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা এর দ্বারা মৃত্যুর স্মরণ আসে।[১২৮]

اخرج الحاكم عن ابى ذر قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم زر القبور تذكرها الاخرة واغسل الموتى فان معالجة جسد خاو موعظة بليغة وصل على الجنائز لعل ذالك يحزنك فان الحزين فى ظل الله يتعرض لكل خير–

হাকেম হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি কবরসমূহ যিয়ারত কর। এতে পরকালের স্মরণ আসবে, মুর্দাকে গোসল দিও, কেননা মুর্দার শরীর স্পর্শ করা বড় উপদেশ এবং জানাযার নামায পড়। এটি তোমাকে চিন্তিত করবে। আর চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তি আল্লাহর (রহমতের) ছায়ায় থাকে এবং সর্বপ্রকার ভাল কাজ করতে সক্ষম হয়।[১২৯]

মৃত্যুরও মৃত্যু হবে

জান্নাতিরা জান্নাতে যাওয়ার পর মৃত্যুর কারণে কোন জান্নাতের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে কিনা সর্বদা চিন্তিত থাকবে। পক্ষান্তরে জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার পর মৃত্যুর মাধ্যমে একদিন আযাব থেকে মুক্তি লাভের আশা পোষণ করবে। তাদের এই ভয় ও আশা দূরীভূত করার ব্যাপারে হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– **إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَصَارَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ أُتِيَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ** –

[১২৬]. প্রাগুক্ত, পৃ- ২১
[১২৭]. প্রাগুক্ত
[১২৮]. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), শরহুস সুদূর, বৈরুত, পৃ-২৩
[১২৯]. প্রাগুক্ত, পৃ-২৩

الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে তখন মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে আর জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যখানে রেখে মৃত্যুকে যবেহ করে দেয়া হবে। তারপর ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসী এখন আর মৃত্যু নেই, হে জাহান্নামীরা এখন আর কোন মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতীরা আনন্দের উপর আনন্দিত হবে আর জাহান্নামীরা দুঃখের উপর দুঃখিত হবে।[১৩০]

মৃত্যুর ফযিলত

اخرج الحاكم فى المستدرك والطبرانى فى الكبير وابن المبارك فى الزهد والبيهقي فى شعب الايمان عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت–

ইমাম হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে, তাবরানী আল কবীর গ্রন্থে, ইবনে মুবারক আয যুহদ গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– মৃত্যু মু'মিনের জন্য তোহফা।[১৩১]

اخرج الديلمى فى مسند الفردوس عن الحسين بن على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الموت ريحانة المؤمن

দায়লামী মুসনাদে ফেরদৌস গ্রন্থে হযরত হাসান ইবনে আলি (র.) থেকে বর্ণনা করেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, মৃত্যু মু'মিনের ফুল।[১৩২]

اخرج احمد وسعيد بن منصور فى سننه بسند صحيح عن محمود بن لبيد ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اثنتان يكره هما ابن آدم يكره الموت والموت خير له من الفتنة ويكره قلة المال وقلة المال اقل للحساب–

ইমাম আহমদ ও সাঈদ ইবনে মনসূর (র.) স্বীয় সুনান গ্রন্থে বিশুদ্ধ সূত্রে হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– দু'টি বস্তুকে মানবজাতি অপছন্দ করে। এক. মৃত্যুকে অপছন্দ করে অথচ মৃত্যু তার জন্য

১৩০. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি), সহীহ মুসলিম, হাদিস নং- ৭০৫৬
১৩১. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), শরহুসুদূর, বৈরুত, পৃ-১২
১৩২. প্রাগুক্ত

ফিতনার চেয়ে উত্তম। দুই. ধনসম্পদের স্বল্পতাকে অপছন্দ করে অথচ সম্পদের স্বল্পতার কারণে কিয়ামত দিবসে তার হিসাব কম হবে।[১৩৩]

اخرج ابن المبارك والطبرانى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وفتنه فاذا فارق الدنيا فارق السجن والفتنة–

আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক ও তাবরানী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন– নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা ও মুসিবত। যখন দুনিয়া থেকে পৃথক হবে তখন জেলখানা ও বালা-মুসিবত হতেও মুক্তি লাভ করবে।[১৩৪]

اخرج ابو نعيم عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لابى ذر يا اباذر الدنيا سجن المؤمن والقبرامنه والجنة مصيره يا اباذر الدنيا جنة الكافر والقبر عذابه والنار مصيره

আবু নঈম (র.) ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ হযরত আবু যর গিফারী (রা.)কে বললেন– হে আবু যর! দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা আর কবর নিরাপদ স্থান এবং জান্নাত তার স্থায়ী ঠিকানা। হে আবু যর! দুনিয়া কাফিরদের জন্য জান্নাত আর কবর তার জন্য শাস্তির স্থান এবং জাহান্নাম তার স্থায়ী ঠিকানা।[১৩৫]

اخرج ابن سعد فى الطبقات والبيهقى فى الشعب عن ابى الدرداء قال احبّ الفقر تواضعًا لربى واحب الموت اشتياقًا لربى واحب المرض تكفيرًا لخطيّى–

ইবনে সা'দ (র.) তাবকাত গ্রন্থে ও বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আমি অভাবগ্রস্থ হওয়াকে ভালবাসি আমার প্রভুর নিকট বিনম্র ও বিনয়ী হওয়ার জন্য। মৃত্যুকে ভালবাসি স্বীয় প্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য এবং রোগকে ভালবাসি স্বীয় গুনাহ মাপের কারণে।[১৩৬]

اخرج عن سفيان قال كان يقول الموت راحة العابد

ইবনে আবিদ দুনিয়া (র.) হযরত সুফিয়ান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– মৃত্যু আবেদের জন্য প্রশান্তি।[১৩৭]

১৩৩. প্রাগুক্ত পৃ- ১৩
১৩৪. প্রাগুক্ত
১৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ-১৪
১৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ-১৫
১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ-১৮

মৃত্যু কামনা না জায়েয

اخرج مسلم عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايتمنين احدكم الموت ولايدع به من قبل ان يأتيه انه اذا مات احدكم انقطع عمله وانه لايزيد المؤمن من عمره الا خيرًا

ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যু আসার পূর্বে মৃত্যুকে আহবান করবেনা। কেননা তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায় অথচ মু'মিনের জন্য দীর্ঘ জীবন উত্তম।[১৩৮]

اخرج احمد والبزار وابو يعلى والحاكم والبيهقى فى شعب الايمان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتمنوا الموت فان هول المطلع شديد وان من السعادة ان يطول عمر الْمَرْءِ حتى يرزقهُ الله الانابة–

ইমাম আহমদ, বাযযার, আবু ইয়ালা, হাকেম ও বায়হাকী (র.) শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা মৃত্যু কামনা করিওনা। কেননা মৃত্যু যন্ত্রণা বড়ই কঠিন। মানুষের হায়াত দীর্ঘ হওয়া সৌভাগ্যের আলামত। আল্লাহ তা'আলা তাকে গুনাহ থেকে ফিরে আসার তৌফিকও দিতে পারেন।[১৩৯]

اخرج المروزي عن القاسم مولى معاوية ان سعد بن ابى وقاص تمن الموت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتمن الموت فان كنت من اهل الجنة فالبقاء خيرلك وان كنت من اهل النار فما يعجلك اِلَيْهَا–

মারওয়াযী (র.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)'র আযাদকৃত গোলাম কাসেম থেকে বর্ণনা করেন– হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) মৃত্যু কামনা করলে রাসূল ﷺ তা শ্রবণ করলেন। তিনি বললেন, মৃত্যু কামনা করো না। কেননা তুমি যদি জান্নাতবাসী হও, তবে তোমার হায়াত উত্তম আর যদি জাহান্নামী হও, তবে তাতে দ্রুত যেতে চাও কেন?[১৪০]

اخرج احمد وابو يعلى والطبرانى والحاكم عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنّ رَسُولَ اللّه ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَعمه الْعَبَّاسُ يشتكى فتمنى الْمَوْتَ، فَقَالَ له :يَا عَمُّ، لا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ، فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا، فَإِنْ تُؤَخِّرُ تَزْدَادُ حُسْنًا إِلَى إِحْسَانِكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئًا، فَإِنْ تُؤَخِّرُ تَسْتَعْتِبُ مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَكَ، فَلا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ.

১৩৮. ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি) শরহুস সুদূর, বৈরুত, পৃ- ৫
১৩৯. ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি) শরহুস সুদূর, বৈরুত, পৃ- ৫
১৪০. ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি) শরহুস সুদূর, বৈরুত, পৃ- ৬

ইমাম আহমদ, আবু ইয়ালা, তাবরানী ও হাকেম (র.) উম্মে ফজল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন– রাসূল ﷺ তাঁদের ঘরে প্রবেশ করেন এ সময় তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (র.) অসুস্থ ছিলেন। ফলে মৃত্যু কামনা করছিলেন। অতঃপর তিনি তাকে বললেন– হে চাচা! মৃত্যু কামনা করবেন না। কেননা যদি আপনি নেককার হন, তাহলে বিলম্বে মৃত্যুবরণ করা এবং নেক কাজ বেশী হওয়াই আপনার জন্য মঙ্গলজনক। আর যদি বদকার হন তাহলেও বিলম্বে মৃত্যুবরণ করা এবং তাওবা করে নেওয়াই আপনার জন্য উত্তম। সুতরাং কখনো মৃত্যু কামনা করবেন না।[১৪১]

মৃত্যুর স্মরণ করা আমল দুরস্ত করার ক্ষেত্রে বড়ই উপকারী। তবে বালা মুসিবত কিংবা রোগ বালাই থেকে মুক্তি লাভের জন্য নেককার হোক কিংবা বদকার হোক কারো জন্য মৃত্যু কামনা করা জায়েয নেই। কারণ যদি সে নেককার হয় তাহলে তার দীর্ঘ হায়াতের কারণে তার নেকী বৃদ্ধি পাবে আর যদি গুনাহগারও হয় তাহলে আল্লাহ তাকে মৃত্যুর পূর্বে তাওবা নসীব করতে পারেন। যা দ্বারা সে গুনাহ মুক্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারবে।

এ ব্যাপারে হাদিস শরীফে আছে– **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ** হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা কেউ মৃত্যু কামনা করবেনা। কেননা যদি সে নেককার হয়, তাহলে তার নেকী বৃদ্ধি পাবে (দীর্ঘ জীবনের দ্বারা) আর যদি সে গুনাহগার হয়, তাহলে হতে পারে সে তাওবা করে গুনাহ মুক্ত হয়ে যাবে।[১৪২] তবে ঈমান রক্ষার্থে ফিৎনা থেকে বাঁচার জন্য মৃত্যু কমনা করা যায়। যেমন হাদিস শরীফে আছে–

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– কোন মুসিবতের কারণে তোমাদের কেউ মৃত্যু কামনা করবেনা। যদি একান্তই করতে হয় তবে এভাবে বলবে– হে আল্লাহ! আমার জীবন যদি আমার জন্য কল্যাণকর হয় তবে আমাকে হায়াত দাও আর যদি মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয় তবে আমাকে মৃত্যু দান কর।[১৪৩]

১৪১. ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি) শরহুস সুদূর, বৈরুত, পৃ- ৬
১৪২. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি) বুখারী শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৩৯
১৪৩. ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.), বুখারী ও মুসলিম শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৩৯

আল্লাহর অনুগত দীর্ঘজীবন উত্তম

اخرج احمد والترمذى وصححه الحاكم عن ابى بكرة ان رجلا قال يا رسول الله ايّ الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قال فايّ الناس شر قال من طال عمره وساء عمله–

ইমাম আহমদ, তিরমিযী (হাকেম উহাকে সহীহ বলেছেন) (র.) হযরত আবু বুকরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি আরয করল– ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি বললেন– যার হায়াত বেশী এবং আমল ভাল। তারপর আরয করল– মানুষের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোক কে? উত্তরে তিনি বললেন– যার হায়াত বেশী কিন্তু আমল মন্দ।[১৪৪]

اخرج احمد والبزار عن طلحة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ليس احد افضل عند الله تعالى من مؤمن يعمر فى الاسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله–

ইমাম আহমদ ও বায্যার (র.) হযরত তালহা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– আল্লাহর নিকট ঐ মু'মিনের চেয়ে উত্তম কেউ নন যিনি ইসলামে দীর্ঘ হায়াত প্রাপ্ত হয়েছেন। কারণ তার (দীর্ঘ হায়াতের কারণে) তাসবীহ, তাকবীর ও তাহলিলও বেশী হয়।[১৪৫]

তালকীন

শয়তান মানবজাতির চিরশত্রু। সে মানুষের সারা জীবনে প্রতি মূহূর্তে প্রতারণা দিতে চেষ্টা চালায়। এমনকি মৃত্যুকালীন সময়েও উপস্থিত হয়ে ঈমান নষ্ট করার প্রচেষ্টা চালায়। তাই হাদিস শরীফে এ সময় মৃত্যুআসন্ন ব্যক্তিকে কালিমায়ে তায়্যেবার শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী ও আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– তোমরা তোমাদের মৃত্যুআসন্ন ব্যক্তিদেরকে কালিমা তায়্যেবাহ শিক্ষা দাও।[১৪৬]

১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ- ৭
১৪৫. প্রাগুক্ত
১৪৬. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি), মুসলিম শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৪০

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– তোমাদের মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তিদেরকে কালিমার তালকীন দাও।[১৪৭]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– যার শেষ বাক্য কালিমায়ে তায়্যেবাহ হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৪৮]

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের মৃত্যুআসন্ন ব্যক্তিদের নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ কর।"[১৪৯]

ইমাম আহমদ (র.) (২৪১ হি.) আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন–**ما من ميت يقرء عند رأسه يس الا هوّن الله عليه** কোন মৃত্যুআসন্ন ব্যক্তির মাথার পাশে সূরা ইয়াছিন পাঠ করা হলে আল্লাহ তা'আলা তার উপর মৃত্যু সহজ করে দেন।"[১৫০]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ

হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– যখন তোমরা কোন অসুস্থ রোগীর কিংবা কোন মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হবে, তখন তোমরা কল্যাণময় কথা বল। কেননা ফেরেশ্তারা তোমাদের কথায় আমিন বলেন।[১৫১]

১৪৭. ইবনে মাজাহ (র.) (২৭৩ হি) ইবনে মাজাহ শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৪
১৪৮. ইমাম আবু দাউদ (র.) (২৭৫ হি) আবু দাউদ শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-১৪১
১৪৯. ইমাম আহমদ (র.) (২৪১ হি) আবু দাউদ (র.) (২৭৫ হি) ও ইবনে মাজাহ (র.) (২৭৩ হি), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-১৪১
১৫০. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), শরহুস সুদূর, বৈরুত, পৃ- ৩৭
১৫১. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি), মুসলিম শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৪০

اَخْرَجَ الْبَيْهَقِي فِي شُعَبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " افْتَحُوا عَلَى صِبْيَانِكُمْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ أَوَّلَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَآخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ مَا سُئِلَ عَنْ ذَنْبٍ وَاحِدٍ "

ইমাম বায়হাকী (র.) শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সর্বপ্রথম কালিমায়ে তাইয়্যেবা শ্রবণ করাও এবং মৃত্যুকালে তাদেরকে কালিমায়ে তায়্যেবা শিক্ষা দাও। কেননা যে ব্যক্তির প্রথম ও শেষ কাজ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" হবে অতপর সে যদি হাজার বছর জীবিত থাকে তাহলে তাকে কোন গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না।[১৫২]

اخرج الحاكم عن سعد بن ابى وقّاص ان النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال هل ادلكم على اسم الله الاعظم دعاء يونس لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين فايما مسلم دعا بها فى مرض موته اربعين مرةً فمات فى مرضه ذالك اُعطى اجر شهيد ان برئ برئ مغفورًا له

ইমাম হাকেম হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– আমি কি তোমাদেরকে ইসমে আ'যম সম্পর্কে অবহিত করবো? আর তা হলো হযরত ইউনুচ (আ.)র দোয়া লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনায যোয়ালেমীন। যে ব্যক্তি মৃত্যু রোগে এই দোয়া চল্লিশ বার পাঠ করবে অতঃপর ঐ রোগে মৃত্যুবরণ করবে তাহলে সে শহীদের ন্যায় সওয়াব প্রাপ্ত হবে। আর যদি সে সুস্থ হয়ে যায় তাহলে সে পাপ মুক্ত হয়ে যাবে।[১৫৩]

اخرج الطبرانى عن انس رضي الله عنه ان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال مَن أتاهُ ملك الموتُ وَهُوَ عَلَى وُضوءٍ أُعطيَ الشهادةَ".

তাবরানী হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– মৃত্যুর ফেরেশ্তা উযূ অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে যে ব্যক্তির রূহ কবয করবেন অর্থাৎ উযূ অবস্থায় যার মৃত্যু হবে কিয়ামত দিবসে সে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করবে।[১৫৪]

ফেতনায় লিপ্ত হওয়ার আশংকায় মৃত্যু কামনা করা বৈধ

اخرج مالك والبزار عَنْ ثوبان أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ بالنَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ

[১৫২]. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি) শরহুস সুদুর, বৈরুত, পৃ- ৩৮
[১৫৩]. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯
[১৫৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

ইমাম মালিক ও বায্যার (রা.) হযরত সওবান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ বলেছেন- হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ভাল কাজ করার, খারাপ থেকে বিরত থাকার এবং মিসকীনদেরকে ভালবাসার প্রার্থনা করছি। যখন আপনি লোকদেরকে ফিতনায় (পরীক্ষায়) লিপ্ত করতে চান তখন আমাকে ঐ ফিতনায় লিপ্ত হওয়া ব্যতীত আপনার কাছে নিয়ে যাবেন অর্থাৎ মৃত্যু দান করবেন।[১৫৫]

اخرج مالك عن عمر رضى الله عنه انه قال اللهم قد ضعتْ قوتى وكبر سنّى وانتشرت رعيي فا قبضنى اليك غير مضيعٍ ولا مقصرٍ فما جاوز ذالك الشهر حتى قبض

ইমাম মালিক (রা.) হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আমার শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। বয়স বেশী হয়েছে আর আমার জনগণও চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়েছে অর্থাৎ বিস্তৃত লাভ করেছে। সুতরাং আপনি আমাকে মৃত্যুদান করুন। যাতে আমি বিনষ্টকারী ও অলস সাব্যস্ত না হই। অতএব একমাস অতিক্রম করেনি তিনি ইন্তেকাল করেছেন।[১৫৬]

اخرج ابى الدنيا عن سفيان قال يأتى على الناس زمان يكون الموت فيه احب الى قراة ذالك الزمان من الذهب الاحمر

ইবনে আবিদ দুনিয়া (রা.) হযরত সুফিয়ান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- মানুষের নিকট এমন এক যুগ আসবে, ঐ যুগের ওলামাদের নিকট মৃত্যু লালবর্ণের স্বর্ণের চেয়েও অধিক প্রিয় হবে।[১৫৭]

মৃত্যু যন্ত্রণা

মু'মিনগণ মৃত্যুকে ভয় করে না বরং মৃত্যুর জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকে। মু'মিনের জন্য দুনিয়া জেলখানার ন্যায়। একমাত্র মৃত্যুর মাধ্যমেই এই জেলখানা থেকে মুক্তিলাভ করে খোদার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হওয়া যায়। তাই মৃত্যু মু'মিনের জন্য তোহ্ফাস্বরূপ।

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ " হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, মৃত্যু হলো মু'মিনের জন্য তোহ্ফা।[১৫৮] কিন্তু মৃত্যু-

[১৫৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
[১৫৬]. প্রাগুক্ত
[১৫৭]. প্রাগুক্ত
[১৫৮]. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি.), শুয়াবুল ঈমান, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ.১৪০

যন্ত্রণা বড়ই কঠিন ও কষ্টদায়ক। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ মৃত্যুযন্ত্রণা অবশ্যই আসবে। আর এটি এমন বিষয় যা থেকে তুমি পলায়ন করতে পারবে না।[১৫৯]

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, هو قدر ثلاث مائة ضربة بالسيف মৃত্যুযন্ত্রণা এত কষ্টদায়ক যে, তিনশতবার তলোয়ারের আঘাতের সমান।[১৬০]

হযরত ওমর (রা.) হযরত কা'ব আখবার (রা.)'র কাছে মৃত্যুযন্ত্রণা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বলেন- মৃত্যুযন্ত্রণা এত কষ্টদায়ক যে, কারো পেটে যদি বৃক্ষের কাঁটাযুক্ত শাখা প্রবেশ করিয়ে দেয় এবং এর প্রত্যেক কাঁটাসমূহ একেক রগে প্রবিষ্ট হয়ে যায় আর কোন শক্তিশালী ব্যক্তি ঐ শাখা ধরে টান দিলে যেরূপ কষ্টদায়ক হয় মৃত্যু যন্ত্রণাও অনুরূপ কষ্টদায়ক।[১৬১]

হযরত দাইনুরী (র.) 'মাজালিসাহ' গ্রন্থে ওহাব ইবনে ওরাদ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- যখন আমি কোন বান্দার উপর দয়া করতে চাই তখন মৃত্যুর পূর্বেই দুনিয়াতে তার প্রত্যেক গুনাহের বিনিময় দিয়ে দেই। কখনো অসুস্থতার মাধ্যমে, কখনো পরিবারের সদস্যদেরকে বিপদে লিপ্ত করে, কখনো রিযিক সংকীর্ণ করে। এরপরও যদি কোন গুনাহ থেকে যায় তখন মৃত্যুকালে তার মৃত্যুযন্ত্রণা বৃদ্ধি করে দেই। এভাবে যখন সে আমার সাক্ষাত করবে তখন পাপ থেকে এমন মুক্ত থাকবে যেভাবে মুক্ত ছিল জন্মের দিন। আমার ইজ্জত ও জালালিয়তের শপথ! আমি যে বান্দাহকে আযাব দিতে চাই তার সব নেকীর বিনিময় তাকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেই। কখনো শরীরের সুস্থতার মাধ্যমে, কখনো রিযিক বৃদ্ধি করে, কখনো পরিবার-পরিজনকে আনন্দ-উৎফুল্লে রেখে। এরপরও যদি কোন নেকী রয়ে যায় তখন মৃত্যুকালে তার মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ করে দেওয়া হয়। ফলে তার আর কোন নেকী অবশিষ্ট থাকবে না যা দ্বারা সে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে।[১৬২]

ইবনে আবিদ দুনিয়া যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন কোন মু'মিনের উপর গুনাহ অবশিষ্ট থাকে এবং ঐ গুনাহ মার্জনার জন্য তার কোন আমল নেই তখন আল্লাহ তার উপর মৃত্যু যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে দেন। আর তার মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা

১৫৯. সূরা ক্বাফ, আয়াত; ১৯
১৬০. জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.), শরহুস সুদূর, বৈরুত, পৃ. ৩১
১৬১. ইমাম গাজ্জালী (র.) (৫০৫ হি.), কিমিয়ায়ে সাআদাত, পৃ. ৭৪৩ ও জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.), শরহুস সুদূর, বৈরুত, পৃ. ৩৩
১৬২. জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.), শরহুস সুদূর, বৈরুত, পৃ. ২৮

তার জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে কোন কাফির যখন দুনিয়াতে ভাল কাজ করে। আল্লাহ তার মৃত্যু সহজ করে দেন। যাতে দুনিয়ার মধ্যেই তার ভাল কাজের প্রতিদান পেয়ে যায়। অতঃপর সে জাহান্নামী হয়ে যায়।[১৬৩]

اخرج ابن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ليؤجر فى كل شئ حتى فى الكظ عند الموت

ইবনে মাজাহ (র.) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, মু'মিন ব্যক্তি প্রত্যেক কিছুতে সওয়াব প্রাপ্ত হয় এমনকি মৃত্যুর সময় যে কষ্ট পায় তাতেও।[১৬৪]

পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া মৃত্যু যন্ত্রণা বৃদ্ধির কারণ

اخرج الطبرانى والبيهقى فى شعب الايمان وفى دلائل النبوة عن عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَهُنَا غُلَامًا قَدِ احْتُضِرَ يُقَالُ لَهُ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَلَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يَقُولَهَا، قَالَ: " أَلَيْسَ قَدْ كَانَ يَقُولُهَا فِي حَيَاتِهِ ؟ " قَالُوا: بَلَى، قَالَ: " فَمَا مَنَعَهُ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ ؟ " قَالَ: فَنَهَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَهَضْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى الْغُلَامَ، فَقَالَ: " يَا غُلَامُ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَهَا، قَالَ: " وَلِمَ ؟ " قَالَ: لِعُقُوقِ وَالِدَتِي، قَالَ: " أَحَيَّةٌ هِيَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " أَرْسِلُوا إِلَيْهَا "، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهَا فَجَاءَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: " ابْنُكِ هُوَ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " أَرَأَيْتِ لَوْ أَنَّ نَارًا أُجِّجَتْ فَقِيلَ لَكِ: إِنْ لَمْ تَشْفَعِي لَهُ قَذَفْنَاهُ فِي هَذِهِ النَّارِ "، قَالَتْ: إِذًا كُنْتُ أَشْفَعُ لَهُ، قَالَ: " فَأَشْهِدِي اللهَ، وَأَشْهِدِينَا مَعَكِ بِأَنَّكِ قَدْ رَضِيتِ "، قَالَتْ: قَدْ رَضِيتُ عَنِ ابْنِي، قَالَ: " يَا غُلَامُ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِيْ مِنَ النَّارِ "

"তাবরানী ও বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান এবং দালায়েলুন নবুয়্যত গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ'র খেদমতে হাযির হয়ে বলেন- এক ছেলের মৃত্যু সময় সন্নিকটে কিন্তু সে কালিমা পাঠে অক্ষম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- সে কি জীবদ্দশায় এই কালিমা পাঠ করতো না? উত্তরে লোকটি বললেন হ্যাঁ, পাঠ করতো। তখন রাসূল ﷺ সেই ছেলের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সাথে আমরাও গেলাম। তিনি ছেলেকে বললেন- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বল। সে বলল, আমি এটা

১৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
১৬৪. প্রাগুক্ত

পাঠ করতে সক্ষম নই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কেন? উত্তরে ছেলে বলল- আমি আমার মায়ের অবাধ্য ছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বলল- হ্যাঁ, জীবিত আছেন। তখন তার মাকে ডেকে আনা হলো। তিনি তাকে বললেন- এটা কি তোমার সন্তান? উত্তরে বলল হ্যাঁ। তখন রাসূল ﷺ বললেন- যদি বিরাট এক অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তোমাকে বলা হয় যে, আমরা এই ছেলেকে আগুনে নিক্ষেপ করবো নতুবা তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। তবে কি তুমি তাকে ক্ষমা করে দেবে? উত্তরে মা বলল- হ্যাঁ। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তাহলে তুমি আমাদেরকে এবং আল্লাহকে সাক্ষী করে বল যে, আমি তার উপর সন্তুষ্টি হয়েছি। অতঃপর মা বলল- আমি আমার সন্তানের উপর সন্তুষ্টি হয়েছি। তারপর রাসূল ﷺ ছেলেকে বললেন- এখন কালিমা পড়। তখন সে কালিমা পাঠ করল। আর রাসূল ﷺ বললেন- সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমার উসিলায় এই ছেলেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন।[১৬৫]

হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)'র সাথে শত্রুতা পোষণ করলে, তাঁদের বিরোদ্ধাচরণ করলে মৃত্যুকালীন ঈমান নসীব হয়না

اخرج بن عساكر عن عبد الرحمن المحاربى قال حضرت رجلا الوفاة فقيل له قل لا اله الا الله فقال لا اقدر كنتُ اصحب قومًا يأمرونى لشتم ابى بكر وعمر رضى الله عنهما

ইবনে আসাকের হযরত আব্দুর রহমান মুহারিবী থেকে বর্ণনা করেন- এক ব্যক্তির মৃত্যু সন্নিকট হলে তাকে কালিমায়ে তায়্যেবা পড়তে বলা হলো। সে উত্তরে বলল- আমি তা পড়তে সক্ষম নই। কারণ আমি এমন লোকের সাথে চলাফেরা করতাম যারা আমাকে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)কে গালি দিতে বলতো।[১৬৬]

জানাযা নামায

জানাযা নামায ফরয়ে কিফায়া। কয়েকজনে আদায় করলে সকলে দায়মুক্ত হয়ে যাবে নতুবা সকলেই গুনাহগার হবে। এর দ্বারা মইয়্যত গুনাহগার হলে নামাযীর উপস্থিতি ও দোয়ার দ্বারা মৈয়্যত উপকৃত হয় পক্ষান্তরে নামাযী গুনাহগার ও মইয়্যত নেককার হলে নামাযী উপকৃত হয়। তাছাড়া মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিকভাবে বসবাস করতে গেলে পরস্পরের উপর কিছু দায়িত্ব থাকে। রাসূল ﷺ সালাতে জানাযাকে মুসলমানের কর্তব্য ও দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেছেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে- **عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ستٌّ بِالْمَعْرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ**

১৬৫. ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.), শরহুস সুদূর, বৈরুত, পৃ. ৩৮
১৬৬. প্রাগুক্ত

وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি কর্তব্য রয়েছে। ১. যখন তার সাক্ষাত হবে সালাম দেবে। ২. যখন সে ডাকবে তার ডাকে সাড়া দেবে। ৩. যখন সে হাঁচি দেবে তখন তার হাঁচির জবাব দেবে। ৪. যখন সে অসুস্থ হবে তার সেবা করবে। ৫. যখন সে মৃত্যুবরণ করবে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করবে এবং ৬. নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অপরের জন্যও তা পছন্দ করবে।[১৬৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের জানাযার পেছনে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত গমন করবে এবং তার নামাযে জানাযা পড়বে ও তাকে দাফনে সহযোগিতা করবে সে দু'ক্বীরাত সওয়াব নিয়ে প্রত্যার্বতন করবে। প্রত্যেক ক্বিরাত উহুদ পর্বত সমান। আর যে ব্যক্তি কেবল জানাযা পড়ে দাফনের পূর্বে চলে আসবে, সে এক ক্বীরাত পরিমাণ সমান সওয়াব পাবে।[১৬৮]

জানাযা নামাযে মুসল্লী যত বেশী হয় মইয়্যতের তত বেশী ক্ষমার সম্ভাবনা থাকে। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে– **عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيه** হযরত আয়েশা (রা.) নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– যদি কোন (মুসলিম) মইয়্যতের উপর একশ জন মুসলমানে জানাযার নামায পড়ে এবং তার জন্য (আল্লাহর দরবারে মাগফিরাতের) সুপারিশ করে, তাহলে অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[১৬৯]

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ فَقَالَ يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنْ النَّاسِ قَالَ فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِه أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمْ اللَّهُ فِيه

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)'র গোলাম কুরাইব ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস (রা.)'র পুত্র কুদাইদ বা উসফান নামক স্থানে ইন্তেকাল হলে তিনি বলেন হে কুরাইব! জানাযার জন্য লোকেরা একত্রিত হয়েছে কিনা দেখ। কুরাইব বলেন,

১৬৭. ইমাম তিরমিযী ও দারেমী (র.), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ৩৯৮
১৬৮. ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.), বুখারী ও মুসলিম শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৪৪
১৬৯. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি), মুসলিম শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৪৫

আমি গিয়ে দেখি লোকেরা জানাযার জন্য একত্রিত হয়েছে। আমি এসে তাঁকে এ সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন, লোক চল্লিশজন হয়েছে? সে বলল হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন তাহলে জানাযা বের কর। কেননা আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তার উপর এমন চল্লিশজন লোকে জানাযার নামায পড়লে যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি আল্লাহ তা'আলা তাদের সুপারিশ মইয়্যতের জন্য কবুল করেন।[১৭০]

عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَبَ قَالَ فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ لِلْحَدِيثِ

হযরত মালিক ইবনে হোবায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, কোন মুসলিম মৃত্যুবরণ করলে তিন কাতার মুসলমান তার জানাযার নামায আদায় করলে তার উপর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। জানাযায় লোক কম হলে হযরত মালিক (র.) তাদেরকে তিন কাতারে বণ্টন করে দিতেন। যাতে এই হাদিসের উপর আমল হয়।[১৭১]

জানাযা বহন করা

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– যে ব্যক্তি জানাযার পিছনে গমন করবে এবং তিনবার জানাযা বহন করবে সে অবশ্যই তার উপর অর্পিত হক আদায় করেছে।[১৭২]

জানাযা বহন করার সুন্নত পদ্ধতি হলো একের পর এক চার জনই প্রতি পায়া বহন করবে। প্রথমে চারজনই জানাযা কাঁধে নিয়ে দশ কদম চলবে। প্রথমে ডান পাশের মাথার দিকের পায়া তারপর ঐ ব্যক্তি ডান পাশের পায়ের দিকের পায়া কাঁধে নিবে তারপর তার বাম পাশের মাথার দিকের পায়া এরপর বাম পাশের পায়ের দিকের পায়া কাঁধে নিবে এবং প্রতিবার দশ কদম করে অগ্রসর হবে। এভাবে চল্লিশ কদম পূর্ণ করবে।

১৭০. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি), মুসলিম শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৪৫
১৭১. ইমাম আবু দাউদ (র.) (২৭৫হি), ইমাম তিরমিযী (র.) ও ইমাম ইবনু মাজাহ (র.) (২৭৩ হি) যথাক্রমে আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৪৭
১৭২. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি), তিরমিযী শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৪৬

কেননা হাদিস শরীফে আছে যে ব্যক্তি চল্লিশ কদম জানাযা বহন করবে তার চল্লিশটি কবীরা গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

হাদিস শরীফে আরো বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি জানাযার চার পায়া কাঁধে নিয়ে বহন করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন।[১৭৩]

কবর ও কবর আযাব

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى মাটি থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং সেখানেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবো আর সেখান থেকেই তোমাদেরকে দ্বিতীয় বার বের করবো।[১৭৪]

কবর হলো পরকালের প্রথম ঘাঁটি। এখানে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে অবস্থান করতে হয়। কবরেই মুনকার-নকীরের সাওয়াল হবে। যারা সঠিক উত্তর দিতে পারবে কিয়ামত পর্যন্ত তারা নতুন বরের ন্যায় সুখে শান্তিতে থাকবে। পক্ষান্তরে যারা সঠিক উত্তর দিতে অক্ষম হবে তারা বিভিন্ন প্রকারের আযাব ও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। কবরে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। প্রথমত আল্লাহ সম্পর্কে, দ্বিতীয়ত দ্বীন সম্পর্কে এবং তৃতীয়ত রাসূল ﷺ সম্পর্কে।

শেষ প্রশ্নটি হবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে– عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنْ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন– তিনি বলেন– বান্দাহকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তাকে পেছনে রেখে তার সাথীরা চলে যায় তখন সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। এ সময় তার কাছে দু'জন ফেরেশ্‌তা এসে তাকে বসিয়ে দেন। এরপর তারা প্রশ্ন করেন, এই যে মুহাম্মদ ﷺ। তাঁর সম্পর্কে তুমি কি বলতে? তখন সে বলবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হবে,

১৭৩. মুফতি আমজাদ আলি খান (র.), বাহারে শরীয়ত, খণ্ড-৪ পৃ- ১৪৪
১৭৪. সূরা তোয়াহা, আয়াত– ৫৫

জাহান্নামে তোমার অবস্থানের জায়গাটি দেখে নাও। যার পরিবর্তে আল্লাহ তোমার জন্য জান্নাতে একটি স্থান নির্ধারন করেছেন। নবী করিম ﷺ বলেন, তখন সে দু'টি স্থান একই সময়ে দেখতে পাবে। আর যারা কাফির বা মুনাফিক, তারা বলবে, আমি জানিনা। তবে অন্য লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, না তুমি নিজেই জেনেছ, না তিলাওয়াত করে শিখেছ। এরপর তার দু'কানের মধ্যবর্তী স্থানে লোহার মুগুর দিয়ে এমন জোড়ে আঘাত করা হবে, এতে সে চিৎকার করে উঠবে, মানুষ ও জ্বীন ব্যতীত তার আশে পাশের সকলেই তা শুনতে পাবে।[১৭৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالآخَرُ النَّكِيرُ فَيَقُولاَنِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولاَنِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُولُ أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ فَيَقُولاَنِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي فَيَقُولاَنِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ الْتَئِمِي عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلَاعُهُ فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– যখন মইয়্যতকে কবরে রাখা হয় তখন নীল চক্ষু বিশিষ্ট দু'জন কালো বর্ণের ফেরেশ্‌তা তার নিকট আসবে। তাদের একজনকে মুনকার ও অন্যজনকে নকীর বলা হয়। তারা জিজ্ঞাসা করবে– তুমি এই ব্যক্তি (মুহাম্মদ ﷺ) সম্পর্কে কি বলতে? তখন সে বলবে তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দাও রাসূল। ফেরেশ্‌তাদ্বয় বলবেন– আমরা জানতাম তুমি এরূপ বলবে। অতঃপর তার কবরকে সত্তর গজ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে এবং তার জন্য কবরকে আলোকিত করে দেওয়া হবে। তারপর তাকে বলা হবে 'ঘুমাও'। সে বলবে, আমাকে আমার পরিবারের কাছে যেতে দিন যাতে তাদেরকে এই সুসংবাদ দিতে পারি। তারা বলবে, তুমি সেই দুলহার ন্যায় ঘুমাও যাকে তার অতি প্রিয়জন ছাড়া কেউ জাগ্রত করবেনা। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে সে স্থান থেকে (কিয়ামতের দিন) উঠাবেন। পক্ষান্তরে মইয়্যত যদি মুনাফিক হয়, তবে

[১৭৫]. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), বুখারী শরীফ, ইন্ডিয়া, খণ্ড-১ পৃ- ১৭৮ হাদিস নং- ১২৫৭

বলবে, আমি তাঁর (মুহাম্মদ ﷺ) সম্পর্কে মানুষকে যা বলতে শুনেছি আমিও তা বলেছি, আমি জানি না। তখন ফেরেশ্‌তাদ্বয় বলবেন– আমরা জানতাম তুমি এরূপই বলবে। অতঃপর মাটিকে বলা হবে, এই ব্যক্তির উপর সংকুচিত হয়ে যাও। তখন মাটি তার উপর সংকুচিত হয়ে যাবে। ফলে তার হাড়সমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। কিয়ামত পর্যন্ত সে কবরে সর্বদা আযাবে লিপ্ত থাকবে।[১৭৬]

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرُ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ هَاهُنَا وَقَالَ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ يَا هَذَا مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ قَالَ هَنَّادٌ قَالَ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ قَالَ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولَانِ وَمَا يُدْرِيكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا} الْآيَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا قَالَ وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ وَإِنَّ الْكَافِرَ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوهُ مِنْ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنْ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمُ مَعَهُ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا قَالَ فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا قَالَ ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– (মইয়্যতকে কবরে রাখার পর) দু'জন ফেরেশ্‌তা এসে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করবে তোমার রব কে? উত্তরে সে বলবে "আমার রব আল্লাহ"। তারা তাকে বলবে তোমার দ্বীন

[১৭৬]. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি), মুসলিম শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ২৫

কি? সে বলবে "আমার দ্বীন ইসলাম"। তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করবে এই ব্যক্তি কে যাকে তোমাদের মধ্য থেকে প্রেরণ করা হয়েছিল? উত্তরে সে বলবে তিনি আল্লাহর রাসূল। তারা বলবে তুমি কিভাবে জানলে? সে বলবে আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি অতঃপর ঈমান এনেছি এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এভাবে আল্লাহর বাণী: আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে দৃঢ় কথার দ্বারা সুদৃঢ় রাখবেন। তিনি বলেন- আসমান থেকে আওয়ায আসবে যে, আল্লাহর বান্দা সত্য বলেছে। তার জন্য জান্নাতী বিছানা বিছিয়ে দাও, জান্নাতী পোশাক তাকে পরিধান করিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকে একটি দরজা উন্মুক্ত করে দাও। তারপর জান্নাতের দিকে দরজা খুলে দেওয়া হবে। আর তার কাছে আসতে থাকবে জান্নাতী আবহাওয়া ও সুগন্ধি এবং তার কবরকে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে।

তারপর তিনি কাফেরের মৃত্যু সম্পর্কে বলেন কবরে তার রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে তার শরীরে। অতঃপর দু'জন ফেরেশ্‌তা এসে তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করবে– তোমার রব কে? সে বলবে হ্যায় হ্যায় আমি জানিনা। তারা জিজ্ঞাসা করবে তোমার দ্বীন কি? সে বলবে হ্যায় হ্যায় আমি জানিনা। তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করবে এই ব্যক্তি যাকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি কে? সে বলবে হ্যায় হ্যায় আমি জানিনা। তখন আসমান থেকে একজন আহবানকারী আহবান করে বলবেন সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। তিনি বলেন, তার নিকট জাহান্নামের উত্তাপ আসতে থাকবে। তার কবরকে সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে এমনকি তার একপাশের হাড় সমূহ অন্য পাশে পরিবর্তন হয়ে যাবে। তার উপর একজন অন্ধ ও বধির আযাবের ফেরেশ্‌তা নিয়োগ করা হবে যার হাতে থাকবে লোহার হাতুড়ি। যদি তা দিয়ে কোন পাহাড়ে একবার আঘাত করা হয় তাহলে ঐ পাহাড় ধুলি-কণায় পরিণত হবে। ফেরেশ্‌তা তাকে ঐ হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করতে থাকবে যার বিকট শব্দ জ্বিন ইনসান ছাড়া সমগ্র পৃথিবীর সকল সৃষ্টি শুনতে পাবে। ফলে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে অতঃপর পুনরায় তার রূহ তার মধ্যে ফেরত দেওয়া হবে। (এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে)।[১৭৭]

اخرج ابن ابى شيبة والشيخان عن عائشة رضى الله عنها انّ النبى صلى الله عليه وسلم قال انّ اهل القبور يعذبون فى قبورهم عذابًا سمعه البهائم

ইবনে আবি শায়বা এবং ইমাম বুখারী ও

[১৭৭]. ইমাম আহমদ (র.) ও ইমাম আবু দাউদ (র.), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ২৫

মুসলিম (র.) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– নিশ্চয় কবরবাসীকে এমন আযাব দেওয়া হয় যা চতুষ্পদ জন্তুরা শুনতে পায়।[১৭৮]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এমন দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার কবরবাসীকে আযাব দেওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, এদের দু'জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে অথচ তাদেরকে তেমন বড় গুনাহের জন্য আযাব দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাবের ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন করত না আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত। এরপর তিনি খেজুরের একটি তাজা ডাল নিয়ে তা দু'ভাগে বিভক্ত করলেন। তারপর প্রতিটি কবরে একটি করে পুঁতে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এরূপ কেন করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, ডাল দু'টি না শুকানো পর্যন্ত তাদের কবর আযাব হাল্কা হওয়ার আশা করা যায়।[১৭৯]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ زَادَ غُنْدَرٌ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, এক ইহুদি স্ত্রীলোক হযরত আয়েশা (রা.)'র কাছে এসে কবর আযাব সম্পর্কে আলোচনা করে বলল, আল্লাহ আপনাকে কবর আযাব থেকে রক্ষা করুন। পরে আয়েশা (রা.) কবর আযাব সম্পর্কে রাসূল ﷺ থেকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন হ্যাঁ, কবর আযাব সত্য। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এরপর থেকে রাসূল ﷺকে এমন কোন নামায আদায় করতে দেখিনি, যাতে তিনি কবর আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন নি। হযরত গুনদার (র.) বৃদ্ধি করেছেন যে, কবর আযাব সত্য।[১৮০]

[১৭৮]. ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), শরহুস সুদূর, পৃ- ১৬১
[১৭৯]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬ হি), বুখারী শরীফ, খণ্ড-১ পৃ- ১৮২, হাদিস নং- ১২৭৮
[১৮০]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড-১ পৃ- ১৮৩, হাদিস নং- ১২৮৯

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূল ﷺ দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার সমীপে পানাহ চাচ্ছি কবর আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন ও মরনের ফিতনা থেকে এবং মসীহ্ দাজ্জাল এর ফিতনা থেকে।[১৮১]

اخرج الترمذى وحسنه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُصَلَّاهُ فَرَأَى نَاسًا كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ قَالَ أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَأَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَحَبَّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ قَالَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوْ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَبْغَضَ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ قَالَ فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصَابِعِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ وَيُقَيِّضُ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ تِنِّينًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ

ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন (ইমাম তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন) রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– তোমরা স্বাদ বিনষ্টকারী (মৃত্যুর) অধিকহারে স্মরণ কর। কেননা কবর প্রতিদিন বলে যে, আমি অপরিচিত একাকীত্বের ঘর, আমি পোকা-মাকড় ও মাটির ঘর। যখন কোন মু'মিনকে কবরে দাফন করা হয় তখন কবর তাকে উদ্দেশ্য করে বলে তোমাকে স্বাগতম তুমি আমার নিকট আমার পৃষ্ঠে সবচেয়ে প্রিয় পদচারণাকারী ব্যক্তি ছিলে। এখন তুমি আমার ভিতরে প্রবিষ্ট হয়েছ এবং তোমার সাথে আমার আচরণ দেখতে পাবে। তখন কবর তার জন্য দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যাবে আর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে কোন ফাজির বা কাফিরকে দাফন করা হলে তখন কবর অসন্তুষ্টি প্রকাশ

[১৮১]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড-১ পৃ- ১৮৪, হাদিস নং- ১২৯৪

করে বলে তুমি আমার নিকট আমার পৃষ্ঠে চলমানকারী সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক ছিলে। এখন আমার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছ এবং তোমার সাথে আমার আচরণ দেখতে পাবে। অতঃপর কবর তার উপর এমনভাবে সংকুচিত হয়ে যাবে, যাতে তার হাড্ডিসমূহ পরিবর্তন হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল ﷺ তাঁর এক হাতের আঙ্গুলকে অন্য হাতের আঙ্গুলে প্রবিষ্ট করেন তিনি বাস্তব চিত্র প্রদর্শন করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার উপর এমন সত্তরটি সর্প মোতায়েন করে দেবেন। যদি একটি সর্পও পৃথিবীতে নিশ্বাস ফেলে তাহলে পৃথিবীতে কিছুই উৎপন্ন হবে না এবং পৃথিবীতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা। এরূপ বিষাক্ত সর্প কিয়ামত পর্যন্ত তাকে দংশন করতে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কবর হয়ত জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান হবে নতুবা জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্যে একটি গর্ত হবে।[১৮২]

যেসব কারণে কবর আযাব হয়

اخرج البيهقى عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان عذاب القبر من ثلاثة من الغيبة والنميمة والبول فاياكم وذالك

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, তিনটি কারণে কবর আযাব হয়। ১. গীবতের কারণে। ২. চোগলখোরীর কারণে। ৩. পেশাব থেকে ভালভাবে পরিষ্কার না হওয়ার কারণে। সুতরাং তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাক।[১৮৩]

ইমাম বুখারী ও আবুশ শায়খ কিতাবুত তাওবীখ-এ, ইবনে মসউদ (রা.) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আল্লাহর এক বান্দাকে কবরে একশত বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সে আল্লাহর নিকট আবেদন করলে মাত্র একটি বেত্রাঘাতের সিদ্ধান্ত হয়। একটি বেত্রাঘাত করা মাত্র তার কবর আগুনে পূর্ণ হয়ে গেল এবং সে আগুনে জ্বলে ছাই হয়ে গেল। যখন পুনরায় জ্ঞান ফিরে আসল তখন জিজ্ঞাসা করল তোমরা আমাকে প্রহার করলে কেন? ফেরেশ্তারা বলল- انك صليت بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره তুমি বিনা উযূতে নামায পড়েছ এবং একজন মযলুমের পাশ দিয়ে গিয়েছ কিন্তু তাকে সাহায্য করনি।[১৮৪]

[১৮২]. ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), শরহুস সুদুর, আরবী, পৃ- ১১২
[১৮৩]. ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), শরহুস সুদুর, বৈরুত, পৃ- ১৬২
[১৮৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

اخرج ابن ابى الدنيا في القبور عن الحسن مرفوعًا قال خرج من الدنيا شَاتِمًا لاحد من اصحابى سلط الله عليه دابة تقرض لحمه يجد اله الى يوم القيامة

ইবনে আবিদ দুনিরা (র.) 'আল কুবুর' গ্রন্থে মারফু হাদিস হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার কোন সাহাবীকে গালি দেওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ তায়ালা তার কবরে এমন একটি জন্তু নিয়োজিত করে দেবেন যেটি তার গোশ্ত খেতে থাকবে যার ব্যাথা ও কষ্ট কিয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকবে।[১৮৫]

اخرج ابن ابى الدنيا عن مسروق قال ما من ميت يموت وهو يسرق او يزنى او يشرب او يأتى شيئًا من هذه الاجعل معه شجاعان ينهشانه فى قبره

ইবনে আবিদ দুনিয়া (রা.) হযরত মসরূক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি চুরি, মদ্যপান ও ব্যাভিচারে লিপ্ত থেকে মৃত্যুবরণ করবে তার উপর কবরে দু'টি সাপ নিয়োজিত করে দেওয়া হবে যারা তার গোশত চুসে চুসে খাবে।[১৮৬]

ইসবাহানী তারগীব গ্রন্থে ইবনে জওশাব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন আমি একটি গোত্রে গেলাম যার একপার্শ্বে রয়েছে একটি কবরস্থান। আসরের পরে ঐ কবরস্থানে একটি কবর ফেটে একজন মানুষ প্রকাশিত হল। যার মাথা গাধার ন্যায় আর শরীর ছিল মানুষের ন্যায়। সে গাধার ন্যায় তিনবার আওয়ায দিয়ে পুনরায় কবরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি তার সম্পর্কে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল- সে মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল। যখন সে মদ্যপান করত তখন তার মা বলত- হে আমার সন্তান! আল্লাহকে ভয় কর। তখন সে মাকে উত্তর দিত যে, তুমি গাধীর ন্যায় চিৎকার করছ কেন? সে আসরের পর মৃত্যুবরণ করেছিল। প্রতিদিন আসরের পর কবর ফেটে বের হয় এবং তিনবার গাধার ন্যায় শব্দ করে পুনরায় কবরে অদৃশ্য হয়ে যায়।[১৮৭]

ইবনে জওযী (রা.) 'উয়ুনুল হিকায়াত' গ্রন্থে স্বীয় সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফারইয়ারী (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবু সিনান থেকে শুনেছি. তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তির নিকট তার ভাইয়ের মৃত্যুতে সমবেদনা জানাতে গিয়েছি। তাকে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখলাম। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল- আমি আমার ভাইকে দাফন করার পর কবর থেকে কান্নার আওয়ায শুনলাম। আমি দ্রুত কবর খনন করতে চাইলে কেউ বলল- কবর খনন করিও না। আমি পুনরায় মাটি দিয়ে ভরে দিলাম। একটু দূরে গেলে আবারো ঐ শব্দ শুনতে পেলাম। আমি এবারও এসে সামান্য

[১৮৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
[১৮৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
[১৮৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

মাটি কবর থেকে সরালাম। কিন্তু আওয়ায আসল তুমি এরূপ করনা। ফলে আমি পুনরায় কবরে মাটি দিয়ে চলে আসলাম। পুনরায় সেই আওয়ায শুনতে পেয়ে বললাম- খোদার শপথ! এবার অবশ্যই কবর খুলে দেখবো। কবর খনন করে দেখলাম তার গলায় আগুনের শিকল আর পুরো কবর আগুনের আলোয় আলোকিত। তখন আমি চাইলাম যে তার গলা থেকে আগুনের শিকল খুলে নিতে। যেই মাত্র আমি তা ধরলাম সাথে সাথে আমার আঙ্গুলসমূহ আগুনে জ্বলে পুরে গেল। সে আমাদেরকে তার হাত দেখালে দেখি তার হাতের চারটি আঙ্গুল ছিলনা।

আমি হযরত আওযাঈ (র.)কে এই ঘটনা বর্ণনা করে জিজ্ঞাসা করলাম, ইহুদি-নাসারা ও অগ্নিপূজারী মৃত্যুবরণ করলে তাদের এসব অবস্থা পরিলক্ষিত হয় না অথচ গুনাহগার মুসলমানের এই অবস্থা কেন পরিলক্ষিত হয়? উত্তরে তিনি বলেন, তারা জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু তাওহীদপন্থী থেকে এ অবস্থা দেখানো হয় যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[১৮৮]

ইবনে আবিদ দুনিয়া (র.) হযরত আমর ইবনে দীনার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একজন মদীনাবাসী ব্যক্তির বোন ইন্তেকাল করেছে এবং সে তাকে দাফন করে আসল। ঘরে এসে মনে পড়ল যে, সে একটি থলে কবরে ফেলে আসে। সে এক বন্ধুকে নিয়ে কবরে আসল এবং সে থলে পেল। সে ঐ ব্যক্তিকে বলল, তুমি একটু দূরে সরে যাও, আমি আমার বোনের অবস্থা দেখবো। যখন কবর থেকে মাটি সরাল তখন দেখতে পেল যে, আগুন প্রজ্জলিত হচ্ছে কবরে। সে তাড়াতাড়ি মাটি ঢেলে দিয়ে কবর বন্ধ করে দিল এবং মায়ের নিকট এসে বোনের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইল। তার মা বলেন– **كانت تؤخر الصلاة ولا تصلى فيما اظن بؤضؤ وتأتى ابواب الجيران اذا ناموافتلعم اذنها ابوابهم فتخرج حديثهم** সে সময় মতো নামায পড়ত না, আমার ধারণা সে উযূবিহীন নামায পড়ত এবং রাতের বেলায় প্রতিবেশীর দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের গোপন কথা শুনত আর তা বাইরে বলে বেড়াত।[১৮৯]

কবর আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়

হাদিস শরীফে আছে– **من قرأ الم السجدة وتبارك الملك قبل النوم نجامن عذاب القبر ووقى فتانى القبر** যে ব্যক্তি ঘুমানোর পূর্বে সূরা আলিফ লাম সিজদা এবং সূরা মুলুক পাঠ করবে সে কবরের আযাব ও ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে।[১৯০]

ইমাম আহমদ ও তিরমিযী (র.) হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– **ما من مسلم يموت يوم الجمعة اوليلة الجمعة الاوقاه الله فتنة القبر**

[১৮৮]. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৭৭-১৭৮
[১৮৯]. প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৮
[১৯০]. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪৯

কোন মুসলমান জুমার দিন কিংবা জুমার রাতে মৃত্যুবরণ করে সে কবর আযাব থেকে মুক্তি পাবে।[১৯১]

ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন–**ان هذا القبور مملوءة على اهلها ظلمة وان الله ينورها بصلاتى على**– নিশ্চয় এই কবর অন্ধকারে পূর্ণ। আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠের উসিলায় আল্লাহ তা'আলা এই অন্ধকার দূর করে দেন।[১৯২]

দায়লামী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– **اذا مات العالم صور الله علمه فى قبره يؤنسه الى يوم القيامة وَيَدْرُأُعَنْهُ هوام الارض** যখন কোন আলেমে দ্বীন ইন্তেকাল করেন তখন আল্লাহ তা'আলা তার জ্ঞানকে আকৃতি প্রদান করেন যেটি কিয়ামত পর্যন্ত তার বন্ধু হিসাবে থাকবে এবং মাটির বিষাক্ত কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করবেন।[১৯৩]

আবু শেখ ও ইবনে আবিদ দুনিয়া (র.) হযরত জাফর সাদেক (র.) থেকে, তিনি তঁর পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– কোন ব্যক্তি যদি কোন মুসলমান ভাইকে আনন্দিত ও খুশী করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা ঐ খুশী ও আনন্দ থেকে একজন ফেরেশ্তা সৃষ্টি করেন, যিনি আল্লাহর ইবাদত ও তৌহিদ বর্ণনা করবে। অতঃপর যখন ঐ বান্দা ইন্তেকাল করবে তখন ঐ ফেরেশ্তা তার কবরে এসে বলবে– তুমি কি আমাকে চিনেছ? সে বলবে তুমি কে? উত্তরে ফেরেশ্তা বলবে– **انا السرور الذى ادخلتنى على فلان انا اليوم أونسُ وحشتك والقنك حجتك واثبتك بالقول الثابت واشهدك مشاهد يوم القيامة اشفع لك واريك مَنْزِلَكَ فى الجنة** আমি হলাম সেই আনন্দ যা তুমি অমুক ব্যক্তিকে প্রদান করেছিলে। আজ আমি তোমার কবরের ভয়ংকর সময়ে তোমার বন্ধু হবো। তোমাকে তোমার হুজ্জত শিক্ষা দেবো এবং তোমাকে কালিমা তায়্যেবার মাধ্যমে সুদৃঢ় রাখবো। আর কিয়ামতের দিন তোমার সাথে উপস্থিত হবো। তোমার জন্য শাফায়াত করবো এবং বেহেশতে তোমার স্থান দেখিয়ে দেবো।[১৯৪]

ইবনে মুনদাহ (র.) আবু কাহেল থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– **হে اِعْلَمْنَ يا ابا كاهل انه من كفَّ اذاة عن الناس كان حقًا على الله ان يكفَّ عنه اذى القبر**

[১৯১]. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪৯
[১৯২]. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৫৮
[১৯৩]. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৫৮
[১৯৪]. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৫৯

আবু কাহেল! জেনে রাখ যে, যে ব্যক্তি মানুষ থেকে দুঃখ কষ্ট দূরীভূত করে আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরের দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত রাখেন।[১৯৫]

আবুল ফজল তুসী (র.) হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন– **من نور فى مساجد الله نورًا نوَّرَ الله له فى قبره ومن اراح فيه رائحة طيبة ادخل الله عليه فى قبره من روح الجنة** যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদকে আলোকিত করবে আল্লাহ তা'আলা তার কবরকে আলোকিত করবেন আর যে মসজিদে সুগন্ধি রাখবে আল্লাহ তা'আলা তার কবরে জান্নাতের সুগন্ধি দান করবেন।[১৯৬]

اخرج الاصبهانى فى الترغيب عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من صلى بعد المغرب ركعتين فى ليلة الجمعة يقرأ فى كل ركعةٍ منهما بفاتحة الكتاب مرة واذازلزلت خمس عشرة مرة هون الله عليه سكرات الموت واعاذه الله من عذاب القبر ويسر له الجواز على الصراط يوم القيامة

ইমাম ইস্পাহানী (র.) 'তারগীব' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন– তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– যে ব্যক্তি জুমার রাতে মাগরিবের পর দু'রাকাত নামায প্রতি রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা ও পনের বার সূরা যিলযালাহ পড়বে আল্লাহ তায়ালা তার উপর মৃত্যুযন্ত্রনা সহজ করে দেবেন এবং কবর আযাব থেকে তাকে মুক্তি দেবেন আর কিয়ামত দিবসে পুলসিরাত পার হওয়া সহজ করে দেবেন।[১৯৭]

اخرج الترمذي وحسنه وابن ماجه والبيهقى عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ قالا قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ قَبْرِه

ইমাম তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী (র.) হযরত সুলায়মান ইবনে সুরাদ ও খালেদ ইবনে উরফুতাহ থেকে বর্ণনা করেন, তারা বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি পেটের ব্যাথায় মৃত্যুবরণ করবে তার কবর আযাব হবেনা।[১৯৮]

اخرج ابو نعيم عن سلمان الفارسى ان بعض اهل الكتاب اخبره عن عيسى عليه السلام قال طول القنوت الامان على الصراط وطول السجود الامان من عذاب القبر

[১৯৫]. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৫৯
[১৯৬]. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৫৯
[১৯৭]. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৮৬
[১৯৮]. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৮৪

আবু নঈম (র.) হযরত সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, কোন কোন আহলে কিতাব হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণনা করেন– নামাযে দীর্ঘ দণ্ডায়মান দ্বারা পুলসিরাতে নিরাপদ লাভ করবে আর দীর্ঘ সিজদা দ্বারা কবর আযাব থেকে মুক্তি লাভ করবে।[১৯৯]

ইবনে আবিদ দুনিয়া (র.) হযরত কা'ব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যখন মু'মিনকে কবরে রাখা হয়, তখন তার নেকআমলসমূহ তাকে পরিবেষ্টন করে রাখে। নেক আমলসমূহ হল- নামায, রোযা, হজ্ব, জিহাদ ও সাদকা। আযাবের ফেরেশ্‌তা যখন পায়ের দিক দিয়ে আসতে চাইবে তখন নামায বলবে যে, তুমি পিছনে যাও। এদিক দিয়ে তোমার যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। কেননা সেই এই পা দিয়ে আল্লাহর ইবাদত (নামায) করতো। তখন আযাবের ফেরেশ্‌তা মাথার দিক দিয়ে আসতে চেষ্টা করবে। তখন রোযা বলবে যে, এদিক দিয়েও তোমার পথ নেই। সে দুনিয়াতে আল্লাহর জন্য ক্ষুধার্ত থাকতো। ফেরেশ্‌তা শরীরের পার্শ্বের দিক দিয়ে আসতে চাইলে হজ্ব ও জিহাদ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে এবং বলবে দূর হও। সে দুনিয়াতে নিজের প্রাণ দিয়েছে, শরীরকে কষ্ট দিয়েছে এবং হজ্ব ও জিহাদ করেছে। তোমার জন্য কোন পথ নেই। তখন ফেরেশ্‌তা হাতের দিক দিয়ে অগ্রসর হতে চাইবে। তখন সাদকা বলবে, আমার সাথী থেকে দূর হও। এ দু'হাতে কত সাদকা সে দিয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তোমার কোন পথ নেই। তখন তাকে মোবারক বাদ দিয়ে বলা হবে তোমার জীবন ও মরণ উভয়টি সফল। তারপর রহমতের ফেরেশ্‌তা এসে তার জন্য জান্নাতী বিছানা বিছায়ে দেবেন এবং তার কবরকে দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেবেন আর একটি জান্নাতী ঝাড়-বাতি দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত তার কবরকে আলোকিত করে রাখবেন।[২০০]

ঈছালে সাওয়াব

জীবিত লোকের পক্ষ থেকে মৃতদের জন্য কোন নেকীর সাওয়াব প্রেরণ করাকে ঈছালে সাওয়াব বলা হয়। এটি কুরআন-হাদীস সম্মত অত্যন্ত পুণ্যকাজ। এর দ্বারা মৃতরা উপকৃত হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ যারা (মুহাজির ও আনসারদের) পরে পৃথিবীতে আগমন করবে, তারা বলবে– হে আমাদের প্রভূ! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের পূর্বে ঈমান আনয়নকারী ভাইদেরকেও ক্ষমা করে দিন।[২০১]

[১৯৯]. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৮৪
[২০০]. প্রাগুক্ত, পৃ- ৩০২
[২০১]. সূরা হাশর, আয়াত- ১০

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী মু'মিনগণ কর্তৃক পূর্ববর্তী মু'মিনদের জন্য দোয়া করার কথা উল্লেখ করেছেন। আর এটাই হলো ঈছালে সাওয়াব।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَنْهَا

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.)'র মা মারা গেলেন তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। পরে তিনি রাসূল ﷺকে বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা যান। আমি যদি তার পক্ষে কিছু সাদকা করি, তাহলে কি তা তাঁর কোন উপকারে আসবে? উত্তরে তিনি বললেন– হ্যাঁ। সা'দ বললেন তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষী করছি যে, আমার মিখরাফ নামক বাগানটি তার জন্য সাদকা করলাম।[২০২]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, একজন সাহাবী নবী করিম ﷺকে বললেন, আমার মা হঠাৎ মারা যান। আমার ধারণা যে, তিনি যদি কথা বলতে পারতেন, তাহলে সাদকা করতেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে সাদকা করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তুমি তার পক্ষ থেকে সাদকা কর।[২০৩]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) রাসূল ﷺ'র কাছে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমার মা মারা গেছেন এবং তাঁর উপর মান্নত ছিল। রাসূল ﷺ বললেন তুমি তার পক্ষ থেকে তা আদায় কর।[২০৪]

[২০২]. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী, খণ্ড-১ পৃ- ৩৮৬ হাদিস নং ২৫৬৯
[২০৩]. প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৮৬, হাদিস নং- ২৫৭২ , মুসলিম শরীফ باب اصول الثواب صدقات الثواب الى الميت হাদিস নং– ৪১০৭
[২০৪]. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) (২৫৬ হি) সহীহ বুখারী, খণ্ড-১ পৃ- ৩৮৭ হাদিস নং- ২৫৭৩

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ

হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সা'দ এর মা মারা গিয়েছেন। কোন বস্তু সাদকা করলে উত্তম হবে? তিনি বললেন, পানি সাদকা করা উত্তম। সা'দ একটি পানির কূপ খনন করে দিয়ে বললেন, এটি সা'দের মায়ের জন্য।[২০৫]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُخْتِى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ قَالَ « لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ». قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ « فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ'র নিকট এক মহিলা এসে বলল, আমার বোন ইন্তেকাল করেছে এবং তার উপর রোযা (কাযা) ছিল। তিনি বললেন, যদি তার উপর কর্য থাকতো তুমি কি আদায় করে দিতে? মহিলা বলল, হ্যাঁ, আদায় করে দিতাম। তিনি বললেন, (বান্দার হকের চেয়ে) আল্লাহর হক আদায় করা অধিক প্রয়োজন।[২০৬]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ اقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এর নিকট একজন মহিলা এসে বলল, আমার মা হজ্বের মান্নত করেছিলেন। কিন্তু তিনি হজ্ব করার পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করতে পারবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্ব কর। তোমার মায়ের উপর কর্য থাকলে তুমি কি তা আদায় করতে? মহিলা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর কর্যও আদায় কর। কেননা আল্লাহর হক আদায় করা অধিক প্রয়োজন।[২০৭]

اخرج الطبرانى فى الاوسط والبيهقى فى سننه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

তাবরানী আওসাত গ্রন্থে এবং বায়হাকী স্বীয় সুনান গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, নেককার বান্দার

২০৫. ইমাম আবু দাউদ (র.) (২৭৫ হি) সুনানে আবু দাউদ শরীফ, খণ্ড-১ পৃ- ২৩৬ লাহোর।
২০৬. ইমাম দারে কুতুনী (র.) (৩৮৫ হি), সুনানে দারে কুতুনী, খণ্ড-২ পৃ- ১৯৫ মুলতান
২০৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী, খণ্ড-২ পৃ- ১০৮৮, হাদিস নং- ৬৮১৭

জন্য জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। সে বলবে, হে প্রভু! এই মর্যাদা কোথা হতে? বলা হবে- তোমার জন্য তোমার সন্তানের মাগফিরাত কামনার কারণে।[২০৮]

عن ابى سعيد الخدوري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الرجل يوم القيامة من الحسنات امثال الجبال فيقول انى هذا فيقال باستغفار ولدك لك.

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির নেকআমল বৃহৎ আকারের পাহাড়ের ন্যায় হয়ে তার পেছনে পেছনে চলবে। সে বলবে, এগুলো কোথা হতে? বলা হবে এগুলো তোমার জন্য তোমার সন্তানের মাগফিরাত বা দোয়ার বিনিময়ে।[২০৯]

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ ما الميت فى قبره الاشبه الغريق المتغوث ينظر دعوة تلحقه من اب او ام او ولد او صديق ثقة فاذا لحقته كانت احب اليه من الدنيا وما فيها وان الله تعالى ليدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال وان هدية الاحياء الى الاموات الاستغفار لهم .

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কবরে মইয়্যত পানিতে ডুবন্ত অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফরিয়াদী ব্যক্তির ন্যায় হয়। তারা তাদের পিতা-মাতা, সন্তান কিংবা কোন প্রিয় বন্ধুর পক্ষ থেকে দোয়া প্রেরণের আকাঙ্ক্ষায় থাকে। যখন তাদের কাছে কোন দোয়া পৌঁছে তখন তা তাদের কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল নিয়ামত থেকে অধিক প্রিয় মনে হয়। আর আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীবাসীর দোয়াকে পাহাড় সমতুল্য বৃহৎকার করে কবরবাসীদের নিকট প্রবেশ করিয়ে দেন। নিশ্চয় মৃতদের জন্য জীবিতদের পক্ষ থেকে হাদিয়া হলো তাদের জন্য ইস্তিগফার করা।[২১০]

عن انس سمعت رسول الله ﷺ يقول ما من اهل ميت يموت منهم ميت فيتصدقون عنه بعد موته الاّ اهداه له جبرئيل على طبق من نور ثم يقف على شفير القبر فيقول يا صاحب القبر العميق هذه هدية اهداها اليك اهلك فاقبلها فتدخل عليه ففرح بها ويستبشر ويحزن جيرانه الذى لا يهدى اليهم شيء.

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি- কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার জন্য কেউ সাদকা করলে ঐ সাদকা হযরত জিব্রাইল (আ.)

২০৮. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), শরহুস সুদূর, বৈরুত, পৃ- ৩০৪
২০৯. প্রাগুক্ত, পৃ- ৩০৪
২১০. প্রাগুক্ত, পৃ- ৩০৫

নূরানী পাত্রে ভরে নিয়ে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, হে গভীর মাটির নিচের কবরবাসী। এগুলো তোমার জন্য তোমার পরিবারের লোকেরা হাদিয়া পাঠিয়েছে, এগুলো গ্রহণ কর। তখন মৃত ব্যক্তি খুবই খুশী হয় এবং আনন্দ উদ্‌যাপন করে। আর প্রতিবেশী কবরবাসী যার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে কিছুই পাঠায়নি, সে অত্যন্ত মর্মাহত হবে।[২১১]

اخرج ابن ماجه وابن خزيمة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِه وَحَسَنَاته بَعْدَ مَوْته عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِه فِي صِحَّتِه وَحَيَاتِه يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِه

ইবনে মাজাহ ও ইবনে খোযাইমা (র.) হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কিছু আমল আছে যেগুলোর সওয়াব কবরে পৌঁছে। ১. ইলম প্রচার। ২. নেককার সন্তান রেখে যাওয়া। ৩. কোন কিতাব লিখে যাওয়া। ৪. কোন মসজিদ নির্মাণ করা। ৫. মুসাফিরখানা নির্মাণ করা। ৬. নদী খনন করা ও ৭. সাদকায়ে জারিয়া। এগুলোর সওয়াব মৃত্যুর পরে পাবে। হযরত আনাস (রা.)'র বর্ণনায় কূপ খনন এবং খেজুর গাছ লাগানোর কথাও উল্লেখ আছে।[২১২]

হযরত আবু কিলাবা (র.) বর্ণনা করেন, একদিন আমি স্বপ্নে দেখি যে, একটি কবরস্থান ফেটে মুর্দাগণ কবর থেকে বেরিয়ে এসে কবরের পাশে বসে আছে। তাদের সামনে নুরানী পাত্র রয়েছে। কিন্তু এক মুর্দার সামনে কিছুই ছিল না। আমি তার কাছে এর কারণ জানতে চাইলে সে বলল, ওদের সন্তান-সন্ততি ও বন্ধু-বান্ধবগণ তাদের জন্য সাদকা করে, যা নুর হয়ে তাদের নিকট পৌঁছে। আমার একজন সন্তান আছে সে বদকার। সে আমার জন্য দোয়াও করে না এবং সাদকাও করেনা। ফলে আমার নিকট কিছুই পৌঁছেনা। তাই আমি আমার কবরের প্রতিবেশীদের কাছে লজ্জিত থাকি সর্বদা।

হযরত আবু কিলাবা (র.) জাগ্রত হয়ে সেই মৃতের সন্তানকে ডেকে তার স্বপ্নের কথা বললে সন্তান তাওবা করল এবং পিতার জন্য মাগফিরাত ও সাদকা করতে লাগল। এরপর আবু কিলাবা (র.) পুনরায় ঐ ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তার সামনে সূর্যের আলোর চেয়ে অধিক আলো বিদ্যমান যা অন্যান্য সাথীদের আলোর চেয়ে অধিক আলোকিত। স্বপ্নে সেই ব্যক্তি তাকে বলল, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আপনার উসিলায় আমি আমার প্রতিবেশীদের নিকট লজ্জিত হওয়া থেকে মুক্তি পেয়েছি।[২১৩]

২১১. প্রাগুক্ত, পৃ-৩০৮
২১২. প্রাগুক্ত, পৃ- ৩০৪
২১৩. ইমাম গাজ্জালী (র.) (৫০৫ হি), দাকায়েকুল আখবার, পৃ- ১২

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালেহ (র.) বলেন, আবু নাওয়াসকে স্বপ্নে দেখা গেল যে, তিনি অত্যন্ত ভাল অবস্থায় আছেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমিতো গুনাহগার ছিলাম তবে আমাদের কবরস্থানে একরাতে একজন আল্লাহর মকবুল বান্দা আসেন। তিনি স্বীয় চাদর বিছায়ে দু'রাকাত নফল নামায পড়েছেন। তিনি প্রতি রাকাতে এক হাজার বার করে **قُلْ هُوَ الله احد** পাঠ করেন এবং ঐ নামাযের সাওয়াব কবরবাসীদেরকে বখশিস করে দিলেন। অতঃপর সেই মকবুল বান্দার ঈছালে সাওয়াবের উসিলায় সকল কবরবাসীকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন। ফলে আমিও ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েছি।[২১৪]

হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী (র.) বলেন, আমার নিকট রাসূল ﷺ'র হাদিস পৌঁছল যে, যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়বে আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আমি এই কালিমা সত্তর হাজার বার পড়েছি। একদিন আমি এক দাওয়াতে গেলাম। সেখানে একজন কাশফের অধিকারী যুবকও উপস্থিত ছিল। এই যুবকের কাশফ প্রসিদ্ধ ছিল। অতপর খাবার গ্রহনের প্রাক্কালে যুবক কাঁদতে লাগল। আমি তার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আমি আমার পিতা-মাতাকে তাদের কবরে দেখেছি- তাদের আযাব হচ্ছে, তাই কাঁদছি।

মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী (র.) বলেন, তখন আমি মনে মনে নিজের পঠিত সত্তর হাজার বার কালিমার সাওয়াব ঐ যুবকের পিতা মাতাকে বখশিশ করলাম। সাথে সাথে যুবক হাসতে লাগল। আমি তার হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে সে বলল, আমার পিতা মাতার আযাব দূরীভুত হয়ে গেল এখন তারা আযাব মুক্ত আছেন। তখন মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী (র.) বলেন, উক্ত হাদিসের বিশুদ্ধতা ঐ যুবকের কাশফের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল।[২১৫]

عَنْ عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ اذا تصدق بصدقة تطوعًا فيجعلها عن ابويه فيكون لها اجرها ولاينقص من اجره شيئًا

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যখন কোন ব্যক্তি নফল সাদকা করে তা নিজের পিতা-মাতার জন্য উৎসর্গ করে তাহলে তার পিতা-মাতা এর সওয়াব পাবেন এবং তার নিজের সওয়াব থেকে বিন্দুমাত্র কমবেনা।[২১৬]

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول اي رب ايُّ شئي هذا فيقال ولدك استغفرلك

২১৪. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), শরহুস সুদূর, পৃ-১২০
২১৫. শরহে শিফা খণ্ড-১ পৃ-৩৯৯, সূত্র: সাচ্ছি হেকায়াত খণ্ড-৫ পৃ- ৫২
২১৬. নুরুদ্দীন আলী ইবনে আবু বক্কর (র.) (৮০৭ হি), মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা-১৩৮

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত্যুর পরে মৃতের জন্য একটি স্তর বৃদ্ধি করা হয়। তখন সে বলে, হে আমার প্রভু। এটি কি? তখন বলা হবে তোমার সন্তান তোমার জন্য ইস্তেগফার তথা ক্ষমার জন্য দোয়া করেছে। (তারই কারণে তোমার জন্য এই মর্তবা)।[২১৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যখন মানুষ মরে যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমল বন্ধ হয় না। ১. সাদাকায়ে জারিয়া। ২. উপকারজনিত জ্ঞান। ৩. এমন সৎ সন্তান যারা তার জন্য দোয়া করে।[২১৮]

আল্লামা বদর উদ্দীন আইনী (র.) (৫৮৮ হি.)'র মতে মইয়্যতের পক্ষ থেকে সাদকা করা জায়েয এবং এর দ্বারা মইয়্যত উপকৃত হয়। ইমাম ইব্রাহীম ইবনে হিব্বান স্বীয় সনদে বর্ণনা করেন, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল ﷺকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আমরা মৃতদের জন্য দোয়া করি, তাদের পক্ষ থেকে সাদকা করি, হজ্ব করি এগুলো কি তাদের নিকট পৌঁছে? উত্তরে তিনি বলেন, এগুলো তাদের নিকট পৌঁছে এবং এতে তারা এমন খুশী হয় যে, যেভাবে তোমরা হাদিয়া পেলে খুশী হও।[২১৯]

আল্লামা ইবনে নুজাইম মিশরী (র.) বলেন, আমাদের মতে মানুষ নিজের আমলের সওয়াব অন্যদের নিকট পৌঁছানো জায়েয। চাই ঐ আমল নামায, রোযা, তিলাওয়াতে কুরআন, যিকর, তাওয়াফ, হজ্ব ও ওমরাসহ অন্যান্য আমলও হোকনা কেন। এটি কুরআন ও সুন্নাত দ্বারা সাব্যস্ত।[২২০]

আল্লামা তাহতাভী (র.) বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে মানুষ নিজের আমলের সওয়াব অন্যদেরকে প্রদান করতে পারে, চাই জীবিত হোক কিংবা মৃত হোক। আর সওয়াব প্রদানকারীর সওয়াব থেকে কিছুই কমবে না।[২২১]

মারাকীউল ফালাহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে- فللانسان ان يجعل عمله لغيره عند اهل السنة والجماعة صلاة كان او صومًا اوحجًا او صدقة او قراة القران اولاذكار আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে মানুষ তার নিজের আমল অন্যকে প্রদান করতে পারে চাই ঐ আমল নামায, রোযা, হজ্ব, সাদকা, কুরআন তিলাওয়াত কিংবা যিকর হোক।[২২২]

২১৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (২৫৬ হি.), আদাবুল মুফরাদ, পৃ-২০-২১
২১৮. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি) সহীহ মুসলিম শরীফ, হাদিস নং- ৪১১০ ও মিশকাত শরীফ, পৃ- ৩২
২১৯. আল্লামা বদর উদ্দিন আইনী (র.) (৫৮৮ হি.) উমদাতুল কারী, খণ্ড, ৮ম, পৃ. ২২২, মিশর
২২০. যাইনুদ্দিন ইবনে নুজাইম মিশরী (র.) (৯৭০ হি.), আল বাহরুর রায়েক, খণ্ড ৩য়, পৃ. ৬৪
২২১. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ তাহতাভী (র.) (১২৩১ হি.), হাশীয়ায়ে তাহতাভী, দামেস্ক, পৃ. ৩৪১
২২২. হাসান ইবনে আম্মার (র.) (১০৬৯ হি.) মারাকীউল ফালাহ, হাশীয়ায়ে তাহতাভী, দামেস্ক, পৃ. ৩৪১

দেওবন্দীদের প্রখ্যাত আলেম যাকারিয়া কানদেহলভী ফাযায়েলে আ'মাল গ্রন্থে ইমাম নববী (র.)'র উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সাদকার সাওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে- এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। এটিই সত্য মাযহাব। যারা বলে, মৃত ব্যক্তির নিকট সাওয়াব পৌঁছে না তারা নিশ্চিত বাতিল ও প্রকাশ্য ভ্রান্ত এবং পবিত্র কুরআন ও নবী করিম ﷺ'র হাদিসের বিপরীত। সর্বোপরি ইজমায়ে উম্মতেরও বিপরীত। সুতরাং এমত মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি উক্ত কিতাবে ঈছালে সাওয়াবের পক্ষে কুরআন হাদিসের অনেক দলীল উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া কয়েকটি ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। যেমন- বিশর ইবনে মনচুর (র.) বলেন, তাউনের যামানায় জনৈক ব্যক্তি অধিকহারে জানাযায় অংশগ্রহণ করত এবং সন্ধ্যায় কবরস্থানের দরজায় দাঁড়িয়ে এই দোয়া পাঠ করতো– اٰنَسَ اللهُ وَحْشَكُمْ وَرَحِمَ غُرْبَتَكُمْ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّاٰتِكُمْ وَقَبِلَ اللهُ حَسَنَاتِكُمْ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ভীতিকে ভালবাসার দ্বারা পরিবর্তন করে দিন, তোমাদের একাকীত্বের উপর দয়া প্রদর্শন করুন, তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিন এবং তোমাদের নেকী সমূহ কবুল করুন। এই দোয়ার পর সে স্বীয় ঘরে চলে যেত। ঘটনাক্রমে একদিন সে ঐ দোয়া পড়তে পারেনি ঘরে এসে রাতে স্বপ্ন দেখল যে, একদল লোক তার নিকট এসে একত্রিত হয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল তোমরা কারা? কেন এসেছ? তারা বলল– আমরা কবরস্থানের অধিবাসী। প্রতিদিন আমাদের নিকট তোমার পক্ষ থেকে হাদিয়া পৌঁছত। সে জিজ্ঞাসা করল কি হাদিয়া? তারা বলল তুমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় যে দোয়া করতে তা আমাদের নিকট হাদিয়া হিসেবে পৌঁছে যেতো। লোকটি বলল, এরপর থেকে আমি কোনদিন ঐ দোয়া পাঠ ছেড়ে দেইনি।[২২৩]

জনৈক আলিম বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল যে, একটি কবরস্থানের সব কবর ফেটে গেল আর মৃত ব্যক্তিরা বাইরে এসে মাটি থেকে কি যেন দ্রুত কুড়িয়ে নিচ্ছে। কিন্তু এক ব্যক্তি পৃথক হয়ে বসে রইল। সে অন্যান্যদের ন্যায় কিছুই কুড়িয়ে নিচ্ছে না। আমি তার নিকট গিয়ে সালাম করে জিজ্ঞাসা করলাম– এই লোকেরা কি কুড়িয়ে নিচ্ছে? সে বলল জীবিত লোকেরা সামান্য সাদকা, দোয়া-দুরূদ ইত্যাদি করে এই কবরবাসীদের জন্য প্রেরণ করে। তারা ঐগুলো নিচ্ছে। আমি বললাম তাহলে তুমি কেন তা নিচ্ছ না? সে বলল, আমি এজন্য তা থেকে অমুখাপেক্ষী, কারণ আমার এক সন্তান জীবিত আছে, সে অমুক বাজারে 'যালাবিবাহ' (হালুয়া জাতীয় মিষ্টি খাবার) বিক্রি করে। সে প্রতিদিন এক খতম কুরআন পড়ে আমার নিকট প্রেরণ করে। আমি সকালে উঠে সেই বাজারে গিয়ে দেখি এক যুবক 'যালাবিবাহ' বিক্রি করছে আর তার ঠোঁট দু'টি নড়ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম– তুমি কী পড়ছ? সে বলল, আমি প্রতিদিন কুরআনে পাক একবার

২২৩. যাকারিয়া কান্দুলভী, ফাযায়েলে আ'মাল, খণ্ড-২ পৃ- ৯২

খতম করে আমার পিতার জন্য হাদিয়া পাঠাই। এই ঘটনার অনেক দিন পর আমি ঐ কবরস্থানের লোকদেরকে পূর্বের ন্যায় মাটি থেকে (সাওয়াব) খুড়তে দেখেছি। এবার তাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকেও কুড়াতে দেখেছি, যে প্রথমে তা থেকে বিমুখ ছিল। তারপর আমি জাগ্রত হলাম এবং অবাক হলাম। সকালে উঠে আমি সেই বাজারে গেলাম আর খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম তার সেই সন্তান ইন্তেকাল করেছে।[২২৪]

হযরত সালেহ মুরির (র.) বলেন, আমি একদিন জুমার রাতে শেষ ভাগে জামে মসজিদে যাচ্ছিলাম ফজরের নামায পড়ার উদ্দেশ্যে। তখন সকাল হওয়ার সময় অনেক বাকী ছিল। পথে একটি কবরস্থান ছিল। আমি একটি কবরের পাশে বসে গেলাম। বসতেই আমার চোখে ঘুম এসে গেল। আমি স্বপ্নে দেখলাম সব কবর ফেটে গেল এবং কবর থেকে মুর্দাগণ হাসি খুশি অবস্থায় কথা বলছে তাদের মধ্যে একজন যুবকও কবর থেকে বের হল যার কাপড় ছিল আবর্জনাময়। সে চিন্তিত অবস্থায় একপাশে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ পর আসমান থেকে অনেক ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হলো যাদের হাতে নূরের চাদরে ডাকা পাত্র ছিল। তারা প্রত্যেক কবরবাসীকে একটি করে পাত্র দিলেন আর যে লোকে পাত্র নেয় সে কবরে প্রবেশ করে। যখন সবাই পাত্র নিয়ে নিল, তখন ঐ যুবক খালি হাতে কবরে ফিরে যেতে লাগল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার! তুমি এত চিন্তিত কেন? আর এই পাত্র কিসের ছিল? সে বলল– এই পাত্রসমূহ হল ঐসব জীবিত লোকদের পক্ষ থেকে যারা তাদের মৃত ব্যক্তিদের জন্য হাদিয়া পাঠায়। আমার নিকট হাদিয়া পাঠানোর মত কেউ নেই। একজন মা ছিলেন কিন্তু তিনি দুনিয়ায় লিপ্ত হয়ে গেলেন। তিনি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেন ফলে তিনি নিজের স্বামীকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আমাকে স্মরণ করেন না। আমি ঐ মহিলার কাছে তার ছেলে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং স্বপ্নের কথা বললাম। সে বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয় সে আমার সন্তান। আমার কলিজার টুকরা ছিল। আমার কোল ছিল তার বিছানা। অতঃপর মহিলা আমাকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে বলল, আমার প্রিয় সন্তানের জন্য এগুলো সাদকা করে দেবেন আর ভবিষ্যতে আমি সর্বদা তাকে দোয়া ও সাদকার মাধ্যমে স্মরণ করবো, কখনো ভুলবনা।

হযরত সালেহ (র.) বলেন, এরপর আমি পুনরায় স্বপ্নে সেই কবরবাসী দলকে পূর্বের ন্যায় দেখেছি এবং সেই যুবকও উত্তম পোশাকে হাসি খুশীতে ছিল। সে দৌড়ে আমার নিকট এসে বলতে লাগল– হে সালেহ! আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, আপনার প্রেরিত হাদিয়া আমার নিকট পৌঁছেছে।[২২৫]

---

২২৪. আল্লামা ইয়াফেঈ (র.) (৭৬৮ হি), রওযুর রাইয়্যাহীন, পৃ- ১৬১ হেকায়ত নং– ১৫৭

২২৫. আল্লামা ইয়াফেঈ (র.) (৭৬৮ হি), রওযুর রাইয়্যাহীন, পৃ- ১৬২ হেকায়ত নং– ১৫৯

কিয়ামত ও পুনরুত্থান দিবস

কিয়ামত ও পুনরুত্থান দিবসের নির্দিষ্ট একটি সময় আছে। ঐসময় যখন আসবে তখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। এতে আসমান ফেটে যাবে, চন্দ্র-সূর্য নিস্প্রভ হয়ে পড়বে। যমীন চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে, পাহাড় তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে, সাগর মহাসাগর শুকিয়ে যাবে এবং সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রথম বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হলে জীবিতরা মারা যাবে এবং দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হলে সকলে জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ، تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ তাদের সামনে বরযখ তথা পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। যাদের (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম এবং যাদের (নেকীর) পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে। তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে ভীবৎস আকার ধারণ করবে।[২২৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, ফলে যাদের আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই মুছিত (বেহুঁশ) হয়ে পড়বে। তারপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। [২২৭]

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত সম্পর্কে আরো বলেন– ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে।[২২৮]

কিয়ামতের দিনটি অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠিন হবে। এদিন কাফিরদের জন্য হবে খুবই ভয়ংকর ও কষ্টদায়ক আর মু'মিনগণ থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদে।

---

২২৬. সূরা মু'মিনুন আয়াত– ১০০-১০৪

২২৭. সূরা যুমার, আয়াত– ৬৮

২২৮. সূরা মু'মিনুন, আয়াত– ১৫-১৬

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন– هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ، عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ، تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ، تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ، لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ، لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ، لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? তাদের ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে। কন্টক পূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই। এটা তাদেরকে পুষ্ট করবেনা এবং ক্ষুধায়ও নিবারণ করবেনা। আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে সতেজ ও সজীব, তাদের কর্মের কারণে তারা সন্তুষ্ট।[২২৯]

আল্লাহ বলেন– فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ، يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ، فَأَمَّا مَنْ طَغَى ، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ، فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ، إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ، إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا . অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে, সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে এবং দর্শকদের জন্যে জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে। তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে তার ঠিকানা হবে জান্নাত। তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, কিয়ামত কখন হবে? এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? এর চরম জ্ঞান আপনার পালনকর্তার কাছে আছে। যে একে ভয় করে আপনি কেবল তাকেই সতর্ক করবেন। যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা কিংবা এক সকাল অবস্থান করেছে।[২৩০]

কুরআনে আরো বলা হয়েছে– يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ، إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ، لِلطَّاغِينَ مَآبًا ، لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ، لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ، إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ، جَزَاءً وِفَاقًا ، إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا যে দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে। আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে।

২২৯. সূরা আল গাশিয়া, আয়াত– ১-৯
২৩০. সূরা আন নাযীয়াত, আয়াত– ৩৪-৪৬

নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে সীমালঙ্ঘনকারীর আশ্রয়স্থলরূপে। তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে। তথায় তারা কোন শীতল এবং পানীয় আস্বাদন করবেনা। কিন্তু ফুটন্ত পানি পূঁজ পাবে পরিপূর্ণ প্রতিফল হিসেবে। নিশ্চয় তারা হিসাব নিকাশ আশা করতো না।[২৩১]

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ، أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ، بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ، بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ، يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ، وَخَسَفَ الْقَمَرُ ، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ، يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ، كَلَّا لَا وَزَرَ ، إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ، يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ، بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ

আমি শপথ করি কিয়ামত দিবসের, আরো শপথ করি সেই মনের যে নিজেকে ধিক্কার দেয়, মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করবো না? আমি তার অঙ্গুলিগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। বরং মানুষ তার ভবিষ্যত জীবনেও ধৃষ্টতা করতে চায়। সে প্রশ্ন করে, কিয়ামত দিবস কবে? যখন দৃষ্টি চমকে যাবে, চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। সেদিন মানুষ বলবে পলায়নের জায়গা কোথায়? না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। আপনার পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাঁই হবে। সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে, সে যা পরকালের জন্য প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে (দুনিয়াতে) ছেড়ে এসেছে। বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে চক্ষুষ্মান।[২৩২]

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ، وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ، وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ، يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে একটি মাত্র ফুঁক। পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। সে দিন কিয়ামত সংঘঠিত হবে। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে এবং ফেরেশ্তাগণ আকাশের প্রান্ত দেশে থাকবে আর আটজন ফেরেশ্তা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের ঊর্ধ্বে বহন করবে। সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না।[২৩৩]

২৩১. সূরা আন নাবা, আয়াত– ১৮-২৭
২৩২. সূরা আল কিয়ামাহ, আয়াত– ১-১৪
২৩৩. সূরা আল হাক্কাহ, আয়াত– ১৩-১৮

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ، ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ، تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ، أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ

অতঃপর যেদিন কর্ণ বিদারক নাদ আসবে। সেদিন মানুষ তার ভাইয়ের কাছ থেকে তার মাতা পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে পলায়ন করবে। সেদিন প্রত্যেকেই নিজের এক চিন্তা থাকবে। যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেক মুখমণ্ডল হবে সেদিন ধুলি ধুসরিত। তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল।[২৩৪]

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে। তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।[২৩৫]

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ কিয়ামত অব্যশই আসবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপন করেনা।[২৩৬]

শাফায়াত

বান্দা আল্লাহর অপরাধী এবং তিনিই তাদেরকে কিয়ামত দিবসে ক্ষমা করবেন। তিনি ব্যতীত ক্ষমা করার ক্ষমতা অন্য কারো নেই। আর এ ব্যাপারে তিনি কারো নিকট বাধ্য নন বরং এটা সম্পূর্ণ তাঁর অনুকম্পা। তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত মকবুল বান্দাগনের মর্যাদা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শাফায়াতের অনুমতি প্রদান করে ধন্য করবেন। তিনি নিজ দয়া ও মেহেরবাণীতে তাদের শাফায়াত কবুল করবেন এবং গুনাহগারদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।

আল্লাহ শাফায়াতের মকাম দান করবেন নবী মুহাম্মদ ﷺকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا আল্লাহ অচিরেই আপনাকে মকামে মাহমুদ তথা শাফায়াতে কুবরা বা শাফায়াতে উয্মায় অধিষ্ঠিত করবেন।[২৩৭]

২৩৪. সূরা আবাসা, আয়াত- ৩৩-৪২
২৩৫. সূরা আল ইনফিতার, আয়াত- ১-৫
২৩৬. সূরা আল মু'মিনূন, আয়াত- ৫৯
২৩৭. সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত- ৭৯

তবে সকল প্রকার শাফায়াতের জন্য আল্লাহর অনুমতি প্রয়োজন। তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ শাফায়াত করতে পারবেনা। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে। যেমন, مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِه আল্লাহর সামনে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে কে সুপারিশ করবে?[২৩৮]

مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِه আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন সুপারিশকারী হবে না।[২৩৯]

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ সেদিন কেবল তাঁর শাফায়াতই কার্যকর হবে, যাকে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন।[২৪০]

কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম শাফায়াতের অনুমতি লাভ করবেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ। এ প্রসঙ্গে হাদিস শরীফে আছে

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম শাফায়াত আমিই করবো এবং সর্বপ্রথম আমার শাফায়াতই কবুল করা হবে। আর এজন্য আমি অহংকার করি না।[২৪১]

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرُ فَخْرٍ

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, যখন কিয়ামত দিবস সংঘঠিত হবে তখন সকল নবীগণের ইমাম হবো আমি, বক্তব্য প্রদানকারী হবো আমি এবং শাফায়াতকারী হবো আমি। তবে এতে কোন অহংকার করছি না।[২৪২]

বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন তারা বলবে, আমাদের জন্য আমাদের রবের কাছে যদি কেউ শাফায়াত করত, যা এ স্থান থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করত। তখন তারা সকলেই আদম (আ.)র কাছে এসে বলবে,

২৩৮. সূরা বাকারা, আয়াত- ২৫৫
২৩৯. সূরা ইউনূছ, আয়াত- ৩০
২৪০. সূরা তোহা, আয়াত- ১০৯
২৪১. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি), সহীহ মুসলিম শরীফ, খণ্ড-২, পৃ-২৭৫, করাচি, ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি), জামে তিরমিযী, পৃ-৫২০, করাচি, ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) (২৭৩ হি), সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ- ৩৯১, করাচি
২৪২. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি) জামে তিরমিযী, পৃ-৫২০ করাচি, ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) (২৭৩ হি), সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ- ৩২০, করাচি

আপনি ঐ ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ তা'আলা স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মাঝে নিজ থেকে রূহ ফুঁক দিয়েছেন এবং ফেরেশ্তাদেরকে হুকুম দিয়েছেন ফলে তারা আপনাকে সিজদা করেছেন। অতঃপর আপনি আমাদের জন্য আমাদের প্রভুর কাছে শাফায়াত করুন। তখন তিনি বলবেন, আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই বরং স্বীয় ভুলের কথা উল্লেখ করবেন। এরপর বলবেন, তোমরা নূহ (আ.)এর কাছে যাও। যাঁকে আল্লাহ প্রথম রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও স্বীয় ভুলের কথা উল্লেখ করে বলবেন, আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা ইব্রাহিম (আ.)র কাছে যাও, যাঁকে আল্লাহ খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও স্বীয় ভুলের কথা উল্লেখ করে বলবেন, আমি তোমাদের কাছে তোমাদের এ কাজের জন্য উপযোগী নই। তোমরা মূসা (আ.)র কাছে যাও, তাঁর সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা ঈসা (আ.)'র কাছে যাও। তারা তাঁর কাছে আসবে। তখন তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য উপযোগী নই। তোমরা মুহাম্মদ ﷺ'র কাছে চলে যাও। তাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তখন তারা সকলেই আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে অনুমতি চাইব। যখনই আমি আল্লাহকে দেখতে পাব তখন সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। এরপর আমাকে বলা হবে, আপনার মাথা উঠান, সাওয়াল করুন, আপনাকে দেওয়া হবে। বলুন, আপনার কথা শ্রবণ করা হবে। শাফায়াত করুন, আপনার শাফায়াত কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উত্তোলন করব এবং আল্লাহ আমাকে যে প্রশংসার বাণী শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করব। এরপর আমি সুপারিশ করব, তখন আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। এরপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে বেহেশ্তে প্রবেশ করিয়ে দেব। এরপর আমি পূর্বের ন্যায় পুনঃ তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার সিজদায় পড়ব। অবশেষে কুরআনের বানী মোতাবেক যারা অবধারিত জাহান্নামী তাদের ব্যতীত আর কেউ জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবেনা।[২৪৩]

মিশকাত শরীফে বুখারী ও মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বলা হয়েছে– ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا } قَالَ وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ। অতঃপর তিনি কুরআনের মকামে মাহমুদ সম্পর্কীয় আয়াতটি তিলাওয়াত

[২৪৩]. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড-২ পৃ- ৯৭১, হাদিস নং– ৬১১৯

করে বলেন, এটিই হলো মকামে মাহমুদ যা তোমাদের নবীকে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ।[২৪৪]

عَنْ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثًا كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ يَا فُلَانُ اشْفَعْ يَا فُلَانُ اشْفَعْ حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন লোকেরা দলে দলে নিজ নিজ নবীগণের তালাশ করবে আর বলবে হে অমুক নবী! শাফায়াত করুন। সর্বশেষ মুহাম্মদ ﷺ'র কাছে গিয়ে শাফায়াত প্রাপ্ত হবে। আর ঐ দিন আল্লাহ তাঁকে মকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমি মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতের সুপারিশ করব।[২৪৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, প্রত্যেক নবীর একটি দোয়া কবুল হয় এবং প্রত্যেক নবীগণই তাঁদের সেই দোয়া দুনিয়াতে ব্যয় করে দিয়েছেন। কিন্তু আমি সেই দোয়াকে কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য রেখে দিয়েছি। ইনশাল্লাহ এটি আমার ঐসব উম্মত প্রাপ্ত হবে যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি।[২৪৬]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমার শাফায়াত হবে আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীদের জন্যে।[২৪৭]

[২৪৪]. শায়খ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (৭৪০ হি), মিশকাত শরীফ, পৃ–৪৮৮
[২৪৫]. ইমাম মুসলিম (রা.) (২৬১ হি.), সহীহ মুসলিম শরীফ, খণ্ড ১ম. পৃ. ১৯৯, করাচি
[২৪৬]. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি.), সহীহ মুসলিম শরীফ, খণ্ড ১ম, পৃ. ১১৩
[২৪৭]. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি.), জামে তিরমিযী, পৃ. ৩৫১

عَنْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَخْرَجُ مِنْ النَّارِ قَوْمٌ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فيدخلون الجنّة فَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ

হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ'র শাফায়াতের দ্বারা এক সম্প্রদায়কে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। তাদেরকে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করা হবে।[২৪৮]

নবী ছাড়া অন্যদের শাফায়াত

কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর অনুমতিক্রমে শাফায়াতের সূচনা করবেন। এরপর অন্যান্য নবীগণসহ আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নেকআমলসমূহ আল্লাহর মহান দরবারে সুপারিশ করবেন হাদিস শরীফে আছে,

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ

হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন তিন দলে শাফায়াত করবেন। প্রথমত নবীগণ, দ্বিতীয়ত ওলামাগণ এবং তৃতীয়ত শুহাদাগণ।[২৪৯]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَهْطٍ بِإِيلِيَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শকীক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঈলার একটি দলের সাথে ছিলাম। ঐ দলের এক ব্যক্তি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন- আমার উম্মতের এক ব্যক্তির (ওয়ায়েস করণী অথবা ওসমান) সুপারিশে বনী তামীম গোত্রের লোকের চেয়ে অধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৫০]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ مِنْ النَّاسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমার উম্মতের কিছু লোকে একটি দলের জন্য সুপারিশ করবে, আর কিছু লোকে একটি

২৪৮. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (রা.) (২৫৬ হি.), সহীহ বুখারী, খণ্ড ২য়, পৃ. ৯৭১, হাদিস নং-৬১২০
২৪৯. ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) (২৭৩ হি.), সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ. ৩২০
২৫০. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি.), জামে তিরমিযী, পৃ. ৩৫১

গোত্রের জন্য আবার আর কিছু লোকে স্বগোত্রের জন্য আরো কিছু লোকে এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে। এভাবে তারা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৫১]

عَنْ ابن عمر قال قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زار قبرى وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে তার উপর আমার সুপারিশ আবশ্যক হবে।[২৫২]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَفِظَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়েছে এবং মুখস্থ করেছে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাকে তার পরিবারের সদস্যদের থেকে এমন দশজনের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন যাদের উপর জাহান্নাম আবশ্যক হয়ে পড়েছে।[২৫৩]

عَنْ أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি- তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর। কেননা কুরআন কিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করতে আসবে।[২৫৪]

শাফায়াতের প্রকারভেদ

কিয়ামতের দিন শাফায়াতের বিভিন্ন প্রকার ও স্তর হবে। এর মধ্যে সর্বোত্তম স্তর হলো শাফায়াতে উযমা। এ ব্যাপারে শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (র.) বলেন– প্রথম প্রকারের শাফায়াত হলো শাফায়াতে উযমা যা সমস্ত মাখলুকের জন্য হবে। এটি কেবল আমাদের নবীর জন্য খাস। এটি শুধু কিয়ামতের ময়দানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থানের ভীষণ কষ্ট এবং দ্রুত হিসাব নিকাশের জন্য করা হবে। দ্বিতীয় প্রকারের শাফায়াত হবে এক দলকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশের জন্য। তৃতীয় প্রকারের শাফায়াত হবে ওদের জন্য যাদের নেকী ও বদী সমান হবে। শাফায়াতের মাধ্যমে তারা জান্নাত লাভ করবে। চতুর্থ প্রকারের হবে যারা গুনাহের কারণে দোযখের উপযোগী হয়ে যাবে। শাফায়াতের

২৫১. ইমাম তিরযিমী (র.) (২৭৯ হি.), জামে তিরমিযী, পৃ. ৩৫১
২৫২. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি.), জামে তিরমিযী, পৃ. ৫২০
২৫৩. ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) (২৭৩ হি), সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ- ১৯
২৫৪. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি), সহীহ মুসলিম, খণ্ড-১ পৃ- ২৭০

ফলে তারাও জান্নাতী হয়ে যাবে। পঞ্চম প্রকারের শাফায়াত হবে নেককরা লোকদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে। ষষ্ঠ প্রকারের শাফায়াত হবে যাদের দোযখে নিক্ষেপ করা হয়েছে তাদের জন্যে। শাফায়াতের দ্বারা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে আনা হবে। সপ্তম প্রকারের শাফায়াত হবে জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করার জন্য। অষ্টম প্রকারের শাফায়াত হবে যারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়েছে তাদের মধ্যে কারো কারো আযাব হাল্কা করার জন্য। নবম প্রকারের শাফায়াত হবে মদীনাবাসী এবং নবী করিম ﷺ'র রওযা মোবারক যিয়ারত কারীদের জন্য। এসব শাফায়াত বিশেষত নবী করিম ﷺ'র জন্য সাব্যস্ত হবে তবে কিছু কিছুতে অন্যান্য নেককার বান্দারাও সুপারিশ করতে পারবেন।[২৫৫]

কিয়ামত দিবসে শানে মোস্তফা

শায়খ মুহিউদ্দীন নববী (র.) বলেন, কিয়ামতের ময়দানে সকল লোক প্রথমেই নবী করিম ﷺ'র নিকট না গিয়ে প্রথমে হযরত আদম (আ.)'র নিকট এরপর হযরত নূহ (আ.)'র নিকট এভাবে একে একে সকল বড় বড় নবীগণের নিকট যাবে আর তাঁরাও সর্বপ্রথম আখেরী নবীর দিকে না পাঠিয়ে একেক করে অন্যান্য নবীগণের নিকট পাঠানোর কারণ হলো যাতে সকলেই বুঝতে পারে যে আজকে শাফায়াতের একমাত্র অধিকারী হযরত মুহাম্মদ ﷺ। তারা প্রথমেই যদি শেষনবীর কাছে এসে যেতো তাহলে হয়তো মনে করতো অন্য নবীগণও সুপারিশ করতে পারতেন।

فافهم لوسألوه ابتداءً لكان يحتمل ان غيره يقدر على هذا তারা যদি প্রথমেই তাঁর নিকট শাফায়াত প্রার্থনা করত, তাহলে লোকেরা মনে করত যে, সম্ভবত অন্য নবীগণও শাফায়াতের ক্ষমতা রাখেন। তাদের নিকট গেলে হয়তো শাফায়াত করতেন। এখন আর একথা বলার কোন সুযোগ নেই। আর যখন কোন নবীই শাফায়াতের সাহস করবেন না কেবল নবী মুহাম্মদ ﷺই শাফায়াত করবেন তখন সকলের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, فهو نهاية فى ارتفاع المنزلة وكمال القرب তিনিই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং আল্লাহর পূর্ণ নৈকট্য অর্জনকারী।

وفيه تفضيله على جميع المخلوقين من الرسل الادميين والملائكة المقربين فان هذا الامر العظيم وهى الشفاعة العظمى لايقدر على الاقدام عليه غيره صلواة الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين এর মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির উপর সকল নবীগণের উপর সকল নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশ্তাদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কেননা এটি (শাফায়াত) বিরাট ব্যাপার এটিই হলো শাফায়াতে উযমা। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারবেনা।[২৫৬]

---

২৫৫. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি) , আশআতুল লুমআত, ফার্সী, খণ্ড-৪ পৃ- ৩৮২

২৫৬. মোল্লা আলী কারী (র.) (১০১৪ হি), মিরকাত, খণ্ড-১০ পৃ- ২৭৮

আমলনামা

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মানুষের সাথে দু'জন ফেরেশ্তা নিয়োগ করে দিয়েছেন। তারা সর্বদা মানুষের ভাল-মন্দ আমল লিপিবদ্ধ করে থাকেন। তাদেরকে কারামান কাতেবীন বলা হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন– إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ যখন দুই ফেরেশ্তা ডানে ও বামে বসে তার কাছে আমল গ্রহণ করে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।[২৫৭]

হযরত ইবনে কাসীর আহনাফ ইবনে কায়েসের বর্ণনা উদ্ধৃত করে লিখেছেন– এই ফেরেশ্তাদ্বয়ের মধ্যে ডান দিকের ফেরেশ্তা নেক আমল লিপিবদ্ধ করে আর বাম দিকের ফেরেশ্তারও দেখাশুনা করে। মানুষ যদি কোন গুনাহ করে, তবে ডান দিকের ফেরেশ্তা বাম দিকের ফেরেশ্তাকে বলে এখনি এটা আমলনামায় লিপিবদ্ধ করো না। তাকে সময় দাও, যদি সেই তাওবা করে তবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হবে না। অন্যথায় আমলনামায় লিপিবদ্ধ কর।

কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের আমলনামা তাদের গলায় ঝুলানো থাকবে এবং তা তাকে পাঠ করতে বলা হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ، اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামতের দিন বের করে দেখাবো তাকে একটি কিতাব (আমলনামা) যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট।[২৫৮]

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ، كِرَامًا كَاتِبِينَ ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে, সম্মানিত আমল লিখকবৃন্দ। তারা জানে তোমরা যা কর।[২৫৯]

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ

যখন আমলনামা খোলা হবে, যখন আকাশের আবরণ অপসারিত করা হবে, যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্জলিত করা হবে এবং যখন জান্নাত সন্নিকটবর্তী হবে, তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে।[২৬০]

---

২৫৭. সূরা ক্বাফ, আয়াত– ১৭-১৮

২৫৮. সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত– ১৩-১৪

২৫৯. সূরা আল ইনফিতার, আয়াত– ১০-১২

২৬০. সূরা আত তাকভীর, আয়াত– ১০-১৪

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ، كِتَابٌ مَرْقُومٌ ، يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ

কখনো নয়, নিশ্চয় সৎ লোকদের আমলনামা সংরক্ষিত আছে ইল্লিয়্যীনে। আপনি জানেন ইল্লিয়্যীন কি? এটা হলো লিপিবদ্ধ খাতা। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশ্তাগণ একে প্রত্যক্ষ করে।[২৬১]

নেককার লোকদের আমলনামা ডান হাতে প্রদান করা হবে পক্ষান্তরে বদকার লোকদের বাম হাতে প্রদান করা হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ، وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ، وَيَصْلَى سَعِيرًا অতঃপর যাকে আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, তার হিসাব নিকাশ সহজ হয়ে যাবে। আর যাকে তার আমলনামা পিঠের পিছন দিক থেকে দেওয়া হবে, সে মৃত্যুকে আহবান করবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[২৬২]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন– فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে– নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। তারপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে সুউচ্চ জান্নাতে।[২৬৩]

এরপর বলা হয়েছে– وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ، يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ، مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ ، هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ، خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ، إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে– হ্যায়, আমায় যদি আমলনামা না দেওয়া হতো! আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হ্যায়, আমার মৃত্যুতেই যদি সবকিছু শেষ হয়ে যেতো! আমার ধন সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও ধ্বংস হয়ে গেল। ফেরেশ্তাদেরকে বলা হবে একে ধর, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। তারপর তাকে সত্তরগজ দীর্ঘ শিকল দিয়ে বেঁধে রাখ। নিশ্চয় সে আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিলনা এবং মিসকিনকে আহার্য দিতে উৎসাহিত করতো না।[২৬৪]

---

২৬১. সূরা আল মুতাফফিফীন, আয়াত– ১৮-২১
২৬২. সূরা আল ইনশিকাক, আয়াত– ৭-১২
২৬৩. সূরা আল হাক্কাহ, আয়াত– ১৯-২২
২৬৪. সূরা আল হাক্কাহ, আয়াত– ২৫-৩৪

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য প্রদান

আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন মানুষের মুখে মোহরাঙ্কিত করে দেবেন, তাদের মুখে তালাবদ্ধ থাকবে। তখন তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ স্ব স্ব কর্মের সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ আজ আমি এদের মুখে মোহর এঁটে দেবো। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।[২৬৫]

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না মনে করে তোমরা তাদের কাছে কিছুই গোপন করতে না। তোমাদের ধারনা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ তায়ালা জানেন না। তোমাদের পালনকর্তা সম্মন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ।[২৬৬]

সহীহ মুসলিম শরীফে, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূল ﷺ'র সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ তিনি বসে হেসে উঠলেন, তারপর বললেন, তোমরা কি জান আমি কেন হেসেছি? আমরা আরয করলাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, আমি সে কথা স্মরণ করে হেসেছি, যা হাশরের হিসাবের সময় বান্দা তার পালনকর্তাকে বলবে। সে বলবে– হে পরওয়ারদেগার! আপনি কি আমাকে যুলুম থেকে আশ্রয় দেননি? আল্লাহ বলবেন, অবশ্যই দিয়েছি। তখন বান্দা বলবে, তাহলে আমি আমার হিসাব নিকাশের ব্যাপারে অন্য কারো সাক্ষ্যে সন্তুষ্ট নই। আমার অস্তিত্বের (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) মধ্য থেকেই কোন সাক্ষী না দাঁড়ালে আমি সন্তুষ্ট হবো না। আল্লাহ বলবেন– كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا অর্থাৎ আজকে তোমার হিসাবের জন্য তুমিই যথেষ্ট। এর পর তার মুখে মোহর এঁটে দেওয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা তার ক্রিয়া কর্ম বর্ণনা কর। এতে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলতে আরম্ভ করবে এবং সত্য সাক্ষ্য দেবে। এরপর তার মুখ খুলে দেওয়া হবে। তখন সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বলবে তোমরা ধ্বংস হও। আমি তো দুনিয়াতে যা কিছু করেছি তোমাদের সুখের জন্যে করেছি। এখন তোমরাই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে শুরু করলে।[২৬৭]

---

২৬৫. সূরা ইয়াছিন, আয়াত– ৬৫-৬৬
২৬৬. সূরা হা-মীম-সিজদা, আয়াত– ২২-২৩
২৬৭. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি) সহীহ মুসলিম, হাদিস নং– ৭৩০৮, কিতাবুয যুহদ ও মিশকাত শরীফ, পৃ- ৪৮৫

মীযান ও হিসাব নিকাশ

মীযান অর্থ হলো দাঁড়িপাল্লা যা দিয়ে বিচারের দিন মানুষের নেকী-বদীর ওযন ও হিসাব নিকাশ হবে। মানুষের ভাল-মন্দ আমল যদিও জড়পদার্থ বস্তু নয় তবুও আল্লাহর কুদরতী শক্তি দ্বারা তা ওযন করতে সক্ষম। বর্তমানে বাতাসের চাপ, বৈদ্যুতিক প্রবাহ ও শীত গ্রীষ্মের পর্যন্ত ওযন করার যন্ত্র বের হয়েছে। এগুলোর মিটারই হলো এদের দাঁড়িপাল্লা। এগুলো মানুষের আবিস্কৃত। আর আল্লাহর ক্ষমতা তো অপরিসীম। সুতরাং তাঁর জন্য এটা মোটেও অসম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে– وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ সেদিন যথার্থই ওযন হবে। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা তারা আমার আয়াত সমূহ অস্বীকার করতো।[২৬৮]

আল্লাহ বলেন– وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করবো। সুতরাং কারো প্রতি যুলুম করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয় তা আমি উপস্থিত করবো এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।[২৬৯]

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ অতঃপর যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সুখে-শান্তিতে থাকবে আর যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে তার স্থান হবে হাবীয়া নামক দোযখে।[২৭০]

এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা আমলের ওযন করার কথা বলেছেন সংখ্যা গণনার কথা বলেন নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, যার আমল যতবেশী এখলাস, আন্ত রিকতা ও একনিষ্টতার সহিত হবে ততবেশী ওযনে ভারী হবে। আমল সংখ্যায় বেশী হওয়া ধর্তব্য নয় বরং আমল কম হলেও নিয়ত ও এখলাস থাকা বাঞ্চনীয়। বিশুদ্ধ নিয়ত ও এখলাস সম্বলিত অল্প আমলই মীযানের পাল্লা ভারী করতে যথেষ্ট।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন তোমাদের মধ্যে কার কর্ম উত্তম, কার কর্ম বেশী একথা বলেন নি।

একাধিক হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী হাশরের দাঁড়িপাল্লায় কালিমা তাইয়্যেবা তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ওযন হবে সবচেয়ে বেশী। এ কালিমা যে পাল্লায় থাকবে তা সর্বাধিক ভারী হবে।

---

২৬৮. সূরা আল আরাফ, আয়াত– ৮-৯

২৬৯. সূরা আম্বিয়া, আয়াত– ৪৭

২৭০. সূরা কারীয়া, আয়াত– ৬-৯

তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী ও হাকেম প্রমুখ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, হাশরের ময়দানে আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে তার নিরান্নব্বইটি আমলনামা সহ সকলের সামনে উপস্থিত করা হবে। প্রত্যেকটি আমলনামা তার দৃষ্টিসীমা পযন্ত দীর্ঘ হবে। তার সবগুলো আমলনামায় অসৎকাজ এবং গোনাহে পরিপূর্ণ থাকবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে এ আমলনামায় যা আছে তা ঠিক কিনা? নাকি অবাস্তব বা অতিরিক্ত লিখা হয়েছে? উত্তরে সে বলবে হে আল্লাহ! এতে যা আছে সবই ঠিক। তার আমল ওযন করা হলে মন্দের পাল্লা ভারী হবে এবং নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে। তখন তাকে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এসময় একটি আওয়ায আসবে যে, একে দোযখে এত দ্রুত নিও না। তার একটি বস্তু ওযনে আসেনি। তখন ঐ বস্তুটি আনা হবে যার উপর লিখা আছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। ঐটিকে তার নেকীর পাল্লায় দেওয়া হবে, সাথে সাথে নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে এবং তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে।[২৭১]

বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদিসে বর্ণিত আছে– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- দু'টি কালিমা আল্লাহর নিকট প্রিয় যা মুখে উচ্চারণে সহজ কিন্তু মীযানে খুবই ভারী। কালিমা দু'টি হলো– সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম।[২৭২]

এভাবে বিভিন্ন হাদিসে নেকীর পাল্লা ভারী করে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমলের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, সচ্চরিত্র, অপ্রয়োজনীয় কথা বার্তা থেকে চুপ থাকা, আল্লাহ ও পরকালের ভয়ে ক্রন্দন করা ও চোখের পানি ফেলা, মানুষকে মাসআলা শিক্ষা দেওয়া, সময় মতো ফরয নামায আদায় করা, জ্ঞানীদের কলমের কালি এবং পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যয় ইত্যাদি সৎকর্ম মীযানের নেকীর পাল্লায় ভারী হবে।

হাউযে কাউসার

আল্লাহ তায়ালা সূরা কাউসারে বলেন– إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার তথা অজস্র কল্যাণ দান করেছি। এই কাউসার সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। তম্মধ্যে একটি মত হলো কাউসার জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম। আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন– له صلى الله عليه وسلم حوضان احدهما فى الموقف قبل الصراط والثانى فى الجنة وكلاهما يسمى كوثرا والكوثر فى كلاهمهم الخير الكثير ثم الصحيح ان الحوض قبل الميزان فان الناس يخرجون

---

২৭১. শায়খ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, পৃ- ৪৮৬, আব্দুল কাদের জিলানী (র.) গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দু, পৃ- ১৫৬

২৭২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড-২ পৃ-১১২৯

عطاشًا من قبورهم فيقدم الحوض قبل الميزان. রাসূল ﷺ'র জন্য দু'টি হাউয থাকবে। একটি পুলসিরাতের আগে কিয়ামতের ময়দানে আর অপরটি হবে জান্নাতে। উভয়টিকে নামকরণ করা হয়েছে কাউসার করে। এর অর্থ হলো অজস্র কল্যাণ। তবে বিশুদ্ধ মত হলো হাউযে কাউসার হবে মীযানের আগে। কেননা মানুষ কবর থেকে পিপাসার্ত অবস্থায় বের হবে তখন তাদেরকে হাউযে কাউসার থেকে পানি পান করনো হবে।[২৭৩]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيُرْفَعَنَّ مَعِي رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি তোমাদের আগে হাউযের কাছে পৌঁছে যাব। এসময় তোমাদের কতিপয় লোককে আমার সামনে উঠানো হবে, আবার আমার সামনে থেকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি আরয করবো, হে প্রভু! এরা তো আমার উম্মত, তখন বলা হবে, তুমি জাননা, এরা তোমার পর কি নতুন কীর্তি করেছে।[২৭৪]

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنْ اللَّبَنِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন,নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, আমার হাউয এক মাসের দূরত্বের সমান (বড়) হবে। এর পানি দুধের চেয়ে শুভ্র, ঘ্রাণ মিশকের চেয়ে সুগন্ধিযুক্ত এবং এর পানপাত্রগুলো হবে আকাশের তারকার ন্যায় অধিক। যে ব্যক্তি তা থেকে একবার পান করবে সে আর পিপাসার্ত হবে না।[২৭৫]

আল্লামা তাফতাযানী (র.) (৭৯১ হি.) ও আব্দুল আযীয ফরহারী (র.) বলেন– والاحاديث فيه كثيرة بل صرح القاضى عياض بتواترها وذكر من رواها سبعة وعشرين من الصحابة ومنهم ابو بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم এ বিষয়ে অসংখ্য হাদিস রয়েছে বরং কাযী আয়ায (র.) বলেছেন, এ বিষয়টি খবরে মুতাওয়াতির দ্বারা সাব্যস্ত। তিনি এ বিষয়ে হাদিস বর্ণনাকারীদের সংখ্যা ২৭জন উল্লেখ করেছেন। যাদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু বকর, ওমর ও আয়েশা (রা.)'র ন্যায় সাহাবীও রয়েছেন।[২৭৬]

পুলসিরাত

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তা (পুলসিরাত)

২৭৩. মোল্লা আলী কারী (র.) (১০১৪ হি) মিরকাত, হাশীয়ে মিশকাত, পৃ- ৪৮৭ টীকা নং- ৫
২৭৪. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী, হাউয অধ্যায়, খণ্ড-২ পৃ-৯৭৩
২৭৫. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬ হি) সহীহ বুখারী শরীফ, হাউয অধ্যায়, খণ্ড-২ পৃ-৬১৩০
২৭৬. সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী (র.) (৭৯১ হি) ও আব্দুল আযীয ফরহারী (র.)– শরহে আকায়েদে নসফিয়্যা ও নিবরাস, পৃ- ২১৮

পার হবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফায়সালা। অতঃপর আমি খোদা ভীরুদের মুক্তি দেবো এবং যালেমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেবো। পুলসিরাত হলো জাহান্নামের উপর দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা বা সেতু।

فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنْ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ এ সম্পর্কে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে– জাহান্নামের উপর একটি সেতুপথ (পুলসিরাত) স্থাপন করা হবে। রাসূলগণের মধ্যে আমিই সবার আগে আমার উম্মত নিয়ে এ পথ অতিক্রম করবো।[২৭৭]

الصراط حق ممدود على متن جهنم ادق من الشعر واحد من السيف يعبربه اهل الجنة ويزل به اقدام اهل النار. শরহে আকায়েদে নসফিয়্যা গ্রন্থে আছে– পুলসিরাত সত্য। এটি জাহান্নামের উপর বিস্তৃত হবে এবং চুলের চেয়ে চিকন ও তরবারীর চেয়ে ধারাল হবে। জান্নাতীরা সহজে পার হয়ে যাবে আর জাহান্নামীরা পদস্খলন হয়ে পড়ে যাবে।[২৭৮]

قَالَ أَبُو سَعِيد بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنْ الشَّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنْ السَّيْفِ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, আমার নিকট হাদিস পৌঁছেছে যে, পুলসিরাত চুলের চেয়ে চিকন এবং তরবারীর চেয়ে ধারালো হবে।[২৭৯]

ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেন– الصراط حق وهو حبسرُ ممدد على متن جهنم احد من السيف وادق من الشعرة تزل عليه واقدام الكافرين بحكم الله سبحانه فتهوى بهم الى النار وثبت عليه اقدام المؤمنين بفضل الله فيساقون الى دار القرار. পুলসিরাত সত্য। এটি একটি দীর্ঘ সেতু যা জাহান্নামের উপর বিস্তৃত থাকবে। এটি তরবারীর চেয়ে অধিক ধারাল হবে এবং চুলের চেয়ে চিকন হবে। কাফেরদের পা পদস্খলিত হয়ে আল্লাহর হুকুমে জাহান্নামে পতিত হবে। পক্ষান্তরে মু'মিনদের কদম সুদৃঢ় থাকবে এবং আল্লাহর দয়ায় সেতু পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৮০]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– জাহান্নামে সাতটি পুল থাকবে। প্রত্যেক দুই পুলের মধ্যে সত্তর বছরের দূরত্ব হবে। এটি তলোয়ারের চেয়ে ধারাল হবে। লোকদের প্রথম দল চোখের পলকের ন্যায় দ্রুতগতিতে পার হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দল বিদ্যুৎগতিতে, তৃতীয় দল তীব্র বাতাসের গতিতে, চতুর্থ দল উড়ন্ত পাখির গতিতে, পঞ্চম দল দ্রুতগামী ঘোড়ার ন্যায়, ষষ্ঠ দল দ্রুতগতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ন্যায় এবং সপ্তম দল ধীরগতিতে পায়ে হাটা লোকের ন্যায় পার হবে। পুল অতিক্রমকারীদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তিকে বলা হবে তুমি পার হয়ে যাও। যখন সে উভয়

২৭৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড-১ পৃ-৭৬৯
২৭৮. আল্লামা সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী (র.) (৭৯১ হি) শরহে আকায়েদে নসফিয়্যা ও নিবরাস, পৃ- ২১৮
২৭৯. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি), সহীহ মুসলিম শরীফ, বাবু আদনা আহলিল জান্নাতে মানযিলাতান
২৮০. ইমাম গাজ্জালী (র.) (৫০৫হি), কাওয়ায়েদুল আকায়েদ, খণ্ড-১ পৃ-১৬৬

পা পুলে রাখবে তখন পদস্খলন ঘটবে। তারপর সে হাঁটু দিয়ে চলতে চেষ্টা করবে। দোযখের আগুন তার লোম ও ত্বকে আক্রমণ করবে। সে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে চেষ্টা করবে। পা যখন কোন কাজে আসবে না তখন সে এক হাতে লটকিয়ে পার হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। দোযখের আগুন তাকে আহত করতে থাকবে। সে মনে করবে আমি এই আযাব থেকে রক্ষা পাব না। কিন্তু বুকে চেচড়িয়ে চেচড়িয়ে সে পার হয়ে যাবে অতঃপর সে পুলের দিকে ফিরে তাকাবে আর বলবে কতই না বরকত মণ্ডিত সেই সত্তা যিনি আমাকে এই আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমার প্রভু আমার উপর যে দয়া ও মেহেরবাণী করেছেন মনে হয় এরূপ আর কাউকে করেন নি।[২৮১]

মোটকথা হলো পুলসিরাত পার হওয়া সহজ ও কঠিন হওয়াটা বান্দার আমল অনুযায়ী হবে। যার নেকী বেশী সে ততবেশী দ্রুতগতিতে পার হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে গুনাহের পরিমাণ অনুযায়ী বিলম্বে পার হবে গুনাহগারগণ। তবে বিলম্বে হলেও সকল মু'মিন আল্লাহর মেহেরবাণীতে পার হতে সক্ষম হবে। কিন্তু কাফির লোক কোন অবস্থাতেই তা পার হতে পারবেনা। তারা বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত হয়ে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।

জান্নাত ও জাহান্নাম

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সর্বদা দু'টি জিনিস পাশাপাশি বর্ণনা করেছেন। একটি হলো ভাল অপরটি হলো মন্দ। যেখানে মু'মিনের কথা বলেছেন সেখানে কাফিরের কথাও বলেছেন। এভাবে যেখানে জান্নাতের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে জাহান্নামের কথাও উল্লেখ করেছেন। নেক্কার মু'মিনদের জন্য সৃষ্টি করেছেন জান্নাত অপর দিকে কাফের ও মুনাফিকদের জন্য সৃষ্টি করেছেন জাহান্নাম। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করে রেখেছেন। আল্লাহ বলেন– وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার প্রস্ত সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরি করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য।[২৮২]

জান্নাতের বিশালত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে, مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا জান্নাতে লাঠি রাখার সামান্য স্থানও দুনিয়া এবং এর সমস্ত নিয়ামতের চেয়ে উত্তম।[২৮৩]

আর জাহান্নাম সম্পর্কে বলেছেন– فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ আর তা যদি না পার অবশ্য তা তোমরা কখনো

২৮১. আব্দুল কাদের জিলানী (র.), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দু, পৃ- ২৯৮
২৮২. সূরা আলে ইমরান, আয়াত– ১৩৩
২৮৩. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র; মিশকাত, পৃ- ৪৯৫

পারবেনা। তাহলে সেই জাহান্নামের আগুনকে ভয় কর, যার জ্বালানী হবে (গুনাহগার) মানুষ ও পাথর, যা তৈরি করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।[২৮৪]

জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টির ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত উভয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা অতীতকালবাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন যা তৈরি করে রাখা বুঝায়। তাছাড়া হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাতে অবস্থান করেছিলেন এবং নবী করিম ﷺ মিরাজের সময় জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন করেছিলেন ইত্যাদি দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহর কুদরতী শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করে রেখেছেন। জাহান্নাম যদিও কেবল কাফির মুশরিকদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তথাপি গুনাহগার মু'মিনও সাময়িকভাবে গুনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। পরবর্তীতে আল্লাহর দয়া ও মেহেরবাণীতে তা থেকে মুক্তি লাভ করবে। কোন মু'মিন চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। জান্নাতে সুখ-সাচ্ছন্দ, আরাম-আয়েশের যাবতীয় উপকরণ থাকবে, যা জান্নাতীরা স্থায়ীভাবে ভোগ করতে থাকবে। পক্ষান্তরে জাহান্নামে দুঃখ-দুদর্শা, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ও সীমাহীন যন্ত্রনাদায়ক স্থায়ী শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে, যা বর্ণনাতীত।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে জান্নাতের নিয়ামত ও জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা কেবল মানুষের ধারণাভুক্ত জিনিসগুলোর কথা বলা হয়েছে নতুবা এগুলো বর্ণনাতীত। জান্নাতের নিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র রমণীকুল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।[২৮৫]

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে।[২৮৬]

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ، نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ

তোমাদের জন্য সেখানে (জান্নাতে) রয়েছে যা তোমাদের মন চায় এবং যা তোমরা দাবী কর। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন।[২৮৭]

২৮৪. সূরা বাকারা, আয়াত– ২৪
২৮৫. সূরা বাকারা, আয়াত– ২৫
২৮৬. সূরা বাকারা, আয়াত– ৮২

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ، يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ، لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ .

তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। তাদের (জান্নাতীদের) নিকট পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তাতে চিরকাল থাকবে।[২৮৮]

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ، هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ، لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ، سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ

এদিন জান্নাতিরা আনন্দে মশগুল থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবশে আসনে হেলান দিয়ে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফলমূল এবং যা চাইবে। করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'।[২৮৯]

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

পরহেযগারদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে এমন জান্নাতসমূহ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে অবগত।[২৯০]

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

তারা প্রবেশ করবে বসবাসের জান্নাতে। তথায় তারা স্বর্ণ নির্মিত, মোতি খচিত কংকন দ্বারা অলংকৃত হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।[২৯১]

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ

২৮৭. সূরা হামীম সিজদা, আয়াত ৩১-৩২
২৮৮. সূরা আয যুখরুক, আয়াত– ৭০
২৮৯. সূরা ইয়াছিন, আয়াত– ৫৫-৫৯
২৯০. সূরা আলে ইমরান, আয়াত– ১৫
২৯১. সূরা ফাতির, আয়াত– ৩৩-৩৪

পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থা হলো তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্যে আছে রকমারি ফলমূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা।[২৯২]

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ، فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ، كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ، مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ، يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ.

নিশ্চয় পরহেযগারগণ থাকবে জান্নাতে ও নিয়ামতে। তারা উপভোগ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদের দেবেন এবং তিনি জাহান্নামের আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর। তারা শ্রেণিবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়ত লোচনা হুরদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব আর তাদের আমল বিন্দুমাত্র হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। আমি তাদেরকে দেবো ফলমূল এবং গোশত যা তারা চাইবে। যেখানে তারা একে অপরকে পানপাত্র দেবে, যাতে অসার বকাবকি নেই এবং পাপকর্মও নেই। সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফিরা করবে।[২৯৩]

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ، مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ، يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ، لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ، وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ، وَحُورٌ عِينٌ ، كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ، إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ، وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ، وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ، لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ، وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ، إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ، عُرُبًا أَتْرَابًا ، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ.

২৯২. সূরা মুহাম্মদ, আয়াত–১৫
২৯৩. সূরা আত তূর, আয়াত– ১৭-২৪

জান্নাতীরা থাকবে স্বর্ণ খচিত সিংহাসনে। তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। তাদের কাছে ঘোরা-ফিরা করবে চির-কিশোরেরা পান পাত্র কূঁজা ও খাঁটি সূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে। যা পান করলে তাদের শির পিড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্ত ও হবেনা। আর তাদের পছন্দমত ফলমূল নিয়ে এবং রুচিসম্মত পাখির মাংস নিয়ে তথায় থাকবে আনত নয়না হুরগণ, আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়। তারা (দুনিয়াতে) যা কিছু করত তার পুরষ্কারস্বরূপ। তারা তথায় অবান্তর ও কোন খারাপ কথা শুনবে না তবে শুনবে সালাম আর সালাম। যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান। তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে এবং কাদি কলায় আর দীর্ঘ ছায়ায় ও প্রবাহিত পানিতে এবং প্রচুর ফলে মূলে, যা শেষ হবার নয় ও নিষিদ্ধও নয়। আর থাকবে সমুন্নত শয্যায়। আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, কামিনী, সমবয়স্কা ডান দিকের লোকদের জন্য।[২৯৪]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ، خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদৌস। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল, সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না।[২৯৫]

فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ، مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ، قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا ، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ، عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا

আর তাদের সবরের প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। তারা সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবেনা। আর বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্বাধীন রাখা হবে। তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের ন্যায় পানপাত্রে রূপালী স্ফটকের পাত্রে। পরিবেশন কারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে 'যানজাবীল' মিশ্রিত পান পাত্র। এটা জান্নাতস্থিত 'সালসাবিল' নামক একটি ঝরণা। তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে

২৯৪. সূরা আল ওয়াকিয়া, আয়াত- ১৫-৩৮
২৯৫. সূরা আল কাহফ, আয়াত- ১০৭-১০৮

মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা। আপনি যখন দেখবেন, তখন নিয়ামতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদের পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকন এবং তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন 'শরাবান তাহুরা'[২৯৬]

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ، لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ، لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ، فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ، فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ

সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে সজীব, তাদের কর্মের কারণে তারা সন্তুষ্ট। তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে। তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা, তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝর্ণা। তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন এবং সংরক্ষিত পান পাত্র আর সারি সারি গালিচা ও বিস্তৃত বিছানো কার্পেট।[২৯৭]

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ পরহেযগারদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে এমন জান্নাতসমূহ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে অবগত।[২৯৮]

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ আর যারা কুফুরি করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে শাস্তিও লাঘব করা হবেনা। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকারীকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।[২৯৯]

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ، تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং সেখানে তারা থাকবে ভীবৎস চেহারায়।[৩০০]

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ، يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ، كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا

২৯৬. সূরা আদ দাহর, আয়াত- ১২-২১
২৯৭. সূরা আল গাশিয়া, আয়াত- ৮-১৬
২৯৮. সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৫
২৯৯. সূরা ফাতির, আয়াত- ৩৬
৩০০. সূরা মু'মিনুন, আয়াত- ১০৩-১০৪

عَذَابَ الْحَرِيقِ যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। এর দ্বারা তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে এবং তাদের জন্য থাকবে লৌহ মুদগর। যখনই তারা যন্ত্রনায় কাতর হয়ে জাহান্নাম হতে পলায়ন করতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তাতে। আর তাদেরকে বলা হবে, আস্বাদ কর দহন যন্ত্রনা।[৩০১]

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ، لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ

নিশ্চয় (কাফির) অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকবে। তাদের থেকে আযাব লাঘব করা হবে না এবং তারা তাতেই থাকবে হতাশ হয়ে। আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি কিন্তু তারাই ছিল যালিম। তারা (জাহান্নামের দারগাকে) ডেকে বলবে হে মালেক! তোমার প্রভুর কাছে আমাদের (মুক্তির) জন্য আবেদন কর। সে বলবে, নিশ্চয় তোমরা (এখানে) চিরকাল থাকবে।[৩০২]

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ، طَعَامُ الْأَثِيمِ ، كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ، كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ، خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ، ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ، إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ পাপীর খাদ্য হবে (জাহান্নামে)। গলিত তাম্রের মত পেটে ফুটতে থাকবে, যেমন ফুটে পানি। (বলা হবে) একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও। স্বাদ গ্রহণ কর। তুমি তো সম্মানিত সম্ভ্রান্ত! এ সম্পর্কে তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে।[৩০৩]

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ، فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ আর যদি সে পথভ্রষ্ট মিথ্যাবাদীদের একজন হয় তবে তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে অগ্নিতে। এটা ধ্রুব সত্য।[৩০৪]

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ

আযাবের ফেরেশ্তাদেরকে বলা হবে একে ধর, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। তারপর সত্তর গজ দীর্ঘ শিকলে আবদ্ধ কর।[৩০৫]

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ، لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ، لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ، عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

৩০১. সূরা হাজ্জ, আয়াত- ১৯-২২
৩০২. সূরা আয যুখরুফ, আয়াত- ৭৪-৭৭
৩০৩. সূরা আদ দোখান, আয়াত- ৪৩-৫০
৩০৪. সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত- ৯২-৯৫
৩০৫. সূরা আল হাক্কাহ, আয়াত: ৩০-৩২

আমি তাকে দাখিল করব অগ্নিতে। আপনি কি জানেন অগ্নি কি? এটা অক্ষত রাখবেনা এবং ছাড়বেও না, মানুষকে দগ্ধ করবে। এর উপর নিয়োজিত আছে উনিশজন ফেরেশ্তা।[৩০৬]

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ، فَأَمَّا مَنْ طَغَى ، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى -

আর দর্শকদের জন্যে জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে। তখন যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।[৩০৭]

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

আর যারা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী। অনন্তকাল সেখানে থাকবে।[৩০৮]

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ، لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ

আজকের দিন এখানে তাদের কোন সুহৃদ নেই এবং কোন খাদ্য নেই ক্ষত নিঃসৃত পুজঁ ব্যতীত। পাপীরা ব্যতীত কেউ এটা খাবেনা।[৩০৯]

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, জাহান্নামীদের পান করার জন্য যে পুঁজ দেয়া হবে এর এক বালতি যদি দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে সমগ্র দুনিয়াবাসী দুর্গন্ধে মারা যাবে। এভাবে জাহান্নামীদের খাদ্য যাক্কুমের এক ফোটা যদি দুনিয়ায় পড়ে তবে দুনিয়াবাসীর সকল পানাহার দ্রব্য বিনষ্ট হয়ে যাবে।[৩১০]

مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ، يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ তার পেছনে রয়েছে জাহান্নাম। তাকে পুঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে। ঢোক গিলে তা পান করবে এবং গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেনা। প্রতি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আসবে কিন্তু সে মরবেনা। তার পশ্চাতেও রয়েছে কঠোর আযাব।[৩১১]

৩০৬. সূরা আল মুদ্দাস্সির,আয়াত: ২৬-৩০
৩০৭. সূরা আন নাযিয়াত, আয়াত- ৩৬-৩৯
৩০৮. সূরা বাকারা, আয়াত- ৩৯
৩০৯. সূরা আল হাক্কাহ, আয়াত-৩৫-৩৭
৩১০. শেখ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (৭৪০ হি), মিশকাত শরীফ, পৃ- ৫০৩
৩১১. সূরা ইব্রাহিম, আয়াত- ১৬-১৭

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ، عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ، تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ، تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ، لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ، لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ

আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে। কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই। এটা তাদেরকে পুষ্ট করবেনা এবং ক্ষুধা নিবারণ ও উপকার করবেনা।[৩১২]

জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চিরস্থায়ী ভাবে থাকবে। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। অতঃপর এতদ উভয়ের মধ্যখানে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন– يا اهل الجنة لاموت وياهل النار لاموت كل خالدٌ فيها هو فيه হে জান্নাতবাসী! এখন মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামবাসী! এখন কোন মৃত্যু নেই। যে যেখানে আছ সেখানেই থাকবে চিরকাল।[৩১৩]

এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ

- দাতা গঞ্জেবখশ লাহোরী (র.) ৮ সফর ৪৬৫ হিজরি
- হযরত সালমান ফারসী (রা.) ১১ সফর ৩১/৩৪/৩৫ হিজরি
- আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী (র.) ১২ সফর
- ইমাম নাসাঈ (র.) ১৩ সফর ৩০ হিজরি
- মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) ২৬ সফর ১০৩৪/৩৫ হিজরি
- হযরত ইমাম হাসান (রা.) ২৮/২৯ ৪৯ হিজরি
- ইমাম আহমদ রেযা (র.) ২৫ সফর ১৩৪০ হিজরি

৩১২. সূরা আল গাশিয়া, আয়াত– ১-৭
৩১৩. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি), সহীহ মুসলিম শরীফ, হাদিস নং– ৭০৫৫

রবিউল আউয়াল

রবিউল আউয়াল মাস হলো আরবী হিসেবে তৃতীয় মাস। আল্লাহ তায়ালা একেক মাসকে একেক কারণে ফযিলত দান করেছেন। যেমন, রমযান মাসকে নুযূলে কুরআন ও লায়লাতুল কদরের কারণে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আর রবিউল আউয়াল মাসকে সাহেবে কুরআন এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ﷺ'র শুভাগমনের কারণে সব মাসসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাবান মাস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ মাস আগমন করলে ঈমানদারগনের মনে আনন্দের ঢেউ উঠে এবং মাসব্যাপী ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঈদ তথা খুশি উদ্‌যাপন করে থাকে। এসব মাহফিলে নবী প্রেমিক আলোচকগণ নবী করিম ﷺ এর সৃষ্টি, পৃথিবীতে শুভাগমন, চারিত্রিক গুণাবলি এবং তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে তাঁর আদর্শে আদর্শবান হওয়া ও তাঁর আনুগত্যের প্রতি মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেন।

নূরে মুহাম্মদী ﷺ সৃষ্টি

আল্লাহ তায়ালা আসমান যমিন, লাউহে-কলম, আরশ-কুরচি, জিন-ইনসান, ফেরেশ্‌তা সবকিছু সৃষ্টির পূর্বে নূরে মুহাম্মদীকে স্বীয় নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। এ ব্যাপারে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন,

قلت يا رسول الله! بابى وانت وامى! اخبرنى عن اول شَيْئٍ خلقه الله تعالى قبل الاشياء قال يا جابر! ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره فجعل ذالك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن فى ذالك الوقت لوح ولاقلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء والارض ولا شمس ولا قمر ولا جنى ولا انسى فلما اراد الله تعالى ان يخلق الخلق قسم ذالك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثانى اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول حملة العرش ومن الثانى الكرسي ومن الثالث باقى الملائكة ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول السموات ومن الثانى الارضين ومن الثالث الجنة والنار

আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক। আমাকে বলুন আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কি সৃষ্টি করেছেন? রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– হে জাবির! আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টির পূর্বে সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূরকে স্বীয় নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ নূর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী যেখানে ইচ্ছে ভ্রমণ করতে থাকেন। তখন লাওহ, কলম, জান্নাত, দোযখ, ফেরেশ্‌তা, আসমান, যমিন, চন্দ্র,

সূর্য, জিন, ইনসান কিছুই ছিলনা। আল্লাহ তায়ালা যখন মাখলুখ সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন ঐ নূরকে চারভাগে ভাগ করেন। প্রথমভাগ থেকে কলম দ্বিতীয় ভাগ থেকে লাওহ এবং তৃতীয় ভাগ থেকে আরশ সৃষ্টি করেন। তারপর চতুর্থ ভাগকে পুনরায় চারভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগ থেকে আরশ বহনকারী ফেরেশ্তা, দ্বিতীয়ভাগ থেকে কুরসি এবং তৃতীয় ভাগ থেকে অন্যান্য ফেরেশ্তা সৃষ্টি করেন। আবার ঐ চতুর্থ ভাগকে চারভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগ থেকে আসমান, দ্বিতীয়ভাগ থেকে যমিন এবং তৃতীয় ভাগ থেকে জান্নাত ও দোযখ সৃষ্টি করেছেন।[৩১৪]

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله ﷺ سَأَلَ جبرئيل عليه السلام فقال يا جبرئيل كم عمرت من السنين فقال يا رسول الله لست اعلم غيران فى الحجاب الرابع نجم يطلع فى كل سبعين الف سنة مرّة رأيته اثْنَيْنِ وسبعين الف مرّةٍ فقال يا جبرئيل وعزّة ربى جَلَّ جلاله انا ذالك الكوكب –

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ হযরত জিব্রাইল (আ.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিব্রাইল! তোমার বয়স কত? জিব্রাইল (আ.) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সঠিক বয়স কত তা আমি জানি না। তবে এতটুকু জানি যে, সমস্ত কায়েনাত সৃষ্টির পূর্বে হেযাবে এলাহীর চতুর্থ হেযাবে সত্তর হাজার বছর পর পর একটি উজ্জ্বল তারকা উদিত হতো। আমি ঐ তারকাকে বাহাত্তর হাজার বার উদিত হতে দেখেছি। তখন নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– হে জিব্রাইল! আমি আমার প্রভুর ইজ্জতের শপথ করে বলতেছি যে, সেই তারকা ছিলাম আমি।[৩১৫]

عن على بن الحسين عن ابيه عن جده عن النبى ﷺ قال كنت نورًا بين يدى ربى قبل خلق ادم باربعة عشر الف عام

হযরত আলী ইবনে হোসাইন তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা হযরত আলী (রা.) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার প্রভুর নিকট আদম (আ.)'র সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে নূর হিসেবে ছিলাম।[৩১৬]

---

৩১৪. ইমাম আহমদ কাস্তলানী (র.) (৯২৩ হি) আল মুয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ, খণ্ড- ১, পৃ- ৭১, ইমাম যুরকানী (র.) (১২২২ হি), শরহে মুয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ, খণ্ড-১, পৃ- ৮৯-৯১, আলী ইবনে বুরহান উদ্দীন হালভী (র.) (১৪০৪ হি), সীরাতে হালবীয়্যাহ, খণ্ড- ১, পৃ- ৫০, আজলুনী (র.) (১১৬২ হি) কাশফুল খিফা, খণ্ড-১ পৃ- ৩১১ , আশরাফ আলী থানভী (র.) (১৩৬২ হি), নশরুত তীব, পৃ-১৩, আল্লামা ফাসী ইমাম ইবনে আহমদ (র.) মাতালিউল মুসাররাত, পৃ- ২১০, শাহাবুদ্দিন ইবনে হাজর হায়তমী মক্কী (র.) (৯৭৪ হি) ফাতাওয়ায়ে হাদিসীয়্যাহ, পৃ-৫১, আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র), (১০৫২ হি.) মাদারেজুন নবুওয়াত, খণ্ড-১, পৃ. ৩০৯) ইদ্রিস কান্দলভী দেওবন্দী, মকামাতের হাশিয়া, পৃ-১

৩১৫. আলী ইবনে বুরহান উদ্দীন হালভী (র.) (১৪০৪ হি), সীরাতে হালবীয়্যাহ, খণ্ড- ১, পৃ- ৩০, আশরাফ আলী থানভী, (১৩৬২ হি), নশরুত তীব, পৃ-৯১৭

৩১৬. ইমাম আহমদ কাস্তুলানী (র.) (৯২৩ হি) আল মুয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ, খণ্ড ১, পৃ-৭৪, ইমাম যুরকানী (র.) (১২২২ হি), শরহে মুয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ, খণ্ড-১, পৃ- ৯৫, আলী ইবনে বুরহান

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নবুয়ত কখন থেকে নির্ধারিত ছিল? উত্তরে বললেন– যখন আদম (আ.) রূহ ও শরীরের মধ্যবর্তীতে ছিলেন তখন থেকে।[৩১৭]

হযরত ওমর (রা.) থেকে মুরসাল হাদিসে বর্ণিত আছে– **مَتى جعلت نَبيا قَالَ وآدَم منجدل فِي الطين** হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে কখন নবী বানানো হয়েছিল? উত্তরে তিনি বলেন– যখন হযরত আদম (আ.) মাটির খামীর ছিলেন।[৩১৮]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– **قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى كُتِبْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ:وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ.** ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল ﷺকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কখন থেকে নবী? উত্তরে বললেন– যখন হযরত আদম (আ.) রূহ ও শরীরের মধ্যে ছিলেন।[৩১৯]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– **قيل للنبى صلى الله عليه وسلم : متى وجبت لك النبوة ؟ قال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه** নবী করিম ﷺকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল– আপনার জন্য নবুয়ত কখন আবশ্যক হয়েছিল? উত্তরে তিনি বলেন, যখন আদম (আ.)কে সৃষ্টি করে তার মধ্যে ফুঁক দেয়া হয়েছিল।[৩২০]

উদ্দীন হালভী (র.) (১৪০৪ হি), সীরাতে হালবীয়্যাহ, খণ্ড- ১, পৃ- ৩০, আশরাফ আলী থানভী, (১৩৬২ হি), নশরুত তীব, পৃ-১৫

৩১৭. ইমাম তিরমিযী, তিরমিযী শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ–৫১৩

৩১৮. আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) (৭৭৪ হি), আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-২, পৃ- ৩২১, আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), আল খাসায়েসুল কুরবা, খণ্ড-১ পৃ–৮

৩১৯. তিবরানী (র.) (৩৬০ হি), আল মু'জামুল কবীর, খণ্ড- ১২, পৃ- ৯২, তিবরানী (র.) (৩৬০ হি), আল মু'জামুল আওসাত, খণ্ড-৪ পৃ- ২৭২, হায়ছামী (র.) (৮০৭ হি), মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড-৮ পৃ- ২২৩, আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) (৭৭৪ হি), আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-২ পৃ- ৩২১, আজলুনী (র.) (১১৬২ হি) কাশফুল খিফা, খণ্ড-২ পৃ-১৬৯, ইমাম আহমদ কাস্তুলানী (র.) (৯২৩ হি) আল মুয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ, খণ্ড- ১ পৃ- ৬০, আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি) আল খাসাযেসুল কুরবা, খণ্ড-১ পৃ-৮

৩২০. ইমাম হাকেম (র.) (৪০৫ হি) আল মুস্তাদরাক, খণ্ড-২, পৃ. ৬৬৫, ইবনে হিব্বান (র.) (৩৫৪ হি) আস্-সিকাত, খণ্ড-১, পৃ. ৪৭, ইবনে আসাকের (র.) (৫৭১ হি.), তারীখে দামেস্ক আল্-কবীর, খণ্ড-৫৪, পৃ- ৪৮৮-৮৯, আল্লামা ইবনে কাসীর (র.), (৭৭৪ হি.), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-২ পৃ–৩০৭ .৩২০, আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.), আল খাসায়েসুল কুরবা, খণ্ড-১ পৃ–৭, খতীব বাগদাদী (র.) (৪৬৩ হি), তারীখে বাগদাদ, খণ্ড-৩ পৃ-৭০

ইমাম শাবী (র.) বর্ণনা করেন– قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى استنبت -قال وآدم بين الروح والجسد حين اخذ منى الميثاق ! এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনাকে কখন নবী বানানো হয়েছিল? উত্তরে তিনি বলেন, যখন আদম (আ.) রূহ ও শরীরের মধ্যে ছিলেন। তখন আমার থেকে মিসাক তথা ওয়াদা নেওয়া হয়েছিল।[৩২১]

এ ব্যাপারে ইমাম কাসতুল্লানী (র.) বলেন:-

إن الله تعالى لما خلق نور نبينا محمد ﷺ أمره أن ينظر إلى أنوار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فغشيهم من نوره ما أنطقهم الله به وقالوا: يا ربنا، من غشينا نوره؟ فقال الله تعالى: هذا نور محمد بن عبد الله، إن آمنتم به جعلتكم أنبياء، قالوا: آمنا به وبنبوته فقال الله تعالى: أشهد عليكم؟ قالوا: نعم. فذلك قوله تعالى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ} إلى قوله: {وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

যখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ'র নূর সৃষ্টি করলেন তখন ঐ নূরকে সকল নবীগণের নূরের দিকে তাওয়াজ্জুহ দিতে আদেশ করেন। অতঃপর রাসূল ﷺ'র নূর সকল নবীগণের নূরকে আচ্ছাদিত করে ফেলল। তখন আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়াদের রূহকে আহবান করলেন। তারা আরয করলেন, হে প্রভু! আমাদেরকে কার নূরে আচ্চাদিত করে রেখেছে? আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর নূর। যদি তোমরা তাঁর উপর ঈমান আন তবে তোমাদেরকে নবী বানাবো হবে। তারা সকলেই বললেন– আমরা তাঁর এবং তাঁর নবুয়তের উপর ঈমান আনলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন– আমি তোমাদের সাক্ষী হবো? তারা বললেন, হ্যাঁ, সুতরাং কুরআনে বর্ণিত আয়াত وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الخ এর দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৩২২]

অপর একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– كنت اول النبيين فى الخلق واخرهم فى البعث সৃষ্টিগতভাবে আমি সকল নবীগণের প্রথম নবী আর দুনিয়াতে আগমনের দিক দিয়ে সর্বশেষ নবী।[৩২৩]

---

৩২১. ইবনে সাদ (র.) (২৩০ হি.) আত্-তাবকাতুল কুবরা, খণ্ড-১, পৃ-১৪৮, ইমাম কাসতুল্লানী (র.) (৯২৩ হি), আল মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যাহ, খণ্ড-১ পৃ-৭৪

৩২২. ইমাম কাসতুল্লানী (র.) (৯২৩ হি.), মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যাহ, খণ্ড-১, পৃ-৬৬

৩২৩. দায়লামী (র.) (৫০৯ হি), আল ফেরদৌস, খণ্ড-৩ পৃ-২৮২, আজলুনী (র.) (১১৬২ হি), কাশফুল খিদা, খণ্ড-২ পৃ-১৬৯, ইমাম বগভী (র.) (৫১৬ হি), মুয়ালিমুত তানযীল, খণ্ড-৩ পৃ-৫০৮, ইবনে কাসীর (র.) (৭৭৪ হি), তাফসীরুল কুরআন, খণ্ড-৩, পৃ-৪৭, শওকানী (র.) (১২৫০ হি), ফাতহুল

উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবী করিম ﷺ'র সৃষ্টি সকল বস্তুর সৃষ্টির পূর্বে হয়েছে এবং তাঁর নবুয়ত প্রাপ্তিও হযরত আদম (আ.)'র সৃষ্টির অনেক আগে হয়েছিল। যেমন: উপরে বর্ণিত তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হাদিস قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ؟ قَالَ: وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالجَسَدِ. এর ব্যাখ্যায় দেওবন্দী প্রখ্যাত আলেম আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী বলেন, اى كان النبى صلى الله عليه وسلم نبيًا وجرت عليه احكام النبوة من ذالك الحين بخلاف الانبياء السابقين فان الاحكام جرت عليهم بعد البعثة অর্থাৎ নবী করিম ﷺ'র আদম (আ.)'র সৃষ্টির পূর্বেই নবী ছিলেন এবং তাঁর উপর নবুয়তের বিধান জারী হয়ে গিয়েছিল। পূর্ববর্তী অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামগণ এর ব্যতিক্রম। কেননা তাঁদের উপর নবুয়তের বিধান পৃথিবীতে আগমনের পরেই জারী হয়েছিল।[৩২৪]

হযরত মুহাম্মদ ﷺ সকল সৃষ্টির উৎস ও উসিলা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وما خلقنا السموات والارض وما بينهما الا بالحق আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ দু'টির মধ্যবর্তী অবস্থিত সবকিছু রাসূল ﷺ'র উসীলায় সৃষ্টি করছি।[৩২৫]

عن سلمان قال هبط جبرئيل على النبى ﷺ فقال ان ربك يقول ان كنت اتخذت ابراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبًا وما خلقت خلقًا اكرم على منك ولقد خلقت الدنيا واهلها لاعرفهم كرامتك ومنزلتك عندى ولولاك ما خلقتُ الدنيا–

হযরত সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত জিব্রাইল (আ.) রাসূল ﷺ'র খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রভু বলছেন– আমি ইব্রাহিমকে স্বীয় খলীল বানিয়েছি আর আপনাকে আমার হাবীব বানালাম। আমার নিকট আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন বস্তু আমি সৃষ্টি করিনি। নিশ্চয় আমি পৃথিবী এবং এর অধিবাসীকে সৃষ্টি করেছি, আপনার যে সম্মান আমার নিকট রয়েছে তা তাদের নিকট প্রকাশ করার জন্য। যদি আপনি না হতেন তবে আমি পৃথিবী সৃষ্টি করতাম না।[৩২৬]

কাদীর, খণ্ড-৪, পৃ-২৬৭, আলূসী (র.) (১২৭০ হি), রুহুল মায়ানী খণ্ড-২১, পৃ-১৫৪, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), আদদুররুল মনসূর, খণ্ড-৬ পৃ-৫৭০

৩২৪. আনোয়ার শাহ কাশমিরী (১৩৫২ হি), আল উরফুশ শাযিয, খণ্ড-২, পৃ-২০২

৩২৫. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.), (১০৫২ হি), মাদারেজুন নবুয়্যত, খণ্ড-১, পৃ-৩০৯। সূত্র: মাওয়ায়েযুর রেজবীয়্যাহ, খণ্ড-৩, পৃ-৬

৩২৬. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি), আনোয়ারে মুহাম্মদিয়া, পৃ-১৪, আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২হি), মাদারেজুন নবুয়্যত, খণ্ড-২, পৃ-৪

عن على قلتُ يا رسول الله مم خلقت؟ قال لما اوحى الى ربى ما اوحى قلت يارب مما خلقتنى قال تعالى وعزتى وجلالى لولاك ما خلقت ارضى ولاسمائى قلتُ يا رب مما خلقتنى قال تعالى وعزتى وجلالى لولاك ما خلقتُ جنتى وناری

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ'র নিকট আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? উত্তরে তিনি বলেন, যখন আমার কাছে ওহী নাযিল হল তখন আমি আরয করলাম, হে আমার প্রভূ! আপনি আমাকে কেন সৃষ্টি করেছেন? উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার ইজ্জত ও জালালিয়্যতের শপথ! যদি আপনি না হতেন তাহলে আমি আমার আসমান ও যমিন সৃষ্টি করতামনা। আমি পুনরায় এ প্রশ্ন করলে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার ইজ্জতের ও জালালিয়্যতের শপথ! আপনি না হলে আমি আমার জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করতামনা।[৩২৭]

عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله ﷺ لما اقترف آدم الخطية قال يارب اسئالك بحق محمد لما غفرت لى فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدًا ولم اخلقه قال يارب لأنك لما خلقتنى بيدك ونفخت فى من روحك رفعتُ رأسى فرأيتُ على قوائم العرش مكتوبًا لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضف الى اسمائك الا احب الخلق فقال الله صدقت يا آدم انه لا حَبُّ الخلق الى ادعنى بحقه فقد عَفَرتُ لك ولولا محمد ما خلقتك –

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যখন আদম (আ.) থেকে ভুল সংঘঠিত হয়েছিল, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, হে পারওয়ারদিগার! আমি আপনার নিকট হযরত মুহাম্মদ ﷺ'র উসিলায় প্রার্থনা করছি যে, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম! তুমি মুহাম্মদকে কিভাবে চিনলে? অথচ তাঁকে এখনো (পৃথিবীতে) সৃষ্টি করা হয় নি। তখন আদম (আ.) বললেন, হে প্রভূ! আমি তাঁকে এভাবে চিনেছি যে, যখন আপনি আমাকে স্বীয় কুদরতী হাত দ্বারা সৃষ্টি করে আপনার পক্ষ হতে আমার ভিতরে রূহ ফুঁক দিয়েছেন তখন আমি মাথা তুলে আরশের পায়াতে লিখা দেখলাম **لا اله الا الله محمد رسول الله** তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে, আপনি আপনার পবিত্র নামের সাথে এমন ব্যক্তির নাম মিলালেন যিনি আপনার নিকট সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হবেন। তখন আল্লাহ

[৩২৭]. আব্দুর রহমান সফুরী (র.) (৮৯৪ হি), নুযহাতুল মাজালিস, খণ্ড-২, পৃ-৮১

তা'আলা এরশাদ করেন, হে আদম! তুমি সত্য বলেছ, বাস্তবই মুহাম্মদ আমার নিকট সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে অধিক প্রিয়। যখন তুমি তাঁর উসিলা নিয়ে আমার নিকট প্রার্থনা করেছ, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আর যদি মুহাম্মদ না হতেন, তবে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।[৩২৮]

নূরে মুহাম্মদী ﷺ সর্বদা পবিত্র পাত্রে আমানত ছিল

হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) এবং হযরত হাওয়া (আ.) থেকে হযরত আমেনা (রা.) পর্যন্ত যে সব ভাগ্যবান ব্যক্তিরা নূরে মুহাম্মদীকে ধারন-বাহন করেছিলেন সকলেই মুসলমান ও পুতপবিত্র ছিলেন। শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) বলেন, কুরআনের আয়াত وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– নবী করিম ﷺ বলেছেন, আমি নবী থেকে নবীর মধ্যে স্থানান্তর হয়েছি। নবী করিম ﷺ সর্বদা নবীগণের পৃষ্ঠের মাধ্যমে স্থানান্তর হয়েছিলেন।[৩২৯]

عن بن عباس قال قلتُ يا رسول الله اين كنتَ وآدم فى الجنة قال كُنتُ فى صلبه واهبط الى الارض وانا فى صلبه وركبت السفينة فى صلب ابى نوح وقدفت فى النار فى صلب ابى ابراهيم لم يلتق لى ابوان قط على سفّاح لم يزل ينقلنى من الاصلاب الطاهرة الى الارحام النقية مهذبًا–

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আদম (আ.) যখন জান্নাতে ছিলেন, তখন আপনি কোথায় ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাঁর পিঠে ছিলাম। যখন তাঁকে পৃথিবীতে অবতরণ করা হলো তখনো তাঁর পিঠে ছিলাম। আমাকে আমার পূর্বপূরুষ হযরত নূহ (আ.)'র পিঠের মাধ্যমে কিশ্‌তিতে আরোহন করা হয়েছিল এবং পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ.)'র পিঠের মাধ্যমে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আমার পিতা-মাতা কখনো মন্দ কাজে লিপ্ত হন নি। আমি পাক পবিত্র নসলের এবং পবিত্র রেহেমের মাধ্যমে স্থানান্তর হয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছি।[৩৩০]

[৩২৮]. হাকেম (৪০৫ হি) আল মুস্তাদরাক, খণ্ড-২, পৃ-৪৮৬। তিবরানী (৩৬০ হি), আল মুজামুল আওসাত খণ্ড-৬, পৃ-৩১৩। হায়ছামী (র.) (৮০৭ হি), মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড-৮, পৃ-২৫৩। ইবনে আসাকের (র.) (৫৭১ হি), তারীখে দামেস্ক আল কুবরা, খণ্ড-১ পৃ-৮১, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), আল খাসায়েসুল কুবরা, খণ্ড-১, পৃ-১২, আলী ইবনে বুরহান উদ্দীন হালবী (র.) (১৪০৪ হি), আস সিরাতুল হালবীয়্যাহ, খণ্ড-১, পৃ-৩৫৫, ইমাম আহমদ কাস্‌তুল্লানী (র.) (৯২৩ হি), আল মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যাহ, খণ্ড-১, পৃ-৮, জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), আদ দারুল মনসূর খণ্ড-১, পৃ-১৪২।

[৩২৯]. শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), মাদারেজুন নবুয়্যত, উর্দু খণ্ড-১, পৃ-৬, আলী ইবনে বুরহান উদ্দিন হালবী (র.), (১৪০৪ হি), সীরাতে হালবিয়্যাহ, পৃ-২৪

[৩৩০]. ইবনে জওযী (র.) (৫৭৯হি), আল ওয়াফা বি আহ ওয়ালীল মুস্তফা, খণ্ড-১, পৃ-২৮

لم يَزَلْ يَنْقُلُني من الأصْلابِ الطيبة الى الارحام الطَّاهِرَةِ, আল্লাহ তা'আলা সর্বদা আমাকে পবিত্র পৃষ্ঠ থেকে পবিত্র রেহেমে স্থানান্তরিত করেন।[৩৩১]

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (র.) (৬০৬ হি.) বলেন, ان جميع اباء محمد كانوا مسلمين ومما يدل على ذالك قوله صلى الله عليه وسلم الم ازل انقَلُ من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات রাসূল ﷺ'র সকল পূর্বপূরুষ মুসলমান ছিলেন। এর উপর স্বয়ং রাসূল ﷺ'র হাদিস রয়েছে। তিনি বলেন- আমি সর্বদা পবিত্র পুশ্ত থেকে পবিত্র রেহেমের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছি। অথচ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই মুশরিকগণ নাপাক। এর দ্বারা আবশ্যক হয় যে, রাসূল ﷺ 'র পূর্বপুরুষের মধ্যে কেউ মুশরিক ছিলেন না।[৩৩২]

রাসূল ﷺ আমেনার গর্ভে আগমন ও দুনিয়াতে শুভাগমন

اخرج ابو نعيم عن ابن عباس قال كان من دلالات حمل رسول الله ﷺ ان كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة وقبلت حمل برسول الله ﷺ ورب الكعبة وهو امان الدنيا وسراج اهلها ولم تبق كاهنة فى قريش ولافى قبيلة من قبائل العرب الاحجت عن صاحبتها وانتزع علم الكهنة منها ولم يبق ملك من ملوك الدنيا الا اصبح منكوسًا والملك مخر سالا ينطق يومه ذالك ومرت وحشى المشرق الى وح شئ المغرب بالبشارات وكذالك اهل البحار يبشر بعضهم بعضًا له فى كل شهر من شهوره نداءً فى الارض ونداء فى السماء ان ابشروا فقد أن لابى القاسم ان يخرج الى الارض ميمونًا مباركًا قال وبقى فى بطن امه تسعة اشهركما لا تشكو وجعًا ولا ريحًا ولا مغصا ولا ما يعرض للنساء ذوات الحمل وهلك ابوه عبد الله وهو فى بطن امه فقالت الملائكة الهنا وسيدنا بقى نبيك هذا يتيمًا فقال الله اناله ولى وحافظ وَنَصِيْرٌ وتبركوا بمولده فمولده ميمون مبارك وفتح الله لمولده ابواب السماء وجنانه فكانت أمنة تحدث عن نفسها وتقول اتانى ات حين مرّبى من حمله ستة اشهر فركزنى برجله فى المنام وقال لى يا امنة انك قد حملت بخير العالمين طرّا فاذا ولدتيه فسميه محمدًا فكانت تحدث عن نفسها وتقول لقد اخذنى مايأخذ النساء ولم يعلم لى احد من القوم فسمعت وجبة شديدة وامرًا عظيمًا فها لنى ذالك فرأيت كان جناح طير ابيض قد

[৩৩১]. শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১৩৫০ হি), মাদারেজুন নবুয়্যত, উর্দু, খণ্ড-২, পৃ.৬, আল্লামা ইউসূফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি), আনওয়ারে মুহাম্মদীয়া, পৃ-১৫।

[৩৩২]. আল্লামা ইউসূফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি), আনওয়ারে মুহাম্মদীয়্যাহ, পৃ-৩৪

مسح على فوادى فذهب عنى كل رعب وكل وجع كنت اجد ثم التفت فاذا انا بشرية بيضاء لبنًا وكنت عطشى فتنا ولتها فشربتها فأضاء منى نور عال ثم رايت نسوة كالنخل الطوال كانّهن من بنات عبد مناف يحدقن بى فبينا انا اعجب واذا بدياج ابيض قد مَدَّبين السماء والارض واذا بقائل يقول خذوه من اعين الناس قالت ورأيت رجلاً قد وقفوا فى الهواء بأيديهم اباريق فضة ورايت قطعة من الطيرِ قد اقبلت حتى غطت حجرى مناقيرها من الزمرد واجنحتها من اليوا قيت فكشف الله عن بصرى وابصرت تلك الساعة مشارق الارض ومغاربها ورَأيت ثلاثة اعلام مضروبات علما فى المشرق وعلما فى المغرب وعلما فى ظهر الكعبة فاخذنى المخاض فَوَلَدْتُ محمدًا ﷺ فلما خرج من بطنى نظرت اليه فاذا انابه ساجدًا قد رفع اصبعيه كالمتضرع المبتهل ثم رأيت سحابة بيضاء قد اقبلت من السماء حتى غشيته فغيب عن وجهى وسمعت مناديًا ينادى طوفوا بمحمدٍ شرق الارض وغربها وادخلوه البحار ليعرفوه باسمه ونعته وصورته ويعلمون انه سُمّى فيها الماحى لا يبقي شئى من الشرك الامحى فى زمنه ثم تجلت عنه فى السرع وقت فاذا انابه مدرج فى ثوب صوف ابيض وتحته حريرة حضراء وقد قبض على ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ الرطب واذا قائل يقول قبض محمد على مفاتيح النصرة ومفاتيح الريح ومفاتيح النبوة ثم اقبلت سحابة اخري يسمع منها صهيل الخيل وخفقان الاجنحة حتى غشية فغيب عن عينى فسمعت مناديا ينادى وطوفوا بمحمدٍ الشرق والغرب وعلى مواليد النبيني واعرضوه علي كل روحانى من الجن والانس والطير والسباع واعطوه صفاء آدم ورقة نوح وخلة ابراهيم ولسان اسماعيل وبشرى يعقوب وجمال يوسف وصوت داؤاد وصبر ايوب وزهد يحى وكرم عيسى واعمروه فى اخلاق الانبياء ثم تجلت عنه فاذا انابه قد قبض على حريرة حضراء مطوية واذا قائل يقول بخّ بخّ قبض محمد على الدنيا كلها لم يبق خلق من اهلها الا دخل فى قبضة واذا انا بثلاثة نفرفى يد احدهم ابريق من فِضَّةٍ وفى يد الثانى طست من زمرد اخضر وفى يد الثالث حريرة بيضاء فنشرها فاخرج منها خاتمًا تحار ابصار الناظرين دونه فغسله من ذالك الابريق سبع مرات ثم ختم بين كتفيه بالخاتم ولفه فى الحريرة ثم حمله فادخله بين اجنحته ساعته ثم ردّه الىّ .

আবু নুয়াইম (র.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আমেনা (রা.)'র গর্ভে পবিত্র নূরে মুহাম্মদী ﷺ-র আগমন সম্পর্কে

অবগতি হলো এভাবে যে, সে রাতে কুরাইশদের প্রত্যেক জন্তুর বাকশক্তি এসে গিয়েছিল। ঐগুলো বলতে লাগল আল্লাহর ঘরের শপথ! রাসূল ﷺ স্বীয় মায়ের পবিত্র গর্ভে শুভাগমন করেছেন। তিনি পৃথিবীর জন্য আমানত এবং পৃথিবীবাসির জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ। আরব গোত্রে যেসব যাদুকর মহিলা ছিল তাদের বাধ্যগত জ্বিনরা ঐ রাতে তাদের নিকট আসতে অক্ষম হয়ে গিয়েছিল। ভবিষ্যতদ্রষ্টাদের যাবতীয় জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। সমগ্র পৃথিবীর প্রভাবশালী রাজা-বাদশাদের সিংহাসন উল্টে দেওয়া হয়েছিল এবং তারা বোবা হয়ে গিয়েছিল। সে রাতে তারা কথা পর্যন্ত বলতে পারেনি। সুসংবাদ প্রচারের জন্য পূর্ব প্রান্তের জীব-জন্তু পশ্চিম প্রান্তের দিকে ছুটে গিয়েছিল। এভাবে সমুদ্রের সমস্ত জীব-জন্তুও একে অপরকে সুসংবাদ প্রদান করেছিল। ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে গায়েবী আওয়ায দেয়া হয়েছিল যে, সন্তুষ্ট হয়ে যাও, রহমত ও বরকত মণ্ডিত আবুল কাসেম নবী মুহাম্মদ ﷺ'র শুভাগমনের সময় সন্নিকট হয়েছে।

নবী করিম ﷺ মাতৃগর্ভে নয় মাস পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। এ সময় হযরত আমেনা (রা.) কোন প্রকারের কষ্ট, বমি, অস্থিরতা ইত্যাদি যা সাধারণত মহিলাদের হয়ে থাকে সব কিছু থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা ইতিপূর্বে ইন্তিকাল করেছেন। ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহকে বললেন, হে আল্লাহ! আপনার নবী ইয়াতিম জন্মগ্রহণ করবেন? আল্লাহ বলেন, আমিই তাঁর সংরক্ষণকারী, প্রতিপালনকারী এবং সাহায্যকারী। রাসূল ﷺ'র মাওলদ দ্বারা সকলেই বরকত অর্জন করেছিল। এই খুশিতে আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

হযরত আমেনা (রা.) বলেন– যখন তাঁকে গর্ভধারণের ছয় মাস পূর্ণ হলো তখন স্বপ্নে একজন সুদর্শন ব্যক্তিকে দেখলাম যে, তিনি তার পা ছুঁয়ে বললেন, হে আমেনা! পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি তোমার গর্ভে বিদ্যমান। যখন তিনি ভূমিষ্ট হবেন তখন তাঁর নাম রাখবেন মুহাম্মদ। যখন ভূমিষ্ট হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসল তখন অন্যান্য গর্ভবতীদের ন্যায় আমারও প্রসবকালীন অবস্থা আরম্ভ হলো। এ সময় আমার পাশে কেউ ছিল না। হঠাৎ আমি উচ্চস্বরে আওয়ায শুনলাম যাতে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তারপর দেখলাম যে, কে যেন শুভ্র পাখির পালকের ন্যায় কিছু একটা আমার বক্ষে মালিশ করে দিলেন। এতে আমার ভয় কেটে গেল এবং যাবতীয় ব্যাথা বেদনাও দূরীভূত হয়ে গেল। তখন আমি পিপাসা অনুভব করলাম। হঠাৎ দুধের ন্যায় শুভ্র পানীয় আমার সম্মুখে পেশ করা হলো যা আমি পান করেছি। এতে সবকিছু আলোকিত হয়ে গেল এবং আমার থেকে নুরের আলো বিকশিত হতে লাগল। অতঃপর আমি খেজুর বৃক্ষের ন্যায় লম্বা লম্বা কিছু মহিলা দেখলাম যারা আমাকে ঘিরে রেখেছে। তাদেরকে দেখতে আবদে মুনাফের কন্যাদের মত লাগে। এদেরকে দেখে আমি সীমাহীন অবাক হলাম। হঠাৎ

ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এর মধ্যবর্তী স্থানে রেশমী পোশাক দেখলাম। কেউ বলল, এই নবজাতক শিশুকে নাও এবং লোকদের দৃষ্টি থেকে গোপন রাখ। অতঃপর এমন কিছু লোক দেখলাম যারা পবিত্র পাত্র নিয়ে বাতাসে দণ্ডায়মান। এক ঝাঁক পাখি দেখলাম এগুলো আমার ঘর আচ্ছাদিত করে দিল। এই আশ্চর্যজনক দুর্লভ পাখিগুলোর ঠোঁট ছিল যমরদ এবং পালক ছিল ইয়াকুতের। আল্লাহ তায়ালা আমার চোখের পর্দা উঠিয়ে নিলেন। আমি পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত দেখলাম। আমি তিনটি পতাকা দেখলাম। একটি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে, দ্বিতীয়টি পশ্চিম প্রান্তে এবং তৃতীয়টি কাবা ঘরের ছাদের উপর ছিল। যখন রাসূল ﷺ ভূমিষ্ট হলেন তখন আমি দৃষ্টান্তহীন এই নবজাতককে দেখলাম। তিনি সিজদারত অবস্থায় হাতের আঙ্গুলসমূহ উপরের দিকে রেখে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দোয়া করছেন। তারপর এক টুকরা শুভ্র মেঘ দেখলাম যা নিচে এসে এই নবজাতককে আচ্ছাদিত করে ফেলল এবং আমার চক্ষুর অন্তরাল হয়ে গেলেন। আমি কারো আওয়ায শুনলাম, বলছে– মুহাম্মদকে মাগরিব ও মাশরিক ভ্রমণ করাও এবং সমুদ্রে নিয়ে যাও, যাতে সকলেই তাঁর সত্তা, গুণাবলি সম্পর্কে অবগতি লাভ করে। আর এটাও যেন জেনে নেয় যে, তাঁর একটি নাম হলো মাহী তথা দূরীভূতকারী। তিনি স্বীয় সমকালে শিরকের নিশানা পর্যন্ত দূরীভূত করবেন। এরপর হঠাৎ তিনি আমার চোখের সামনে দৃষ্টিগোচর হলেন। এসময় তিনি শুভ্র পশমের পোশাক পরিহিত ছিলেন এবং নিচে সবুজ রেশম বিছানো ছিল। একদিন মুতি দ্বারা তৈরি তিনটি চাবি তাঁর হাতের মুষ্ঠিতে ছিল। কেউ বলছিল, মুহাম্মদ বিজয়, নবুয়্যত এবং আবহাওয়ার চাবি গ্রহণ করেছেন। তারপর আর এক টুকরা মেঘ প্রকাশিত হলো এবং এর থেকে ঘোড়ার আওয়াযের ন্যায় ও পাখির পালকের ন্যায় শব্দ হচ্ছিল। এই মেঘের টুকরা তাঁকে ডেকে ফেলল এবং তিনি আমার দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেলেন। কাউকে বলতে শুনেছি, মুহাম্মদকে মাশরিক ও মাগরিব এবং আম্বিয়ায়ে কিরামগণের জন্মস্থানে নিয়ে যাও আর জ্বিন, ইনসান, জীব-জন্তু, পশু-পাখি ও প্রত্যেক প্রকারের রূহানী মাখলুককে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দাও। তাঁকে হযরত আদম (আ.)'র সফুয়্যত (স্বচ্ছতা), হযরত নূহ (আ.)'র রিক্কত (নরম অন্তর) ও কান্নাকাটি, হযরত ইব্রাহিম (আ.)'র খিল্লত (বন্ধুত্ব), ইসমাঈল (আ.)'র যবান, হযরত ইয়াকুব (আ.)'র সুসংবাদ। হযরত ইউসূফ (আ.)'র সৌন্দর্য, হযরত দাউদ (আ.)র আওয়ায, হযরত আইয়ুব (আ.)'র ধৈর্য, হযরত ইয়াহিয়া (আ.)'র যুহদ এবং ঈসা (আ.)'র সাখাওয়াত তথা দানশীলতা প্রদান কর আর সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের আখলাক প্রদান কর। তিনি দ্বিতীয়বার আমার চোখের সামনে দৃশ্যমান হলেন। এসময় তাঁর হাতের মুষ্ঠিতে একখানা সবুজ রঙের কাপড়ের টুকরা ছিল। কেউ বলল, মোবারক হোক– হযরত মুহাম্মদ ﷺ সমগ্র পৃথিবীকে অধিনস্থ করে নিয়েছেন এবং সকল সৃষ্টি

তাঁর আনুগত্যে এসে গেল। তারপর আমি তিনজন ব্যক্তি দেখলাম। একজনের হাতে রূপার পানির পাত্র এবং দ্বিতীয়জনের হাতে ছিল রেশমের টুকরা। সে তা খুলে সেখান থেকে একটি মহর বের করেন, যেটির চাকচিক্যে দর্শনকারীদের দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার উপক্রম হয়। ঐ পাত্রের পানি দিয়ে মহরটিকে সাতবার ধুয়ে রাসূল ﷺ র উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে লাগিয়ে দিয়ে রেশমের কাপড়ের টুকরা দিয়ে ডেকে দিলেন। অতঃপর তারা তাঁকে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ তাদের পালকের মধ্যে গোপন করে রাখেন তারপর তারা তাঁকে আমাকে সোপর্দ করলেন।[৩৩৩]

রাসূল ﷺ'র শুভাগমণের তারিখ

অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমত অভিমত হলো রাসূল ﷺ আমুল ফিল তথা হস্তিবাহিনীর বছর ১২ রবিউল আউয়াল ২০ আগস্ট ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে সোমবার সুবহে সাদিকের সময় পৃথিবীতে শুভাগমন করে সমগ্র পৃথিবীকে ধন্য করেছেন। তিনি পৃথিবীর বুকে পদার্পণ করার সাথে সাথে তাঁর ঠোঁট দু'টি নড়াচড়া করতে লাগল। যখন তাঁর ঠোঁটের নিকট কান নিয়ে শ্রবণ করা হয়েছিল, তখন শুনা গেল তিনি স্পষ্টভাবে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

ইমাম দিয়ারে বকরী (র.) বলেন– انه صلى الله عليه وسلم لما وقع على الارض رفع رأسه وقال بلسان فصيح لا اله الا الله وان رسول الله নবী করিম ﷺ যখন পৃথিবীতে পর্দাপণ করলেন তখন তাঁর মস্তক মোবারক উত্তোলন করে স্পষ্টভাষায় বলেছেন– আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই আর আমি হলাম আল্লাহর রাসূল।[৩৩৪]

রাসূল ﷺ শুভাগমনের রাতের ফযিলত

আল্লাহ তায়ালা কতিপয় রাতকে বিশেষ কারণে ফযিলত দান করেছেন। যেমন নুযূলে কুরআনের কারণে শবে কদরকে, জুমার কারণে জুমার রাতকে, মিরাজের কারণে রজবের ২৭ তারিখের রাতকে ফযিলত দিয়েছেন। কিন্তু সব নিয়ামতের মূল ও সকল সৃষ্টির উৎস হযরত মুহাম্মদ ﷺ 'র শুভাগমনের কারণে শবে মিলাদের ফযিলত ও মর্যাদা সব রাতের চেয়ে বেশী। এ ব্যাপারে ইমাম কাসতুল্লানী (র.) বলেন– যদি প্রশ্ন করা হয়– রাসূল ﷺ 'র বিলাদতের রাত উত্তম না শবে কদর উত্তম? উত্তরে আমি বলব– রাসূল ﷺ 'র বিলাদতের রাত তিন কারণে লায়লাতুল কদর থেকে উত্তম। ১. রাসূল ﷺ - বেলাদতের

৩৩৩. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), আল খাসায়েসুল কুবরা, খণ্ড- ১, পৃ- ৮১-৮২, ইবনে কাসির (র.) (৭৭৪ হি), আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড- ৬, পৃ- ২৯৮, ইউসূফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি), আনওয়ারে মুহাম্মদিয়্যাহ, পৃ- ২২-২৪, সূত্র: ড. তাহের আল কাদেরী, মিলাদুন্নবী (স), উর্দু, পৃ.২০৭

৩৩৪. ইমাম হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ দিয়ারে বকরী (র.), তারিখুল খামীস, খণ্ড-১, পৃ-২০৩।

রাতটি এমন রাত যাতে তাঁর প্রকাশ ঘটেছিল অথচ লায়লাতুল কদর তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল। সুতরাং যে রাত তাঁর প্রকাশ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল নিশ্চয় সেই রাত ঐ রাতের চেয়ে উত্তম হবে যে রাত তাঁকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এই ব্যাপারে কোন দ্বন্ধ নেই যে, শবে মিলাদ শবে কদরের চেয়ে উত্তম।

২. লায়লাতুল কদরের ফযিলত যদি ফেরেশ্‌তা অবতরণের কারণে হয়ে থাকে তবে শবে মিলাদে সমগ্র জাহানের মাহবুব রাসূল ﷺ'র শুভাগমন হয়েছে। অধিকাংশ আহলে সুন্নাতের বিশুদ্ধ ও নির্বাচিত মত হলো– যে কারণে শবে মীলাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তা লায়লাতুল কদরের ফযিলতের কারণের চেয়ে অনেকগুণ বেশী উত্তম। অতএব শবে মিলাদ উত্তম।

৩. লায়লাতুল কদরের কারণে কেবল উম্মতে মুহাম্মদী উপকৃত হয়েছে। কারণ এ রাত অন্য কোন উম্মতকে প্রদান করা হয়নি। পক্ষান্তরে শবে মীলাদের কারণে সমগ্র পৃথিবীবাসী উপকৃত ও লাভবান হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। সুতরাং শবে মীলাদ শবে কদরের চেয়ে অনেক উত্তম।[৩৩৫]

ইমাম তাহাভী (র.) (৩২১ হি.) শাফেঈ মাযহাবের কোন কোন আলেম থেকে বর্ণনা করেন– ان افضل الليالى ليلة مولده صلى الله عليه وسلم ثم ليلة القدر ثم ليلة الاسراء والمعراج ثم ليلة عرفة ثم ليلة الجمعة ثم النصف من شعبان ثم ليلة العيد সর্বোত্তম রাতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো শবে মিলাদুন্নবী ﷺ, অতঃপর লায়লাতুল কদর। অতঃপর লায়লাতুল মি'রাজ, অতঃপর আরফার রাত, অতঃপর জুমার রাত অতঃপর শবে বরাত, অতঃপর ঈদের রাত।[৩৩৬] এ কথা দ্বারা শবে কদরের ফযিলতকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয় বরং শবে মিলাদুন্নবী ﷺ'র ফযিলত ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করাই হলো উদ্দেশ্য।

মীলাদুন্নবী ﷺ উদ্‌যাপন করা সুন্নতে এলাহী ও সুন্নতে মোস্তফা

নবী করিম ﷺ 'র বিলাদতসহ তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করাই হলো মিলাদুন্নবী উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে নবী করিম ﷺ'র বিলাদত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

৩৩৫. ইমাম কাসতুল্লানী (র.) (৯২৩ হি), মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যাহ, খণ্ড-১, পৃ-১৪৫, ইমাম যুরকানী (র.) (১১২২ হি), শরহে মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যাহ, খণ্ড-১, পৃ-২৫৫, ইউসূফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি), জাওয়াহেরুল বিহার, খণ্ড-৩, পৃ-৪২৪, শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.), (১০৫২ হি), মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ, উর্দু, পৃ-৮৪

৩৩৬. ইউসূফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি), জাওয়াহিরুল বিহার, খণ্ড-৩, পৃ-৪২৬

১. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ এভাবে আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন মহান রাসূল প্রেরণ করেছি।[৩৩৭]

২. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর বড়ই ইহসান করেছেন যে, তাদেরই মধ্য থেকে একজন মহান রাসূল প্রেরণ করেছেন।[৩৩৮]

৩. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ হে লোক সকল! নিশ্চয় তোমাদের নিকট এই রাসূল তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য সহকারে আগমন করেছেন। অতএব তোমরা তোমাদের কল্যাণের জন্য তাঁর উপর ঈমান আন।[৩৩৯]

৪. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ হে আহলে কিতাবগণ! নিশ্চয় তোমাদের নিকট আমার রাসূল তাশরীফ নিয়েছেন, যিনি তোমাদের জন্য এমন অনেক কিছু প্রকাশ করবেন যা তোমরা কিতাব থেকে গোপন করে রেখেছ এবং অনেক বিষয়ে তিনি মার্জনা করবেন। তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নূর এসেছে এবং একটি সমুজ্জল কিতাব এসেছে।[৩৪০]

৫. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল ﷺ আগমন করেছেন। যিনি পয়গম্বরদের বিরতির পর তোমাদের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ (বিধান) বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা একথা বলতে না পার যে, আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক আগমন করেন নি। অতএব তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক এসে গেছেন। আল্লাহ সর্বময় শক্তির অধিকারী।[৩৪১]

৬. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে একজন মহান রাসূল আগমন

[৩৩৭]. সূরা বাকারা, আয়াত- ১৫১
[৩৩৮]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৬৪
[৩৩৯]. সূরা নিসা, আয়াত- ১৭০
[৩৪০]. সূরা মায়েদা, আয়াত- ১৫
[৩৪১]. সূরা মায়িদা, আয়াত- ১৯

করেছেন। তোমাদের দুঃখ কষ্ট তাঁর কাছে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।[৩৪২]

৭. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ হে সম্মানিত রাসূল! আমি আপনাকে সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।[৩৪৩]

৮. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ তিনিই (আল্লাহ) যিনি উম্মীদের মধ্য থেকে একজন মহান রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হেকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।[৩৪৪]

৯. إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا হে মক্কাবাসীরা! আমি তোমাদের নিকট একজন মহান রাসূল প্রেরণ করেছি।[৩৪৫]

উপরোক্ত আয়াতসমূহে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নবী করিম ﷺ'র মীলাদ তথা শুভাগমনের আলোচনা করেছেন। আর তাঁর শুভাগমনের আলোচনাই হলো মীলাদুন্নবী উদযাপনের কেন্দ্রবিন্দু।

রাসূল ﷺ বিলাদতের বছর আল্লাহ তা'আলা বিশেষ রহমত নাযিল করেছেন। পৃথিবীকে সবুজ, সুজলা-সুফলা করে দিয়েছেন। এমনকি সমস্ত বৃক্ষ ফুলে ফলে ভরে গিয়েছিল। দুর্ভিক্ষ এলাকাও খাদ্যে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ফলে ঐ বছরকে সুখের ও শান্তির বছর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[৩৪৬]

বিলাদতের সময় আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। ঐ বছর আল্লাহ তা'আলা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ মুলতবী করে দিয়েছেন ফলে সারা বছর পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। কারণ তখন কন্যা সন্তান জন্ম হওয়াকে দূর্ভাগ্য মনে করা হতো এবং লোকে জানার পূর্বেই জীবন্ত দাফন করে ফেলত। আল্লাহ তা'আলা

[৩৪২]. সূরা তাওবা. আয়াত- ১২৮
[৩৪৩]. সূরা আম্বিয়া, আয়াত- ১০৭
[৩৪৪]. সূরা জুমা, আয়াত- ২
[৩৪৫]. সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত- ১৫
[৩৪৬]. আলী ইবনে বুরহান উদ্দীন হালবী (র.), (১৪০৪ হি), সীরাতে হালবীয়্যাহ, খণ্ড-১ পৃ-৪৮, ইমাম কাসতুল্লানী (র.) (৯২৩ হি), মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যাহ, খণ্ড-১ পৃ-১১৯, যুরকানী (র.) (১১২২ হি), শরহে মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যাহ, খণ্ড-১, পৃ-১৯৭, ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি), আনওয়ারে মুহাম্মদীয়্যাহ, পৃ-২০

মীলাদুন্নবীর উসিলায় ঐ বছর কাউকে লজ্জিত ও মনক্ষুন্ন হতে দেননি এবং কোন সন্তানকে জীবন্ত দাফনের ব্যবস্থা রাখেন নি। এ ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, واذن الله تلك السنة لنساء الدنيا ان يحملن ذكورًا كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم আল্লাহ তা'আলা ঐ বছর এই আদেশ জারি করেন যে, রাসূল ﷺ র সম্মানার্থে পৃথিবীর গর্ভবতী মহিলারা পুত্র সন্তান জন্ম দেবে।[৩৪৭]

নবী করিম ﷺ মীলাদুন্নবীর দিন রোযা রেখে নিজেই নিজের মিলাদ উদযাপন করেছেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে– عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يوم الاثْنَيْنِ قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو نزل على فيه – হযরত আবু কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ থেকে সোমবারে রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, ঐ দিন আমার বিলাদত হয়েছে, ঐ দিন আমার নবুয়্যত প্রকাশ হয়েছে এবং ঐ দিন আমার উপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে।[৩৪৮]

রাসূল ﷺ বকরী জবেহ করে নিজের মীলাদ নিজেই পালন করেছেন। হাদিস শরীফে আছে– عَنْ أَنَسٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত নবী করিম ﷺ নবুয়ত প্রকাশের পর স্বয়ং নিজেই নিজের আকীকা করেছেন।[৩৪৯]

হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি কাফিরদের মুখে রাসূলুল্লাহ ﷺ'র বিরুদ্ধে কিছু কথা শুনেন। এতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে রাসূল ﷺ'র নিকট ছুটে

৩৪৭. আলী ইবনে বুরহান উদ্দীন হালবী (র.) (১৪০৪ হি), সীরাতে হালবীয়্যাহ, খণ্ড-১ পৃ-৭৮, ইমাম কাসতুল্লানী (র.) (৯২৩ হি), মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যাহ, খণ্ড-১ পৃ-১২৪, যুরকানী (র.) (১১২২ হি), শরহে মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যাহ, খণ্ড-১ পৃ-২০৮, জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), আল খাসায়েসুল কুবরা, খণ্ড-১ পৃ- ৮০, ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.), আনওয়ারে মুহাম্মদীয়্যাহ পৃ-২২

৩৪৮. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি), সহীহ মুসলিম শরীফ, খণ্ড- ২ পৃ-৮১৯, কিতাবুস সিয়াম, ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), আস সুনানুল কুবরা, খণ্ড-৪ পৃ-২৮৬, ইমাম নাসাঈ (র.) (৩০৩ হি), আস-সুনানুল কুবরা, খণ্ড-২ পৃ-১৪৬, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), আল-মুসনাদ খণ্ড-৫ পৃ-২৯৬, ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (র.), (২১১ হি), আল মুসান্নিফ, খণ্ড-৪ পৃ-২৯৬

৩৪৯. আল্লামা আলূসী (র.) (১১৩৭ হি) তাফসীরে রুহুল বয়ান, খণ্ড-১০ পৃ-১৪১, জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), আদ দররুল মনসূর, খণ্ড-৪ পৃ-৩৩০, বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), আস-সুনানুল কুবরা, খণ্ড-৯ পৃ-৩০০, ইবনে হাজর আসকালানী (র.) (৮৫২ হি), ফতহুল বারী, খণ্ড-৯, পৃ-৫৯৫, ইবনে হাজর আসকালানী (র.) (৮৫২ হি), তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-৫ পৃ-৩৪০

আসলেন এবং কথাটি তাঁকে জানালেন। তখন রাসূল ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি কে? উত্তরে সাহাবীরা বললেন, আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ان الله خلق الخلق فجعلنى فى خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلنى فى خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلنى فى خيرهم فبيلة ثم جعلهم بيوتًا فجعلنى فى خيرهم بيتًا فانا خيرهم نفسًا وخيرهم بيتًا আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল মোত্তালিবের পুত্র মুহাম্মদ। আল্লাহ যে সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে আমাকে উত্তম শ্রেণিতে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর সেই দলকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে আমাকে উত্তম গোত্রে (কুরাইশ) সৃষ্টি করেছেন। আমার সেই গোত্রকে বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত করেছেন। আমাকে উত্তম পরিবারে (হাশেমী) সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ব্যক্তি ও পরিবার হিসাবে আমি সর্বোত্তম।[৩৫০]

নবীর শুভাগমনে খুশী (ঈদ) উদযাপন করতে আল্লাহর নির্দেশ

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ হে নবী! আপনি বলুন (এসব কিছু) আল্লাহর দয়া ও রহমতের কারণে হয়েছে। সুতরাং তাদের উচিৎ যেন খুশি উদযাপন করে। এটি তারা যা অর্জন করেছে তার চেয়ে অনেক উত্তম।[৩৫১]

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ আপনার প্রভু যে সকল নিয়ামত দান করেছেন সেগুলো আলোচনা কর।[৩৫২]

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا তোমাদের উপর অবতীর্ণ আল্লাহর নিয়ামতের আলোচনা কর। যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের অন্তরে মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের বদৌলতে পরস্পর ভাই হয়ে গিয়েছ।[৩৫৩]

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনস্বরূপ আলোচনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টিজগতে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো রাসূল ﷺ। তাছাড়া সূরা ইউনুসের ২৮ আয়াতে আল্লাহর ফযল ও রহমত প্রাপ্তির কারণে খুশী উদযাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাস্সির ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত দাহ্হাক (র.) বলেন, আয়াতে فضل অর্থ কুরআন আর

৩৫০. তিরমিযি, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৫১৩, হাদিস নং ৫৩৮৬

৩৫১. সূরা ইউনুস, আয়াত- ৫৮

৩৫২. সূরা দোহা, আয়াত- ১১

৩৫৩. সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১০৩

رحمة অর্থ মুহাম্মদ ﷺ। হযরত কতাদাহ, মুজাহিদ (র.) সহ আরো অনেক থেকে বর্ণিত, হযরত আবু জাফর বাকের (র.) বলেন– আয়াতে فضل الله দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ উদ্দেশ্য।

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, "সোমবার আমার বিলাদত হয়েছে, আমার নবুয়ত প্রকাশ হয়েছে এবং আমার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে।" তাই এই আয়াতের নির্দেশ فليفرحوا দ্বারা ঐ দিন নুযূলে কুরআন ও নবীর বিলাদতের কারণে খুশী তথা ঈদ উদ্‌যাপন করা আবশ্যক।

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি) বলেন– ان جده عبد المطلب عق عنه فى سابع ولادته والعقيقة لاتعاد مرّة ثانية فيحمل ذالك على ان الذى فعله النبى صلى الله عليه وسلم اظهارًا للشكر على ايجاد الله تعالى اياه رحمة للعالمين وتشريفًا لامته كما كان يصلى على نفسه لذالك فيستحبُّ لنا ايضًا اظهار الشكر بمولده باجتماع الاخوان واطعام الطعام ونحو ذالك من وجوه القربات واظهار المسرات– রাসূল ﷺ-র দাদা আব্দুল মোত্তালিব তাঁর শুভাগমনের সপ্তম দিনে তাঁর আকীকা করেন। আকীকা দুই বার হয় না। সুতরাং রাসূল ﷺ কর্তৃক বকরী জবেহ করাটা তাঁর বিলাদতের খুশী প্রকাশ করা, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করা এবং উম্মতের মর্যাদার কারণের উদ্দেশ্যে ছিল, যেভাবে তিনি নিজের উপর দুরূদ পাঠ করতেন। এমনিভাবে আমাদের উপর মুস্তাহাব হলো আমরাও তাঁর বিলাদতের দিন খুশী উদযাপন করি, আত্মীয়-স্বজন একত্র করে পানাহার করাই এবং অন্যান্য নেক্‌কাজের মাধ্যমে খুশী প্রকাশ করি।[৩৫৪]

মীলাদুন্নবী উপলক্ষে খুশী উদ্‌যাপনে কাফিরের আযাবে হ্রাস

সহীহ বুখারী শরীফের হাদিসে বর্ণিত আছে, فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيتَ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ আবু লাহাব মারা যাওয়ার পর তার পরিবারের একজন তাকে স্বপ্ন দেখল যে, সে ভীষণ কষ্টের মধ্যে নিপতিত আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হয়েছে? আবু লাহাব বলল, যখন থেকে তোমাদের থেকে দূরে চলে এসেছি তখন থেকেই ভীষণ

[৩৫৪]. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), আল হাভী লিল ফাতাওয়া, খণ্ড-১, পৃ-১৯৬, জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), হুসনুল মাকসাদ ফী আমলিল মাওলাদ, পৃ-৬৫, ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, পৃ-২৩৭

কষ্টে আছি। কিন্তু দাসী সুয়াইবাকে (মুহাম্মদের জন্মের সুসংবাদ দেওয়ায়) আযাদ করার কারণে কিছু পানি পান করতে পারছি।[৩৫৫]

এই ঘটনাকে ইবনে হাজর আসকালানী (র.) ইমাম সুহাইলী (র.)'র উদ্ধৃতি দিয়ে এভাবে বর্ণনা করেন– أَنَّ الْعَبَّاس قَالَ : لَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَب رَأَيْته فِي مَنَامِي بَعْد حَوْل فِي شَرّ حَال فَقَالَ : مَا لَقِيت بَعْدكُمْ رَاحَة ، إِلَّا أَنَّ الْعَذَاب يُخَفَّف عَنِّي كُلّ يَوْم اِثْنَيْنِ ، قَالَ : وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ يَوْم الِاثْنَيْنِ ، وَكَانَتْ ثُوَيْبَة بَشَّرَتْ أَبَا لَهَب بِمَوْلِدِهِ فَأَعْتَقَهَا . আব্বাস (রা.) বলেন– আবু লাহাব মরে যাওয়ার এক বছর পর আমি তাকে স্বপ্নে খুব খারাপ অবস্থায় দেখেছি। সে বলল, তোমাদের থেকে পৃথক হওয়ার পর থেকে আমি আরামে নেই বরং কঠিন আযাবে আছি। কিন্তু প্রতি সোমবার আসলে আমার আযাব হাল্কা করে দেওয়া হয়। আর এটি এ কারণে যে, নবী করিম ﷺ'র বিলাদত সোমবারে হয়েছিল। সুয়াইবা যখন আবু লাহাবকে রাসূল ﷺ'র বিলাদতের সুসংবাদ দিল তখন সে তাকে আযাদ করে দিয়েছিল।[৩৫৬]

আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) বলেন– এ হাদিসটি মীলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষে খুশী প্রকাশকারী ও মাল সাদকাকারীদের জন্য বড় দলীল। যে আবু লাহাবের বিরুদ্ধে কুরআনে সূরা নাযিল হয়েছে, সে যখন রাসূল ﷺ'র বিলাদতের খুশীতে দাসী আযাদ করে আযাবে কিছুটা হ্রাস পেতে পারে তাহলে ঐসব মুসলমানের স্থান কত বড় হবে যাদের অন্তর রাসূলের ভালবাসায় পূর্ণ এবং তারা মিলাদ উপলক্ষে খুশী উদ্‌যাপন করে এবং মাল খরচ করে। তবে এসব খুশী উদ্‌যাপনে এমন বিদআত যা অজ্ঞ লোকেরা করে থাকে যেমন নাচ, গান, বাদ্য-বাজনা ইত্যাদি নিষিদ্ধ কাজ থেকে মুক্ত হওয়া আবশ্যক। কেননা এর দ্বারা মীলাদের বরকত থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়ে যায়।[৩৫৭]

ইমামুল কুবরা হাফিয শামশুদ্দিন ইবনে জযরী (র.) স্বীয়গ্রন্থ عرف التعريف بمولد فاذا كان ابو لهب الكافر الذى نزل القران بذمه جوزي فى النار بَفَرْحة ,الشريف গ্রন্থে বলেন, ليلة مولد النبى صلعم فما حال المسلم الموحد من امة محمد صلعم بمولده وتبذل ما تصل اليه قدرته فى محبته صلعم لعمرى انما يكون جزاء من الله الكريم ان يدخله بفضله جنات النعيم– কাফির আবু লাহাব যার বিরুদ্ধে কুরআন নাযিল হয়েছে– নবীর মীলাদের রাতে আনন্দিত হওয়ার কারণে যদি আযাবে হাল্কা করে দেওয়া হয়। তাহলে ঐ মুসলমান যে রাসূল ﷺ

[৩৫৫]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হাদিস-৪৭৩৪
[৩৫৬]. ইবনে হাজর আসকালানী (র.) (৮৫২ হি), ফতহুল বারী, খণ্ড-৯, পৃ-১৪৫
[৩৫৭]. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), মাদারিজুন নবুয়্যত, খণ্ড-২, পৃ-১৯

'র আশেক সে যদি মীলাদে খুশী উদ্‌যাপন করে সে কতটুকু বিনিময় পাবে? খোদার শপথ, আমার মতে দয়ালু আল্লাহ এমন মুসলমানকে স্বীয় মাহবুব ﷺ'র মীলাদে খুশী উদ্‌যাপনের কারণে জান্নাতুন নাঈম দান করবেন।[৩৫৮]

মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী ও মুফতি রশীদ আহমদ বলেন– আবু লাহাবের ন্যায় হতভাগা কাফির যদি মীলাদুন্নবীর খুশি উদযাপনের কারণে আযাবে হ্রাস পায়, তাহলে কোন উম্মত রাসূল ﷺ'র বিলাদতের খুশী উদযাপন করলে এবং সামর্থানুযায়ী তাঁর মহব্বতে খরচ করলে সে কেন উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেনা?[৩৫৯]

মীলাদুন্নবী উদযাপন সম্পর্কে প্রখ্যাত মনীষীদের অভিমত

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাদিস সমালোচক হযরত ইমাম ইবনে জওযী (৫১০-৫৭৯) (র.) বলেন, **لا زال اهل الحرمين الشريفين والمصر واليمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبى صلى الله عليه وسلم ويفرحون بقدوم هلال شهر ربيع الاول ويهتمون اهتمامًا بليغًا على السماع والقراة لمولد النبى صلى الله عليه وسلم وينالون بذالك اجرًا جزيلاً وفوزًا عظيمًا** সর্বদা মক্কা মদীনায়, মিশর, সিরিয়া, ইয়েমেন এমনকি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত হতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত আরববাসীরা মীলাদুন্নবীর মাহফিল উদযাপন করে আসছেন। যখন রবিউল আউয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়, তখন তাদের খুশীর সীমা থাকেনা। তখন যিকরে মিলাদ পাঠ করা ও শ্রবণের বিশেষ ব্যবস্থা করেন এবং অসীম সওয়াব ও মহা সফলতা অর্জন করেন।[৩৬০]

ইমাম শামশুদ্দিন সাখাভী (র.) (৮৩১-৯০২) বলেন– **وانما حدث بعدها بالمقاصد الحسنة والنية التى للاخلاص شاملة ثم لازال اهل الاسلام فى سائر الاقطار والمدن العظام يحتفلون فى شهر مولده صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم بعمل الولائم البديعة والمطاعم المشتملة على الامور البهية والبديعة ويتصدقون فى لياله بانواع الصدقات ويظهرون المسرات ويزيدون فى المبرات بل يعتنون بقرابة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عظيم عميم بحيث كان**

[৩৫৮]. ইউসূফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, পৃ-২৩৭-২৩৮, জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), আল হাভী লিল ফাতাওয়া, খণ্ড-১ পৃ-১৯৬, জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), হুসনুল মাকসাদ ফী আমলিল মাওলাদ, পৃ-৬৫

[৩৫৯]. মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (১৩০৪ হি), ফাতাওয়ায়ে আব্দুল হাই, খণ্ড-২, পৃ-২৮২, মুফতি রশীদ আহমদ, আহসানুল ফাতাওয়া, খণ্ড-১, পৃ- (৩৪৭-৩৪৮)

[৩৬০]. ইবনে জওযী (র.) (৫৭৯ হি), আল মীলাদুন নববী সূত্রঃ ড. তাহের আল কাদেরী, মিলাদুন্নবী (স), উর্দু, পৃ. ৬১৩

مما جرب كما قال الامام شمس الدين الجزرى المقري انه امان تام فى ذالك العام وبشرى تعجل بنيل ما ينبغى ويرام– মীলাদুন্নবী প্রথম তিন যুগ পরে সৎ উদ্দেশ্যে আরম্ভ হয়েছে এবং এর উদযাপন কেবল বিশুদ্ধ ও একনিষ্ঠ নিয়্যতের উপর ভিত্তি করেই হয়ে আসছে। অতঃপর সর্বদা পৃথিবীর সকল দেশে সব মুসলমানগণ কর্তৃক বড় বড় শহরে রাসূল ﷺ'র বিলাদতের মাসে মাহফিলে মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ উপলক্ষে যিয়াফত ও গরীব মিসকিনদেরকে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এখনো মিলাদের রাতে বিভিন্ন ভাবে দান খয়রাত, সাদকা এবং খুশী উদযাপন করে আর বেশী বেশী ভাল কাজ করে। এমনকি মীলাদুন্নবীর মাস ঘনিয়ে আসলে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে মীলাদুন্নবী পালনের ব্যবস্থা করে থাকে। ফলে ঐ পবিত্র মাসের বরকত আল্লাহর তায়ালার এক বিরাট রহমত ও ইহসান হিসেবে তাদের উপর প্রকাশিত হয়। এটি পরীক্ষিত সত্য। যেমন হযরত শামশুদ্দিন ইবনে জযরী (র.) বর্ণনা করেন যে, মীলাদুন্নবীর পুরো বছর পরিপূর্ণ ভাবে আমান ও নিরাপত্তা বিদ্যমান থাকে এবং আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার সুসংবাদ দ্রুত পাওয়া যায়।[৩৬১] ইমাম কাসতুল্লানী (র.) উপরোক্ত বর্ণনার সাথে আরো যোগ করেছেন যে, **فرحم الله امرأ اتخذ ليالى شهر مولده المبارك اعيادًا ليكون اشد علة على من فى قلبه مرض** আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন, যিনি মীলাদুন্নবীর রাতে ঈদ উদ্‌যাপন করে, যাতে অন্তরে ব্যধি সম্পন্ন ব্যক্তির ব্যধি আরো বৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ যাদের অন্তরে রাসূলের শত্রুতা আছে ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন দ্বারা তাদের শত্রুতা আরো বৃদ্ধি পায়।[৩৬২]

শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) বলেন– **لايزال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده صلى الله عليه وسلم ويعملون الولائم ويتصدقون فى لياله بانواع الصدقات ويظهرون السرور** সর্বদা মুসলমানদের নিয়ম ছিল রবিউল আউয়াল মাসে মাহফিলে মিলাদ উদযাপন করে থাকে। সাদকাত, খায়রাত এবং খুশী উদযাপনের ব্যবস্থা করে থাকে। তারা ঐ দিনে অধিক ভাল কাজের চেষ্টা করে এবং বিলাদতের ঘটনাসমূহ বর্ণনা করে।[৩৬৩]

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র.) তাঁর পিতা শাহ আব্দুর রহিম দেহলভী (র.) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: **كنتُ اصنع فى ايام المولد طعامًا صله بالنبى صلى الله عليه وسلم فلم**

[৩৬১]. মোল্লা আলী কারী (র.) (১০১৫ হি), আল মওরদুর রবি মিওলদুন্নবী, পৃ- ১২-১৩, ইউসূফ সালেহী (র.), সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, খণ্ড-১ পৃ-৩৬২ সূত্রঃ ড. তাহের আল কাদেরী, মিলাদুন্নবী (স) উর্দু, পৃ. ৬২৭

[৩৬২]. ইমাম কাসতুল্লানী (র.) (৯২৩ হি), মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যাহ, খণ্ড-১, পৃ-১৪৭

[৩৬৩]. শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ, পৃ-৬০

يفتح لى سنة من السنين شيء اصنع به طعامًا فلم اجد الاحمصًا مقليًا فقسمته بين الناس فرأيته صلى الله عليه وسلم وبين يديه هذا الحمص متبهجًا بشاشًا– শাহ আব্দুর রহিম (র.) বলেন, আমি প্রতি বছর মীলাদুন্নবী উপলক্ষে খাবারের ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু একবছর (অভাবের কারণে) খাবারের ব্যবস্থা করতে পারিনি। তবে আমি কিছু ভুনা চনা নিয়ে মীলাদুন্নবীর খুশীতে লোকের মধ্যে বন্টন করে দিলাম। রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, রাসূল ﷺ'র সামনে সেই চনা বিদ্যমান এবং তিনি অত্যন্ত খুশি মনে রয়েছেন।[৩৬৪]

মুফতি এনায়েত আহমদ কাকুরী বলেন, হারামাইনে শরীফাইন ও অধিকাংশ ইসলামী শহরে নিয়মিত মাহফিলে মীলাদ অনুষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানরা একত্রিত হয়ে মওলুদ শরীফ করে আর অধিকহারে দুরূদ পাঠ করে। দাওয়াত করে খাবার অথবা শীরনী বন্টন করে। এ কাজটি অত্যন্ত বরকতমণ্ডিত এবং রাসূল ﷺ'র ভালবাসা অর্জনের উত্তম উপায়। ১২ রবিউল আউয়াল মদীনা শরীফে এ বরকতমণ্ডিত মাহফিল মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত হতো এবং মক্কা শরীফে রাসূল ﷺ'র বিলাদতের স্থানে অনুষ্ঠিত হতো।[৩৬৫]

হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.) বলেন, মওলদ শরীফ হারামাইন শরীফাইনের সকল অধিবাসীরা করেন। এটিই আমাদের জন্য দলীল হিসেবে যথেষ্ট। রাসূল ﷺ'র আলোচনা কিভাবে মন্দ হতে পারে? তবে যেসব অতিরঞ্জিত কাজ লোকেরা করেছে তা না হওয়া বাঞ্চনীয়।[৩৬৬]

তিনি অন্যত্র আরো বলেন, আমি নিয়মিত মাহফিলে মিলাদে কেবল অংশগ্রহণ করে থাকিনা বরং বরকত মণ্ডিত মনে করে প্রতি বছর মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করি এবং কিয়ামে স্বাদ ও মজা পাই।[৩৬৭]

আব্দুল হাইই লক্ষ্ণৌভী বলেন, যে কোন কালে মুস্তাহাব পদ্ধতিতে মাহফিলে মিলাদ উদযাপন করা সাওয়াবের কাজ। পবিত্র মক্কা, পবিত্র মদীনা, বসরা, শাম, ইয়েমেন এবং অন্যান্য দেশের লোকেরাও রবিউল আউয়াল মাসের চাঁদ দেখে খুশি হয়ে মাহফিলে মিলাদ উপলক্ষে নেক কাজ করে এবং ওয়ায-নসীহতের ব্যবস্থা করে। রবিউল আউয়াল মাস ছাড়াও অন্যান্য মাসে ঐ সব দেশে মাহফিলে মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়। এ বিশ্বাস না

[৩৬৪]. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১১৭৪ হি), আদ দুররুছ ছামীন, পৃ-৪০
[৩৬৫]. মুফতি এনায়েত আহমদ কাকুরী (র.), তাওয়ারীখে হাবীবে ইলাহ, পৃ-১৫
[৩৬৬]. এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (১৩১৭ হি), শামায়েলে এমদাদীয়া. পৃ-৮৭-৮৮
[৩৬৭]. এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (১৩১৭ হি), ফায়সালায়ে হাফ্তাহ মাসয়ালা, পৃ-৯

রাখা উচিত যে, মাহফিলে মিলাদ কেবল রবিউল আউয়াল মাসেই করলে সওয়াব পাওয়া যায় অন্য মাসে করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে না।[৩৬৮]

তিনি আরো বলেন, এ ব্যাপারে সারকথা হলো যিকরে মওলদ মূলত মনদূব ও মুস্তাহাব। কারণ প্রথম তিন যুগে এর প্রচলন ছিল অথবা এটি শরয়ী বিধানের অধিনস্থ একটি বিষয়। মিলাদ মনদূব হওয়ার ব্যাপারে কেউ অস্বীকার করে নি। তবে একটি ক্ষুদ্র দল যাদের মধ্যে বড় হলেন তাজউদ্দীন ফাকেহানী মালেকী তিনিই এর বিরোধীতা করেছেন মাত্র। আর ইনি জ্ঞানের দিক দিয়ে ঐ সকল প্রখ্যাত মুজতাহিদ আলেমগণের মোকাবেলায় নগণ্য, যারা যিকরে মওলদকে মুস্তাহাব বলেছেন। সুতরাং তার কথা এক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।[৩৬৯]

মীলাদুন্নবীর ফযিলত সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীদের অভিমত

আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী (৮৯৯-৯৭৪ হি.) (র.) "আন-নি'মাতুল কুবরা আলাল আলমে" গ্রন্থে বলেন– قال ابو بكر الصديق رضى الله عنه من انفق درهمًا على قراة مولد النبى صلى الله عليه وسلم كان رفيقى فى الجنة হযরত আবু বক্কর (রা.) বলেন– যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি দিরহাম ব্যয় করবে সে জান্নাতে আমার সাথী হবে।

وقال عمر رضى الله عنه من عظم مولد النبى صلى الله عليه وسلم فقد احياء الاسلام– হযরত ওমর (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবীকে সম্মান করল সে ইসলামকে জীবিত করল।

وقال عثمان رضى الله عنه من انفق درهمًا على قراة مولد النبى صلى الله عليه وسلم كانّما شهد غزوة بدر وحنين হযরত ওসমান (র.) বলেন, যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী উপলক্ষে একটি দিরহাম ব্যয় করল, সে যেন বদর ও হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল।

وقال على رضى الله عنه وكرم الله وجهه من عظّم مولد النبى صلى الله عليه وسلم وكان سببًا لقراته لايخرج من الدنيا الا بالايمان ويدخل الجنة بغير حساب হযরত আলী (রা.) বলেন– যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবীকে সম্মান করল, সে পৃথিবী থেকে ঈমান নিয়ে যাবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

[৩৬৮]. আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী (১৩০৪ হি), ফাতাওয়ায়ে আব্দুল হাই, খণ্ড-২, পৃ-২৮৩
[৩৬৯]. আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী (১৩০৪ হি), মাজমুয়ায়ে ফাত্ওয়া, পৃ-১৩

وقال حسن البصرى رحمة الله عليه وَدِدْتُ لو كان لى مثل جبل اُحُدٍ ذهبًا فانفقته على قراة مولد النبى صلى الله عليه وسلم হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, আমার নিকট যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে, তা আমি মীলাদুন্নবীর জন্য ব্যয় করা পছন্দ করবো।

وقال جنيد البغدادى قدس الله سره من حضر مولد النبى صلى الله عليه وسلم وعظم قدره فقد فاز بالايمان হযরত জুনাইদ বোগদাদী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী মাহফিলে উপস্থিত হবে এবং এর যথাযথ সম্মান করবে সে ঈমানের সাথে সফলতা লাভ করল।

وقال معروف الكرخى قدس الله سره من هيّا طعامًا لاجل قراة مولد النبى صلى الله عليه وسلم وجمع اخوانا وَاَوْقَدَ سراجًا ولبس جديدًا وتبخّر وتعطّر تعظيمًا لمولد النبى صلى الله عليه وسلم حشره الله يوم القيامة مع الفرقة الاولى من النبيين وكان فى اعلى عليين হযরত মারুফ কারখী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী উপলক্ষে খাবার তৈরি করল, মুসলমানদেরকে একত্রিত করল, চেরাগ প্রজ্জ্বলিত করল, নতুন পোশাক পরিধান করল এবং মীলাদুন্নবীর সম্মানার্থে আতর-গোলাপ লাগাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে নবীগণের প্রথম দলের সাথে হাশর করাবেন আর সর্বোচ্চ বেহেশতে স্থান লাভ করবে।

وقال وحيد عصره وفريد دهره الامام فخر الدين الرازي ما من شخص قرا مولد النبى صلى الله عليه وسلم على ملح او برٍّ او شئ آخر من الماكولات الاظهرت فيه البركة وفى كُل شَيئ وصل اليه من ذالك الماكول فانه يضطرب ولا يستقر حتى يغفر الله لاكله وان قرئ مولد النبى صلى الله عليه وسلم على ماء فمن شرب من ذالك الماء دخل قلبه الف نور رحمة وخرج منه الف غلٍّ وعلة ولايموت ذالك القلب يوم تموت القلوب ومن قرأ مولد النبى صلى الله عليه وسلم على دراهم مسكوكة فضةٍ كانت او ذهبًا وخلط تلك الدراهم بغيرها وقعت فيها البركة ولا يفتقر صاحبها হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি কোন লবণ, গম কিংবা অন্য কোন খাবার বস্তুতে মিলাদ পাঠ করে তবে তাতে বরকত প্রকাশিত হবে এবং ঐসব বস্তু অন্য খাবার বস্তুর সাথে মিশ্রণ হলে এর আহারকারীকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন। মিলাদ পাঠকৃত পানি কেউ পান করলে তার অন্তরে সহস্র রহমতের নূর প্রবেশ করবে, তার অন্তর থেকে সহস্র হিংসা ও রোগ বের হয়ে যাবে এবং যেদিন সমস্ত অন্তর মরে যাবে তখন ঐ অন্তর জীবিত থাকবে। কোন স্বর্ণ বা রৌপ্যের দিরহামে মিলাদ পাঠ করে ঐ দিরহামকে অন্য দিরহামের সাথে

মিলিয়ে রাখলে সবগুলোতে বরকত হবে এবং এর মালিক কখনো গরীব হবে না আর নবী করিম ﷺ'র বরকতে তার হাত কখনো ধনদৌলত থেকে খালি হবেনা।

وقال الامام الشافعى رحمة الله من جمع لمولد النبى صلى الله عليه وسلم اخوانًا وهيّا طعامًا واخلى مكانًا وعمل احسانًا وصار سببًا لقراته بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী উপলক্ষে মুসলমান ভাইদেরকে একত্রিত করে, খাবার তৈরি করে এবং ভাল কাজের ব্যবস্থা করে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তাকে কিয়ামতের দিন সালেহীন, শোহাদা ও সিদ্দীকিনদের সাথে উঠাবেন এবং সে জান্নাতুন নাঈমে অবস্থান করবেন।

وقال السرّي السّقطى قدس الله سره من قصد موضعًا يقرأ فيه مولد النبى صلى الله عليه وسلم فقد قصد روضة من رياض الجنة لانه ما قصد ذالك الموضع الا لمحبة النبى صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم من احبنى كان معى فى الجنة–

হযরত সিররী সাক্তী (র.) বলেন– যে ব্যক্তি কোন মীলাদুন্নবীর মাহফিলে যাওয়ার ইচ্ছে করল, সে রিয়াদুল জান্নাতের একটি জান্নাতের ইচ্ছে করল। কেননা সে কেবল রাসূল ﷺ'র মহব্বতের কারণে ঐ স্থানে যাওয়ার ইচ্ছে করেছে। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, যে আমাকে মহব্বত করবে সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।

وقال سلطان العارفين الامام جلال الدين السيوطى قدس الله سره ونور ضريحه فى كتابه المسمي بالوسائل فى شرح الشماءل ما من بيت او مسجد او محلة قري فيه مولد النبى صلى الله عليه وسلم الاحفتِ الملائكة ذالك البيت او المسجد او المحلة وصلت الملائكة على اهل ذالك المكان وعمهم الله تعالى بالرحمة والرضوان ، واما المطوّقون بالنور يعنى جبرائيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل عليهم السلام فانهم يصلون على من كان سببًا لقراة مولد النبى صلى الله عليه وسلم وقال ايضًا ما من مسلم قراء فى بيته مولد النبى صلى الله عليه وسلم الا رفع الله سبحانه وتعالى القحط والوباء والحرق والغرق والافات والبليات والبغض والحسد وعين السوء واللصوص عن اهل ذالك البيت فاذا مات هوَّنَ الله عليه جواب منكر ونكير ويكون فى مقعد صدق عند مليك مقتدر فمن اراد تعظيم مولد النبى صلى الله عليه وسلم يكفيه هذا القدر–

ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) 'আল ওয়াসায়েল ফী শরহিশ শামায়েল' গ্রন্থে বলেন, কোন ঘরে বা মসজিদে কিংবা কোন মহল্লায় মীলাদুন্নবী উদযাপিত হলে রহমতের

ফেরেশ্‌তারা ঐ ঘর, মসজিদ ও মহল্লাকে আবৃত করে রাখেন এবং ঐ এলাকাবাসীদের উপর রহমত নাযিল করেন আর আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। চার ফেরেশ্‌তা তথা জিব্রাইল, মীকাঈল, ইস্রাফিল ও আযরাঈল (আ.) মীলাদুন্নবী উদযাপনের কারণে রহমত নাযিল করেন। তিনি আরো বলেন, কোন মুসলমান ঘরে মীলাদুন্নবী উদযাপন করলে আল্লাহ তা'আলা দূর্ভিক্ষ, বালা মুসিবত, আগুন, পানিতে ডুবে যাওয়া, সকল আপদ-বালা থেকে মুক্ত রাখেন এবং হিংসা, বিদ্বেষ, বদ নজর ও চুরি-ডাকাতি থেকে ঐ ঘরের বাসিন্দাদেরকে হেফাযত করেন। আর যখন সে মৃত্যুবরণ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তার কবরে মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর সহজ করে দেবেন এবং সে যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে থাকবে। অতএব মীলাদুন্নবীকে তা'জীম ও সম্মানকারীদের জন্য এতটুকু ফযিলতই যথেষ্ট।[৩৭০]

মসজিদে হারামে মীলাদুন্নবী ﷺ

الاعلام باعلام بيت الله الحرام **নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে:**

يزار مولد النبى صلى الله عليه وسلم المكانى فى الليلة الثانية عشر من ربيع الاول فى كل عام فيجتمع الفقهاء والاعيان على نظام المسجد الحرام والقضاة الاربعة بمكة المشرفة بعد صلاد المغرب بالشموع الكثيرة والمفروعات والفوانيس والمشاغل وجميع المشائخ مع طوائهم بالاعلام الكثيرة ويخرجون من المسجد الى سوق الليل ويمشون فيه الى محل مولد الشريف بازدحام ويخطب فيه شخص ويدعو للسلطنة الشريفة ثم يعودون الى المسجد الحرام ويجلسون صفوفًا فى وسط المسجد من جهة الباب الشريف والقضاة يدعو للسلطان ويلبسه الناظر خلعة ويلبس شيخ الفراشين خلعة ثم يوذن للعشاء ويصل الناس على عادتهم ثم يمشى الفقهاء مع ناظر الحرم الى الباب الذى يخرج منه من المسجد ثم يتفرقون وهذا من اعظم مراكب ناظر الحرم الشريف بمكة المشرفة ويأتى الناس من البدو والحضرو اهل جدّة وسكان الاودية فى تلك الليلة ويفرحون بها –

প্রতি বছর ১২ রবিউল আউয়াল রাতে যথা নিয়মে মাহফিলে মিলাদে একত্রিত হওয়ার জন্য ঘোষণা করা হয়। সমস্ত এলাকার ওলামা, ফুকাহা, গর্ভনর এবং চার মাযহাবের কাযীগণ মাগরিবের নামাযের পর মসজিদে হারামে জমায়েত হয়ে যেতেন। নামাযের পর "সওকুল লায়ল" দিয়ে অতিক্রম করে নবীর মওলুদের স্থানে যিয়ারতের জন্য গমন করতেন। তাদের হাতে অসংখ্য বাতি, লেম্প এবং মশাল থাকতো। সেখানে মানুষের

[৩৭০]. শাহাবুদ্দিন আহমদ ইবনে হাজর হায়তামী (র.) (৯৭৪ হি), আন নি'মাতুল কুবরা, পৃ ৭-১১

যথেষ্ট ভীড় হতো, কোথাও তিল পরিমাণ খালি থাকতো না। অতঃপর একজন বিশুদ্ধ আলেমেদ্বীন বক্তব্য রাখতেন। সকল মুসলমানদের জন্য দোয়া করা হতো। তারপর সবাই মসজিদে হারামে চলে আসতেন এবং সকলে মসজিদের মধ্যখানে সারিবদ্ধ হয়ে বসতেন। কাযীগণ রাজ্যের জন্য দোয়া করতেন। মসজিদে তৎকালীন বাদশা ও মাহফিল আয়োজনকারীগণকে দস্তারবন্দি করা হতো। এরপর এশার আযান হতো। সকলে নামায পড়ে আপন আপন বাড়ী ঘরে চলে যেতো। এখানে এত বড় জমায়েত হতো যে, দূর-দূরান্ত থেকে, গ্রাম-শহর এমনকি সুদূর জিদ্দা থেকে পর্যন্ত লোকজন মাহফিলে অংশগ্রহণ করার জন্য আগমন করতেন এবং নবীর বিলাদতের খুশী উদযাপন করতেন।[৩৭১]

ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভালকাজে অর্থ ব্যয় করলে তা কখনো অপচয় বলে বিবেচিত হবেনা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, **ليس فى الحلال اسراف وانما السرف فى ارتكاب المعاصى** হালাল কাজে ব্যয় করলে অপচয় হয়না। অপচয় হয় কেবল পাপ কাজে ব্যয় করলে।[৩৭২]

হযরত সুফিয়ান সওরী (র.) বলেন, **الحلال لا يحتمل السرف** হালাল বা বৈধ কাজে ব্যয় করা অপচয়ের সম্ভাবনা নেই।[৩৭৩]

অতএব ঈদে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে মসজিদ, বাড়ীঘর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহ সুসজ্জিত করা এবং সামর্থানুযায়ী গরু, ছাগল, মহিষ ও উট যবেহ করে ঈমানদারগণের খাবারের ব্যবস্থা করা এবং শান শওকতের সাথে জশনে জুলুছ বের করা ইত্যাদি সম্পূর্ণ জায়েয এবং উত্তম ইবাদত। বাদশাহ মুযাফ্‌ফর মীলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষে পাঁচ হাজার বকরী, ছয় হাজার মুরগী যবেহ করতেন। এক লক্ষ পেয়ালা মাখন এবং ত্রিশ হাজার তাব্বাক হালুয়ার ব্যবস্থা করতেন। তিনি মীলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষে তৎকালীন তিন লক্ষ দিনার ব্যয় করতেন।[৩৭৪]

ইবনে দিহায়া (র.) বাদশা মুযাফ্‌ফরের জন্য মীলাদুন্নবীর উপর **التنوير فى مولد البشير والنذير** নামক একটি পুস্তক রচনা করে দিলে বাদশা তাকে এক হাজার দীনার পুরস্কার প্রদান করেন।[৩৭৫] এ পর্যন্ত কেউ এগুলোকে অপচয় বলে মন্তব্য করে নি। বরং এগুলোকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ'র রেজামন্দি অর্জনের উসীলা মনে করা হয়।

[৩৭১]. ইমাম কুতুব উদ্দিন হানাফী (র.), আল ইলাম বি ইলামে বায়তুল্লাহিল হারাম, পৃ-১৯৬, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে জারুল্লাহ ইবনে জহির (র.), আল জামেউল লতীফ ফী ফযলে মক্কা- পৃ-২৩১

[৩৭২]. হযরত শারবীনী (র.), মাগনাল মুহতাজ, খণ্ড-১, পৃ-৩৯৩

[৩৭৩]. দিময়াতী (র.), ইয়ানতুত তালেবীন, খণ্ড-২, পৃ-১৫৭

[৩৭৪]. সিবতে ইবনে জওযী (র.), মিরাতুয যামান ও সীরাতে নববী, পৃ-৪৫

[৩৭৫]. প্রাগুক্ত

আল্লাহ ও রাসূল ﷺকে ভালবাসা

মহান আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা। আর রাসূল ﷺ হলেন তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তাঁরই উসিলাতে আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত নিয়ামত তাঁরই উসিলায় সকলে প্রাপ্ত হয়। তাই আল্লাহর ও তাঁর রাসূল ﷺ'র আদেশ-নিষেধ মান্য করা এবং তাঁদেরকে ভালবাসা প্রত্যেকের উপর ফরয।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ হে নবী ! আপনি বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধনসম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়ত করেন না।[৩৭৬]

উপরোক্ত আয়াতে পার্থিব জীবনের সব প্রিয় বস্তু থেকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করাকে অধিক ভালবাসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এর বিপরীত হলে আল্লাহর আযাবের অপেক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এদেরকে ভালবাসা ফরয।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ হে নবী! আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩৭৭]

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহকে ভালবাসতে হলে তাঁর নবীকে অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ নবীর অনুসরণ দ্বারাই আল্লাহর ভালবাসা প্রমাণিত হবে। সুতরাং যে যতটুকু নবীর অনুসরণ করবে ততটুকু আল্লাহর ভালবাসার প্রকাশ পাবে। আর নবীকে অনুসরণ করলেই আল্লাহর ভালবাসা, দয়া ও মাগফিরাত লাভে ধন্য হবে। কেননা আল্লাহকে ভালবাসার দাবী করা বড় কথা নয় বরং আল্লাহ ভালবাসলে সেটাই হবে বড় পাওনা ও সফলতা। আর আল্লাহর ভালবাসা অর্জিত হয় নবীর অনুসরণের মাধ্যমে। নবীর

[৩৭৬]. সূরা তাওবা, আয়াত- ২৪
[৩৭৭]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ৩১

অনুসরণ তখনই হয় যখন নবীর ভালবাসা অন্তরে থাকবে। নবীর আনুগত্য ও ভালবাসা আল্লাহর আনুগত্য ও ভালবাসার নামান্তর মাত্র। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ যে রাসূলের আনুগত্য করল সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল।[৩৭৮]

হাদিস শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, ان رجلًا قال يا رسول الله متى الساعة قال ويلك وما اعددت لها قال ما اعددتُ لها الاَّ انى احبّ الله ورسوله قال انت مع من احببت قال انس فما رأيت المسلمين فرحوا بشيئ بعد الاسلام فَرْحهم بها এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুত করেছ? উত্তরে সে বলল, আমি এর জন্য কিছুই প্রস্তুত করিনি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবেসেছ কিয়ামতের দিবসে তুমি তার সাথেই থাকবে। হযরত আনাস (রা.) বলেন, ইসলামের আর্বিভাবের পর আমি মুসলমানদেরকে কোন বিষয়ে এত খুশী হতে দেখিনি, যতটা খুশি হয়েছেন তাঁরা এই বাণীতে।[৩৭৯]

আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে ভালবাসলে হযরত জিব্রাইল (আ.)সহ আসমানের সকল ফেরেশ্‌তা তাকে ভালবাসেন এবং পৃথিবীতে তার গ্রহণযোগ্যতা স্থাপন করা হয়। অর্থাৎ আসমান ও যমিনবাসী সকলেই তাকে ভালবাসতে থাকে।

হাদিস শরীফে আছে, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন জিব্রাইল (আ.)কে ডেকে বলেন, আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। তিনি বলেন, তখন জিব্রাইল (আ.) তাকে ভালবাসতে থাকেন। অতঃপর তিনি আকাশে ঘোষণা করে দেন, আল্লাহ তা'আলা অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন, অতএব তোমরাও তাকে ভালবাস। ফলে আসমানবাসীরাও তাকে ভালবাসতে থাকে। তারপর পৃথিবীতে তার গ্রহণযোগ্যতা স্থাপন করা হয়।[৩৮০]

[৩৭৮]. সূরা নিসা, আয়াত- ৮০
[৩৭৯]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ৪২৬
[৩৮০]. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি), সহীহ মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ৪২৫

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ সকল বস্তুর চেয়ে অধিক ভালবাসলেই ঈমানের স্বাদ অর্জিত হয়। হযরত আনাস (রা.)কে নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ তিনটি অভ্যাস যার মধ্যে থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ লাভ করবে। (১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺকে সবকিছু থেকে অধিক ভালবাসবে। (২) কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে ভালবাসবে এবং (৩) আল্লাহ কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর পুনরায় কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়াকে এরূপ অপছন্দ করবে, যেরূপ আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।[৩৮১]

ইমাম বুখারী (র.)'র মতে রাসূল ﷺকে ভালবাসা ঈমানের অংশ। তাই তিনি তাঁর সহীহ বুখারী শরীফে بَاب حُبُّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْإِيمَانِ নামক একটি পরিচ্ছেদ করেছেন।

ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর সহীহ মুসলিম শরীফে بَاب وُجُوبِ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَإِطْلَاقِ عَدَمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبُّهُ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ অর্থাৎ পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং সকল মানুষ থেকে রাসূল ﷺকে অধিক ভালবাসা ওয়াজিব। আর যার কাছে এরূপ ভালবাসা থাকবেনা সে পূর্ণ ঈমানদার নয় নামক একটি পরিচ্ছেদ করেছেন।

উভয় গ্রন্থে ঐ পরিচ্ছেদের অধীনে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবেনা, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় হই।[৩৮২]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হেশাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা নবী করিম ﷺ'র সাথে ছিলাম। এ সময় তিনি হযরত ওমর (রা.)'র হাত ধরেছিলেন। ওমর (রা.) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ

[৩৮১]. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী শরিফ, খণ্ড-১, পৃ-৭ হাদিস নং-১৫, ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি) সহীহ মুসলিম, খণ্ড-১, হাদিস নং-৭৩

[৩৮২]. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী শরিফ, খণ্ড-১, পৃ-৭ হাদিস নং-১৪, ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি), সহীহ মুসলিম, খণ্ড-১, হাদিস নং- ৭৭

عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ আমার প্রাণ ব্যতীত আপনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তখন নবী করিম ﷺ বললেন, না ঐ মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! এমনকি তোমার কাছে তোমার প্রাণের চেয়েও আমাকে অধিক প্রিয় হতে হবে। তখন ওমর (রা.) তাঁকে বললেন, আল্লাহর কসম! এখন আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। নবী করিম ﷺ বললেন, হে ওমর! এখন (তোমার ঈমান পূর্ণ হয়েছে)।[৩৮৩]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺকে ভালবাসার নিদর্শন হলো তাঁদের আনুগত্য করা, তাঁদেরকে ত্রুটিমুক্ত মনে করা, তাঁদের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ না করা, তাঁদের আলোচনা বেশী করা। তাঁদের শান-মান শ্রবণে আগ্রহী হওয়া, তাঁদের প্রিয়দেরকে ভালবাসা, তাঁদের প্রতি সম্পর্কিত বস্তুকে ভালবাসা, তাঁদের শত্রুদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ইত্যাদি। যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺকে ভালবাসবে তাদের মধ্যে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলী অবশ্যই থাকতে হবে। তবেই সে একজন আল্লাহ ও রাসূল ﷺর সত্যিকারের আশিক বলে দাবী করতে পারবে। নতুবা ভণ্ড ও স্বার্থপর বলে বিবেচিত হবে।

এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ

- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান জযূলী (র.) ১ রবিউল আউয়াল ৮৭০ হিজরি
- হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দি (র.) ২ রবিউল আউয়াল ৭৯১ হিজরি
- হযরত ইমাম হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু ৫ রবিউল আউয়াল ৪৯ হিজরি
- ইমাম আবু ইউসূফ (র.) ৫ রবিউল আউয়াল ১৮৭ হিজরি
- ইমাম মালেক (র.) ১০/১১/১৪ রবিউল আয়াল ১৭৯ হিজরি
- হযরত সরমদ (র.) ১০ রবিউল আউয়াল
- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ১২ রবিউল আউয়াল ২১৪ হিজরি
- হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) ১৪ রবিউল আউয়াল ৬৩৩ হিজরি
- হযরত মখদুম ছাবের কালিরী (র) ১৫ রবিউল আউয়াল
- শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) ২১ রবিউল আউয়াল ১০৫২ হিজরি
- হযরত বু আলী শাহ কলন্দর (র.) ২৬ রবিউল আউয়াল
- আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ নসফী (র) ৭১০/৭১১ হিজরি

[৩৮৩]. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী শরিফ, খণ্ড-২, পৃ-৯৮১, হাদিস নং-৬১৭৮

রবিউস সানি

রবিউস সানি হিজরি সনের চতুর্থ মাস। এ মাসে গাউছে পাক হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.)'র ওফাত হয়েছিল। এ মাসের শুরুতে দুরূদ শরীফ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

দুরূদ শরীফ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্তাগণ নবীর উপর দুরূদ পাঠ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরা তাঁর উপর দুরূদ পড় আর উত্তমভাবে সালাম পেশ কর।[৩৮৪]

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করিম ﷺ'র উপর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর ফেরেশ্তাগণ সর্বদা দুরূদ প্রেরণ করেন। ইমাম বুখারী (র.) আবু আলীয়া থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালার সালাতের অর্থ হল রাসূল ﷺ'র সম্মান ও ফেরেশ্তাগণের সামনে প্রশংসাকীর্তন করা। আর إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ বাক্যটি জুমলা ইসমিয়্যা তথা নামবাচক বাক্য। আরবী ব্যাকরণ মতে এটি সর্বদা ও স্থায়ী অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ ও ফেরেশ্তাগণ সর্বদা দুরূদ পাঠ করে থাকেন। উক্ত আয়াত দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, কেবল একটি বিধান আছে, যেটি আল্লাহ, ফেরেশ্তা ও বান্দা করে থাকেন আর সেটি হল রাসূল ﷺ'র উপর দুরূদ পাঠ করা। অতএব বুঝা যায় যে, যে কাজটি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা করেন সেটি কত বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ। আয়াতে বর্ণিত صَلُّوا ও سَلِّمُوا শব্দদ্বয় 'আমর' তথা নির্দেশসূচক। এর দ্বারা ফরয-ওয়াজিব বুঝায়। সুতরাং প্রত্যেক মু'মিনের উপর জীবনে অন্তত একবার সালাত ও সালাম পাঠ করা ফরয। নামাযে পাঠ করা সুন্নাত আর অন্যান্য সময়ে পাঠ করা মুস্তাহাব ও উত্তম আমল। কোন মজলিসে বারবার রাসূল ﷺ'র নাম উল্লেখ করলে একবার দুরূদ পাঠ করা ওয়াজিব আর প্রতিবার পাঠ করা মুস্তাহাব।[৩৮৫]

দুরূদ পাঠের ফযিলত

দুরূদ শরীফ পাঠকারীর উপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়:

বিশুদ্ধ হাদিসে দুরূদ পাঠের অসংখ্য ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় ফযিলত হল দুরূদ পাঠকারীর উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। কেননা আল্লাহর এক বিন্দু রহমত সমগ্র পৃথিবীর চেয়েও বড় ও প্রশস্ত। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত,

৩৮৪. সূরা আহযাব, আয়াত-৫৬

৩৮৫. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) (১৩৯১ হি), নুরুল ইরফান, উক্ত আয়াতের টিকা নং-১৬৭

তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيَّاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া হবে।[৩৮৬]

হযরত আবু তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ اَنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا একদিন রাসূল ﷺ আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন তখন তাঁর চেহারা মুবারকে আনন্দের ভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। অতঃপর বললেন, আমার কাছে জিব্রাইল (আ.) এসেছিলেন আর বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনার প্রভু বলেছেন, আপনি কি খুশী হবেন না? আপনার কোন উম্মত আপনার উপর একবার দুরূদ পাঠ করলে আমি তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবো, আপনার কোন উম্মত আপনার উপর একবার সালাম পেশ করলে আমি তার উপর দশবার শান্তি বর্ষণ করবো।[৩৮৭]

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- مَنْ صَلَّى عَلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ যে ব্যক্তি নবী করিম ﷺ'র উপর একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করেন, তার দশটি গুনাহ মুছে দেন এবং তার জন্য দশটি মরতবা বৃদ্ধি করেন।[৩৮৮]

হযরত আম্মার বিন ইয়াসার (রা.) রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَى مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ، فَهُوَ قَائِمٌ عَلَى قَبْرِي حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي يُصَلِّي عَلَيَّ صَلَاةً إِلا قَالَ: يَا أَحْمَدُ فُلَانُ بْنُ فلان بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ صَلَّى عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا فَيُصَلِّي الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَإِنْ

৩৮৬. ইমাম নাসাঈ (র.) (৩০৩ হি) নাসাঈ শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৮৬, কাযী আয়ায (র.) (৫৪৪ হি) শেফা শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৫, কায়রো, হাদিস নং-৮৬০

৩৮৭. নাসাঈ ও দারেমী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৮৬, হাদিস নং-৮৬৬, কাযী আবু ইসহাক মালেকী (র.) (২৮২ হি), ফযলুস সালাত আলান নবীয়্যি, পৃষ্ঠা-২, হাদিস নং-২৪

৩৮৮. কাযী আবু ইসহাক মালেকী (র.) (২৮২ হি), ফযলুস সালাত আলান নবীয়্যি, পৃষ্ঠা-২, হাদিস নং-২৪

زَادَ زَادَ اللّٰهُ عز وجل আল্লাহ তায়ালা ফেরেশ্তাদের থেকে একজন ফেরেশ্তাকে সকল সৃষ্টির কথা শ্রবণের ক্ষমতা দিয়ে আমার ইন্তেকালের পর কিয়ামত পর্যন্ত আমার কবরে দাঁড়িয়ে থাকার দায়িত্ব অর্পন করেন। যখন আমার উম্মত আমার উপর দুরূদ পাঠ করে তখন সে ফেরেশ্তা বলে হে আহমদ! অমুকের ছেলে অমুক তার নাম ও পিতার নাম সহ আপনার উপর এরূপ দুরূদ পাঠ করেছে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তার উপর রহমত নাযিল করেন। রাসূল ﷺ বলেন– যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন। আর যদি সে দুরূদ আরো বৃদ্ধি করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা রহমতও বৃদ্ধি করেন।[৩৮৯]

خَرَجَ رَسُولُ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى دَخَلَ نَخْلًا فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى خِفْتُ أَوْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللّٰهُ قَدْ تَوَفَّاهُ أَوْ قَبَضَهُ قَالَ فَجِئْتُ أَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْه السَّلَام قَالَ لِي أَلَا أُبَشِّرُكَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْه وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْه একদিন রাসূল ﷺ শহর থেকে বের হলেন। আমি তাঁর পিছু নিলাম। তিনি একটি খেজুর বাগানে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সিজদায় পড়ে রইলেন। আমার ভয় হলো যে, আল্লাহ তায়ালা কোন তাঁকে ওফাত দিলেন কিনা। আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, আমি নিকটে এসে তাঁকে দেখতে লাগলাম। এসময় তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, তুমি কেন এসেছ? আমি তাঁকে তা বললাম। আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, তখন তিনি বললেন, জিব্রাইল (আ.) আমাকে বলেন,আমি কি আপনাকে এ সুসংবাদ দেবো না, আল্লাহ তায়ালা আপনার ব্যাপারে বলেন, যে ব্যক্তি আপনার উপর দুরূদ পাঠ করবে আমি তার প্রতি রহমত নাযিল করবো, যে আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার প্রতি শান্তি বর্ষণ করবো।[৩৯০]

مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً যে ব্যক্তি নবী করিম ﷺ এর উপর একবার দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্তাগণ তার উপর সত্তরবার সালাত পাঠ করবেন।[৩৯১]

৩৮৯. আবু বকর ইবনে আবি আসেম (র.) (২৮৭ হি), কিতাবুস সালাত আলান নবীয়্যি, দামেস্ক, পৃ-৫১, হাদিস নং-৪২, ইবনে কাইয়্যম,জিলদুল ইফহাম,পৃ-৯৫,আল্লামা শা'রানী (র.), কাশফুল গুম্মাহ, পৃষ্ঠা–২৭০, জাওয়াহিরুল বিহার, পৃ-১৬৫

৩৯০. ইমাম আহমদ (র.) (২৪১ হি),মুসনাদে আহমদ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৮৬, হাদিস নং-৮৭৫

৩৯১. ইমাম আহমদ (র.) (২৪১ হি),মুসনাদে আহমদ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৮৭, হাদিস নং-৮৭৫

দুরূদ দ্বারা গুনাহ মার্জনা হয়

দারেকুতুনী ও ইবনে শাহীন হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– الصّلواة عَلَيَّ نورٌ على الصِرَطِ فمن صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الجمعة ثَمَانِيْنَ مَرَّةً غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً আমার উপর প্রেরিত দুরূদ পুলসিরাতে নুর হবে। যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর আশিবার দুরূদ পাঠ করবে তার আশি বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৩৯২]

হাফেয আবু নঈম (র.) 'হুলিয়া' নামক কিতাবে হযরত আলী (রা.) ও হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺএর উপর দুরূদ শরীফ পাঠের দ্বারা গুনাহ এমনভাবে মুছে যায়, যেমনিভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। গোলাম আযাদ করার চেয়ে রাসূল ﷺএর উপর দুরূদ পাঠ করা উত্তম। আর রাসূল ﷺকে ভালবাসা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার চেয়ে উত্তম।[৩৯৩]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, দুই মুসলমান যখন পরস্পর সাক্ষাতে করমর্দন করে এবং আমার উপর দুরূদ পাঠ করে তাহলে তারা পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের আগের ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[৩৯৪]

কাযী আয়ায (র.) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (র.) থেকে বর্ণনা করেন– الصَّلَوةُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اَمْحَقُ لِلذُّنُوْب مِنَ المَاءِ البَارِدِ لِلنَّارِ وَالسَّلَامُ عَلَيْه اَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرِّقَابِ নবী করিম ﷺএর উপর দুরূদ পাঠ করা গুনাহকে এমনভাবে মুছে দেয় যেভাবে শীতল পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। আর নবীর প্রতি সালাম প্রেরণ করা গোলাম আযাদ করা থেকে শ্রেয়।[৩৯৫]

قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ হযরত আবু কাহেল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– عَلَيْه وَسَلَّمَ: وَاعْلَمَنَّ يَا أَبَا كاهِلٍ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ كُلَّ يومٍ ثَلاثَ مرات وَكُلَّ ليلة ثَلاثَ مرات حُبًّا وَشَوْقًا إِلَيَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ذُنُوبَهُ تلْكَ اللَّيْلَةَ وَذَلِكَ الْيَوْمَ রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, হে আবু কাহেল! যে ব্যক্তি প্রতিদিন ও প্রতিরাতে আমার উপর তিনবার করে দুরূদ পাঠ করবে আমার প্রতি ভালবাসা ও আগ্রহী হয়ে, ঐ রাত ও দিনের গুনাহ মাফ করে দেয়া আল্লাহর উপর আবশ্যক হয়ে যায়।[৩৯৬]

৩৯২. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি), জাওয়াহেরুল বিহার, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬৩

৩৯৩. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), জযবুল কুলূব, উর্দু, পৃষ্ঠা–২৬৭

৩৯৪. প্রাগুক্ত

৩৯৫. কাযী আয়ায (র.) (৫৪৪ হি), শেফা শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা–৫৬, কায়রো

৩৯৬. আবু বকর ইবনে আসেম (র.) (২৮৭ হি), কিতাবুস সালাত আলান নবীয়্যি, পৃষ্ঠা–৬২, হাদিস নং–৪৮

বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি হাদিস অধ্যয়নকারী একজন ছাত্রকে স্বপ্নে দেখেন। ছাত্রটি বলল আল্লাহ তায়ালা আমাকে এবং হাদিসের শ্রোতাদেরকে রাসূল ﷺএর উপর দুরূদ পাঠের কারণে মার্জনা করে দিয়েছেন। আর দুরূদ পাঠ করা এ শাস্ত্র অধ্যয়নকারীদের জন্য অপরিহার্য।[৩৯৭]

দুরূদ শরীফ নেকীর পাল্লা ভারী করবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, কিয়ামত দিবসে ন্যায়ের পাল্লায় মানুষের আমল মাপা হবে। মানুষ ভয়ে কাঁপতে থাকবে। দুনিয়ার সকল মানুষ এক ময়দানে সমবেত হবে। লোকেরা দেখবে হযরত আদম (আ.)কে তিনি সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় আল্লাহর আরশের নিচে অবস্থান করবেন এবং দেখবেন তাঁর আওলাদগণ থেকে কারা জান্নাতে যাচ্ছে আর কারা জাহান্নামে যাচ্ছে। ইত্যবসরে তিনি দেখবেন যে, একজন উম্মতে মুহাম্মদীকে দোযখের ফেরেশ্তারা দোযখে নিয়ে যাচ্ছে। এটা দেখে তিনি উচ্চস্বরে বলবেন– হে আহমদ! হে আহমদ! মুহাম্মদ ﷺ উত্তরে বলবেন, লাব্বায়েক হে আবুল বশর! আদম (আ.) বলবেন, দেখুন আপনার একজন উম্মতকে দোযখের ফেরেশ্তারা দোযখের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর কথা শুনে মুহাম্মদ ﷺ উম্মতের দিকে দৌড়ে তাশরীফ নিবেন আর ফেরেশ্তাদেরকে বলবেন, হে আল্লাহর দূতগণ! একটু থাম। এ ব্যক্তিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? ফেরেশ্তারা আরয করবেন, আমরা কঠিন প্রকৃতির ফেরেশ্তা। আমরা আল্লাহর আদেশের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করি না। এসময় রাসূল ﷺ তাঁর বাম হাত দাড়ি মোবারকে রেখে আল্লাহর কাছে আরয করবেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন, আমার উম্মতের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করবেন না। এখন ওয়াদা পালনের সময় এসেছে। তখন আল্লাহর আরশ থেকে নির্দেশ আসবে, اَطِيْعُوا مُحَمَّدًا হে ফেরেশ্তারা! তোমরা মুহাম্মদের অনুগত হও। ফেরেশ্তারা লোকটিকে পুনরায় মীযানে নিয়ে আসবেন। দ্বিতীয়বার তার আমল ওজন দেয়া হবে। রাসূল ﷺ একটি সাদা কাগজ তার নেকীর পাল্লায় রাখবেন। ফলে নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। গুনাহের চেয়ে নেকী অনেক বেশী হয়ে যাবে ফলে তার ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যাবে। অতঃপর একটি আওয়ায আসবে– এখন সে নেককার হয়ে গিয়েছে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও। ফেরেশ্তারা যখন তাকে জান্নাতে যেতে বলবে তখন সে তাদেরকে বলবে, একটু দাঁড়ান। আমি এই মহান ব্যক্তির নিকট কিছু আবেদন করি নেই। তখন রাসূল ﷺএর খেদমতে এসে বলবে, আমার পিতা মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক, আপনি কতইনা সুন্দর! দয়া করে একটু বলবেন, আপনি কোন মহান

[৩৯৭]. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), জযবুল কুলূব, উর্দু, পৃষ্ঠা–২৬৯

ব্যক্তি? যিনি আমাকে এই বিরাট মুসিবত থেকে উদ্ধার করেছেন। উত্তরে তিনি এরশাদ করবেন, আমি তোমার নবী মুহাম্মদ ﷺ। আর সাদা কাগজটি হল তোমার সেই দুরূদ শরীফ যা তুমি আমার উপর একবার পড়েছিলে। আমি তা সংরক্ষণ করে রেখেছি যাতে প্রয়োজনের সময় তোমার কাজে আসে এবং তোমার মুক্তির উপায় হয়।[৩৯৮]

দুরূদ শরীফ দ্বারা আযাব থেকে মুক্তি লাভ

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন: اِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَنْظُرُ اِلٰى مَنْ يُصَلِّي عَلَيَّ وَمَنْ نَظَرَ اللهُ تَعَالٰى اِلَيْهِ لَا يُعَذِّبُهُ اَبَدًا নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা দয়ার দৃষ্টি দান করেন ঐ ব্যক্তির উপর যে আমার উপর দুরূদ পাঠ করে। আর যার উপর আল্লাহর দয়ার দৃষ্টি পড়বে আল্লাহ তায়ালা তাকে কখনো আযাব দেবেন না।[৩৯৯]

আল্লাহর দয়ার একটি দৃষ্টি বান্দার সারা জীবনের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। কেননা যে আল্লাহর দয়া প্রাপ্ত হয়েছে দুনিয়া-আখিরাতের যাবতীয় নিয়ামত তার পদচুম্বন করবে। আর আল্লাহর দয়া প্রাপ্ত হয় নবী করিম ﷺ'র উপর দুরূদ শরীফ পাঠ দ্বারা।

ইমাম সাখাবী (র.) বর্ণনা করেন- হযরত মূসা (আ.)'র সময়কালে একজন ব্যক্তি বড়ই ফাসিক, ফাজির ছিল। বনী ইসরাইল তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট ছিল। তার মৃত্যু হলে লোকেরা কাফন-দাফন ব্যতীত একটি আবর্জনার স্তুপে তাকে নিক্ষেপ করে দিল। তার নামাযে জানাযাও তারা পড়েনি। আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ.)কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, হে মূসা! অমুক আবর্জনার স্থানে একজন মৃত ব্যক্তি কাফন-দাফন ব্যতীত পড়ে আছে। সেখানে গিয়ে তাকে গোসল দিয়ে কাফন পড়িয়ে জানাযা পড়ে তাকে সম্মানের সহিত দাফন কর। কেননা আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। মুসা (আ.)ও তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তার গুনাহ কী কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন? তার কোন আমলটি তার মাগফিরাতের কারণ হল? আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হল- হে মুসা! তার মাগফিরাতের কারণ হল, একদিন সে তাওরাত পাঠ করার সময় আমার মাহবুব মুহাম্মদ ﷺ'র নাম দেখে দুরূদ পাঠ করেছে। এ কারণেই আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।[৪০০]

দুরূদ পাঠকারী কিয়ামত দিবসে আল্লাহর আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবে

কিয়ামত দিবসে ময়দান তামার ন্যায় প্রচণ্ড গরম হবে। মানুষ ছায়ায় আশ্রয়ের জন্য হাহাকার করবে। এ সময় তারাই আল্লাহর আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবে যারা পৃথিবীতে অধিক হারে নবী করিম ﷺ'র উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করেছে। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– ثَلَاثَةٌ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمٌ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ قِيْلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ

[৩৯৮]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি) জাওয়াহেরুল বিহার, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬৭
[৩৯৯]. আফযালুস সালাত, পৃষ্ঠা-৪০
[৪০০]. আফযালুস সালাত, পৃষ্ঠা-৪১

قَالَ مَن فَرَّجَ عَنْ مَكْرُوبٍ مِن اُمَّتِي وَاَحْيِ سُنَّتِي وَاَكْثَرُ الصَّلوةَ عَلَيَّ তিন প্রকারের মানুষ কিয়ামত দিবসে আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় পাবে যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। কেউ আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? উত্তরে তিনি বললেন, যে আমার কোন মুছিবতগ্রস্থ উম্মতের মুসিবত দূরীভূত করবে, যে আমার সুন্নতকে জীবিত রাখবে এবং যে আমার উপর অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে।[৪০১]

মুনকার-নকীরের সাওয়ালের জবাব

হযরত শিবলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার এক প্রতিবেশী মারা যায়। আমি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করি, আল্লাহ তায়ালা তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমার সম্পর্কে কি জিজ্ঞাসা করবেন, আমার উপরতো বড় ধরনের মুছিবত এসেছিল। বিশেষত মুনকার-নকীরের সাওয়ালের সময়। আমার মনে হয়েছিল যে, আমি যেন দ্বীনে ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করিনি। এ সময় হঠাৎ আওয়ায হল তুমি যে তোমার মুখকে বেকার রেখেছিলে, এটি তারই শাস্তি। আযাবের ফেরেশ্তা আমার দিকে এগিয়ে আসলে আমি দেখলাম যে, সুগন্ধিযুক্ত একজন সুন্দর পুরুষ আমার এবং ফেরেশ্তার মাঝখানে আড়াল হয়ে আছেন। তিনি আমাকে ঈমানের দলীল তথা সাওয়ালের জবাব শিখিয়ে দেন। আমি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করি আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তায়ালা আপনার অধিক সংখ্যক দুরূদ শরীফ পাঠ করার ফলে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন বিপদে-আপদে আপনার সাহায্য করি।[৪০২]

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– اَكْثَرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ مَا شِئْتَ قَالَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ النِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنْبُكَ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার উপর অধিকহারে দুরূদ পড়ি। আমি কি পরিমাণ সময় দুরূদ পাঠ করবো? তিনি বললেন, যা তুমি চাও। আমি বললাম চার ভাগের একভাগ? তিনি বললেন, যা তুমি চাও,তবে যদি ইচ্ছে কর, আরো বেশী সময় নির্ধারণ কর তা তোমার পক্ষে কল্যাণকর হবে। আমি

৪০১. আফযালুস সালাত, পৃষ্ঠা–২৮, সূত্র: মাওয়ায়েযে রেজভীয়্যা, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা–৫৬

৪০২. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), জযবুল কুলূব, ফার্সী, পৃষ্ঠা-২৫০, উর্দু, পৃষ্ঠা–২৬৬ এবং আব্দুর রহমান সফুরী (র.) (৮৯৪ হি), নুযহাতুল মাজালিস, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা–৯৪

বললাম, তাহলে কি অর্ধেক? তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছে, তবে যদি আরো বেশী কর, তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, তাহলে কি তিনভাগের দুইভাগ? তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছে। তবে আরো বেশী কর তা তোমার পক্ষে কল্যাণকর হবে। তখন আমি বললাম, তাহলে পুরো সময়ই আপনার উপর দুরূদ পাঠের জন্য নির্ধারণ করলাম। রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন, তাহলে তুমি বালা-মুছিবত থেকে মুক্তি পাবে এবং তোমার গুনাহ মাফ করা হবে।[৪০৩]

উক্ত হাদিস শরীফ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কত বেশী সময় ধরে রাসূল ﷺ'র উপর দুরূদ পাঠ করতে হয়। নির্ধারিত ফরয-ওয়াজিব ও অত্যাবশ্যকীয় ইবাদতের পর বাকী পুরো সময়ে দুরূদ পাঠে নিয়োজিত থাকা বান্দার জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর।

উদ্দেশ্য সফলের জন্য দুরূদ পাঠ

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে– مَنْ عَسَرَتْ عَلَيْهِ حاجةٌ فَلْيُكْثِرْ من الصَّلوة فَاِنَّهَا تُكْشِفُ الهمومَ والفَمُوْمَ والكَرْبَ وُتُكْثِرُ الاَرْزَاقَ وَتُقْضِى الحَوَائِجَ যার উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না সে যেন অধিক সংখ্যায় দুরূদ পাঠ করে। নিশ্চয় দুরূদ শরীফ দুঃচিন্তা ও দুঃখ-দুদর্শা দূরীভূত করে, রিযিক বৃদ্ধি করে এবং প্রয়োজন পূরণ করে।[৪০৪]

দুরূদ শরীফ আল্লাহর নৈকট্য লাভের উসিলা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً কিয়ামত দিবসে আমার সবচেয়ে নিকটে হবে ঐসব লোক যারা আমার উপর বেশী দুরূদ শরীফ পাঠ করেছে।[৪০৫]

শায়খ আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে রাওয়াদ সূফী মুহাদ্দিস স্বীয় কিতাবে এবং শায়খ মজদ উদ্দিন ফিরোজাবাদী স্বীয় সূত্রে বর্ণনা করেন, আকনসী বর্ণনা করেন যে, একদিন হযরত শিবলী (র.) হযরত আবু বকর (রা.)'র নিকট তাশরীফ আনেন। আবু বকর তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে কুলাকুলি করেন এবং তাঁর কপালে চুমু দেন। আমি বললাম, হে আমার সর্দার! আপনি শিবলীর সাথে এরূপ আচরণ কেন করলেন? অথচ আপনি এবং বাগদাদের অধিবাসীরা তাকে মজনুন তথা পাগল হিসাবে জানে। উত্তরে তিনি বললেন, আমি নিজের পক্ষ থেকে তা করিনি বরং নবী করিম ﷺকে স্বপ্নে যেরূপ করতে দেখেছি আমিও অনুরূপ করেছি। আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, হযরত শিবলী (র.)

৪০৩. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি), সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা–৮৬, হাদিস নং–৮৬৭

৪০৪. আফযালুস সালাত, পৃ-২৮, সূত্র: মাওয়ায়েযে রেজভীয়্যা, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা–৬৩

৪০৫. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি), তিরমিযী, মিশকাত, পৃ-৮৬, হাদিস নং-৮৬১

রাসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলেন আর রাসূল ﷺ উঠে তাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু দিলেন। আমি আরয করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনি শিবলীর সাথে এরূপ আচরণ কেন করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, সে নামাযের পর এই আয়াতখানা তিলাওয়াত করত– لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ এরপর আমার উপর দুরূদ পাঠ করত।[৪০৬]

ইমাম সাখাবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবনে মতরফ (রা.) শয়নের পূর্বে সর্বদা নির্দিষ্ট সংখ্যক দুরূদ শরীফ পাঠ করতেন। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, নবী করিম ﷺ তার গৃহে তাশরীফ এনেছেন এবং স্বীয় অপরূপ সৌন্দর্যে তার গৃহকে আলোকিত করেছেন। তিনি তাকে বললেন, যে মুখে তুমি দুরূদ পাঠ করতে তা আমার নিকট নিয়ে এসো যাতে আমি তথায় চুমু দিতে পারি। তাঁর এ বাণী শুনে আমি লজ্জাবোধ করলাম যে, আমি আমার অযোগ্য মুখ তাঁর সামনে নিয়ে যাবো। তাই আমি আমার চেহারাকে তাঁর নিকটে নিয়ে যাই আর তিনি আমাকে চুমু দেন। আমি যখন জাগ্রত হই, তখন আমার পুরো ঘর মিশক আম্বরের সুগন্ধিতে পূর্ণ ছিল। আটদিন পর্যন্ত আমার চেহারা ও ঘরে উক্ত সুগন্ধি বিদ্যমান ছিল।[৪০৭]

হযরত কা'ব আহবার (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ.)কে ওহী প্রেরণ করেন– হে মুসা! পৃথিবীতে যদি আমার প্রশংসাকারী কেউ না থাকে তবে আমি পৃথিবীতে এক বিন্দু বৃষ্টিও বর্ষণ করবোনা, একটি দানাও উৎপন্ন করবোনা। এভাবে আরো অনেক কিছু উল্লেখ করার পর এরশাদ করলেন, হে মুসা! তুমি কি কামনা কর তোমার কথা তোমার মুখের চেয়ে, তোমার মনের কল্পনা তোমার হৃদয়ের চেয়ে, তোমার রূহ তোমার শরীরের চেয়ে এবং তোমার দৃষ্টিশক্তি তোমার চোখের চেয়ে যতটুকু কাছে আমি তার চেয়েও তোমার অধিক কাছে হই? হযরত মুসা (আ.) আরয করলেন, হ্যাঁ। হে আল্লাহ! অবশ্যই কামনা করি। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, তাহলে তুমি বেশী পরিমাণে হযরত মুহাম্মদ ﷺ'র উপর দুরূদ শরীফ পাঠ কর। তবেই তোমার এ নৈকট্য অর্জিত হবে।[৪০৮]

দুরূদ শরীফ দ্বারা রাসূল ﷺ'র সুপারিশ নসীব হয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন–مَنْ صَلَّى عَلَيَّ او سَأَلَ لِيْ الوَسِيْلَةَ حَقَّتْ عَلَيْهِ شفاعَتِيْ يَوْمَ القِيَامَةِ যে ব্যক্তি

৪০৬. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), জযবুল কুলূব, ফার্সী, পৃষ্ঠা-২৫০,উর্দু, পৃষ্ঠা-২৬৫
৪০৭. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), জযবুল কুলূব, উর্দু পৃষ্ঠা-২৬৫
৪০৮. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), জযবুল কুলূব, উর্দু পৃষ্ঠা-২৬৬

আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে অথবা আমাকে উসিলা বানাবে কিয়ামতের দিন তার উপর আমার শাফায়াত আবশ্যক হবে।[৪০৯]

হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন–مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِينَ يُمْسِي عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ যে ব্যক্তি আমার উপর সকালে দশবার ও বিকেলে দশবার দুরূদ পাঠ করবে সে কিয়ামত দিবসে আমার শাফাআত পাবে।[৪১০]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে হযরত সুফিয়ান (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) একদিন বাইতুল্লাহ তাওয়াফে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে তাওয়াফ অবস্থায় প্রতি কদমে দুরূদ শরীফ পাঠ করছে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তুমি তাওয়াফ অবস্থায় তাসবীহ-তাহলীল ও দোয়ায়ে মাছুরা বাদ দিয়ে শুধু দুরূদ শরীফ কেন পড়ছ? এ ব্যাপারে কি তোমার কাছে কোন দলীল-প্রমাণ আছে? সে বলল, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন,আগে বলুন আপনি কে? আমি বললাম, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস। লোকটি বলল, যদি আপনি বিশেষ কোন ব্যক্তি না হতেন তাহলে আমি আমার অবস্থার কথা বলতাম না বরং গোপন রাখতাম। অতঃপর সে বলল, একদিন আমি আমার পিতাকে নিয়ে হজ্বের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলাম। পথিমধ্যে এক জায়গায় অবস্থান করলাম। সেখানে আমার পিতা অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করলাম তাঁর খেদমত করতে ও তাঁকে বাঁচাতে। কিন্তু তাকদীর তদবীরের উপর অগ্রগামী হল। তিনি ইন্তিকাল করলেন আর তাঁর চেহারা কালো বর্ণের হয়ে গেল। অন্য বর্ণনায় গাধার ন্যায় হয়ে গেল। আমি পিতার চেহারায় চাদর দিয়ে ঢেকে দিলাম এবং এই চিন্তায় আমার তন্দ্রা এসে গেল। স্বপ্নে দেখলাম অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট শুভ্র পোশাক পরিধানকৃত এবং সুগন্ধিযুক্ত এক ব্যক্তি ধীরগতিতে আমার পিতার নিকট আগমন করলেন। তিনি আমার পিতার চেহারা থেকে চাদর তুলে স্বীয় হাত বাড়িয়ে পিতার চেহারায় মালিশ করেন। ফলে আমার পিতার চেহারা উজ্জ্বল ও শুভ্র হয়ে গেল। এরপর তিনি চলে যেতে লাগলেন। আমি দৌঁড়ে গিয়ে তাঁর আচল ধরে বললাম, জনাব! হে আল্লাহর মকবুল বান্দা! আপনি কে? এই অজানা-অচেনা জনপদে আমার পিতার সাহায্য করার জন্য আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, তুমি কি আমাকে চিনতে পারনি? আমি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, যাঁর উপর কুরআন নাযিল হয়েছিল। নিঃসন্দেহে

৪০৯. কাযী আবু ইসহাক (র.) (২৮২ হি), ফযলুস সালাত আলান নবীয়্যি, পৃ-৫০, হাদিস নং-৫১
৪১০. হযরত আবু বকর ইবনে আসেম (র.) (২৮৭ হি), কিতাবুস সালাত আলান নবীয়্যি, পৃ-৬১, হাদিস নং-৪৮

তোমার পিতা সারা জীবন নিজের উপর (গুনাহের দ্বারা) যুলুম করেছে এবং আল্লাহর নাফরমানীতে রত ছিল তবে আমার উপর বেশী করে দুরূদ পাঠ করত। মৃত্যুর পর যখন আযাবে লিপ্ত হল তখন আমার নিকট ফরিয়াদ করেছে। তাই আমি তার সাহায্যের জন্য এসেছি। যে আমার উপর দুরূদ পড়ে আমি অবশ্যই তাকে সাহায্য করি। অতঃপর আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল আমি চোখ খুলে দেখি আমার পিতার চেহারা চাঁদের চেয়ে বেশী আলোকিত ও নুরানী হয়ে গেল।[৪১১]

দুরূদ শরীফ পাঠ হজ্ব ও জিহাদ থেকে উত্তম

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইসলাম নির্দেশিত হজ্ব করার পর একটি ইসলামী জিহাদ করে, তবে তা চারশ হজ্বের সমান সাওয়াব হবে। তাঁর এ বাণী শ্রবণের পর যাদের হজ্ব ও জিহাদ করার সামর্থ ছিলনা তাদের অন্তর ভেঙ্গে পড়ল। আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে নবী করিম ﷺ'র নিকট ওহী প্রেরণ করেন, যে ব্যক্তি আপনার উপর দুরূদ পাঠ করবে, সে চারশ জিহাদের সাওয়াব পাবে। আর প্রত্যেক জিহাদ চারশ হজ্বের সমান হবে।[৪১২]

দুরূদ পাঠের দ্বারা অন্তর নিফাক মুক্ত হয়

'মাজালিসে মক্কীয়া' নামক গ্রন্থে আবুল মোজাফ্ফর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ খৈয়াম সমরকন্দী বলেন, একদিন আমি পথ হারিয়ে গেলে হঠাৎ একজন লোক দেখলাম। লোকটি আমাকে তার সাথে চলতে বললে আমি তার সাথে চললাম। আমার মনে হল যে, তিনি সম্ভবত হযরত খিজর (আ.) হবেন, যিনি হারিয়ে যাওয়া পথিককে রাস্তা দেখান এবং মনযিলে মকসুদে পৌঁছিয়ে দেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নাম কি? উত্তরে বললেন, খিজর ইবনে ঈসা আবুল আব্বাস। আমি তার সাথে আরো একজনকে দেখতে পাই। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নাম কি? উত্তরে বলেন, আমার নাম ইলিয়াস ইবনে শাম। এরপর উভয়কে সম্বোধন করে বললাম, আল্লাহ তায়ালা আপনাদের উপর রহমত নাযিল করুন, আপনারা কি মুহাম্মদ ﷺকে দেখেছেন? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, দেখেছি। আমি আরয করলাম আপনারা আমাকে ঐসব কথা শুনান যা আপনারা রাসূল ﷺ থেকে শুনেছেন যাতে আমি আপনাদের থেকে অন্যদেরকে বর্ণনা করতে পারি। তাঁরা বললেন, আমরা রাসূল ﷺকে এরশাদ করতে শুনেছি– مَنْ صَلَى عَلَيَّ طَهَّرَ اللهُ قَلْبَهُ مِنَ النِفَاقِ كَمَا يُطَهِّرُ الثَّوْبَ المَاءُ যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তার অন্তরকে নিফাক থেকে এমনভাবে পবিত্র করবেন যেভাবে পানি কাপড়কে পবিত্র করে।[৪১৩]

---

৪১১. আফযালুস সালাত,পৃ-৫৬, আব্দুর রহমান সফুরী (র.) (৮৯৪ হি), নুযহাতুল মাজালিস, পৃ-৮৯, আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), জযবুল কুলূব, ফার্সী,পৃ-২৫৩

৪১২. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), জযবুল কুলূব, উর্দু পৃষ্ঠা-২৬৭

৪১৩. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), জযবুল কুলূব, উর্দু পৃষ্ঠা-২৬৭

দুরূদ শরীফ দ্বারা পরকালে মুক্তি লাভ

হযরত উবাদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমার প্রতিবেশী একজন কাতেব তথা হাদিস লিখক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখি এবং জিজ্ঞেস করি, আল্লাহ তায়ালা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, কি কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেন, যখন আমি রাসূল ﷺ'র নাম লিখতাম সাথে ﷺও লিখতাম।

হযরত আবু আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে একজন সূফী ব্যক্তি বলেছেন, তাঁর এক বন্ধু ছিল। যখন সে মৃত্যুবরণ করল, তখন তাকে আমি স্বপ্নে দেখি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি যে, আল্লাহ তায়ালা তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? উত্তরে বলল, আমি হাদিস শরীফ লিখার সময় রাসূল ﷺ'র নাম মোবারক আসলে আমি ﷺ লিখতাম। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রা.) থেকে বর্ণিত, আমাকে সাহেবে খালকানের ছেলে বর্ণনা করেছেন যে, আমার এক বন্ধু ছিল, যে আমার সাথে হাদিস শরীফ লিখত। যখন সে মারা গেল, আমি তাকে স্বপ্নে দেখি যে, সে নতুন সবুজ কাপড় পরিধানরত অবস্থায় বসে আছে। আমি বললাম হে বন্ধু! তোমার একি অবস্থা? সে বলল, হাদিস শরীফ লেখার সময় যখন রাসূল ﷺ'র নাম আসতো আমি দুরূদ শরীফ লিখতাম। তাই এর বিনিময়ে আমাকে সম্মানিত পোশাক পরিধান করা হয়েছে।[৪১৪]

বর্ণিত আছে যে, একজন লোক অপর একজন লোককে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করেন যে, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? এবং কোন আমলের কারণে আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন? লোকটি বলল, আমি যখনই রাসূল ﷺ'র নাম মোবারক লিখতাম, তার সাথে নিশ্চয় 'ﷺ' বাক্যটি লিপিবদ্ধ করতাম। যার বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আরো বর্ণিত আছে যে, কোন এক ব্যক্তি ইমাম শাফেঈ (র.)কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ আমার উপর দয়া করেছেন এবং আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। নতুন দুলহার ন্যায় আমাকে জান্নাতে নিয়ে গিয়েছেন। আমাকে মণি-মুক্তা উৎসর্গ করা হয়েছে,যেভাবে নতুন দুলহাকে করা হয়। এর কারণ হল, যখনই আমি কোন কিতাব লিখতাম তখন বলতাম, صَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَعَدَدَ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الغَافِلُوْنَ[৪১৫]

---

৪১৪. হাশিয়ায়ে দালায়েলুল খায়রাত, দিল্লী, পৃষ্ঠা-২৭

৪১৫. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), জযবুল কুলূব, উর্দু পৃষ্ঠা-২৭৬

দুরূদ শরীফ পাঠ দ্বারা দীদারে মুস্তফা নসীব হয়

প্রত্যেক আশেকে রাসূল ﷺ কামনা করে যে, জীবনে অন্তত একবার হলেও প্রাণপ্রিয় রাসূল ﷺ'র দীদার লাভে ধন্য হওয়া। বাস্তবে হোক কিংবা স্বপ্নে হোক। কেননা স্বপ্নে নবীকে দেখা বাস্তবে দেখার ন্যায়। কারণ শয়তান রাসূল ﷺ'র আকৃতি ধারণ করতে অক্ষম। তাছাড়া হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখবে অচিরেই সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায়ও দেখবে। আর রাসূল ﷺ'র দীদার লাভের সর্বোত্তম উপায় হল বেশী করে দুরূদ পাঠ করা। ওলামায়ে কিরাম তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে নিম্নোক্ত দুরূদ শরীফ পাঠের কথা বলেছেন–

(الف) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَسَلِّمْ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهُ (ب) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلي رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِي الاَرْوَاحِ ، اَللهُمَّ صَلِّ عَلَي جَسَدِهِ فِي الاجْسَادِ ، اَللهُمَّ صَلِّ عَلى قَبْرِه فِي القُبُور (ج) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدِ النَّبِيّ الاُمِّيِّ .

প্রথম ও দ্বিতীয় দুরূদ শরীফটি উযূ সহকারে পাক-পবিত্র হয়ে নিষ্ঠার সাথে অধিকহারে পাঠ করলে উদ্দেশ্য সাধিত হয়। 'মাফাখিরুল ইসলাম' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, জুমার দিন নিম্নোক্ত দুরূদ শরীফ এক হাজার বার পাঠ করলে ইনশাল্লাহ দীদারে মুস্তফা লাভ হবে এবং মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতের দর্শন লাভ করবে। যদি প্রথম বার দীদার লাভ না হয় তাহলে লাগাতার পাঁচ জুমা পর্যন্ত উক্ত দুরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকবে। এর মধ্যে ইনশাল্লাহ অবশ্যই উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। দুরূদ শরীফ খানা হল– اَللهُمَّ صَلِّ عَلى قَبْرِه فِي القُبُور যে ব্যক্তি জুমার রাতে এভাবে দু'রাকাত নামায পড়ে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর এগার বার আয়াতুল কুরসী এবং এগার বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে আর সালাতের পর اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدِ النَّبِيّ الاُمِّيِّ وَالِهِ وَسَلِّمْ পড়বে তবে রাসূল ﷺকে স্বপ্নে দেখবে। যদি প্রথমবার নসীব না হয় তবে অবশ্যই তৃতীয়বার দীদার নসীব হবে। অনেক সুফীয়ায়ে কিরামের অভিজ্ঞতা রয়েছে এব্যাপারে। এরূপ আরো অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।[৪১৬]

হযরত খিজর (আ.) ও হযরত ইলিয়াস (আ.) বলেন, এক ব্যক্তি সিরিয়া থেকে রাসূল ﷺএর খেদমতে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা আপনার সাক্ষাতের জন্য আগ্রহী কিন্তু তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ। আপনার দরবারে উপস্থিত হওয়ার শক্তি নেই। রাসূল ﷺ বললেন, তোমার পিতাকে বল, তিনি যেন এক সপ্তাহ যাবৎ রাতে صَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ পাঠ করে। তাহলে আমাকে স্বপ্নে দেখবে। আরো বলবে তিনি আমার থেকে

[৪১৬]. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), জযবুল কুলূব, উর্দু পৃ. ২৭৬-৭৭

এ হাদিসখানা রেওয়ায়েত করেন। তিনি এরূপ করেন এবং রাসূল ﷺকে স্বপ্নে দেখেন আর হাদিসখানাও রেওয়ায়েত করেন।[৪১৭]

দুরূদ শরীফ পাঠ দ্বারা প্রয়োজন পূরণ হয়

মাফাখিরুল ইসলাম গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي لَيْلَةِ الجُمُعَةِ مِائةُ صَلواةٍ قَضَى اللهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِيْنَ حَاجَةً مِن اُمُوْر الدُّنْيَا وَثَلاَثِيْنَ مِنَ اُمُوْرِ الاخِرَةِ যে ব্যক্তি জুমার রাতে আমার উপর একশবার দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তার একশটি প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন। সত্তরটি দুনিয়াবী প্রয়োজন আর ত্রিশটি পরকালীন প্রয়োজন।[৪১৮]

দুরূদ পাঠকারী গরীব হয় না

মাফাখিরুল ইসলাম কিতাবে বর্ণিত আছে যে, হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الخَمِيْسِ مِائَةَ مَرَّةً لَمْ يَفْتَقِرْ اَبَدًا যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবারে আমার উপর একশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে কখনো গরীব হবে না।[৪১৯]

দুরূদ পাঠের বরকতে ঋণ পরিশোধ হয়

বর্ণিত আছে যে, একজন সৎ ব্যক্তির তিন হাজার দীনার ঋণ হয়। মহাজন লোকটির ব্যাপারে কাযীর দরবারে নালিশ দেয়। কাযী তাকে ঋণ আদায়ের জন্য এক মাস সময় দেন। লোকটি এসে মসজিদের মেহরাবের নিকটে গিয়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করেন এবং রাসূল ﷺ'র উপর দুরূদ পাঠে নিমগ্ন হন। সাতাশ দিনের রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, একলোক তাকে বলছেন, আল্লাহ তোমার ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করবেন। তুমি আলী ইবনে ঈসা উজীরের কাছে গিয়ে বল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ'র নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি আমার তিন হাজার দিনার ঋণ পরিশোধ করে দিন। লোকটি বলেন, যখন আমি জাগ্রত হই, তখন আমার মন প্রফুল্ল ছিল। কিন্তু যখন উজীর মহোদয় প্রশ্ন করবেন তোমার একথার সত্যতার প্রমাণ কি? তবে আমি তাঁকে কি বলবো? এ কথা ভেবে আমি আর তাঁর কাছে গেলাম না। পরবর্তী রাতে আমি আবারো রাসূল ﷺকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি উজীরের কাছে যাওনি কেন? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ আশংকায় যাইনি যে, তিনি যদি আমার কাছে এ কথার সত্যতার প্রমাণ চায় তবে আমি কি উত্তর দেবো? রাসূল ﷺ আমার এ মনোভাব পছন্দ করলেন এবং বললেন, যদি উজীর তোমার সত্যতার প্রমাণ তলব করে, তবে তুমি তাকে বলবে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, তুমি ফজরের নামাযের পর লোকজনের সাথে কথা-

[৪১৭]. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), জযবুল কুলূব, উর্দু পৃ-২৬৮
[৪১৮]. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), জযবুল কুলূব, উর্দু পৃ-২৭৩
[৪১৯]. প্রাগুক্ত, পৃ-২৭৪

বার্তায় লিপ্ত হওয়ার আগে পাঁচ হাজার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে আমার নিকট প্রেরণ করে থাক। তোমার এ আমলের কথা আল্লাহ তায়ালা এবং কেরামন কাতেবীন ব্যতীত আর কেউ অবহিত নয়। এরপর আমি উজীরের নিকট গিয়ে স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করলাম এবং রাসূল ﷺ কর্তৃক বাতলিয়ে দেয়া নিদর্শনও বললাম। এতে উজীর খুবই খুশি হন এবং বলে উঠলেন রাসূল ﷺ'র দূতকে স্বাগতম। অতঃপর তিনি তিন হাজার দীনার আমাকে দিয়ে বললেন, এগুলো দিয়ে তোমার ঋণ পরিশোধ কর। আরো তিন হাজার দিয়ে বললেন এগুলো নিজের পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় কর। পরে তিনি আরো তিন হাজার দীনার দিয়ে বললেন, এগুলো দিয়ে তুমি ব্যবসা কর। এরপর তিনি আমাকে শপথ করালেন যে, ভবিষ্যতে যেন এই ভালবাসার সম্পর্ক ছিন্ন না করি। আর বললেন যখনই কোন প্রয়োজন দেখা দিবে সোজা আমার নিকট চলে আসবে। আমি সাধ্য মতে তোমার প্রয়োজন পূরণের সর্বাত্মক চেষ্টা করবো। আমি তিন হাজার দিনার নিয়ে কাযীর কাছে গেলাম ঋণ আদায় করার জন্য। এ সময় দেখলাম ঋণদাতা হতভম্ব অবস্থায় কাযীর দরবারে এসেছে। আমি দীনার গুণে তাদের সামনে পেশ করলাম এবং সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বললাম। কাযী সাহেব ঘটনা শুনে বললেন, এই সৌভাগ্য শুধু কাযী সাহেব কেন গ্রহণ করবেন? এই ঋণ তোমার পক্ষ থেকে আমিই পরিশোধ করে দেবো। ঋণদাতা বলল, এই সৌভাগ্য অর্জনের আমিই বেশী হকদার। আমি আপনাকে এই ঋণ থেকে মুক্ত করে দিলাম। কাযী সাহেব বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য যা বের করেছি তা ফেরত নেবো না। তা আমি তোমাকেই দিয়ে দিলাম। সৎ লোকটি বললেন, আমি গমনদয় দীনার নিয়ে ঘরে প্রত্যাবর্তন করলাম আর আল্লাহ তায়ালার অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। দুরূদ পাঠের বদৌলতে লোকটি বার হাজার দীনার নিয়ে এবং কর্জমুক্ত হয়ে ঘরে ফিরে গেলেন।[৪২০]

দুরূদ শরীফ দ্বারা গীবত থেকে মুক্তিলাভ

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যখন তুমি কোন মজলিসে বসে বল بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ তবে আল্লাহ তায়ালা একজন ফেরেশ্‌তা নিয়োগ করে দেন, যিনি তোমাকে গীবত করা থেকে বিরত রাখেন। আর যদি তুমি মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার সময় বল بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ তবে আল্লাহ তায়ালা লোকজনকে তোমার গীবত করা থেকে বিরত রাখবেন।[৪২১]

দুরূদ পাঠের দ্বারা ফেরেশ্‌তাদের ইমামতি করার ফযিলত

আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব জামউল জাওয়ামে নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেন যে, ইবনে আসাকের স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে হাফস ইবনে আব্দুল্লাহ

৪২০. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), জযবুল কুলূব, উর্দু পৃ-২৭০
৪২১. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), জযবুল কুলূব, উর্দু পৃ-২৬৮

(র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু যুরআ (আ.)কে তাঁর ইন্তেকালের পর স্বপ্নে দেখি, তিনি আসমানে ফেরেশ্‌তাদের ইমামতি করছেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এত উচ্চ মর্যাদা কিভাবে লাভ করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি স্বহস্তে সহস্র হাদিস লিখেছি আর প্রত্যেক হাদিস লিখার সময় عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ পড়তাম ও লিপিবদ্ধ করতাম। (তাই এই মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়েছি)[৪২২]

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِيْ كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ اِسْمِي فِيْ الْكِتَابِ যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তবে যতদিন পর্যন্ত কিতাবে আমার নাম থাকবে ততদিন যাবৎ ফেরেশ্‌তারা তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবে ।[৪২৩]

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি কার্পন্যতা করে রাসূল ﷺএর নাম মুবারকের সাথে ﷺ লিখত না। তার হাতে এমন রোগ হল যাতে তার হাতে পচন ধরল। অবশেষে হাত ঝলসে গেল। অপর ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, সে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি' পর্যন্ত লিখত 'ওয়াসাল্লাম' লিখত না। রাসূল ﷺ স্বপ্নে তাকে ধমক দিয়ে বলেন, তুমি কেন চল্লিশটি নেকী থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছ? অর্থাৎ وَسَلَّمَ শব্দে চারটি বর্ণ আছে। প্রতি বর্ণে দশটি করে মোট চল্লিশটি নেকী হয়। আবার কেউ কেউ সংক্ষেপে صلعم ও ص– م আর আলাইহিস সালামের স্থলে ع লিখে। এগুলোও ধমক ও নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।[৪২৪]

দুরূদ পাঠকারীর জন্য সমগ্র সৃষ্টির দোয়া

হযরত আমর ইবনে দীনার থেকে বর্নিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কোন বান্দা নিষ্ঠা ও মুহাব্বতের সহিত আমার উপর দুরূদ পাঠ করলে ঐ দুরূদ শরীফ তার মুখ থেকে বের হয়ে দ্রুত পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত জল ও স্থলে ভ্রমণ করে আর উচ্চস্বরে আওয়ায করে বলে আমি সেই দুরূদ শরীফ যাকে অমুকের ছেলে অমুক নিষ্ঠার সাথে মুহাম্মদ ﷺ'র উপর পাঠ করেছে। অতঃপর পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তু ঐ ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত ও রহমতের জন্য দোয়া করে। তারপর আল্লাহ তায়ালা ঐ দুরূদ থেকে একটি পাখি সৃষ্টি করেন, যার সত্তর হাজার পাখা থাকবে আর প্রত্যেক পাখাতে সত্তর হাজার পালক থাকবে। প্রত্যেক পালকে সত্তর হাজার মস্তক থাকবে, প্রত্যেক

৪২২. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), জযবুল কুলূব, উর্দু পৃ-২৬৯
৪২৩. কাযী আয়ায(র) (৫৪৪হি), শেফা শরীফ, খণ্ড-২, পৃ-৫৭ ও আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) (১০৫২হি), জযবুল কুলূব, উর্দু, পৃ-২৫৭
৪২৪. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), জযবুল কুলূব, উর্দু পৃ-২৭৬

মস্তকে সত্তর হাজার চেহারা থাকবে, প্রত্যেক চেহারায় সত্তর হাজার মুখ থাকবে, প্রত্যেক মুখে সত্তর হাজার জিহ্বা থাকবে আর প্রত্যেক জিহ্বায় সত্তর হাজার ভাষা থাকবে। প্রত্যেক ভাষায় কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর তাসবীহ, তাহলীল পাঠ করতে থাকবে। আর এগুলোর সাওয়াব দুরূদ পাঠকারী পেতে থাকবে। আর সেই পাখিটি মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করেছে তাকে ক্ষমা করে দিন।[৪২৫]

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তা দ্বারা একজন ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করেন। যার একটি পাখা পশ্চিম প্রান্তে আর একটি পাখা পূর্ব প্রান্তে। তার পা মাটির সাত স্তর নিচে আর মাথা আল্লাহর আরশের সাথে সংযুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে ফেরেশ্‌তা, তুমি দুরূদ পাঠকারী আমার বান্দার জন্য রহমতের দোয়া কর, যেভাবে সে আমার সম্মানিত মুহাম্মদ ﷺ'র উপর দুরূদ প্রেরণ করেছে। আর ঐ ফেরেশ্‌তা কিয়ামত পর্যন্ত সেই ব্যক্তির জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকবে।[৪২৬]

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, আসমানে একটি নদী আছে যাকে বরকত বলা হয়। এর পাশে একটি দাহইয়া নামক বৃক্ষ রয়েছে এবং ঐ বৃক্ষে সালাত নামক একটি মোরগ আছে, যার অসংখ্য পালক রয়েছে। যখন কোন মু'মিন বান্দা শা'বান মাসে রাসূল ﷺ'র উপর দুরূদ প্রেরণ করে তখন ঐ মোরগ নদীতে ডুব দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং সেই বৃক্ষে বসে পালকসমূহ ঝাড়া দেয়। আল্লাহ তায়ালা পালক থেকে ঝড়ে পড়া প্রতি ফোঁটা পানি থেকে এক একজন ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করেন। তাঁরা আল্লাহর গুণকীর্তনে সর্বদা লিপ্ত থাকে আর এগুলোর সাওয়াব ঐ বান্দার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়।[৪২৭]

রাসূল ﷺ ও জিব্রাইল (আ.)'র বদদোয়া থেকে পরিত্রাণ লাভ

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ অপদস্থ হোক সে ব্যক্তি, যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, অথচ সে আমার উপর দুরূদ পাঠ করে নি। অপদস্থ হোক সে ব্যক্তি যার কাছে মাহে রমযান এসে তা গুনাহ মাফের পূর্বেই চলে গিয়েছে। অপদস্থ হোক সে ব্যক্তি যার কাছে তার পিতা-মাতা অথবা তাঁদের একজন

---

৪২৫. তাযকেরাতুল ওয়ায়েজীন, পৃ-৮৭, সূত্রঃ মাওয়ায়েযে রেজভীয়া, খণ্ড-৬, পৃ-৬৮
৪২৬. প্রাগুক্ত ও হাশিয়ায়ে দালায়েলুল খায়রাত, পৃ-৯১
৪২৭. হাঁশিয়ায়ে দালায়েলুল খায়রাত, দিল্লী, পৃ-২০২

বার্ধক্যে উপনীত, অথচ তাকে তারা বেহেশতে পৌঁছায়নি। অর্থাৎ তাঁদের সেবা করে জান্নাত লাভ করতে পারে নি।[৪২৮]

অপর হাদিসে আছে রাসূল ﷺ একদিন মিম্বরে আরোহণ করার সময় প্রথম মিম্বরে উঠে আমীন বললেন, এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মিম্বরে উঠে আমীন বললেন। হযরত মুয়ায (র.)এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন– اِنَّ جِبْرِئِيْلَ اَتَانِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَن سَمِّيْتَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُصَلِّي عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارِ ، فَاَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ امِيْن فَقُلْتُ امِيْن وَقَالَ فمن اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ فَمَاتَ مِثْلُ ذَالِكَ وَمَنْ اَدْرَكَ اَبوَيْهِ اَوْ اَحَدُ هُمَا فَلَمْ يَبْرَهُمَا فَمَاتَ مِثْلُهُ হযরত জিব্রাইল (আ.) এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! যার সামনে আপনার নাম নেওয়া হবে আর সে আপনার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করবেনা, অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। আপনি আমীন বলুন। অতঃপর আমি আমীন বললাম।[৪২৯]

যে দুরূদ পাঠ করেনা সে বড় কৃপণ

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– اَلْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ সে ব্যক্তি প্রকৃত কৃপণ যার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হবে আর সে আমার উপর দুরূদ পড়ে না।[৪৩০]

হযরত আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– اِنَّ اَبْخَلَ النَّاسِ مَن ذُكِرْتُ عِنْدَه فَلَمْ يُصَلِّى عَلَيَّ সবচেয়ে বড় কৃপণ ব্যক্তি হল যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হয়েছে অথচ আমার উপর দুরূদ পাঠ করে না।[৪৩১]

হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- كَفى بِه شُحًّا اَنْ يَذْكُرَنِى قَوْمٌ فَلاَ يُصَلُّوْنَ عَلَيَّ কৃপণ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, কোন জাতি আমার স্মরণ করল অথচ আমার উপর দুরূদ পাঠ করলনা।[৪৩২]

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে কিয়ামত দিবসে আমার সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত হবে। হযরত আয়েশা (রা.) আরয করলেন– সে হতভাগা কে? রাসূল ﷺ বললেন, কৃপণ ব্যক্তি। হযরত আয়েশা (রা.)

---

৪২৮. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি), তিরমিযী শরীফ, সূত্রঃ মিশকাত, পৃষ্ঠা-৮৬, হাদিস নং-৮৬৫
৪২৯. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি), তিরমিযী শরীফ, সূত্রঃ শেফা শরীফ, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-৫৭
৪৩০. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি), তিরমিযী শরীফ, সূত্রঃ মিশকাত, পৃষ্ঠা-৮৬, হাদিস নং-৮৬৫ ও কাযী আয়ায (৫৪৫ হি), শেফা শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৭
৪৩১. কাযী আবু ইসহাক (র.) (২৮২ হি), ফযলুস সালাত আলান নবীয়্যি,পৃ-৩৭, হাদিস নং-৪৫
৪৩২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯, হাদিস নং-৪৫

পুনরায় আরয করলেন কোন ধরনের কৃপণ লোকের কথা বলেছেন আপনি? উত্তরে তিনি বললেন– এমন কৃপণ ব্যক্তি যার সম্মুখে আমার নাম নেওয়া হবে অথচ সে আমার উপর দুরূদ পাঠ করবেনা।[৪৩৩]

অপর একটি বর্ণনায় আছে নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّي عَلَيَّ فَقَدْ شَقِيَ যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হবে আর আমার উপর দুরূদ পাঠ করবেনা নিশ্চয় সে বড় হতভাগা।[৪৩৪]

দুরূদ শরীফ দ্বারা মাহর আদায়

হযরত আদম (আ.) একাকীত্ব দূরীভূত হওয়ার জন্য আরযু করতেন যে, যদি আমার কোন সঙ্গী হতো, তাহলে তার সাহচর্যে কালাতিপাত করতে পারতাম। আল্লাহ তায়ালা তাঁর উপর দয়া পরবশ হয়েছেন। ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর বাম পাঁজর থেকে হযরত হাওয়া (আ.)কে সৃষ্টি করেন। তিনি খুবই সুন্দরী ছিলেন এবং সৃষ্টি হওয়া মাত্র শারিরিক গঠন পরিপূর্ণ হয়ে গেল। হযরত আদম (আ.) যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন, তখন দেখলেন যে, তাঁরই পাশে একজন সুশ্রী মহিলা বিদ্যমান। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর আসল ইনি আমার বান্দীনি, নাম তাঁর হাওয়া। তোমার একাকীত্ব দূর করার জন্য আমি তাঁকে সৃষ্টি করেছি। আদম (আ.) তাকে হাত লাগাতে চেয়েছেন। আদেশ আসল, হে আদম! তাকে স্পর্শ করবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর 'মাহর' আদায় করবেনা। আদম (আ.) আরয করলেন এর মাহর কি? হুকুম হল– তার মাহর হল তুমি মুহাম্মদ ﷺ'র উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর দশবার দুরূদ শরীফ প্রেরণ কর। আদম (আ.) আরয করলেন, মুহাম্মদ কে? এরশাদ হল– তিনি হলেন তোমার আওলাদ শেষ যামানার নবী। যদি আমি তাঁকে সৃষ্টি না করতাম তবে তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না। অতঃপর হযরত আদম (আ.) দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবারের উপর প্রেরণ করেন আর ফেরেশ্তারা সাক্ষী হলেন। ফলে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)'র বিবাহ সম্পাদিত হয়।[৪৩৫]

দুরূদ শরীফ পুলসিরাত পারে সহায়ক হয়

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (র.) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূল ﷺ বাইরে তাশরীফ আনলেন এবং এরশাদ করলেন আমি গতরাতে একটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেছি। আমার এক উম্মত পুলসিরাত দিয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পার হওয়ার চেষ্টা

৪৩৩. আল্লামা শা'রানী (র.), কাশফুল গুম্মাহ, পৃষ্ঠা-২৭২ ও আফযালুস সালাত, পৃষ্ঠা-৪৫, সূত্রঃ মাওয়ায়েযে রেজভীয়্যা, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৪

৪৩৪. কাযী আয়ায (৫৪৫ হি) শেফা শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬২ ও মাওয়ায়েযে রেজভীয়্যা, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৪

৪৩৫. হাশিয়ায়ে দালায়েলুল খায়রাত, পৃষ্ঠা-২০৩, সূত্রঃ তাফসীরে ফতহুল আযিয

করছে। এসময় দুরূদ শরীফ যা সে আমার উপর পাঠ করত এসে তার হাত ধরে তাকে সোজা করে নিরাপদে পুলসিরাত পার করে দিল।[৪৩৬]

আল্লাহ তায়ালা একজন ফেরেশ্তা সৃষ্টি করেছেন যার নাম আযরাঈল। কিয়ামতের দিন সেই ফেরেশ্তা স্বীয় পালক পুলসিরাতে বিছায়ে আহবান করবেন, যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ'র উপর দুরূদ প্রেরণ করছে সে যেন আমার পালকে পা রেখে নিরাপদে পুলসিরাত পার হয়ে যায়।[৪৩৭]

দুরূদ শরীফ দ্বারা রোগমুক্তি

জনৈক মুত্তাকী নেক্কার পরহেযগার ব্যক্তি পেশাব আটকে যাওয়া রোগে আক্রান্ত হয়। যার কারণে সীমাহীন কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। একরাতে স্বপ্নে আরেফবিল্লাহ শাহাবউদ্দীন ইবনে আরসালান (র.)'র এর সাথে তার সাক্ষাত হয়। সে তার কাছে বেদনাদায়ক রোগের কথা উল্লেখ করলে তিনি বলেন, আমি তোমাকে একটা দুরূদ শিখিয়ে দিচ্ছি– তুমি তা পড়তে থাক। এটি পরীক্ষিত যে এর পাঠের দ্বারা দ্রুত রোগ মুক্ত হওয়া যায়। দুরূদ শরীফটি নিম্নরূপ– اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوْبِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَجْسَادِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُوْرِ লোকটি ঘুম থেকে জাগ্রত হলে স্বপ্ন মনে পড়ল এবং দুরূদ শরীফটিও স্মরণ ছিল। সে ঐ দুরূদ শরীফ পাঠ আরম্ভ করে দিলে আল্লাহ তায়ালা দুরূদ শরীফের বরকতে দ্রুত আরোগ্য দান করেন।[৪৩৮]

হেকমত

আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদেরকে বলেছেন– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا হে মু'মিনগণ! তোমরা নবী করিম ﷺ'র উপর দুরূদ ও সালাম পেশ কর। অথচ আমরা দুরূদ পাঠ করি এভাবে اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ الخ হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবারের উপর দুরূদ পাঠ করুন। অর্থাৎ আমরা আল্লাহর নিকট আবেদন করছি যে, তিনি যেন দুরূদ পাঠ করেন। এর হেকমত কি? এর উত্তরে বলা হবে যে, আমাদের নবী করিম ﷺ সর্বপ্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত। অথচ আমরা গুনাহগার পাপী। তিনি এতই মহান যে, তাঁর প্রতি দুরূদ প্রেরণের যোগ্যতাও আমাদের নেই। তাই মহান

৪৩৬. মা'আরিজুন নবুয়্যত, সূত্রঃ হাশিয়ায়ে দালায়েলুল খায়রাত, পৃ-৯১

৪৩৭. মা'আরিজুন নবুয়্যত, সূত্রঃ হাঁশিয়ায়ে দালায়েলুল খায়রাত, পৃ-৯৪

৪৩৮. আব্দুর রহমান সফূরী (র.) (৮৯৪ হি), নুযহাতুল মাজালিস, পৃ-৯২, সূত্রঃ মাওয়ায়েযে রেজভীয়্যা, খণ্ড-৬, পৃ-৬৬

নিষ্পাপ আল্লাহর নিকট আবেদন যে, তিনি যেন নিষ্পাপ নবীর উপর দুরূদ প্রেরণ করেন। কারণ নবীর উপর দুরূদ প্রেরণের একমাত্র তিনিই যোগ্য।[৪৩৯]

দুরূদ পাঠের দ্বারা কারামত লাভ

হযরত আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান জযূলী (র.) সুদূর আফ্রিকার মরক্কো থেকে তাঁর শাগরিদদের নিয়ে 'ফাস' শহরের একটি গ্রামে পৌঁছেন। সেখানে জোহরের নামাযের সময় শেষ হতে যাচ্ছে কিন্তু পানি না পাওয়ার কারণে নামায পড়তে পারছেন না। অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটি কূপ পেলেন কিন্তু বালতি ও রশি না থাকার কারণে কূপ থেকে পানি তুলতে পারছেন না। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে কূপের চতুর্দিকে ঘুরতে লাগলেন। সেখানে অল্প দূরে একটি ঘর ছিল। সেখান থেকে আট-নয় বছরের এক বালিকা তাঁর এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিল। সে বলল, হে শায়খ! আপনার চিন্তার কারণ কি? উত্তরে তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান জযূলী। জোহরের নামাযের সময় প্রায় শেষের দিকে কিন্তু পানির অভাবে উযূ করে নামায পড়তে পারছিনা। মেয়েটি বলল, আপনি এত বড় একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ব্যক্তি সামান্য ব্যাপারে অক্ষম হয়ে পড়েছেন? ধৈর্য ধরুন। আমি আসছি। মেয়েটি এসে কূপে থু থু নিক্ষেপ করার সাথে সাথে পানি কূপের উপর উপছে পড়ে প্রবাহিত হতে লাগল। মেয়েটি নিজের ঘরে চলে গেল। শায়খ উযূ করে নামায শেষ করে সোজা ঐ ঘরের দরজায় গিয়ে করাঘাত করলে মেয়েটি বলল, কে? শায়খ বললেন, হে প্রিয় বৎস! তোমাকে সেই খোদার শপথ! যিনি তোমাকে সৃষ্টি করে হেদায়েত করেছেন। তোমাকে আমি আল্লাহ, সকল নবী এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ'র উসিলায় আবেদন করছি যার সুপারিশের তুমি আশা রাখ, আমাকে বল তুমি এই মর্তবা কিভাবে অর্জন করেছ? উত্তরে সে বলল, যদি আপনি এত বড় শপথ না দিতেন তবে কখনো আমি বলতাম না। অমুক দুরূদ শরীফ পাঠের বরকতে আমি এই মর্তবা অর্জন করেছি। তখন শায়খ সেই দুরূদ শরীফ পাঠের অনুমতি এই মেয়ে থেকে নিলেন এবং তখনই তাঁর মনে আগ্রহ জন্মাল যে, এমন একটি কিতাব লিখবেন যাতে উত্তম দুরূদ শরীফসমূহের সমাহার হবে এবং এই মেয়ের বর্ণিত দুরূদও তাতে থাকবে। অতঃপর তিনি 'দালায়েলুল খায়রাত' নামক বিখ্যাত দুরূদ শরীফের কিতাব রচনা করেন। আর ঐ দুরূদ শরীফটিকে বলা হয় সালাতুল বি'র। আর তা নিম্নরূপ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلٰوةً دَائِمَةً مَقْبُوْلَةً تُوَدِّيْ بِهَا عَنَّا حَقَّهُ الْعَظِيْمِ[৪৪০]

[৪৩৯]. ফত্ওয়ায়ে জহিরিয়্যা, সূত্র: হাশিয়ায়ে দালায়েলুল খায়রাত, পৃষ্ঠা-১৭৮

[৪৪০]. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মেহদী ফাসী (র.), ভূমিকা, মাতালেউল মুসাররাত শরহে দালায়েলুল খায়রাত

তুফান থেকে মুক্তিলাভ

রওজাতুল আহবাব ও তাফসীরে রূহুল বয়ান গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একদিন এক বুযূর্গ ব্যক্তি জাহাজে আরোহন করছিলেন জাহাজটি তুফানে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। জাহাজটির সকল আরোহী চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ে। এসময় ঐ বুযূর্গ ব্যক্তির তন্দ্রা আসল এবং স্বপ্নে নবী করিম ﷺকে দেখেন আর তিনি এরশাদ করেন, জাহাজের আরোহীদের বল যেন তারা এক হাজার বার আমার উপর 'সালাতে তুনাজ্জিনা' পড়ে। তিনি জাগ্রত হয়ে সবাইকে সালাতে তুনাজ্জিনা পড়তে বলেন। তারা এই দুরূদ তিনশতবার শেষ করেনি তুফান বন্ধ হয়ে গেল আর সকল আরোহী এই মহাবিপদ থেকে মুক্তিলাভ করল। দুরূদ শরীফটি নিম্নরূপ– اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِن جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِن جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيٰوةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ যে কেউ এ দুরূদ শরীফ ঘুমানোর সময় এক হাজার বার পাঠ করবে তার আল্লাহর দীদার ও নবী করিম ﷺ'র দীদার নসীব হবে। এক সপ্তাহ কিংবা চল্লিশ দিনে এই সৌভাগ্য লাভ করবে।[৪৪১]

আরো বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি উক্ত দুরূদ শরীফ এক হাজার বার পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তার সমস্ত বালা-মুসিবত দূরীভুত করে দেবেন।[৪৪২]

মাতালিউল মুসাররাত কিতাবে আছে কোন কোন আউলিয়ায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তার উপর সন্তুষ্ট হবেন, তার সকল কাজ সহজ করে দেবেন এবং তাকে সর্ব প্রকারের গুনাহ থেকে বিরত রাখবেন।[৪৪৩]

দুরূদ শরীফ পাঠ না করার পরিণতি

দুরূদ শরীফ ও দোয়া সমস্ত ইবাদতের মূল। আর নামায সর্বোত্তম দোয়া ও ইবাদত। কিন্তু এগুলো দুরূদ শরীফ ব্যতীত কবুল হয় না। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ নিশ্চয় দোয়া নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যখানে ঝুলন্ত থাকে।

[৪৪১]. হাশিয়া দালায়েলুল খায়রাত, পৃ-১০৩

[৪৪২]. প্রাগুক্ত

[৪৪৩]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৪

যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার নবীর উপর দুরূদ পাঠ করবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তু উপরে উঠবে না।[৪৪৪]

হযরত ফাযালা ইবনে উবাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ قَالَ ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي ادْعُ تُجَبْ একদিন রাসূল ﷺ বসা ছিলেন এ সময় এক ব্যক্তি এসে নামায পড়ে দোয়া করল– হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে দয়া কর। রাসূল ﷺ তাকে সম্বোধন করে বললেন, হে নামাযী! তুমি দোয়াতে তাড়াহুড়া করেছ। যখন তুমি নামায পড়বে তারপর দোয়ার জন্য বসবে, প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করবে, কেননা তিনি এর যোগ্য। তারপর আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে এরপর দোয়া করবে। ফাযালা বলেন, এরপর অপর এক ব্যক্তি এসে নামায পড়ল। তারপর আল্লাহর প্রশংসা করল এবং রাসূল ﷺ'র উপর দুরূদ পাঠ করল। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন, হে নামাযী! এখন আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা কর, তা কবুল করা হবে।[৪৪৫]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– كُنْتُ أُصَلِّي وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْ تُعْطَهْ سَلْ تُعْطَهْ একদিন আমি নামায পড়ছিলাম। আর রাসূল ﷺ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.) ও তাঁর সাথে ছিলেন। নামায শেষে বসলাম। প্রথমে আল্লাহর গুণকীর্তন করলাম অতঃপর নবী করিম ﷺ'র উপর দুরূদ পাঠ করলাম। এরপর নিজের জন্য দোয়া করলাম। তখন রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন, প্রার্থনা কর, তোমাকে দেয়া হবে, প্রার্থনা কর তোমাকে দেয়া হবে।[৪৪৬]

উপরোক্ত হাদিসদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দোয়ার আদব হলো প্রথমে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করা এবং নবী করিম ﷺএর উপর দুরূদ পাঠ করা অতঃপর নিজের জন্য ও অপরের জন্য দোয়া করা। তবেই দোয়া কবুল হবে।

৪৪৪. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি), তিরমিযী শরীফ, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ-৮৭, হাদিস নং-৮৭৪
৪৪৫. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি), তিরমিযী শরীফ, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ-৮৬, হাদিস নং-৮৬৮
৪৪৬. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি), তিরমিযী শরীফ, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ-৮৬, হাদিস নং-৮৬৯

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– مَا مِنْ دَعْوَةٍ لَا يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَهَا اِلاَّ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ যে কোন দোয়া যার পূর্বে নবী করিম ﷺএর উপর দুরূদ পাঠ করা হবে না, তা আসমান ও জমিনের মধ্যস্থানে ঝুলে থাকবে।[৪৪৭]

সভা-সমাবেশে দুরূদ পাঠ করা

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– زَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلوةِ عَلَيَّ فَاِنَّ صَلوتَكُمْ نُوْرٌلَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ তোমরা তোমাদের সভাসমূহকে আমার উপর দুরূদ পাঠের দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। কেননা তোমাদের দুরূদ কিয়ামত দিবসে তোমার জন্য নূর তথা আলোকবর্তিকা হবে।[৪৪৮]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يذْكُرُا اللهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلى نَبِيهِمِ اِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهِ تِرَةٌ فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُمْ কোন সভায় লোকজন একত্রিত হয়ে তাতে যদি আল্লাহর যিকর না করে এবং তাদের নবীর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ না করে তবে সেই সভা তাদের জন্য মুসিবত নিয়ে আসবে। আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদেরকে ক্ষমা করবেন আর ইচ্ছে করলে আযাব দেবেন।[৪৪৯]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوْا اللهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلى نَبِيِّهِمْ اِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسرَةً يَوْمَ القِيَامَةِ وَاِنْ دَخَلُوْا الجَنَّةَ لِلثَّوَابِ কোন মজলিসে লোক সমাগম হয়ে যদি আল্লাহর যিকর না করে এবং তাদের নবীর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ না করে তবে কিয়ামতের দিন ঐ মজলিসের লোকেরা আফসোস করবে যদিও তারা নেক কাজের বিনিময়ে জান্নাতে যাবে।[৪৫০]

দুরূদ পড়তে ভুলে গেলে জান্নাতের রাস্তা ভুলে যাবে

হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, مَنْ ذُكِرَتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّي عَلَيَّ اَخْطَأَ طَرِيْقَ الجَنَّةَ যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ

৪৪৭. কাযী আবু ইসহাক (র.) (২৮২ হি), ফযলুস সালাত আলান নবীয়্যি,পৃ-৭৪, হাদিস নং-৬৮
৪৪৮. আফযালুস সালাত, পৃ-৪১, ইবনে কাইয়্যিম, জিলদুল আফহাম, পৃ-১৯৭, সূত্রঃ মাওয়ায়েযে রেজভীয়্যা, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৮৪
৪৪৯. জাওয়াহিরুল বিহার, খণ্ড, ৪, পৃ. ১৫৭, সূত্রঃ মাওয়ায়েযে রেজভীয়া খণ্ড- ৬, পৃ. ৮৪
৪৫০. আবু দাউদ, তিরমিযী, সূত্রঃ হিসনে হাসীন, পৃ-৪৯৭ ও কাযী আবু ইসহাক (র.) (২৮২ হি) ফযলুস সালাত আলান নবীয়্যি, পৃ-৫৫, হাদিস নং-৫৪

করা হবে আর আমার উপর দুরূদ পাঠ করবেনা সে (কিয়ামতের দিন) জান্নাতের রাস্তা ভুলে যাবে।[৪৫১]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– مَنْ نَسِيَ الصَّلواةَ عَلَيَّ نَسِيَ طَرِيْقَ الْجَنَّةَ। যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ পড়তে ভুলে যাবে সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে যাবে।[৪৫২]

হযরত জাফর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন,

مَنْ نَسِيَ الصَّلواة عَلَيَّ خَطِئَ اَبْوابُ الْجَنَّةَ যে আমার উপর দুরূদ পাঠ করতে ভুলে যাবে সে জান্নাতে প্রবেশের দরজাসমূহ ভুলে যাবে।[৪৫৩]

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হোসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– مَنْ نَسِيَ الصَّلواة عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيْقَ الْجَنَّةَ যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ পড়তে ভুলে যাবে, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে যাবে।[৪৫৪]

নবী করিম ﷺ দুরূদ পাঠকারীকে চিনেন এবং পঠিত দুরূদ শুনেন

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِبًا أَبْلَغْتُهُ যে আমার কবরের পাশে আমার উপর দুরূদ পাঠ করে আমি তা শুনি আর যে দূর থেকে আমার উপর দুরূদ পাঠ করে তা আমার নিকট পৌছানো হয়।[৪৫৫]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন

اِنَّ لِلّٰهِ فِي الاَرْضِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ يُبَلِّغُونِي مِنْ اُمَّتِي السَّلَامَ নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীতে ভ্রমণকারী ফেরেশ্তাগণ রয়েছে যারা আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌছিয়ে দেয়।[৪৫৬] জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনেক দূর থেকে যারা দুরূদ প্রেরণ করে এবং যারা আপনার ইন্তেকালের পরে আপনার উপর দুরূদ পাঠ করবে তাদের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, اَسْمَعُ

[৪৫১]. কাযী আয়ায (র.) (৫৪৪হি), শেফা শরীফ, খণ্ড-২, পৃ-৫৭
[৪৫২]. প্রাগুক্ত, পৃ-৫৮
[৪৫৩]. কাযী আবু ইসহাক (র.) (২৮২ হি), ফযলুস সালাত আলান নবীয়্যি, পৃ-৪১, হাদিস নং-৪৬
[৪৫৪]. প্রাগুক্ত, পৃ-৪২, হাদিস নং-৪৭
[৪৫৫]. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), শুআবুল ঈমান, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৮৭, হাদিস নং-৮৭৪
[৪৫৬]. কাযী আবু ইসহাক (র.) (২৮২ হি), ফযলুস সালাত আলান নবীয়্যি,পৃ-১২, হাদিস নং-৩৬

صَلَواةَ اَهْلِ مَحَبَّتِي وَاَعْرِفُهُمْ وَتُعرَضُ عَلَيَّ صَلَواةَ غَيْرِ هِمْ عَرَضًا আমি মুহাব্বতকারীদের দুরূদ নিজে শুনি এবং তাদেরকে চিনি আর অন্যদের দুরূদ আমার নিকট পৌছানো হয়।[৪৫৭]

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহের আলোকে এবং শায়খুল মুহাক্কিক আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.)'র বর্ণনার সারাংশ মতে নবী করিম ﷺ'র উপর দুরূদ পাঠ কারীর উপর আল্লাহর দশটি রহমত নাযিল হবে, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হবে এবং দশটি গুনাহ মাফ হবে। দশজন গোলাম আযাদ করার এবং বিশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণের ন্যায় সাওয়াব প্রাপ্ত হবে। দুরূদ শরীফ প্রেরণকারীর দোয়া কবুল হয় এবং কিয়ামত দিবসে নবী করিম ﷺ তার জন্য সুপারিশ করবেন। দুরূদ পাঠকারী রাসূল ﷺ'র নৈকট্য লাভে ধন্য হবে এবং কিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজায় তিনি তার পাশেই থাকবেন। তিনি তার নিকট সর্বাগ্রে পৌছে যাবেন, কিয়ামতের ভয়ংকর দিনে তার গমনদয় দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। দুনিয়াতে ও আখিরাতে মুশকিল আসান হয়, মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়, অনেকের মতে ফরয নামাযের কাযার কাফ্ফারা হয়। দুরূদ শরীফ সাদকার স্থলাভিষিক্ত হয় বরং সদকার চেয়ে উত্তম। এর দ্বারা বালা মুছিবত দূরীভূত হয়, রোগ-ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, ভয়-ভীতি বিদূরিত হয়, অত্যাচার ও যুলুম থেকে নিস্কৃতি লাভ হয়, শত্রুর উপর বিজয় সূচিত হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, অন্তরে তাঁর ভালবাসা সৃষ্টি হয়, ফেরেশ্তাগণ দুরূদ পাঠকের জন্য দোয়া করেন। দুরূদ শরীফের বরকতে আমলও সম্পদ পবিত্র হয় এবং বৃদ্ধি পায়। অন্তর স্বচ্ছ হয়, জীবনযাত্রা সুখের হয়, আর্থিক উন্নতি সাধিত হয়। সবকিছুর উপর বরকত নাযিল হয়, এমনকি সন্তান-সন্ততিদের পরবর্তী চার স্তর পর্যন্ত এ বরকত নাযিল হতে থাকে। মৃত্যুকালে কষ্ট লাঘব হয়, কোন কিছু ভুলে গেলে তা স্মরণ হয়, অভাব-অনটন দূরীভূত হয়, কৃপণতা, যুলুম এবং বদদোয়ার প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ হয়। পুলসিরাত পার হওয়ার সময় দুরূদ পাঠকারীর চতুর্দিকে নূর উদ্ভাসিত হয় ফলে দ্রুত পুলসিরাত অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। ফেরেশ্তাগণ তিনদিন যাবৎ দুরূদ প্রেরণকারীর গুনাহ লেখা থেকে বিরত থাকেন, লোকজনকে তার গীবত করা থেকে বিরত রাখেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাবে। তার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, কিয়ামত দিবসে সে পিপাসার্ত হবে না এবং জান্নাতে সে অসংখ্য হুর লাভ করবে। সর্বোপরি রাসূল ﷺ দুরূদ সালাম প্রেরণকারীর সালামের উত্তর পাওয়ার চেয়ে অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে?[৪৫৮]

[৪৫৭]. মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান জযূলী (ক), দালায়েলুল খায়রাত, পৃ-৭৬, সূত্র: মাওয়ায়েযে রেজভীয়্যা, খণ্ড-৬, পৃ-৭৭
[৪৫৮]. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), জযবুল কুলূব, উর্দু, পৃ. ২৬১-২৬৩

এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ

▪ ইমাম বায়হাকী (র.)	১ রবিউস সানি	৪৫৮ হিজরি
▪ ইমাম মালিক (র.)	৩/৭ রবিউস সানি	১৭৯ হিজরি
▪ হযরত হাবীবে আ'যমী (র.)	৩ রবিউস সানি	
▪ হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.)	১১ রবিউস সানি	৫৬১ হিজরি
▪ হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী (র.)	১২ রবিউস সানি	৬৩৮ হিজরি
▪ হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া (র.)	১৭ রবিউস সানি	৭২৫ হিজরি
▪ হযরত সুলতান মাহমুদ গজনবী (র.)	১৮/২১ রবিউস সানি	

জমাদিউল আউয়াল

ঈমান, ইসলাম ও ইহসান

ঈমান শব্দটি আরবী ক্রিয়ামূল। এর শাব্দিক অর্থ হলো বিশ্বাস করা, সত্যায়ন করা।

পবিত্র কুরআনে আছে– وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا আপনি তো আমাদেরকে সত্যায়নকারী নন।[৪৫৯] এখানে بِمُؤْمِنٍ শব্দটি بمصدق অর্থে ব্যবহৃত।

পরিভাষায় ঈমান বলা হয়, الايمان فى الشرع هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى اي تصديق النبى بالقلب فى جميع ما علم بالضرورة مجيئه من عند الله تعالى اجْمَالًا فانه كاف فى الخروج عن عهدة الايمان। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কাছ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন সবগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। অর্থাৎ যেগুলোর সাথে হিদায়েতের সম্পর্ক রয়েছে এগুলো সম্পর্কে সাধারণভাবে এতটুকু জ্ঞান রাখা যে, তিনি তা আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। আর এতটুকুই মু'মিন হওয়ার জন্য যথেষ্ট।[৪৬০]

অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন, মুতাকাল্লিমীন ও ফোকাহগণের মতে ঈমান হলো তিনটি বস্তুর সমষ্টি। আর তা হলো, ১. تصديق بالجنان ২. اقرار باللسان ও ৩. عمل بالاركان ।

১. অন্তরে বিশ্বাস। ২. মুখে স্বীকৃতি ও ৩. কার্যে বাস্তবায়ন। তবে জোর-জবরদস্তির সময় মুখের স্বীকৃতি বিলুপ্ত হতে পারে, কিন্তু অন্তরের বিশ্বাস কোন অবস্থাতেই বিলুপ্ত হবে না।

ইমাম আবু হানিফা (র.)'র মতে ঈমান কম-বেশী হয়না। তবে ঈমানের নুর ও ফলাফল কম-বেশী হয়।

আল্লামা সৈয়দ শরীফ (র.) বলেন, الايمان فى اللغة التصديق بالقلب وفى الشرع هو الاعتقاد بالقلب والاقرار باللسان ، قيل من شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق ومن أخل بالشهادة فهو كافر ঈমানের শাব্দিক অর্থ হলো অন্তরের বিশ্বাস। আর শরীয়তের পরিভাষায় অন্তরের দৃঢ়বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতিকে ঈমান বলে। যে ব্যক্তি ঈমানের সাক্ষ্য দিল এবং কাজে বাস্তবায়ন করল কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস ছিলনা তাকে বলা হবে মুনাফিক। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঈমানের সাক্ষ্য দিল অর্থাৎ কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ

---

[৪৫৯]. সূরা ইউসুফ, আয়াত– ১৭

[৪৬০]. আল্লামা সাদ উদ্দিন তাফতাযানী (র.) (৭৯১ হি), শরহে আকাঈদে নসফিয়্যাহ, পৃ–১১৯

করল কিন্তু কোন আমল করল না তবে অন্তরের বিশ্বাস বহাল আছে তাকে বলা হয় ফাসিক। আর যে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলনা তাকে বলা হয় কাফির।[৪৬১]

ইসলাম (اسلام) আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হলো আত্মসমর্পণ করা, অনুগত হওয়া। পরিভাষায়– الاسلام هو الخضوع والانقياد بمعنى قبول الاحكام والاذعان به ইসলাম হলো অনুগত ও আত্মসমর্পন করা অর্থাৎ ইসলামের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মান্য করা ও আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা।[৪৬২]

ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ ব্যবস্থার আলোকে একজন মুসলমানকে জীবন যাপন করতে হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন।[৪৬৩] আরো এরশাদ করেন– وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না।[৪৬৪]

ইহসান احسان শব্দটি আরবী। এর অর্থ হলো ইখলাস। মীর সৈয়দ শরীফ বলেন– الاحسان لغة فعل ما ينبغى ان يفعل من الخير ، وفى الشريعة ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك অর্থাৎ ইহসান এর শাব্দিক অর্থ হলো এমন কল্যাণকর কাজ যা করা উচিৎ। আর শরীয়তের পরিভাষায়, তোমরা এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাকে না দেখতে পাও তবে এতটুকু বিশ্বাস কর যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।[৪৬৫]

এ প্রসঙ্গে একদিন হযরত জিব্রাইল (আ.) নবী করিম ﷺএর দরবারে এসে আরয করলেন হে মুহাম্মদ ﷺ! أَخْبِرْنِي عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ

[৪৬১]. আল্লামা মীর সৈয়দ শরীফ (র.) (৮১৬ হি), কিতাবুত তা'রীফাত, পৃ– ৪০, বৈরুত
[৪৬২]. আল্লামা সাদ উদ্দিন তাফতাযানী (র.) (৭৯১ হি), শরহে আকাঈদে নসফিয়্যাহ, পৃ–১২৮
[৪৬৩]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত–৮৫
[৪৬৪]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত–৮৫
[৪৬৫]. মীর সৈয়দ শরীফ (র.) (৮১৬ হি), কিতাবুত তারীফাত, পৃ– ১২, বৈরুত

تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ الخ আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল ﷺ বলেছেন, ইসলাম হলো সাক্ষ্য দেয়া, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল। নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানে রোযা রাখা, সামর্থ ও পাথেয় থাকলে বায়তুল্লাহর হজ্ব করা। জিব্রাইল (আ.) বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম বলেন আমরা তাঁর প্রশ্ন ও সত্যায়ন করাতে অবাক হয়েছি।

তিনি আবার বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল ﷺ বললেন, ঈমান হলো আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর ফেরেশ্তাগণ, কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, পরকাল ও তকদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস করা। জিব্রাইল (আ.) বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। তিনি পুনরায় আরয করলেন ইহসান সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। রাসূল ﷺ বলেছেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি দেখতে সক্ষম না হও তাহলে এতটুকু বিশ্বাস কর যে, তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।[৪৬৬]

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنْ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ الخ তোমরা কি জান এক আল্লাহর উপর ঈমান রাখা কি? তারা বললেন– আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল ﷺ বলেন– ঈমান হলো সাক্ষ্য দেওয়া, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই আর মুহাম্মদ ﷺ হলেন আল্লাহর রাসূল এবং নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানে রোযা পালন আর গনীমতের সম্পদ থেকে এক পঞ্চমাংশ প্রদান করা।[৪৬৭]

মুহাদ্দিসীনে কিরামগণ ঈমানকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। একটি হলো মূল ঈমান যার সাথে আমলের কোন সম্পর্ক নেই। অপরটি হলো ঈমানে কামিল বা পূণাঙ্গ ঈমান যা আমলের সাথে সম্পর্কিত। প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলো, যেমন হাদিসে বর্ণিত আছে– مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, কোন বান্দা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" কালিমা শরীফ পড়ার পর যদি মারা যায়, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বর্ণনাকারী আরয করলেন, যিনা ও চুরি করলেও কি জান্নাতে যাবে? উত্তরে তিনি বলেন হ্যাঁ, যিনা ও চুরি

[৪৬৬]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ–১১
[৪৬৭]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ– ১৩

করলেও।[৪৬৮] উক্ত হাদিসে মূল ঈমানের কথা বলা হয়েছে যা দ্বারা বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবে যদিও গুনাহের কারণে তাকে প্রথমে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ হযরত ওসমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৪৬৯]

এ দুই হাদিসে জান্নাতে যাওয়ার জন্য ঈমানকেই শর্তারোপ করা হয়েছে। আমলের কথা বলা হয়নি। দ্বিতীয় প্রকারের ঈমানের উদাহরণ হলো রাসূল ﷺএর বাণী– لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي مُؤْمِنٌ কোন যিনাকারী ব্যক্তি যিনা করার সময় পূর্ণাঙ্গ মু'মিন থাকেনা।[৪৭০]

রাসূল ﷺ হাদিস শরীফে আরো বলেছেন– لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হবে না যতক্ষণ না তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষের থেকে আমি অধিক প্রিয় হব না।[৪৭১]

ঈমানের সম্পর্ক অন্তরের সহিত আর ইসলামের সম্পর্ক বাহ্যিক আমল ও আচরণের সহিত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে প্রায়ই ঈমানের সাথে আমলের কথা উল্লেখ করেছেন এবং ঈমানকে আমলের পূর্বে উল্লেখ করেছেন। কারণ ঈমান ঠিক থাকলেই আমল ঠিক থাকবে। ঈমানবিহীন আমল তলাবিহীন ঝুড়ির ন্যায়। বাজারের সব সওদা কিনে থলের মধ্যে রাখলেও তলা না থাকলে কিছুই থাকবে না। অনুরূপ ঈমানবিহীন আমল আল্লাহর কাছে পৌঁছবেনা। জান্নাতে প্রবেশের জন্য ঈমান শর্ত তবে আমল জান্নাতে জান্নাতীর মর্তবা বৃদ্ধি করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদৌস।[৪৭২]

---

৪৬৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৪
৪৬৯. সহীহ মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ১২
৪৭০. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ,পৃ-১৭
৪৭১. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ১২
৪৭২. সূরা কাহাফ, আয়াত- ১৩৭

ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। ঈমানে মুফাস্সাল নামক শীর্ষক কালিমায় এগুলো বর্ণিত হয়েছে। যেমন– امنتُ بِاللهِ وَمَلائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশ্তাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, আখিরাতের উপর, তকদীরের ভাল মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়ার উপর।

আল্লাহ

আল্লাহ তায়ালার অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে, তম্মধ্যে الله আল্লাহু হলো একমাত্র 'ইসমে জাত' তথা সত্তাবচক নাম। আল্লামা তাফতাযানী (র.) আল্লাহর সংজ্ঞায় বলেন–الله علم على الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع بجميع الصفات الكمال বিশুদ্ধতম মতানুসারে 'আল্লাহ' শব্দটি এমন চিরন্তন সত্তার সত্তাবাচক নাম যাঁর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী এবং যিনি সমস্ত প্রশংসনীয় ও উত্তম গুণাবলীর অধিকারী।[৪৭৩]

হেদায়েতুন নাহুর ব্যাখ্যাগ্রন্থ الهامية এর পাঁচ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে الله فى اللغة معبود برحق وفى الاصطلاح هو اسم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع المحامد وصفات الكمال المنزة عن النقصان والزوال আল্লাহ শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো সত্যিকারের উপাসক। আর পরিভাষায় অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী সত্তার সত্তাবাচক নাম যিনি সমস্ত প্রশংসনীয় ও পরিপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী এবং যাবতীয় ত্রুটি ও ক্ষয় থেকে পবিত্র।

শরহুল আকাঈদিন নাসাফিয়্যা, আল আকীদাতুত তাহাভীয়্যা, আল আকীদাতুল হাসানাহ ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ আল্লাহর পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে– "এ মহাবিশ্বের অবশ্যই একজন অনাদি অনন্ত সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি চিরস্থায়ী, তাঁর অস্তিত্ব সন্দেহাতীত ও অবশ্যম্ভাবী। প্রশংসনীয় সমস্ত গুণাবলী দ্বারা তিনি গুণান্বিত। সব ধরনের দোষ-ত্রুটি হতে তিনি মুক্ত ও পবিত্র। সবকিছু তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। সকল বস্তুর উপর তিনি ক্ষমতাশীল। সকল সৃষ্টি তাঁর ইচ্ছায় আবর্তিত। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তাঁর কোন উদাহরণ নেই। তাঁর সত্তায় ও গুণাবলীতে কেউ শরীক নেই। তিনিই অসুস্থকে সুস্থ করেন,সকল সৃষ্টিবস্তুকে রিযিক দেন। সৃষ্টির সবকিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। তিনি অন্য কোন সত্তায় প্রবিষ্ট ও একীভূত হওয়া থেকে পবিত্র। তিনি দেহ বিশিষ্ট নয় এবং কোন

---

৪৭৩. আল্লামা সাদ উদ্দিন তাফতাযানী (র.) (৭৯১ হি), শরহে আকাঈদে নসফিয়্যাহ, পৃ–১১৯

দিক কিংবা স্থানের গণ্ডিতে আবদ্ধ নন। মু'মিনগণ পরকালে তাঁর দীদার লাভে ধন্য হবেন। তিনি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তিনি যা চান তাই হয়। কোন কাজের জবাবদিহি করতে হয় না। তাঁর প্রতিটি কাজই হেকমতপূর্ণ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন।" উপরোক্ত আল্লাহর দু'টি সংজ্ঞা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ সমস্ত প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী এবং তিনি যাবতীয় দোষ-ত্রুটি মুক্ত। তাই কোন প্রকারের অসৎ, নিন্দনীয় ও ত্রুটিযুক্ত বস্তু তাঁর মধ্যে বিদ্যমান নেই। এমনকি আল্লাহর প্রতি আদব রক্ষার্থে কোন খারাপ ও তুচ্ছ বস্তুকে তাঁর দিকে সম্পর্কিত করাও জায়েয নেই, যদিও কথা সত্য হয়। যেমন- 'শূকরের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ' কথাটি সত্য। কিন্তু শূকর একটি ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট জানোয়ার বিধায় يا خالق الخنزير হে শূকরের সৃষ্টিকর্তা এরূপ বলা নিষেধ। সুতরাং 'আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন' এরূপ বলাও সম্পূর্ণ হারাম। এতে নিঃসন্দেহে ঈমান চলে যাবে।

আল্লাহ একক, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং তাঁর কোন শরীকও নেই। যদি কেউ তাঁর গুণাবলী এবং ইবাদতে অন্য কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করে তবে সে মুশরিক ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ কেউ আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করলে আল্লাহ তার জন্য অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।[৪৭৪]

আল্লাহর একত্ববাদের উপর পবিত্র কুরআনে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। যেমন– وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি দয়াময় অতি দয়ালু।[৪৭৫]

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ .

বলুন, তিনিই আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নয়।[৪৭৬]

[৪৭৪]. সূরা মায়িদা, আয়াত– ৭২
[৪৭৫]. সূরা বাকারা, আয়াত– ১৬৩
[৪৭৬]. সূরা ইখলাস,

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ যদি এক আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে, তবে উভয়টি ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে তা হতে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র।[৪৭৭]

আল্লাহর যিকর

যিকর শব্দের অর্থ হলো স্মরণ করা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অর্থাৎ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সর্বদা তাঁকে স্মরণ করা, তাঁর আনুগত্য করা এবং তাঁর ইসমে জাত ও ইসমে সিফাত মুখে কিংবা মনে মনে উচ্চারণ করা। আল্লাহ তায়ালা জ্বিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। যেমন: আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ আমি জ্বীন ও ইনসানকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।[৪৭৮]

সমস্ত ইবাদতের রূহ হচ্ছে আল্লাহর যিকর। আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে সর্বাবস্থায় অধিকহারে যিকর করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, আল্লাহর বাণী, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর।[৪৭৯]

আল্লাহ তায়ালা বলেন, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও যমিন সৃষ্টির বিষয়ে (তারা বলে) হে পরওয়ারদিগার! এসব আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি।[৪৮০]

তিনি আরো বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ আর স্মরণ কর তোমার পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চিৎকার অপেক্ষা কম; সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বেখবর থেকোনা।[৪৮১]

ইসলামে প্রত্যেক ইবাদতের একটা নির্দিষ্ট সময়-সীমা ও পরিমাণ রয়েছে। যেমন নামায দৈনিক পাঁচওয়াক্ত, রোযা বছরে একমাস, হজ্ব সারা জীবনে একবার এবং যাকাত

[৪৭৭]. সূরা আম্বিয়া, আয়াত– ২২
[৪৭৮]. সূরা যারিয়াত: আয়াত- ৫৬
[৪৭৯]. সূরা আহযাব, আয়াত– ৪১-৪২
[৪৮০]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৯১
[৪৮১]. সূরা আল আরাফ, আয়াত- ২০৫

নেসাব পূর্ণ হলে বছরে একবার ইত্যাদি। শুধুমাত্র যিকর এমন ইবাদত যার কোন সময়, সীমা, পরিমাণ ও শর্ত নেই। দিনে রাতে, সকাল-সন্ধ্যায়, হাঁটতে-বসতে এমনকি শয়ন অবস্থায় এবং উযূ অবস্থায় হোক কিংবা উযূবিহীন হোক সর্বাবস্থায় যিকর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া এই ইবাদতের জন্য কোন বিশেষ পরিশ্রমও করতে হয়না এবং কোন অবসরের দরকার পড়ে না। যিকরের উপকারিতা এতবেশী ও ব্যাপক যে, এর মাধ্যমে পার্থিব কার্যক্রমও ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়। যেমন আহার করার সময় আহারের দোয়া পড়লে, ঘুমানোর সময় ঘুমের দোয়া পড়লে এগুলো ইবাদতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অর্থাৎ সর্বদা আল্লাহর স্মরণ রাখা কোন অবস্থাতেই আল্লাহ সম্পর্কে অমনোযোগী ও গাফেল না হওয়া।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, **فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ** অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর যিকর কর।[৪৮২]

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও বেশী বেশী আল্লাহর যিকর কর।[৪৮৩]

আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন– **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ** যারা ঈমানদার তারা এমন লোক যে, যখন আল্লাহর যিকর করা হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় প্রভুর উপর ভরসা করে।[৪৮৪]

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দিন, যাদের অন্তর আল্লাহর যিকরে ভীত হয়।[৪৮৫]

যিকরের ফযিলত

যিকরের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার যোগসূত্র হয়। বান্দা আল্লাহর দয়া ও মাগফিরাত লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, **فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ** তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদেরকে স্মরণ (দয়া) করবো।[৪৮৬]

৪৮২. সূরা নিসা, আয়াত– ১০৩
৪৮৩. সূরা জুমা, আয়াত- ১০
৪৮৪. সূরা আনফাল, আয়াত- ২
৪৮৫. সূরা হাজ্জ,আয়াত- ৩৪-৩৫

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা যদি আমার হুকুমের আনুগত্যের মাধ্যমে আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে সওয়াব ও মাগফিরাত দানের মাধ্যমে স্মরণ করব। আল্লাহর যিকরের দ্বারা বান্দার ক্বলব প্রশান্তি লাভ করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, **أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ** জেনে রাখো! আল্লাহর স্মরণেই আত্মাসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।[৪৮৭] যেহেতু মু'মিনের ক্বলব আল্লাহর আরশ, তাই আল্লাহর স্মরণে ক্বলব তথা আত্মা প্রশান্তি ভাল করে।

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহর যিকরকারীকে জীবিত ও যিকর থেকে গাফেল ব্যক্তিকে মৃতের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, **«مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ»** যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকর করে এবং যে আল্লাহর যিকর করে না তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়।[৪৮৮]

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– **يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ** আল্লাহ তায়ালা বলেন– আমি আমার বান্দার ধারণা মোতাবেক হই এবং আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমার যিকর করে। যদি সে তার মনে মনে আমার যিকর করে আমি তাকে আমার কুদরতি মনে যিকর করি। আর যদি সে আমাকে মজলিসে গণজমায়েতে যিকর করে তাহলে আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি।[৪৮৯]

হযরত আবু হোরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– **«لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»** কোন দল বসে বসে আল্লাহর যিকর করলে ফেরেশ্তারা তাদেরকে রহমতে ঢেকে নেন এবং তাদের উপর শান্তি নাযিল করেন আর আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশ্তাদেরকে নিয়ে আল্লাহ তাদের স্মরণ করেন।[৪৯০]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন,আল্লাহর একদল ফেরেশ্তা আছেন, যারা আল্লাহর যিকরে মশগুল লোকদের তালাশে রাস্তায় রাস্ত

৪৮৬. সূরা আল বাকারা, আয়াত- ১৫২
৪৮৭. সূরা রা'দ, আয়াত-২৮
৪৮৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৯৬
৪৮৯. বুখারী ও মুসলিম,সূত্র: মিশকাত শরীফ. পৃ-১৯৬
৪৯০. মুসলিম শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৯৬

ায় ঘুরাফেরা করেন। যখন তারা কোথাও আল্লাহর যিকরে মশগুল লোকদের দেখতে পান, তখন তাদের একজন অপরজনকে ডেকে বলেন, তোমরা নিজ কর্তব্য পালনের জন্য এদিকে চলে এসো। তখন তারা সবাই এসে তাদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটস্থ আসমান পর্যন্ত। তখন তাদের রব তাদের জিজ্ঞাসা করেন অথচ এ সম্পর্কে তিনি বেশী জ্ঞাত। আমার বান্দারা কি বলছে? জবাবে তারা বলেন, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে, আপনার প্রশংসা করছে এবং আপনার মাহাত্মা বর্ণনা করছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? ফেরেশ্‌তারা বলবেন, হে আমাদের রব! আপনার কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলবেন আচ্ছা, তবে যদি তারা আমাকে দেখত? তারা বলবেন, যদি তারা আপনাকে দেখত তবে তারা আরো বেশী আপনার ইবাদত করত, আরো অধিক আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করত, আর বেশী বেশী আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (আল্লাহ) বলবেন, তারা আমার কাছে কি চায়? তারা বলবেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? তারা বলবেন, না, আপনার সত্তার কসম! হে রব! তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, যদি তারা তা দেখতো তবে তারা কি করতো? তারা বলবেন, যদি তারা তা দেখতো তাহলে তারা আরো বেশী বেশী জান্নাত আশা করতো। আরো অধিক চাইত এবং এর জন্য আরো অধিক অতিশ্রয় উৎসাহী হয়ে উঠত। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কিসের থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়? তারা বলবেন, জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তারা বলবেন, আল্লাহর কসম! হে রব! তারা জাহান্নাম দেখেনি। যদি তারা তা দেখত তবে তারা তা থেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং একে সাংঘাতিক ভয় করতো। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমি তোমাদের সাক্ষি রাখছি, আমি তাদের মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশ্‌তাদের একজন বলবেন, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের (যিকরকারীদের) অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তারা এমন উপবিষ্টকারীবৃন্দ, যাদের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বিমুখ হয় না। অর্থাৎ তাকেও ক্ষমা করে দিলাম।[৪৯১]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন–انَّ اللهَ تَعالى يقول اَنَا مَعَ عَبْدِي اِذَا ذَكَرَنِى আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আমার বান্দার সাথে থাকি যখন সে আমার যিকর করে।[৪৯২]

---

[৪৯১]. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পৃ- ৯৪৮, হাদিস নং- ৫৯৬৬

[৪৯২]. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), বুখারী শরীফ, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৯৯

জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি এসে নবী করিম ﷺ থেকে জিজ্ঞাসা করল– হে আল্লাহর রাসূল! اىُّ الاعمال افضل কোন আমলটি উত্তম? রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন, أَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ সর্বোত্তম আমল হলো দুনিয়াবিমুখ হওয়া এবং সর্বদা আল্লাহর যিকর দ্বারা তোমার জিহ্বা সিক্ত রাখা।[৪৯৩]

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, لَا تُكْثِرُوا الكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ القَلْبُ القَاسِي. তোমরা আল্লাহর যিকর ব্যতীত অধিক কথা বলবেনা। কেননা আল্লাহর যিকর ব্যতীত অধিক কথা বললে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। আর নিশ্চয় কঠিন হৃদয়ব্যক্তি আল্লাহর রহমত হতে বহু দূরে থাকে।[৪৯৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামী শরিয়তে আমলসমূহ অনেক বেশী মনে হচ্ছে। সহজ একটি আমল সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন, যার উপর আমি সর্বদা আমল করতে পারি। রাসূল ﷺ বলেন, «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطِبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ» তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকরে সিক্ত থাকে।[৪৯৫]

হযরত মুয়ায ইবনে জাবল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– مَا عَمِلَ العَبْد عَمَلاً أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ، مِنْ ذِكْرِ اللهِ আল্লাহর যিকর ব্যতীত আল্লাহর আযাব থেকে অধিক মুক্তিদানকারী কোন আমল নেই।[৪৯৬]

শয়তান মানুষকে পাপ কাজে লিপ্ত করে। আর পাপের কারণে মানুষের অন্তরে কালিমা সৃষ্টি হয়। এই কালিমা দূরীভূত হয় আল্লাহর যিকর দ্বারা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, لِكُلِّ شَيْئٍ صقالةٌ وَصقالة القلب ذكر الله প্রত্যেক বস্তু পরিষ্কার করার উপকরণ আছে। আর অন্তরের ময়লা পরিষ্কার করার উপকরণ হলো আল্লাহর যিকর।[৪৯৭]

---

[৪৯৩]. ইমাম আহমদ ও তিরমিযী (র.), সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৯৮

[৪৯৪]. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি), জামে তিরমিযী, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৯৮

[৪৯৫]. তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৯৮

[৪৯৬]. ইমাম মালিক, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ (র.), সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৯৯

[৪৯৭]. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), আদ দাওয়াতুল কবীর, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৯৯

যিকর দ্বারা শয়তান বিতাড়িত হয়

শয়তান মানুষের চিরশত্রু। সে সর্বদা মানব জাতিকে গুনাহে লিপ্ত করে জাহান্নামী বানাতে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। আর শয়তান ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এবং মানুষের রক্তে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা আছে বিধায় তাকে দমন করা বড়ই কঠিন। আল্লাহর যিকর হলো শয়তানকে বিতাড়িত করার বড় সফল অস্ত্র। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدم فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفِلَ وسوس শয়তান আদম সন্তানের অন্তরে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে। যখন সে আল্লাহর যিকর করে, তখন শয়তান পালিয়ে যায় আর যখন সে আল্লাহর যিকর থেকে গাফেল হয় তখন শয়তান প্ররোচনা দেয়।[৪৯৮]

যিকর হলো সর্বোত্তম ইবাদত। হযরত আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তুর সংবাদ দেবো না যা তোমাদের যাবতীয় আমলের চাইতে উত্তম, তোমাদের প্রভুর নিকট সর্বাদিক গ্রহণযোগ্য, তোমাদের মর্যাদা বিশেষভাবে বর্দ্ধনকারী। আল্লাহর রাস্তায় সোনা-রূপা দান করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করতে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করা বা নিজে শাহাদাত বরণ করার চাইতে উত্তম? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সেটি কি বস্তু? রাসূল ﷺ এরশাদ করেন সেটি হলো আল্লাহর যিকর।[৪৯৯]

সর্বোত্তম যিকর

সর্বোত্তম যিকর কোনটি তা নিয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েত পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে সর্বোত্তম যিকর হলো, কালিমায়ে তায়্যেবাহ। কারণ এর দ্বারা অন্তর পরিষ্কার হয়। কোন রেওয়ায়াতে আছে, তিলাওয়াতে কুরআন হলো সর্বোত্তম যিকর। কেননা এতে একটি হরফে দশটি নেকী পাওয়া যায়। কোন রেওয়ায়েতে আছে, তাওবা ও ইস্তেগফার হলো উত্তম যিকর। এতে মুসিবত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, গুনাহ মাফ হয় এবং রিযিকে বরকত হয়। কোন রেওয়ায়েতে আছে– সর্বোত্তম যিকর হলো দুরূদ শরীফ পাঠ। কোন রেওয়ায়েতে আছে– سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِه سُبْحَانَ اللهِ العظيم এর দ্বারা কিয়ামত দিবসে মীযান ভারী হবে। কোন রেওয়াতে আছে– উত্তম যিকর হলো তাসবীহে ফাতেমী। অর্থাৎ সুবহান্নাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবর ৩৪ বার প্রত্যেহ বাদে ফজর ও বাদে মাগরিব।[৫০০]

[৪৯৮]. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), বুখারী শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৯৯
[৪৯৯]. ইমাম মালিক,আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ (র.), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৯৮
[৫০০]. মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) (১৩৯১হি), তাফসীরে নঈমী, খণ্ড-২ পৃ- ৬৯

যিকরের ফযিলত

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এর নিকট প্রশ্ন করা হলো যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট কোন বান্দার মর্যাদা সবচেয়ে বেশী হবে। তিনি বলেন الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا। অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকরকারীদের। আমি আরয করলাম– হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের চেয়েও কি বেশী? তিনি বললেন– যদি কেউ কোন কাফির ও মুশরিকদের উপর তরবারী দিয়ে আঘাত করে এবং তার তরবারী ভেঙ্গে যায় আর সে কাফির ও মুশরিক রক্তাক্ত হয়ে পড়ে তবুও আল্লাহর যিকরকারীর মর্যাদা তার চেয়েও বেশী এবং উত্তম।[৫০১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– ما من صدقة افضل من ذكر الله আল্লাহর যিকরের চেয়ে উত্তম কোন সাদকা নেই।[৫০২]

হযরত সুহাইল ইবনে হানযালা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, ما جَلَس قوم مجلسًا يذكرون الله عزّ وجل ويقومون حتى يقال لهم قوموا فقد غفر الله لكم وبدلت سياتكم حَسَنات যেসব লোক কোন মজলিসে বসে আল্লাহর যিকর করে যখন মজলিস থেকে উঠে তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয় যে, তোমরা উঠ। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তোমাদের গুনাহ সমূহকে নেকীতে পরিবর্তন করে দিয়েছেন।[৫০৩]

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ للَّه عَزَّ وَجَلَّ سَرَايَا مِنَ الْمَلَائِكَة تَقفُ وَتَحُلُّ عَلَى مَجَالِسِ الذِّكْرِ، فَارْتَعُوا فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ " . قُلْنَا: أَيْنَ رِيَاضُ الْجَنَّةِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " مَجَالِسُ الذِّكْرِ اغْدُوا وَرُوحُوا فِي ذِكْرِ اللهِ রাসূল ﷺ আমাদের থেকে বের হলেন আর বললেন, হে লোক সকল! আল্লাহর একদল ফেরেশ্‌তা আছেন। তারা কোন যিকরের মজলিস পেলে সেখানে অবস্থান করেন। অতঃপর তোমরা জান্নাতের বাগানের ফল খাও। আমরা বললাম, জান্নাতের বাগান কোথায়? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যিকরের মজলিস সমূহ।[৫০৪]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– " إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا " . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: " حِلَقُ الذِّكْرِ "

[৫০১]. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি), জামে তিরমিযী, পৃ- ৪৮৬-৮৭
[৫০২]. হাফিয নুরুদ্দীন আলী হায়সামী (র.) (৮০৭ হি), মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড-১০ পৃ- ৭৩-৭৪
[৫০৩]. হাফিয নুরুদ্দীন আলী হায়সামী (র.) (৮০৭ হি), মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড-১০ পৃ- ৭৫-৭৬
[৫০৪]. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), শোয়াবুল ঈমান, খণ্ড-২ পৃ- ৬৫

তোমরা যখন জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে গমন করবে, তখন তার ফল খাও। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের বাগান কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন– যিকরের মজলিস।[৫০৫]

শিরক

শিরকের সংজ্ঞায় আল্লামা তাফতাযানী (র.) বলেন– **الاشراك هو اثبات الشريك فى الوهية بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس او كمضيى استحقاق العبادة كما لعبدة الاصنام** শিরক বলা হয় আল্লাহর উলুহিয়্যতে অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী অন্য কাউকে শরীক করা, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবীকে সাবস্ত করা যেরূপ করে থাকে অগ্নিপূজারীরা অথবা মূর্তিপূজারীদের ন্যায় অন্য কাউকে ইবাদতের যোগ্য মনে করা।[৫০৬]

শিরক হলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুনাহ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, **إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** নিশ্চয়ই শিরক বড় যুলুম।[৫০৭]

হাদিস শরীফে আছে– **عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُود: قَالَ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ؟ قَالَ: " أَنْ تَدْعُوَ اللهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ الخ "** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন– আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথচ তিনি তোমার সৃষ্টিকর্তা।[৫০৮]

হযরত আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– একদিন আমরা রাসূল ﷺ এর খেদমতে ছিলাম। তিনি বলেন, **أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ** আমি কি তোমাদের সর্বোচ্চ গুনাহের সংবাদ দেব না? কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। সর্বোচ্চ গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ও মিথ্যা কথা বলা।[৫০৯]

শিরক ক্ষমার অযোগ্য গুনাহ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا** নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে

[৫০৫]. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), শোয়াবুল ঈমান, খণ্ড-২ পৃ- ৬৬
[৫০৬]. আল্লামা সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী (র.) (৭৯১ হি), শরহুল আকাঈদিন নসফিয়্যা, পৃ-৬১
[৫০৭]. সূরা লোকমান, আয়াত-১৩
[৫০৮]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-১৬
[৫০৯]. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি), সহীহ মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, হাদিস নং- ১৬৭

শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া সব কিছু যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করেন এবং কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।[৫১০]

শিরক সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– **لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ** আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করিও না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় এবং জ্বালিয়ে দেয়া হয়।[৫১১]

কবীরা গুনাহ

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

যদি তোমরা বেঁচে থাক সেসব বড় গুনাহগুলো থেকে যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের ছোট গুনাহ গুলো ক্ষমা করে দেব এবং সম্মান জনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাব।[৫১২]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গুনাহ দুই প্রকার। কবীরা (বড়) গুনাহ ও সগীরা (ছোট) গুনাহ। কবীরা গুনাহের সংজ্ঞায় মীর সৈয়দ শরীফ (র.) বলেন– **الكبيرة هى ما كان حرامًا محضًا شرع عليها عقوبة محصنة بنص قاطع فى الدنيا والاخرة** কবীরা গুনাহ হলো যা মূলত হারাম বা নিষিদ্ধ। যার বিরুদ্ধে শরীয়তে ইহকাল ও পরকালে শাস্তির অকাট্য দলীল রয়েছে।[৫১৩]

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, **الكبائر جمع كبيرة وهى السيئة العظيمة قيل ما اوعد عليه الشارع بخصوصه وقيل ما عين له حد وقيل النسب اضافية فقد يكون الذنب كبيرة بالنسبة لما دونه وصغيرة لنسبة الى مافوقه وقد يتفاوت باعتبار الاشخاص والاحوال كما قيل حسنات الابرار سيئات المقربين** কাবায়ের শব্দটি কবীরার বহুবচন। বড় গুনাহকে কবীরা গুনাহ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন– বিশেষ করে যেগুলোর বিরুদ্ধে কুরআন হাদিসে শাস্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, যে গুনাহের জন্য শাস্তি নির্ধারিত করা হয়েছে। অনেকেই বলেন, কবীরা-সগীরার নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। বরং কম অপরাধ গুনাহের

[৫১০]. সূরা নিসা, আয়াত- ১১৬
[৫১১]. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), মুসনাদে আহমদ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৮
[৫১২]. সূরা নিসা, আয়াত-৩১
[৫১৩]. মীর সৈয়দ শরীফ (র.) (৮১৬ হি), কিতাবুত তা'রীফাত, পৃ-১৮৩, বৈরুত

তুলনায় বড় অপরাধমূলক গুনাহ হলো কবীরা। পক্ষান্তরে বড় অপরাধমূলক গুনাহের তুলনায় ছোট অপরাধ মূলক গুনাহ হলো সগীরা। এটি আবার ব্যক্তি ও অবস্থা ভেদে বেশ-কম হয়। যেমন বলা হয় যে, সাধারণ নেককার লোকদের অনেক সৎকাজ আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত লোকদের জন্য তা গুনাহ হিসাবে বিবেচিত হয়।[৫১৪]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– **كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة** যা করতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেছেন তাই কবীরা গুনাহ।

ইমাম রাযী (র.)এর মতে **الكبيرة هى التى مقدار عقبها عظيم** যেসব অপরাধের শাস্তির পরিমাণ বেশী তাকে কবীরা গুনাহ বলে। কারো কারো মতে **الكبائر ما وعد الله عليه بالنار صراحة** কবীরা গুনাহ বলা হয় যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে দোযখের হুমকি দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে কবীরা গুনাহের পূর্ণ সংখ্যার বর্ণনা একত্রে উল্লেখ নেই। তবে কুরআন হাদিস থেকে অন্বেষণ করে ওলামায়ে কিরাম এর সংখ্যা ৭০টি বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এতে সীমাবদ্ধ নয়। প্রসিদ্ধ কবীরা গুনাহসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো, (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা (২) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা (৩) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া (৪) সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করা (৫) ইয়াতিমের হক আত্মসাৎ করা (৬) যিনা করা (৭) ওযনে কম দেওয়া (৮) নির্দোষ মহিলার উপর যিনার মিথ্যা অপবাদ দেওয়া (৯) সুদ খাওয়া ও দেওয়া (১০) যাদু ও বান-টোনা ইত্যাদি করা (১১) আমানতের খিয়ানত করা (১২) ওয়াদা ভঙ্গ করা (১৩) মিথ্যা বলা (১৪) ফরয ইবাদত পরিত্যাগ করা (১৫) চুরি করা (১৬) গীবত করা ও শোনা (১৭) মদ্যপান করা (১৮) জুয়া খেলা (১৯) যুলুম করা (২০) মিথ্যা শপথ করা (২১) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া (২২) অহংকার করা (২৩) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা (২৪) ঘুষ খাওয়া (২৫) সাহাবায়ে কিরামদের মন্দ বলা (২৬) আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা (২৭) কোন মুসলমানকে কাফির, বেঈমান আল্লাহর দুশমন ইত্যাদি বলা (২৮) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়ে দেয়া (২৯) সত্যের বিপরীত বিচার করা (৩০) চোগলী করা ইত্যাদি।

কবীরা গুনাহ তাওবা ব্যতীত মাফ হয় না তবে সগীরা গুনাহ নেকআমলের দ্বারা মাফ হয়ে যায়। আর সগীরা গুনাহও যদি বেপরোয়াভাবে ঔদ্ধত্বের সাথে বারবার করা হয়, তা কবীরা গুনাহের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। হাদিস শরীফে আছে– **عن النبى صلى الله عليه وسلم**

[৫১৪]. মোল্লা আলী কারী (র.) (১০১৪ হি), মিরকাত, মিশকাতের প্রান্তটীকা, পৃ-১৬, টীকা নং- ১৪

لا صغيرة مع الاسرار ولا كبيرة مع الاستغفار নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণিত, সগীরা গুনাহ বারবার করতে থাকলে তা আর সগীরা থাকেনা বরং কবীরা হয়ে যায় এবং ইস্তেগফার দ্বারা কবীরা গুনাহের অস্তিত্ব থাকেনা।[৫১৫]

عن بعض الحكماء لا تحقروا الذنوب الصغار فانها تنشعب منها الذنوب الكبار জনৈক জ্ঞানী থেকে বর্ণিত আছে যে, তোমরা কোন গুনাহকে ক্ষুদ্র মনে করোনা। কারণ ক্ষুদ্র গুনাহ থেকেই কবীরা (বড়) গুনাহ সৃষ্টি হয়।[৫১৬]

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ওযাইর (আ.)কে ওহীর মাধ্যমে বলেছেন, হে ওযাইর! যখন তুমি কোন ক্ষুদ্র গুনাহ কর তখন এর ক্ষুদ্রতার প্রতি লক্ষ্য করিওনা; বরং যার আদেশ লঙ্ঘন করে গুনাহ করেছ সেই মহান সত্তার দিকে লক্ষ্য কর।[৫১৭]

আল্লাহর দয়া

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ বলেন- আমার বান্দা কোন গুনাহ্‌র কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করলে তা না করা পর্যন্ত (ফেরেস্তাদেরকে বলেন) তার গুনাহ্ লেখোনা। আর যদি তা করেও ফেলে, তাহলে তা সমপরিমাণ লেখো আর যদি সে ঐ গুনাহের কাজ আমার কারণে পরিহার করে, তাহলেও তার জন্য একটি নেকী লেখো। পক্ষান্তরে বান্দা যদি কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করল কিন্তু তা না করে, তবুও তোমরা তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। অতঃপর যদি সে তা সম্পাদন করে, তবে তার জন্য তোমরা কাজটির দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত লেখো।[৫১৮]

উক্ত হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, বান্দা গুনাহ করার ইচ্ছে করে খোদার ভয়ে গুনাহের কাজটি পরিত্যাগ করলেও তাকে সওয়াব প্রদান করা হয়। অর্থাৎ বান্দা কোন আমল না করেও সওয়াব প্রাপ্ত হয়।

[৫১৫]. ইমাম কুরতুবী (র.) (৬৮৫ হি), আহকামুল কুরআন, খণ্ড-৫, পৃ-১৫৯, আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (র.) (৮৫২ হি), আল মুনাব্বিহাত, ১৯ নং উপদেশ

[৫১৬]. প্রাগুক্ত, উপদেশ নং-১০

[৫১৭]. প্রাগুক্ত, উপদেশ নং-৪৭

[৫১৮]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬ হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড, ২য়, পৃ. ১১১৭ হাদিস নং ৬৯৯২

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করিম ﷺ তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন- তিনি (আল্লাহ) বলেন- আমার বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হই। আর সে যখন আমার দিকে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হয় আমি তখন তার দিকে দু'হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হই। সে যখন আমার দিকে হেঁটে আসে তখন আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।[৫১৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন- আমি সেরূপই, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে আমাকে মনে মনে একা স্মরণ করে, আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে লোক সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়; আমি তখন তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।[৫২০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي হযরত আবু হোরায়রা (রা.) নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ যখন সকল মাখলুক সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করলেন, তখন তাঁর আরশের উপর তারই নিকটে লিপিবদ্ধ করে রাখলেন। অবশ্যই আমার রহমত আমার গযব থেকে অগ্রগামী।[৫২১]

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ

[৫১৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২৫, হাদিস নং ৭০২৮
[৫২০]. প্রাগুক্ত পৃ. ১১০১, হাদিস নং ৬৯০১
[৫২১]. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (রা.) (২৫৬ হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড ২য়, পৃ. ১১০৪ হাদিস নং ৬৯১৬

হযরত জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির উপর দয়া করেন না যে মানুষের প্রতি দয়া করেনা।[৫২২]

আল্লাহ তায়ালা বলেন, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হইওনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু।[৫২৩]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি আল্লাহ তায়ালা রহমতকে একশ ভাগে বিভক্ত করে নিজের কাছে নিরান্নব্বই ভাগ রেখে দিয়েছেন এবং একভাগ দুনিয়াতে নাযিল করেছেন। এরই বদৌলতে সৃষ্টিজীবরা পরস্পর দয়া প্রদর্শন করে। এমনকি ঘোড়াও তার বাচ্চার গায়ে আঘাত লাগার ভয়ে পা সরিয়ে নেয়।[৫২৪]

একমাত্র মু'মিন সৎকর্মশীল ব্যক্তিরাই আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।[৫২৫]

আল্লাহ তায়ালা বলেন, رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ আমার রহমত প্রতিটি বস্তুকে সংকুলান করেছে। অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুর জন্য আমার রহমতের একটি অংশ বরাদ্দ রয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলো তখন অভিশপ্ত শয়তান উঁচু গলায় বলল, আমিও তো একটি বস্তু। সুতরাং আমিও রহমতের একটি অংশ পাবো। তেমনি ইহুদী-নাসারাগণও আশাবাদ ব্যক্ত করে অতঃপর আয়াতের এ অংশ নাযিল হলো- فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ আমি নিশ্চয়ই তা বরাদ্দ করবো তাদের জন্য, যারা (শিরক) পরিহার করে তাক্ওয়া অর্জন করে, যাকাত প্রদান করে এবং আমার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখে।

শয়তান তখন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গেল। কিন্তু ইহুদী-নাসারারা বলল, আমরা শিরক পরিহার করি, যাকাত প্রদান করি এবং তাঁর আয়াত সমূহে বিশ্বাস করি। সুতরাং আমরা তাঁর রহমতপ্রাপ্ত হবো। তখন আয়াতের পরবর্তী অংশ নাযিল

[৫২২]. প্রাগুক্ত পৃ. ১০৯৭, হাদিস নং ৬৮৭২
[৫২৩]. সূরা যুমার, আয়াত, ৫৩
[৫২৪]. ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (র.) (৩৭৩ হি.), তাম্বীহুল গাফেলীন, আরবী, বৈরুত, পৃ. ৪৯
[৫২৫]. সূরা আ'রাফ, আয়াত; ৫৬

হলো। الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ অর্থাৎ- আমার রহমতপ্রাপ্ত হবে যারা উম্মী নবী মুহাম্মদ ﷺ'র অনুসরণ করবে। তখন ইহুদী-নাসারাগণও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায় এবং কেবল মু'মিনরাই রহমতের উপযুক্ত থেকে যায়।[৫২৬]

কিয়ামত দিবসে কোন আমলের বিনিময়ে বান্দা মুক্তি লাভ করতে পারবে না। বরং কেবল আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহে মুক্তি লাভ করবে। হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রা.) হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন নবী করিম ﷺ আমাদের নিকট বেরিয়ে এসে বললেন, এই মাত্র আমার নিকট থেকে আমার বন্ধু জিব্রাইল (আ.) বেরিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে বলেছেন- হে মুহাম্মদ! যিনি আপনাকে সত্য নবী-করে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ! আল্লাহর জনৈক বান্দা পাঁচশ বছর যাবৎ আল্লাহর ইবাদত করেছেন। তিনি একটি পাহাড়ের চূড়ায় থাকতেন। পাহাড়টি দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত ছিল ত্রিশ হাত। পাহাড়টির চতুর্দিকে রয়েছে একটি সাগর। সাগরের প্রতিটি দিক চার হাজার ক্রোশ। আল্লাহ তায়ালা তার জন্য আংগুল পরিমাণ চওড়া একটি মিষ্টি পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করেছেন। ঝর্ণাটি পাহাড়ের নীচ থেকে উৎসারিত। সেখানে আরো রয়েছে একটি ডালিম গাছ। প্রতিদিন সে গাছে একটি করে ডালিম হত। প্রতিদিন বিকেলে লোকটি নেমে উযূ করতেন এবং ডালিমটি নিয়ে আহার করতেন। অতঃপর নামাযে রত হতেন। তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন তাকে যেন তিনি সিজদারত অবস্থায় মৃত্যুদান করেন এবং মাটি বা অন্য কিছু তার শরীরের উপর কোন ক্রিয়াশক্তি দান না করেন। এভাবে কিয়ামত দিবসেও যেন তাকে সিজদা অবস্থায় পুর্নজীবিত করেন। আল্লাহ তায়ালা তার জন্য তেমনটিই করলেন। হযরত জিব্রাইল (আ.) বলেন- আমার উঠা-নামার সময় তার নিকট দিয়ে আসা-যাওয়া করি এবং তাকে সিজদারত অবস্থায় দেখতে পাই। অতঃপর হযরত জিব্রাইল (আ.) বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাকে পুনরায় জীবিত করে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলবেন- আমার বান্দাকে আমার রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আবেদ বলবেন- না, বরং আমার আমলের বিনিময়ে। তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশ্তাদেরকে বলবেন-আমার বান্দার প্রতি আমার নিয়ামতের ও তার আমলের হিসাব করো। দেখা যাবে যে, শুধুমাত্র দৃষ্টিশক্তির বিনিময় হবে পাঁচশ বছর ইবাদত। পুরো শরীরের বিনিময় এখনো অবশিষ্ট রয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমার বান্দাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাও। তখন তাকে জাহান্নামের দিকে টানা হবে। তিনি তখন বলবেন, হে আল্লাহ! আপনার রহমতে আমাকে জান্নাত প্রদান করুন। তখন আল্লাহ বলবেন তাকে ফিরিয়ে আন। তখন তাকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ বলবেন- হে আমার বান্দা! তুমি যখন কিছুই ছিলেনা তখন তোমাকে সৃষ্টি করেছিল কে? তিনি বলবেন- হে আল্লাহ! আপনি। আল্লাহ বলবেন- তা কি তোমার আমলের বিনিময়ে ছিল না আমার রহমতে? আবেদ বলবেন- আপনার রহমতে। আল্লাহ বলবেন- তোমাকে পাঁচশ বছর যাবৎ আমার ইবাদত করতে সামর্থ্য দান

[৫২৬]. ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (র.) (৩৭৩ হি.), তাম্বীহুল গাফেলীন, আরবী, বৈরুত, পৃ. ৪৯

করলো কে? তিনি বলবেন- হে আল্লাহ! আপনি। আল্লাহ বলবেন- সাগরের মাঝখানে পাহাড়ে তোমাকে থাকার ব্যবস্থা করে দিল কে? লবণাক্ত স্থান থেকে মিষ্টি পানি নির্গত করলো কে? প্রতি রাতে তোমার জন্য একটি ডালিম উৎপাদন করলো কে? তুমি প্রতি বছর একবার বের হয়ে আমার নিকট প্রার্থনা করতে যে, আমি যেন তোমাকে সিজদারত অবস্থা মৃত্যুদান করি। আমি তোমার সাথে সেই আচরণই করেছি। এগুলো করেছে কে? তিনি বলবেন- হে আল্লাহ! আপনি। আল্লাহ বলবেন, এগুলোর প্রতিটি আমার রহমতে হয়েছে আর আমার রহমতেই আমি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। হযরত জিব্রাইল (আ.) বলেন, সবকিছু আল্লাহর রহমতে হয়ে থাকে।[৫২৭]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ (হাদিসে কুদসী) তাঁর রব থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা নেকী ও বদীসমূহ চিহ্নিত করেছেন। এরপর সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ তাঁর কাছে এর জন্য পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। আর ভাল কাজের ইচ্ছা করে তা যদি বাস্তবে পরিণত করে তবে আল্লাহ তাঁর কাছে তার জন্য দশগুণ থেকে সাতশগুণ পর্যন্ত এমনকি এর চেয়েও অনেকগুণ বেশী সাওয়াব লিখে দেন। আর কোন ব্যক্তি অসৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না। আল্লাহ তাঁর জন্য পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। আর যদি সেই অসৎ কাজ বাস্তবে পরিণত করে তবে তার জন্য আল্লাহ তায়ালা মাত্র একটি পাপ লিখে দেন।[৫২৮]

হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কিছু সংখ্যক বন্দীসহ আগমন করেন। তাদের মধ্যে জনৈকা বন্দীনী অস্থির হয়ে দৌড়াচ্ছিল আর বন্দীদের মধ্যে কোন শিশু পেলেই সে তাকে কোলে নিয়ে তার পেটের সাথে লাগিয়ে দুধ পান করাত। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা কি মনে কর এ মেয়েটি তার সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে? আমরা বললাম, আল্লাহর শপথ! কখনো ফেলতে পারেনা। তিনি বললেন- لله أَرْحَمُ بعبَاده منْ هَذه بوَلَدهَا আল্লাহর শপথ! এ মেয়েটি তার সন্তানের প্রতি যেরূপ সদয়, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার প্রতি এর চেয়েও অনেক বেশী সদয়।[৫২৯]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি- আল্লাহ তায়ালা দয়াকে একশত ভাগে বিভক্ত করেছেন, অতঃপর নিরান্নব্বই ভাগই তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন আর মাত্র এক ভাগ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এই একভাগের কারণেই সমস্ত সৃষ্টি পরস্পরের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করে থাকে এমনকি চতুষ্পদ জন্তু তার বাচ্চার উপর থেকে এই ভয়ে পা সরিয়ে নেয় যেন বাচ্চা কষ্ট না পায়। অন্য রেওয়ায়েতে আছে আল্লাহ তায়ালার নিকট একশতটি রহমত আছে। তম্মধ্যে মাত্র একটি রহমত জিন, মানুষ, জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গের মাঝে বিতরণ করেছেন। এর কারণেই তারা

[৫২৭]. ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (র.) (৩৭৩ হি.), তাম্বীহুল গাফেলীল, আরবী, বৈরুত, পৃ. ৫২
[৫২৮]. ইমাম বুখারী (র.), (২৫৬ হি.), বুখারী শরীফ, খণ্ড ২, পৃ. ৯৬০-৯৬১, হাদিস নং- ৬০৪৭
[৫২৯]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, পৃ. ২০৩-২০৪, হাদিস নং- ৪১৮, বৈরুত

পরস্পরের প্রতি দয়া, অনুগ্রহ ও প্রেম-প্রীতি প্রদর্শন করে এবং বন্য জন্তু তার বাচ্চাকে স্নেহ করে। আল্লাহ তায়ালা অবশিষ্ট নিরান্নব্বইটি রহমত নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। এগুলো দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।[৫৩০]

অতএব যত বড় মুত্তাকীই হোক না কেন নিজের আমলের উপর ভরসা না করে আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করা উচিত।

আখলাক

আখলাক আরবী "খুলুকুন" এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ হল চরিত্র, স্বভাব, সদাচার, সৌজন্যমূলক আচরণ ইত্যাদি। মানুষের আচার ব্যবহারে, চাল-চলনে যে স্বভাব আচরণ প্রকাশ পায়, সে সবের সমষ্টি হল আখলাক। ইসলামে মানব চরিত্রের যেসব মহৎ গুণাবলির কথা উল্লেখ আছে তাকে আখলাকে হাসানা বা উত্তম চরিত্র বলা হয়। মানব জীবনে ইহ ও পরকালীন শান্তি, মুক্তি, নিরাপত্তা ইত্যাদি আখলাকে হাসানার উপর অনেকটা নির্ভর। নবী করিম ﷺএর জীবনাদর্শই হল আখলাকে হাসানার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।[৫৩১]

এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।[৫৩২]

রাসূল ﷺ আরো বলেন– أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا , أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا মু'মিনদের মাঝে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী তারাই যারা সুন্দর চরিত্রের অধিকারী।[৫৩৩]

তিনি আরো এরশাদ করেন – إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট।[৫৩৪]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا রাসূল ﷺ ছিলেন মানবজাতির মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।[৫৩৫]

কিয়ামতের দিন উত্তম চরিত্র মু'মিনের মীযানে অধিক ভারী হবে। হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ

[৫৩০]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: রিয়াদুস্ সালেহীন, পৃ. ২০৪, হাদিস নং- ৪২০
[৫৩১]. সূরা কালাম, আয়াত: ৪
[৫৩২]. মুসনাদে আহমদ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪৩২, হাদিস নং- ৪৭৪৮
[৫৩৩]. আবু দাউদ ও দারেমী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪৩২-৪৩৩, হাদিস নং- ৪৭৫২
[৫৩৪]. আবু দাউদ। সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ৪৩১, হাদিস নং- ৪৭৩২
[৫৩৫]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, বৈরুত, পৃ-২৮৪, হাদিস নং-৬২১

الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ خُلُقٍ কিয়ামতের দিন মু'মিনের পাল্লায় সচ্চরিত্রের চেয়ে অধিক ভারী আর কোন আমলই হবে না।[৫৩৬]

রাসূল ﷺ হযরত আবু যর (রা.)কে বললেন, হে আবু যর! আমি কি তোমাকে এমন দু'টি স্বভাবের কথা বলে দিবনা যা বহন করা খুবই সহজ এবং মাপের পাল্লায় অতীব ভারী? আমি বললাম, হ্যাঁ, বলুন, তিনি বললেন– طُولُ الصَّمْتِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا দীর্ঘ নিরবতা ও সচ্চরিত্রতা। সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, সৃষ্টিতে এ দু'টির ন্যায় উত্তম কোন আমল নেই।[৫৩৭]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺকে জিজ্ঞাসা করা হল কোন জিনিস দ্বারা মানুষ অধিকহারে জান্নাতে যাবে? তিনি বললেন, تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ খোদাভীতি ও সচ্চরিত্র।[৫৩৮]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি–إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ মু'মিন ব্যক্তি অবশ্যই তার উত্তম চরিত্র দ্বারা দিনে রোযা পালনকারী এবং রাতে ইবাদত কারীর মর্যাদা অর্জন করে।[৫৩৯]

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমি এমন লোকের জন্য জান্নাতের একপ্রান্তে একটি ঘরের যামিন হব, যে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেও লোক প্রদর্শনী পরিত্যাগ করে, যদিও সে এর অধিকারী। আমি এমন লোকের জন্য জান্নাতের মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি ঘরের যামিন হব, যে ঠাট্টাচ্ছলেও মিথ্যা পরিহার করে। আমি জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত একটি ঘরের যামিন হব, এমন লোকের জন্য যে তার চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে।[৫৪০]

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্য থেকে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও সবচেয়ে নিকটে উপবিষ্ট হবে সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম।[৫৪১]

[৫৩৬]. তিরমিযী, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, বৈরুত, পৃ-২৮৫ হাদিস নং-৬২৬
[৫৩৭]. বায়হাকী, শোআবুল ঈমান, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৪১৫ হাদিস নং- ৪৫৩৩
[৫৩৮]. তিরমিযী, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, বৈরুত, পৃ-২৮৫, হাদিস নং- ৬২৭
[৫৩৯]. আবু দাউদ, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, বৈরুত, পৃ-২৮৬, হাদিস নং- ৬২৯
[৫৪০]. আবু দাউদ, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, বৈরুত, পৃ-২৮৬, হাদিস নং- ৬৩০
[৫৪১]. তিরমিযী, সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃ-২৮৬, হাদিস নং-৬৩১

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺকে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে তিনি বললেন– اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ পুণ্য হল উত্তম চরিত্র আর পাপ হল যে কাজ তোমার অন্তরে وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ সংশয় সৃষ্টি করে এবং ঐ কাজটা জনসমাজে প্রকাশ হওয়াটা তুমি পছন্দ কর না।[৫৪২]

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ قَالَ اَلْخُلُقُ الْحَسَنُ মানবজাতিকে প্রদত্ত বস্তুর মধ্যে সর্বোত্তম বস্তু কি ? উত্তরে তিনি বলেন– উত্তম চরিত্র।[৫৪৩]

উত্তম চরিত্র মানুষের একটি দুর্লভ মহৎ গুণ। এর দ্বারা মানুষ যাবতীয় পূণ্য কাজে আগ্রহী হয় এবং যাবতীয় পাপ ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার প্রেরণা পায়। উত্তম ও সচ্চরিত্রবান লোককে সবাই ভালবাসে। এমনকি আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺএর প্রিয়ভাজন হয়। ফলে সমগ্র সৃষ্টির কাছে প্রিয়ভাজন হয়ে উঠে। তাই কথা আছে যে, যার চরিত্র ভাল তার সবকিছু ভাল আর যার চরিত্র খারাপ তার সবকিছু খারাপ। অতএব প্রত্যেক মানুষ উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। আর এই সচ্চরিত্র অর্জন করতে কোন অর্থকড়ির প্রয়োজন হয়না শুধু প্রয়োজন হয় আন্তরিক সদইচ্ছা। যেসব উত্তম গুণাবলীর দ্বারা মানুষ সচ্চরিত্রবান হয় তা হল– লজ্জা, কোমলতা, তাকওয়া, সত্য, ধৈয্য, কৃতজ্ঞ, ইহসান, ক্ষমা, সেবা, তাওয়াক্কুল, ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা, দানশীলতা, আমানতদারী, অঙ্গীকার রক্ষা, সদাচরণ ইত্যাদি।

লজ্জা

লজ্জা মানুষের একটি স্বভাবজাত গুণ। এর দ্বারা মানুষের মধ্যে বহুবিদ নৈতিক গুণাবলির সমাবেশ ঘটে। আল্লামা দকীকুল ঈদ (র.) বলেন– ভর্ৎসনা ও বদনামের ভয়ে মানুষের মধ্যে যে পরিবর্তন ও লাজুকতা সৃষ্টি হয় আভিধানিকভাবে সেটাকে লজ্জা বলে। পরিভাষায় যেসব গুণাবলি মানুষকে অসৎ কাজ থেকে বিরত এবং সৎকাজের প্রতি উৎসাহ যোগায় তাকে লজ্জা বলে।[৫৪৪]

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা লজ্জাশীল। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّى كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِه اِذَا رَفَعَ يَدَيْه اَنْ يُرَدَّهُمَا صُفْرًا তোমাদের প্রতিপালক লজ্জাশীল, পরম দয়ালু। বান্দা যখন তার দরবারে দু'হাত তুলে দোয়া করে, তখন তিনি তা খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।[৫৪৫]

[৫৪২]. মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪৩২ হাদিস নং- ৪৭৩০
[৫৪৩]. বায়হাকী, শোআবুল ঈমান, সূত্র: প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৪৭৩৫
[৫৪৪]. আল্লামা মুনাদি (র.) (১০০৩ হি) , শরহে শামায়েল, খণ্ড- ২ পৃ- ২১৬, করাচি
[৫৪৫]. তিরমিযী ও আবু দাউদ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৯৫, হাদিস নং- ২১৩০

লজ্জা ঈমানের অংশ। লজ্জাশীলতা কল্যাণ ও মঙ্গল বয়ে আনে। লজ্জা মানুষকে সকল অনিষ্ট ও পাপকাজ থেকে বিরত রাখে। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ। লজ্জা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।[৫৪৬]

নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِيْ اِلَّا بِخَيْرٍ। লজ্জাশীলতা কেবল মঙ্গল ও কল্যাণই বয়ে আনে।[৫৪৭]

হযরত যায়েদ ইবনে তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, نَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ, প্রত্যেক দ্বীন বা ধর্মের একটি বিশেষ স্বভাব আছে। আর দ্বীন ইসলামের বিশেষ স্বভাব হলো লজ্জা।[৫৪৮]

ফকীহ আবুল লাইস (র.) বলেন, লজ্জা দু'প্রকার। এক. মানুষের সাথে লজ্জা ও দুই. আল্লাহর সাথে লজ্জা। মানুষের সাথে লজ্জা হলো যেখানে দৃষ্টিপাত করা তোমার জন্য হালাল নয়, সেখান থেকে তোমার দৃষ্টিকে সংযত করা। আর আল্লাহর সাথে লজ্জা হলো তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা উপলব্ধি করে তাঁর নাফরমানী করতে লজ্জাবোধ করা।[৫৪৯]

জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺকে বললেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন, রাসূল ﷺ বললেন, أُوْصِيْكَ بِتَقْوَ اللهِ وَاَنْ تَسْتَحِيَ مِنَ اللهِ كَمَا تَسْتَحْى رَجُلًا صَالِحًا مِنْ قَوْمِكَ আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহকে এভাবে লজ্জা কর যেভাবে তোমার সম্প্রদায়ের সৎলোককে লজ্জা কর।[৫৫০] অর্থাৎ একজন সৎলোকের সামনে যেমন কোন গর্হিত কাজ করতে লজ্জাবোধ করে তেমনি যে কোন গুনাহের কাজ করতে গেলে আল্লাহর প্রতি লজ্জাবোধ জাগ্রত হলে সে কোন গুনাহ করতে পারবে না।

নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– اِنَّ الْحَيَاءَ وَالاِيْمَانَ قُرِنَا جَمِيْعًا فَاِذَا رُفِعَ اَحَدُهُمَا رُفِعَ الاٰخَرَ। নিশ্চয় লজ্জা ও ঈমান একত্রে মিলিত। যখন এ দু'টির একটিকে তুলে নেয়া হয় তখন অপরটিও উঠে যায়।[৫৫১]

নবী করিম ﷺ আশজ্জ ইবনে আব্দুল কায়েস (রা.)কে সম্বোধন করে বললেন– اِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ الْحَيَاءُ وَالاَنَاةُ নিশ্চয় তোমার মধ্যে এমন দু'টি অভ্যাস আছে যে দু'টিকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন। তা হল, লজ্জা ও ধীরস্থিরতা।[৫৫২]

[৫৪৬]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃ-১২ হাদিস নং-৪৭২৭
[৫৪৭]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৩১, হাদিস নং- ৪৭২৮
[৫৪৮]. ইমাম মালিক, ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী, সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৩২, হাদিস নং- ৪৭৪৫
[৫৪৯]. আবুল লাইস সমরকন্দি (র.) (৩৭৩ হি), তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ-২৯৮, বৈরুত
[৫৫০]. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), শুআবুল ঈমান, খণ্ড-১, পৃ-১৭৬, হাদিস নং- ৭৩৪৩
[৫৫১]. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), শুআবুল ঈমান, খণ্ড-১০, পৃ-১৬৬, হাদিস নং- ৭৩৩১

লজ্জা মানুষকে অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। যাদের লজ্জা নেই তারা এমন কোন গর্হিত কাজ নেই যা তারা করতে পারেনা। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– পূর্বকালের নবীগনের কথা যা বর্তমান যুগের লোকেরা পেয়েছে তা হল– اِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ যখন তোমার লজ্জা থাকবে না তখন তুমি যা ইচ্ছে করতে পারবে।[৫৫৩]

হযরত ফুযাইল ইবনে আয়ায (রা.) বলেন– خَمْسٌ مِنْ عَلَامَاتِ الشَّقَاءِ الْقُسْوَةُ فِيْ الْقَلْبِ وَجُمُوْدُ الْعَيْنِ وَقِلَّةُ الْحَيَاءِ وَالرَّغْبَةُ فِيْ الدُّنْيَا وَطُوْلُ الْاَمَلِ পাঁচটি। ১. কঠিন অন্তর, ২. জমাট চক্ষু অর্থাৎ যে চোখে পানি আসেনা, ৩. লজ্জা কম হওয়া, ৪. দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ও ৫. দীর্ঘ আশা করা।[৫৫৪]

ঈমানের পূর্ণতা হলো লজ্জা। লজ্জাহীন ব্যক্তি পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারেনা। ঈমানকে যদি দেহ ধরা হয় তবে সেটার ভূষণ হবে লজ্জাশীলতা। লজ্জাহীন মু'মিন বস্ত্রহীন দেহের ন্যায়। লজ্জাশীল মানুষ কখনো গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ করতে পারেনা। লজ্জা তাকে বাধা দেবে। পক্ষান্তরে লজ্জাহীন মানুষ করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই। তাই নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ যখন তোমার লজ্জা থাকবে না তখন তুমি যা ইচ্ছে তা করবে।[৫৫৫]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– اَلْحَيَاءُ مِنْ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنْ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ লজ্জা ঈমানের একটি অংশ। আর ঈমানদার বেহেশ্‌তে যাবে। পক্ষান্তরে লজ্জাহীনতা অত্যন্ত মন্দ আর মন্দ লোক দোযখে যাবে।[৫৫৬]

খোদাভীতি

সর্বদা আল্লাহর ভয় অন্তরে ধারণ করে আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য অপরিহার্য বিষয়। খোদাভীতি আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়। খোদাভীতির ভিত্তিতে অনর্থক কাজ করলেও তা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় হয়ে উঠে। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তি ছিল, সে তার আমল সম্পর্কে তুচ্ছ ধারণা পোষণ করত। সে তার পরিবারের লোকদেরকে বলল, যখন আমি মারা যাব, তখন তোমরা আমাকে জ্বালিয়ে ফেলবে। অতঃপর প্রচণ্ড গরমের দিনে

[৫৫২]. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৬৭, হাদিস নং- ৭৩৩৩
[৫৫৩]. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), শুআবুল ঈমান, খণ্ড-১০, পৃ-১৭১, হাদিস নং- ৭৩৩৮
[৫৫৪]. প্রাগুক্ত, পৃ-১৮২, হাদিস নং- ৭৩৫৮
[৫৫৫]. বুখারী, সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃ-৪৩১, হাদিস নং- ৪৭২৯
[৫৫৬]. আহমদ ও তিরমিযী, সূত্র: প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৪৭৩৪

আমার ছাই ভস্ম করে গমনদ্রে ছিটিয়ে দিবে। তার পরিবারের লোকেরা সেই অনুযায়ী কাজ করল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ভস্ম ছাইকে একত্রিত করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যা করলে তা কেন করলে? উত্তরে সে বলল, তা একমাত্র আপনার ভয়ে করেছি। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।[৫৫৭]

নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন– আমার প্রতিপত্তি ও সম্মানের শপথ! اِنِّي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَلَاأَمْنَيْنِ مِنْ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أمنته فِى الاخرَة، وَمَنْ أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ আমি আমার বান্দার উপর দু'টি ভয় ও দু'টি নির্ভয় একত্রিত করবনা। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমাকে ভয় করবে কিয়ামতের দিন আমি তাকে নির্ভয় রাখব। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমা থেকে নির্ভয় থাকবে, কিয়ামতের দিন আমি তাকে ভীত রাখবো।[৫৫৮]

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– إِذَا اقْشَعَرَّ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، تَحَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتَّتْ مِنَ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا মু'মিনের অন্তর যখন আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে থাকে তখন গাছের শুকনো পাতা ঝরার ন্যায় তার গুনাহসমূহ ঝরে পড়তে থাকে।[৫৫৯]

নবী করিম ﷺকে প্রশ্ন করা হয়েছিল– আপনার পরিবারের সদস্য কারা? তিনি বললেন– কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মুত্তাকী মু'মিন আমার পরিবারের সদস্য। জেনে রেখ, আমার বন্ধু হলো মুত্তাকী, আর খোদাভীতি ব্যতীত তোমাদের কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই।[৫৬০]

ধৈর্য ও সহমর্মিতা

'সবর' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ– ধৈর্য, দৃঢ়তা, বিরত থাকা ইত্যাদি। বিপদে-আপদে, দুঃখ-কষ্টে, বালা-মুছিবতে অবিচলচিত্তে আল্লাহর উপর ভরসা করে ধৈর্যধারণ করাকে 'সবর' বলে। ধৈর্যের ফল কখনো বিফল হয়না। আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন এবং তাদেরকে সাহায্য করেন। আল্লাহর বাণী– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহর নিকট) সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।[৫৬১]

[৫৫৭]. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পৃ-৯৫৯,হাদিস নং-৬০৩৬
[৫৫৮]. ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দি (র.) (৩৭৩ হি), তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ-২৪২, বৈরুত।
[৫৫৯]. প্রাগুক্ত, পৃ-২৪৩
[৫৬০]. প্রাগুক্ত
[৫৬১]. সূরা বাকারা, আয়াত- ১৫৩

আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত বিনিময় পুরোপুরি ভাবেই দেওয়া হবে।[৫৬২]

আল্লাহ বলেন, وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।[৫৬৩]

আল্লাহ আরো বলেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও শস্যের ক্ষতি সাধন করে পরীক্ষা করব। (এ পরীক্ষায়) ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন।[৫৬৪]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ যারা ধৈর্যধারণ করে আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তারা যা করে তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার দান করব।[৫৬৫]

উপরোক্ত কুরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। শুধু তাই নয় ইসলামের সকল ইবাদত পালনে ধৈর্যের প্রয়োজন। ধৈর্যশীল লোক সবকাজে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে ধৈর্যহীন লোক সবকাজে ব্যর্থ হয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণ করার তাওফীক দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত আর কোন কিছু কাউকে দেওয়া হয়নি।[৫৬৬]

হাদিসে বর্ণিত আছে– الصَّبْرُ ثَوَابُه الجَنَّةُ ধৈর্যের প্রতিদান হলো জান্নাত।[৫৬৭]

শোকর বা কৃতজ্ঞতা

শোকর আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। পরিভাষায় অনুগ্রহ লাভের কারণে হৃদয়, মুখ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকে শোকর বলা হয়।

মানুষ পার্থিব জীবনে আল্লাহর নিয়ামত দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রতি মুহূর্তে মানুষ আল্লাহর নিয়ামত নানাভাবে ভোগ করছে। মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর

[৫৬২]. সূরা যুমার, আয়াত- ১০
[৫৬৩]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৪৬
[৫৬৪]. সূরা বাকারা, আয়াত- ১৫৫
[৫৬৫]. সূরা নাহল, আয়াত- ৯৬
[৫৬৬]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৩০ হাদিস নং- ২৬
[৫৬৭]. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-১৭৩

নিয়ামত। এসব নিয়ামতের শোকর আদায় করা মানুষের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা করলে এর সংখ্যা গুণে শেষ করতে পারবেনা। আর মানুষ অবশ্যই অত্যাচারী, অকৃতজ্ঞ।[৫৬৮]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দিয়ে বলেন– وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ তোমরা আমার নিয়ামতের শোকর আদায় কর এবং আমার অকৃতজ্ঞ হইও না।[৫৬৯]

বান্দা আল্লাহর ইবাদত করার মাধ্যমেই আল্লাহর শোকর আদায় হয়ে যায়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন–بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ বরং তুমি আল্লাহর ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞদের অর্ন্তভুক্ত হও।[৫৭০]

বান্দা আল্লাহর শোকর করলে আল্লাহ নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেন। পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞ হলে আযাব ও শাস্তি দেন এবং প্রদত্ত নিয়ামত ছিনিয়ে নেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ যদি তোমরা আমার নিয়ামতের শোকর আদায় কর তবে আমি তোমাদের জন্য তা বাড়িয়ে দেব পক্ষান্তরে যদি তোমরা আমার নিয়ামতকে অস্বীকার কর তবে জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আমার আযাব খুবই কঠোর।[৫৭১]

আল্লাহ তায়ালা বলেন, سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ আল্লাহ অচিরেই শোকর আদায়কারী দের প্রতিদান দেবেন।[৫৭২]

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ আর তোমরা আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।[৫৭৩]

হযরত সুহাইব ইবনে সিনান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, মু'মিনের সবকিছু আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া অন্যদের ব্যাপারে এরূপ নয়। তার জন্য আনন্দদায়ক কিছু হলে সে আল্লাহর শোকর করে, তাতে

[৫৬৮]. সূরা ইব্রাহিম, আয়াত- ৩৪
[৫৬৯]. সূরা বাকারা, আয়াত– ১৫২
[৫৭০]. সূরা যুমার, আয়াত- ৬৬
[৫৭১]. সূরা ইব্রাহিম, আয়াত-৭
[৫৭২]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৪৪
[৫৭৩]. সূরা নাহল, আয়াত- ১১৪

তার মঙ্গল হয়। আর তার কোন ক্ষতিকর কিছু হলে সে ধৈর্যধারণ করে, সেটিও তার জন্য কল্যাণকর।[৫৭৪]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ বলেন, আমার মু'মিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ছাড়া আর কোন পুরস্কার নেই। যখন আমি দুনিয়া থেকে তার প্রিয়জনকে নিয়ে যাই তখন সে সাওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করে।[৫৭৫]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যখন আমি আমার বান্দাকে তার দু'টি প্রিয় বস্তুর মাধ্যমে পরীক্ষা করি (অর্থাৎ তার দু'টি চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেই) আর সে তাতে ধৈর্যধারণ করে, তখন আমি তাকে তার বিনিময়ে জান্নাত দান করি।[৫৭৬]

কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের মর্যাদা বর্ণনায় নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– **الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ** কৃতজ্ঞ আহার গ্রহণকারী ধৈর্যশীল রোযাদারের ন্যায়। অর্থাৎ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি পানাহার করেও পানাহার পরিত্যাগকারী রোযাদারের মর্যাদা ও সাওয়াবের অধিকারী হবে।

কোমলতা বা নম্রতা

আল্লামা তিবী (র.) বলেন– কোন কাজকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধবের সাথে নরম, কোমল ও ভদ্রতা সুলভ আচরণ করার নামই হল কোমলতা। এটাও আল্লাহর গুণ বিশেষ। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– **إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ** আল্লাহ স্বয়ং কোমল, তিনি কোমলতাকে ভালবাসেন। তিনি কঠোরতার উপর যা দান করেন না তা কোমলতার জন্য দান করেন। কোমলতা ছাড়া অন্যকিছুতেই তা দান করেননা।[৫৭৭]

নবী করিম ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)কে বললেন– কোমলতাকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক কর এবং কঠোরতা ও নির্লজ্জতা পরিহার কর। কেননা **إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ** যে জিনিসের মধ্যে কোমলতা আছে সেটাই

[৫৭৪]. মুসলিম, সূত্রঃ রিয়াদুস সালেহীন, পৃ- ৩০, হাদিস নং-২৭, বৈরুত
[৫৭৫]. বুখারী, সূত্রঃ প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৫, হাদিস নং- ৩২
[৫৭৬]. বুখারী, সূত্রঃ প্রাগুক্ত, পৃ– ৩৫-৩৬, হাদিস নং- ৩৪
[৫৭৭]. মুসলিম, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ- ৪৩০-৪৩১, হাদিস নং-৪৭২৫

শ্রীবৃদ্ধির কারণ হয়। আর সে জিনিস থেকে তা প্রত্যাহার করা হয়, তা ক্রটিপূর্ণ হয়ে যায়।[৫৭৮]

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– **مَنْ يُحْرَمْ الرِّفْقَ يُحْرَمْ الْخَيْرَ** যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয় তাকে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়।[৫৭৯] অর্থাৎ কোমলতা যাবতীয় কল্যাণের উৎস। সুতরাং যার কাছে কোমলতা নেই তার কাছ থেকে কল্যাণকর কিছু আশা করা যায় না।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– **مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ وَمَنْ حُرِّمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِّمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ** যাকে কোমলতার অংশ প্রদান করা হয়েছে তাকে ইহ ও পরকালের কল্যাণ প্রদান করা হয়েছে। আর যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাকে ইহ ও পরকালের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।[৫৮০]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– আমি কি তোমাদেরকে সে ব্যক্তির কথা বলে দেবনা যার উপর দোযখের আযাব হারাম হবে? সে ঐ ব্যক্তি যার মেজাজ নরম হবে, স্বভাব কোমল হবে এবং আচরণ ভদ্র হবে।[৫৮১]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– আল্লাহ তায়ালা যখন কোন পরিবারের কল্যাণ সাধন করতে চান, তখন তাদের মধ্যে কোমলতা ও সহনশীলতা প্রবেশ করিয়ে দেন। কোমলতা যদি কোন বস্তু হতো, তাহলে মানুষ এর চেয়ে অধিক সৌন্দর্যময় আর কোন বস্তু দেখতে পেতো না। পক্ষান্তরে কঠোরতা যদি বস্তু হতো তাহলে মানুষ এর চেয়ে অধিক কুৎসিত কোন বস্তু দেখতে পেতো না।[৫৮২]

সত্য ও সত্যবাদিতা

সত্য একটি মহৎ গুণ। এটি ঈমানদারের অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।[৫৮৩]

[৫৭৮]. প্রাগুক্ত
[৫৭৯]. মুসলিম, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৩১, হাদিস নং- ৪৭২৬
[৫৮০]. শরহুস সুন্নাহ, সূত্রঃ প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৪৭৩৩
[৫৮১]. তিরমিযী, সূত্রঃ প্রাগুক্ত, পৃ-৪৩২, হাদিস নং-৪৭৪০
[৫৮২]. ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দি (র.) (৩৭৩ হি), তাম্বীহুল গাফেলীন, বৈরুত, পৃ-৩৪৩
[৫৮৩]. সূরা তাওবা, আয়াত-১১৯

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا। তোমরা সত্যকে ধারণ কর। কেননা, সত্য পূণ্যের দিকে নিয়ে যায়। আর পূণ্য বেহেস্তের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্য বলতে চেষ্টা করে আল্লাহ তায়ালার কাছে তাকে সিদ্দিক (সত্যবাদী) বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলতে চেষ্টা করে আল্লাহর কাছে তাকে অধিক মিথ্যাবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়।[৫৮৪]

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে আমাকে ছয়টি জিনিসের জামানাত দাও। আমি তোমাদের জন্য বেহেস্তের জামিন হব। ১. তোমরা যখন কথা বল তখন সত্য বলবে। ২. যখন ওয়াদা কর তা পূর্ণ করবে। ৩. যখন তোমাদের কাছে আমানত রাখা হয় তা আদায় করবে। ৪. নিজেদের লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করবে। ৫. আপন দৃষ্টিকে অবনীত রাখবে এবং ৬. আপন হাতকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে।[৫৮৫]

ক্ষমা

ক্ষমা আল্লাহ তায়ালার অন্যতম গুণ। ইসলামী পরিভাষায় প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করে দেওয়াকে ক্ষমা বলে। আল্লাহ তায়ালা পরম ক্ষমাশীল, তিনি সর্বশক্তিমান ও মহাপ্রতাপশালী। তাঁর কাজে বাধা দেওয়ার সাধ্য নেই কারো। অধিকাংশ মানুষ তাঁর অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন এবং তাঁর দয়া ও নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করেন না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺকে ক্ষমাশীল হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে বলেন– خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ হে নবী! আপনি ক্ষমা করুন। সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলুন।[৫৮৬]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ অতএব আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।[৫৮৭]

[৫৮৪]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ৪১১-৪১২, হাদিস নং- ৪৪৯৩
[৫৮৫]. আহমদ ও বায়হাকী, সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃ-৪১৫, হাদিস নং- ৪৫৩৬
[৫৮৬]. সূরা আ'রাফ, আয়াত- ১৯৯
[৫৮৭]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৫৯

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মানুষকে ক্ষমাশীল হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে বলেন– وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ তোমরা যদি ওদের মার্জনা কর, ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।[৫৮৮]

ক্ষমা করা মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (মুত্তাকী তারাই) যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা রাগ সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল হয়। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।[৫৮৯]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন– وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى আর ক্ষমা করে দেওয়াই তাকওয়ার অধিক নিকটতর।[৫৯০]

ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ। যারা যতবেশী মহৎ তারা ততবেশী ক্ষমাশীল হয়। নবী করিম ﷺকে তায়েফবাসী পাথর নিক্ষেপ করে রক্তাক্ত করার পর আল্লাহ তায়ালা পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশ্তাকে পাঠান। ফেরেশ্তা তায়েফবাসীকে কঠিন শাস্তি দেয়ার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেননি বরং তাদেরকে ক্ষমা করে তাদের জন্য দোয়া করেন। তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ব্যতীত কখনো কাউকে মারেন নি। নিজের স্ত্রীগণকেও না, খাদেমকেও না। তাঁকে কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। অবশ্য আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।[৫৯১]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ অশ্লীলবাসী ছিলেন না এবং অশোভন কথা বলার চেষ্টাও করতেন না। তিনি হাট-বাজারে শোরগোলকারী ছিলেন না এবং তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দ্বারা নিতেন না বরং তা ক্ষমা করে দিতেন এবং উপেক্ষা করে চলতেন।[৫৯২]

মক্কা বিজয়ের দিন প্রতিশোধ নেয়ার পূর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি মক্কাবাসী কাফিরদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। ক্ষমার এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল।

তাওয়াক্কুল

জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি ভরসা করা মু'মিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আরবীতে এটাকে তাওয়াক্কুল বলে। ইমাম রাযী (র.) বলেন– التَوَكُّلُ هُوَ اَنْ يُرَاعِى الانْسَانُ الاَسْبَابَ الظَّاهِرَةَ وَلكِنْ لَا يَعُوْلُ بِقَلْبِه عَلَيْهَا بَلْ يَعُولُ عَلى عِصْمَةِ الحَقِّ। মানুষ তার বাহ্যিক

[৫৮৮]. সূরা তাগাবুন, আয়াত-১৪
[৫৮৯]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৩৪
[৫৯০]. সূরা বাকারা, আয়াত-২৩৭
[৫৯১]. মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৫১৯, হাদিস নং-৫৪৪৬ ও রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-২৯০ হাদিস নং-৬৪৪
[৫৯২]. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৫১৯, হাদিস নং- ৫৪৪৮

উপায় উপকরণ ব্যবহার করবে তবে তার ভরসা ঐসব উপায় উপকরণের উপর হবে না বরং আল্লাহর উপর হবে।[৫৯৩]

আল্লামা আলূসী (র.) বলেন– وَاَصْلُ التَوَكُّلُ اِظْهَارُ العِجْزِ وَالاعْتِمادِ عَلى الغَيْرِ তাওয়াক্কুল এর মূল হল অক্ষমতা প্রকাশ করা এবং অন্যের উপর ভরসা করা।[৫৯৪]

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বান্দাকে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার প্রতি বিশেষ ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেন– وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ আর সে চিরঞ্জীব আল্লাহর উপর ভরসা কর, যিনি অমর।[৫৯৫]

তিনি আরো বলেন– وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ আল্লাহর উপরই মু'মিনের ভরসা করা উচিৎ।[৫৯৬]

অন্যত্র বলেছেন– فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ তুমি যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর।[৫৯৭]

কুরআনে আরো বলা হয়েছে-وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।[৫৯৮]

ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ঈমানদার তারাই যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণকালে কেঁপে উঠে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠকালে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদের প্রভুর উপরই ভরসা করে।[৫৯৯] হাদিস শরীফে হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِه لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথাযথ ভরসা করতে পার, তবে তিনি পাখিকে রিযিক দেয়ার ন্যায় তোমাদেরকেও দিবেন। পাখিতো সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।[৬০০]

[৫৯৩]. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) (৬০৬ হি) তাফসীরে কবীর, খণ্ড-৩, পৃ- ৮৩ বৈরুত
[৫৯৪]. সাইয়্যেদ মাহমুদ আলূসী (র.) (১২৭০হি) রুহুল মা'আনী, খণ্ড-৪, পৃ-১০৭ বৈরুত
[৫৯৫]. সূরা ফোরকান, আয়াত- ৫৮
[৫৯৬]. সূরা ইব্রাহিম, আয়াত- ১১
[৫৯৭]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৫৯
[৫৯৮]. সূরা তালাক, আয়াত-৩
[৫৯৯]. সূরা আনফাল, আয়াত– ২
[৬০০]. তিরমিযী সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৫৭ হাদিস নং-৭৯ বৈরুত ও মিশকাত শরীফ, পৃ-৪৫২ হাদিস নং-৪৯৭৪

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ يَعْنِىْ مِنْ بَيْتِه بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يُقَالُ لَهُ هُدِيْتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ যে ব্যক্তি তার বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলে– আল্লাহর নামে বের হলাম এবং আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাহায্যকারী নেই। তখন তাকে বলা হয় তোমাকে হেদায়ত দেওয়া হয়েছে। তোমাকে যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে আর শয়তান তার থেকে দূরে চলে যায়।[৬০১]

আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসাকারী ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা হল ঐ সকল লোক যারা মন্ত্র-তন্ত্র করায় না, অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না এবং যারা নিজেদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে।[৬০২]

বাহ্যিক উপায়-উপকরণ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়। বরং সামর্থ অনুযায়ী যাবতীয় বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করার পর ফলাফলের ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোর্পদ করার নামই হচ্ছে তাওয়াক্কুল। এ ব্যাপারে নবী করিম ﷺ উত্তম নমুনা রেখে গেছেন আমাদের সামনে। তিনি ছিলেন সাইয়্যেদুল মুতাওয়াক্কিলিন তথা সর্বশ্রেষ্ঠ ভরসাকারী। এতদসত্ত্বেও তিনি যুদ্ধের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করা, অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করা এবং রোগ-ব্যাধিতে চিকিৎসা করা, হেরা পর্বতে যাওয়ার সময় কয়েক দিনের খাবার নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কার্যক্রম বাহ্যিক বিষয়ের অবলম্বনের প্রতি শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহকে রিযিকদাতা মনে করে তাঁর উপর ভরসা করে বসে থেকে যাবতীয় কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকার নাম ভরসা নয়। বরং মেহনত করে সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করতে হবে এবং এর পরিণামের ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। বান্দা যখন কোন কাজের চেষ্টা করে তখন আল্লাহ ঐ বান্দাকে সাহায্য করেন। ফলে বান্দা ঐকাজে সফলতা লাভ করে।

ইমাম গায্যালী (র.) বলেন– তোমার সামনে খাবার আছে আর তুমি ক্ষুধার্ত তবুও তুমি খাবারের দিকে হাত বাড়াচ্ছনা আর বলছ আমি ভরসাকারী, এটি ভুল। এভাবে খাবার মুখে দেওয়া, দাঁতে চিবানো ও গলধঃকরণ করা তাওয়াক্কুলের বিরোধ নয়। বীজ

[৬০১]. আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ, সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃ-৫৯ হাদিস নং- ৮৩, বৈরুত
[৬০২]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ- ৪৫২, হাদিস নং- ৪৯৪৩

বপনসহ চাষাবাদের যাবতীয় কার্যক্রম ব্যতীত ফসল উৎপন্ন হয়না। এটি আল্লাহর সুন্নত।[৬০৩]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি বলল– হে আল্লাহর রাসূল! আমি উটনী বেঁধে তাওয়াক্কুল করব না কি ছেড়ে দিয়ে তাওয়াক্কুল করব? তিনি বললেন– اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ তুমি উটনী বেঁধে তাওয়াক্কুল কর।[৬০৪]

হযরত ওমর (রা.) কতিপয় লোকের পাশ দিয়ে গমন করার সময় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন– তোমরা কি করছ? উত্তরে তারা বলল–আমরা তাওয়াক্কুল করছি। তিনি বললেন– না, তোমরা লোকের সম্পদের উপর তাওয়াক্কুল করছ। প্রকৃত ভরসাকারী হল যে মাটিতে বীজ বপন করে আল্লাহর উপর ভরসা করে।[৬০৫]

আদল তথা ন্যায়পরায়নতা

'আদল' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ ইনসাফ, ন্যায়পরায়নতা, সুবিচার ও সমান করে দেওয়া। যাবতীয় কাজ-কর্মে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক মধ্যপন্থা অবলম্বন করাকে আদল বলা হয়। ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে,সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সর্বক্ষেত্রে ইনসাফের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এগুলোর কোন একটিতে যদি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা না হয় তাহলে তাতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে– إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়নতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।[৬০৬]

আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى তোমরা সুবিচার কর, তা তাক্ওয়ার নিকটতর।[৬০৭]

বিশেষ করে বিচার ব্যবস্থায় ইনসাফের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ অত্যাচারিত হয়ে বিচারের ধারস্থ হয়। জাতি ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, উঁচু-নিচু, নির্বিশেষে সকলের জন্য ন্যায় বিচার করা বিচারকের উপর কতর্ব্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন তোমরা ইনসাফের সাথে বিচার করবে।[৬০৮]

[৬০৩]. ইমাম মুহাম্মদ গাযযালী (র.) (৫০৫ হি), ইয়াহিয়াউল উলুম, খণ্ড-৪, পৃ-২৫৯, বৈরুত
[৬০৪]. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি), তিরমিযী শরীফ, পৃ-৩৬১ করাচী
[৬০৫]. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), শোআবুল ঈমান, খণ্ড-২, পৃ-৮১, বৈরুত
[৬০৬]. সূরা নাহল, আয়াত- ৯০
[৬০৭]. সূরা মায়িদা, আয়াত-৮
[৬০৮]. সূরা নিসা, আয়াত-৫৮

আল্লাহ তায়ালা নিজেও ন্যায়বিচারক, সুতরাং তিনি ন্যায়বিচারকদের ভালবাসেন। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে– وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ যদি তুমি বিচার কর তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকদের ভালবাসেন।[৬০৯]

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, একদিন একজন কুরাইশ বংশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরির অপরাধে ধরা পড়লে, রাসূল ﷺ তার হাত কাটার নির্দেশ দেন। অভিজাত্য ও বংশ মর্যাদার কথা উল্লেখ করে মহিলার শাস্তি লাঘব করার জন্য নবী করিম ﷺএর কাছে সুপারিশ করা হলে তিনি বলেন– তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এ কারণেই ধ্বংস হয়েছিল। তাদের কোন সাধারণ লোক অন্যায় করলে তার শাস্তি হত। পক্ষান্তরে কোন মর্যাদাবান লোক অন্যায় করলে তার শাস্তি হত না। আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদ ﷺ 'র কন্যা ফাতিমাও যদি এ কাজ করত, তবুও আমি তার হাত কাটার নির্দেশ দিতাম।[৬১০]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের কঠিন দিনে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন। তম্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর লোক হচ্ছেন– ন্যায়পরায়ন শাসক।[৬১১]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا নিশ্চয় ন্যায়বিচারকগণ আল্লাহ তায়ালার নিকট নূরের মিম্বরে আসন গ্রহন করবে। যারা তাদের বিচারের ক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং যেসব দায়দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত করা হয় সে সব বিষয়ে সুবিচার করে।[৬১২]

হযরত ইয়াদ ইবনে হিমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি– জান্নাতের অধিকারী হবে তিন শ্রেণীর লোক। তম্মধ্যে অন্যতম হল ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ ন্যায়পরায়ণ শাসক যাকে ন্যায় বিচারের তাওফীক দেয়া হয়েছে।[৬১৩]

আমানত রক্ষা করা

যে আমানত রক্ষা করে তাকে আমানতদার বলা হয়। আমানতদারী একটি মহৎ গুণ। নবী করিম ﷺ এতই আমানতদার ছিলেন যে, তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল 'আল আমিন'। কাফির মুশরিকরাও তাঁর কাছে মূল্যবান বস্তু আমানত রাখত। আল্লাহ তায়ালা

[৬০৯]. সূরা মায়েদা, আয়াত-৪২
[৬১০]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৩১৪
[৬১১]. বুখারী, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-২৯৬, হাদিস নং- ৬৫৯
[৬১২]. মুসলিম, সূত্র: প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৬৬০
[৬১৩]. মুসলিম, সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃ-২৯৭,হাদিস নং-৬৬২

কুরআন মাজীদে এরশাদ করেন– إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا নিশ্চয় আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা আমানতের হকদারকে তা ফিরিয়ে দাও।[৬১৪]

উপরোক্ত আয়াতে আমানত শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমানত অনেক প্রকার। আল্লাহর আমানত ও বান্দার আমানত। আল্লাহর আমানত হচ্ছে শরীয়তে আরোপিত সকল ফরয-ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ বিষয়াদি পরিত্যাগ করা। বান্দার আমানত হল, আর্থিক আমানত যা সংরক্ষণ করা এবং যথাসময়ে তার প্রাপককে ফেরত দেওয়া। এছাড়াও কেউ কাউকে গোপন কথা বললে কিংবা পরামর্শ করলে তা গোপন করাও আমানত। শরীয়ত সম্মত অনুমতি ব্যতীত কারও গোপন তথ্য ফাঁস করা আমানতের খিয়ানত। মজুর ও কর্মচারীকে অর্পিত কাজের জন্য পারস্পরিক সমঝোতাক্রমে যে সময় নির্ধারিত হয় এবং যে পরিমাণ কাজের চুক্তি হয় সময়মত সে কাজ পূর্ণ করাও একটি আমানত। এর ব্যতিক্রম করলে তা হবে খিয়ানত।

আমানতদারী মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ প্রকৃত সফল মু'মিন তারাই যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।[৬১৫]

আমানতদারী ঈমানের পূর্বশর্ত। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার কাছে ঈমান নেই আর যে অঙ্গীকার রক্ষা করেন না। তার মধ্যে পূর্ণ দ্বীন নেই।[৬১৬]

আমানতের খিয়ানত করা মুনাফিকের আলামত। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ মুনাফিকের আলামত তিনটি। ১. যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে। ২. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং ৩. আমানত রাখলে খিয়ানত করে।[৬১৭]

ওয়াদা রক্ষা করা

ওয়াদা পালন করা দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা পালনের জন্য মানবজাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে– وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا আর তোমরা ওয়াদা পূর্ণ কর। নিশ্চয় ওয়াদা পালন সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।[৬১৮]

৬১৪. সূরা নিসা,আয়াত-৫৮
৬১৫. সূরা মু'মিনুন, আয়াত- ৮
৬১৬. বায়হাকী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-১৫
৬১৭. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-১৭
৬১৮. সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত– ৩৪

সৎলোকের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন–وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا আর তারা প্রতিশ্রুতি দিলে পূর্ণ করে।[৬১৯]

রাসূল ﷺ ওয়াদাপূর্ণ করার নিমিত্তে লাগাতার তিনদিন যাবৎ অপেক্ষা করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাসামা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺএর নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে আমি তাঁর কাছ থেকে কিছু খরিদ করেছিলাম, যার মূল্য পরিশোধ আমার উপর বাকী রয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে ওয়াদা দিলাম যে, আমি তা এ স্থানে নিয়ে আসছি। কিন্তু আমি ভুলে গেলাম। তিনদিন পর আমার স্মরণ হল। এসে দেখলাম তিনি উক্ত স্থানেই আছেন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি আমাকে কষ্টে ফেলেছ, আমি তিনদিন যাবৎ এ স্থানে তোমারই অপেক্ষা করছি।[৬২০]

কোন ব্যক্তি মৃত্যুর কারণে ওয়াদা পালন করতে না পারলে তার প্রতিনিধি কিংবা ছেলে-মেয়েরা তা পূর্ণ করতে হবে। হযরত জাবির (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করলেন এবং হযরত আবু বকর (রা.)এর কাছে হযরত আলী ইবনে হাযরামী (রা) এর পক্ষ থেকে মালামাল এল, তখন হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, রাসূল ﷺ এর উপর যদি কারো ঋণ থাকে অথবা তাঁর পক্ষ থেকে দেওয়া কোন ওয়াদা থাকে তবে তারা যেন আমার কাছে আসে। জাবির (রা.) বলেন, আমি বললাম, রাসূল ﷺ আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলেন যে, আমাকে এতগুলো দেবেন। অর্থাৎ তিনি তিনবার হস্তদ্বয় প্রসারিত করেছিলেন। হযরত জাবির (রা.) বলেন, অতঃপর আবু বকর (রা.) আমাকে এক অঞ্জলি দিলেন, আমি গুণে দেখলাম তাতে পাঁচশত দিরহাম রয়েছে। তখন আবু বকর (রা.) বললেন, এ পরিমাণ তুমি আরো দুবার নাও।[৬২১]

এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ

- হযরত নাজমুদ্দিন কুবরা (রা.) ১০ জমাদিউল আউয়াল
- ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) ১৯ জমাদিউল আউয়াল ৯১৩/৯১১ হিজরি
- হযরত ইব্রাহিম ইবনে আদহাম (র.) ২৬ জমাদিউল আউয়াল ২৬২ হিজরি
- হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) জমাদিউল আউয়াল ৮ হিজরি

৬১৯. সূরা বাকারা, আয়াত-১১৭
৬২০. আবু দাউদ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪১৬, হাদিস নং-৪৫৪৩
৬২১. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪১৬, হাদিস নং-৪৫৪২

জমাদিউস সানি

সাহাবায়ে কিরাম

সাহাবী শব্দের অর্থ সঙ্গী, সাথী। পরিভাষায় هُوَ مَنْ لَقِىَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَات عَلى الاِيْمَانِ যাঁরা ঈমান অবস্থায় নবী করিম ﷺ'র সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ঈমান নিয়ে ইন্তেকাল করেছেন তাঁদেরকে সাহাবী বলা হয়।[৬২২]

ইমাম বুখারী (র.) বলেন- وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَآهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ মুসলমানদের মধ্যে যে নবী করিম ﷺ'র সাহচর্য পেয়েছেন অথবা তাঁকে যিনি দেখেছেন, তিনি তাঁর সাহাবী।[৬২৩]

হাফিয ইবনে হাজর আসকালানী (র.) বলেন- اَصَحُّ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَالِكَ اَنَّ الصَّحَابِىَّ مَنْ لَقِىَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلى الاِسْلاَمِ فَيَدْخُلُ فِيْمَنْ لَقِيَه مَنْ طَالَتْ مَجَالِسَتِه اَوْ قَصُرَتْ وَمَنْ رَوَى عَنْهُ اَوْ لَمْ يَرْوِ وَمَنْ غَزَا مَعَه اَوْ لَمْ يَغْزُ وَمَنْ رَاهُ رُوْيَةٌ وَلَمْ يُجَالِسْهُ وَمَنْ لَمْ يَرَهُ لِعَارِضٍ كَالْاَعْمَى সাহাবীর সংজ্ঞা সম্পর্কে আমার কাছে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হল- যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে নবী করিম ﷺ'র সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন তিনিই সাহাবী। এ সংজ্ঞায় ঐ ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হবেন, যার সাহচর্য নবী করিম ﷺ'র সাথে বেশী হোক বা কম হোক, যিনি তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করুক বা না করুক এবং যিনি তাঁর সাথে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক বা না করুক। তাছাড়া কোন বাহ্যিক কারণে যথা অন্ধ হওয়ার কারণে যিনি নবী করিম ﷺকে দেখেন নি তিনিও।

সাহাবীর সংখ্যা এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার। এ সংখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও লক্ষাধিক হওয়ার ক্ষেত্রে সকলেই একমত। নবী-রাসূলগণের পরেই এঁদের মর্যাদা। নবী করিম ﷺ এর সংস্পর্শের ও সাহচর্যের কারণের এরা খাঁটি ও পূর্ণাঙ্গ মু'মিনের মর্যাদা লাভ করেছেন। তাঁরা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ'র মনোনীত দল। এরা সত্যের মাপকাঠি। কুরআন ও হাদিস তথা পূর্ণাঙ্গ ইসলাম তাঁদের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। তাঁরা সমালোচনার উর্ধ্বে। তাঁরা উম্মতের প্রশংসার দাবীদার। ইসলামের জন্য, আল্লাহ ও

---

৬২২. মুফতি আমিমুল ইহসান, কাওয়ায়েদুল ফিকহ, পৃ. ৩৪৬

৬২৩. ইমাম বুখারী (র.) (২৬১ হি.), বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পৃ. ৫১৫

রাসূল ﷺ'র জন্য তাঁদের কষ্ট, ত্যাগ, উৎসর্গ অবিস্মরণীয়। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ ও রাসূল ﷺ'র মনোনীত

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে মনোনীত করেছি।[৬২৪]

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসূলগণের পর সমস্ত বিশ্ব ভূমণ্ডলে আমার সাহাবীগণকে মনোনীত করেছেন।[৬২৫]

সাহাবায়ে কিরামের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا আল্লাহ মু'মিনদের (সাহাবীদের) প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তাঁরা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাঁদের অন্তরে ছিল, অতঃপর তিনি তাঁদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাঁদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।[৬২৬]

আল্লাহ তায়ালা আরো এরশাদ করেন, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মধ্যে পুরাতন এবং যারা তাঁদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত আছে প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল বড় সফলতা।[৬২৭]

সাহাবায়ে কিরামের গুণকীর্তন করে আল্লাহ বলেন- لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

---

৬২৪. সূরা ফাতির, আয়াত ৩২

৬২৫. মুসনাদে বাযযার।

৬২৬. সূরা, ফাতাহ, আয়াত ১৮

৬২৭. সূরা তাওবা, আয়াত ১০০

الْمُفْلِحُونَ। এই ধনসম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বসত-ভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে, তারাই সত্যবাদী। যারা মুহাজিরদের আগমণের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদের যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করেনা এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।[৬২৮]

পবিত্র কুরআনে আরো ঘোষণা করা হয়েছে- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন।[৬২৯]

এখানে 'সিজদার চিহ্ন' বলে সেই নূরের আভাকে বুঝানো হয়েছে, যা নামাযের প্রভাবে নামাযীর মুখমণ্ডলে পরিস্পুটিত হয়। কপালে সিজদার দাগ বুঝানো হয়নি, যা কুরআনের অপব্যাখ্যাকারী কতিপয় লোকেরা বলে থাকে। বিশেষত তাহাজ্জুদের নামাযের ফলে উপরোক্ত চিহ্ন খুব বেশী ফুটে উঠে। ইবনে মাযাহ শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন-مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ যারা রাতের বেলায় বেশী নামায পড়ে, দিনের বেলায় তাদের চেহারা সুন্দর আলোকোজ্জল হয়। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এর অর্থ নামাযীদের মুখমণ্ডলের সেই নূর, যা কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে।

উপরোক্ত মতটি কেবল আহলে সুন্নাতের নয় বরং দেওবন্দী আকীদার মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী মা'আরিফুল কুরআনে উপরে বর্ণিত আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন।

হাদিস শরীফের আলোকে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা

সাহাবায়ে কিরাম উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষ

রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ। সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হল আমার যুগের মানুষ (সাহাবীগণ), এরপর তৎসংলগ্ন যুগ (তাবেয়ীগণ), তারপর তৎসংলগ্ন যুগ (তাবে তাবেয়ীগণ)।[৬৩০]

৬২৮. সূরা হাশর, আয়াত ৮-৯।
৬২৯. সূরা ফাতাহ, আয়াত ২৯।
৬৩০. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.), (২৫৬ হি.), সহীহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃ. ৫১৫, হাদিস নং ৩৩৮৯।

নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, أَكْرِمُوا أَصْحَابِي فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান কর, কেননা তারা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।[৬৩১]

সাহাবীগণ হলেন উম্মতের নিরাপত্তা স্বরূপ

হযরত আবু বুরদা (রা.) তাঁর পিতা আবু মুসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন রাসূল ﷺ আসমানের দিকে মাথা তুলে তাকালেন। বস্তুত তিনি প্রায় (অহীর অপেক্ষায়) আসমানের দিকে মাথা তুলে দেখতেন। তারপর বললেন, তারকারাজি আসমানের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। যেদিন এইসব গ্রহগুলো চলে যাবে, সেদিন আসমানে তাই ঘটবে, যার প্রতিশ্রুতি আগেই দেয়া হয়েছে, (অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যাবে) আর আমি হলাম আমার সাহাবীদের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। সুতরাং আমি যখন চলে যাবো, তখন আমার সাহাবীদের মধ্যেও তা সংঘটিত হবে, যার প্রতিশ্রুতি আগেই দেয়া হয়েছে। (অর্থাৎ যুদ্ধবিগ্রহ) আর আমার সাহাবীরা হলেন আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তা স্বরূপ। যখন আমার সাহাবীরা চলে যাবে, তখন আমার উম্মতের উপর তাই নেমে আসবে, পূর্বেই যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ বিদআত, অনৈসলামিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে এবং কল্যাণ চলে যাবে আর অকল্যাণের আগমন ঘটবে)।[৬৩২]

সাহাবীগণ তারকারাজির ন্যায়

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি– আমি আমার প্রভুকে আমার ওফাতের পর আমার সাহাবীদের মধ্যে মতবিরোধ সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি অহীর মাধ্যমে আমাকে জানালেন যে, হে মুহাম্মদ! আমার নিকট আপনার সাহাবীদের মর্যাদা হল আসমানের তারকারাজির ন্যায়। এর একটি অপরটি থেকে উজ্জ্বল। অথচ প্রত্যেকটির মধ্যে আলো রয়েছে। সুতরাং তাদের মতভেদ থেকে যে কেউ একটি অভিমত গ্রহণ করবে, সে আমার কাছে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত। হযরত ওমর (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ আরো বলেন أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ আমার সাহাবীরা হলেন- তারকারাজির ন্যায়। অতএব তোমরা এদের যে কাউকেও অনুকরণ করবে হেদায়াত পাবে।[৬৩৩]

উপরোক্ত হাদিস শরীফে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে আকাশের নক্ষত্ররাজির সাথে তুলনা দিয়েছেন। প্রত্যেক নক্ষত্রের মধ্যে যেমন আলো আছে অনুরূপ প্রত্যেক সাহাবী হেদায়েতের আলোকবর্তিকাস্বরূপ। তৎকালে পথভ্রষ্ট পথিক ও জাহাজের

৬৩১. ইমাম নাসাঈ (র.) (৩০৩ হি.), নাসাঈ শরীফ, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৫৫৪, হাদিস নং ৫৬৩৫।
৬৩২. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি.), সহীহ মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৫৫৩, হাদিস নং ৫৬৩২।
৬৩৩. রযীন, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫৫৪, হাদিস নং ৫৬৪০।

নাবিক নক্ষত্রের মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান খুঁজে নিত। অনুরূপ যেকোন পথভ্রষ্ট মানুষ যে কোন একজন সাহাবীকে অনুসরণ করলে অবশ্যই সে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে। কারণ তারা প্রত্যেকেই সত্যের মাপকাঠি। এদের মধ্যে যেসব ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে তার সমালোচনা করারও অনুমতি নেই। কেননা তা ছিল ইজতিহাদী ভুল যা নিঃসন্দেহে ক্ষমাযোগ্য। হযরত আব্দুল বার (রা.) বলেন, مَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَسْخُطْ عَلَيْهِ اَبَدًا انْ شَاءَ اللهُ আল্লাহ তায়ালা যার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, ইনশাআল্লাহ তিনি তার উপর কখনো অসন্তুষ্ট হবেন না।

সাহাবায়ে কিরামের মতবিরোধ উম্মতের জন্য রহমত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, مَهْمَا اُوْتِيْتُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَالْعَمَلُ بِه لَاعُذْرَ اَحَدٌكُمْ فِى تَرْكِه فَانْ لَمْ يَكُنْ فِى كِتَابِ اللهِ فَسُنَّةُ مِنّى مَاضِيةٌ فَانْ لَمْ يَكُنْ سُنَّةٌ مِنّى مَاضِيَةٌ فَمَا قَالَ اَصْحَابِىْ انَّ اَصْحَابِىْ بِمَنْزَلَةِ النُّجُوْمِ فِي السَّمَاءِ فَاَيُّهَا اُخِذْتُمْ بِه اهْتَدَيْتُمْ واخْتَلَافُ اَصْحَابِى لَكُمْ رَحْمَةٌ আল্লাহর কিতাব থেকে যেসব বিধান তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে, সেগুলো মতে আমল করা উচিত। এগুলো ত্যাগ করার কোন সুযোগ নেই। যদি আল্লাহর কিতাবে কোন বিধান পাওয়া না যায়, তখন আমার সুন্নত হবে ফায়সালাকারী। যদি আমার সুন্নতেও পাওয়া না যায়, তবে আমার সাহাবীর কথাই দলীল হবে। নিশ্চয় আমার সাহাবীগণ আসমানের নক্ষত্রের ন্যায়। তাঁদের যে কাউকে অনুসরণ করলে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে। আর আমার সাহাবীদের মতবিরোধ তোমাদের জন্য রহমতের উপলক্ষ।[৬৩৪]

সাহাবায়ে কিরাম মাহফুয তথা পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত ও ন্যায়ের প্রতীক এবং সত্যের মাপকাঠি একথার উপর সকল মুসলমান বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। যেখানে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ও তদীয় রাসূল ﷺ তাঁদের ন্যায়পরায়ণতার বর্ণনা করেছেন সেখানে অন্য কারো মন্তব্যের প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কিরামের বাতেনী অবস্থা ও ভবিষ্যত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন। সুতরাং সকল মাযহাবের আলেমগণের মতে اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ। সকল সাহাবী ন্যায়পরায়ন।

হযরত জাবির (রা.) নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِي أَوْ رَأَى مَنْ رَآنِي এমন কোন মুসলমানকে দোযখের আগুনে স্পর্শ করবে না, যে আমাকে দেখেছে এবং আমাকে যে দেখেছে, তাকে দেখেছে।[৬৩৫]

৬৩৪. হাকীম সৈয়্যদ আহমদুল্লাহ নদভী, তারীখে হাদিস ওয়া মুহাদ্দিসনী, খণ্ড, ১, পৃ. ১৯৫

৬৩৫. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি.), তিরমিযী শরীফ, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৫৫৪, হাদিস নং ৫৬৩৬

সাহাবায়ে কিরামকে মন্দ বলা নিষেধ

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা (রিসালাতের জন্য) আমাকে নির্বাচিত করেছেন আর আমার সাহচর্যের জন্য আমার সাহাবীদের নির্বাচন করেছেন। তাঁদের মধ্যে কতিপয়কে আমার উযীর, কাউকে আমার জামাতা ও শ্বশুর নির্বাচন করেছেন। فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَلَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلَاعَدْلًا যারা তাঁদেরকে মন্দ বলবে, তাদের উপর আল্লাহর, ফেরেশ্তার ও সকল মানুষের লা'নত নেমে আসবে। তাদের ফরয ও নফল কোন ইবাদতই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না।[৬৩৬]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, اَللّٰهَ اللّٰهَ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللّٰهَ وَمَنْ آذَى اللّٰهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমার (ওফাতের) পর তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থল বানিওনা। যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসার কারণেই তাদেরকে ভালবাসল। পক্ষান্তরে যে তাদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল। আর যে তাদেরকে কষ্ট দিল, মূলত সে আমাকেই কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই কষ্ট দিল। অতএব যে আল্লাহকে কষ্ট দিল অতিসত্ত্বর তিনি তাকে পাকড়াও করবেন।[৬৩৭]

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ তোমরা আমার সাহাবীদের গাল-মন্দ করিওনা। কেননা, আল্লাহর পথে তোমাদের কারো উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করেও সাহাবীর এক মুদ (প্রায় এক সের) বা এর অর্ধেকের সমতুল্য হবেনা।[৬৩৮]

উক্ত হাদিসের প্রান্ত টীকায় মিরকাত গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, وَفِىْ شَرْحِ مُسْلِمٍ اِعْلَمْ اَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ حَرَامٌ وَمِنْ اَكْبَرِ الفَوَاحِشِ وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الجَمْهُوْرِ اَنَّهُ يُعَزَّرُ وَقَالَ

৬৩৬. ইমাম কুরতুবী (র.) (৬৭১ হি.) আহকামুল কুরআন, খণ্ড, ৮, পৃ. ১৯৬

৬৩৭. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি.), তিরমিযী শরীফ, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৫৫৪, হাদিস নং ৫৬৩৭।

৬৩৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫৫৩, হাদিস নং ৫৬৩১

بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ يُقْتَلُ وَقَالَ الْقَاضِى عَيَاضُ سَبُّ اَحَدِهِمْ مِنْ الْكَبَائِرِ وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِاَنَّهُ يُقْتَلُ مِنْ سَبِّ الشَّيْخَانِ فَفِى الْاَشْبَاهِ كُلُّ كَافِرٌ تَابَ فَتَوْبَتُهُ مَقْبُوْلَةٌ فِىْ الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ الْاَجَمَاعَةَ الْكَافِرِ بِسَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِسَبِّ الشَّيْخَيْنِ اَوْ اَحَدُهُمَا শরহে মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয় সাহাবীকে গালমন্দ করা হারাম এবং সবচেয়ে বড় অশ্লীল কাজ। আমাদের এবং অধিকাংশ মাযহাব অনুযায়ী এসব লোককে শাস্তি দিতে হবে। আর মালেকী মাযহাব মতে হত্যা করা হবে। কাযী আয়ায (র.) বলেন, কোন কোন আলিম বলেছেন হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)কে গালিদাতাকে হত্যা করা হবে। আল আশবাহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক কাফিরের তাওবা দুনিয়া-আখিরাত গ্রহণযোগ্য কিন্তু নবী করিম ﷺকে এবং আবু বকর ও ওমর (রা.)কে কিংবা তাদের কোন একজনকে গালি দেওয়ার কারণে যারা কাফির হয়েছে, তাদের তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়।[৬৩৯]

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ اَحَدِكُمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً اَوْ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ তোমরা মুহাম্মদ ﷺ'র সাথীগণকে গালী দিওনা। কেননা, তাদের কোন একজনের এক মুহূর্তের মূল্য তোমাদের কোন একজনের চল্লিশ বছর কিংবা সারা জীবনের ইবাদতের চেয়ে অধিকতর উত্তম।[৬৪০]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, اِنَّ اللهَ اِخْتَارَنِىْ وَاخْتَارَ اَصْحَابِى فَجَعَلَهُمْ اَصْهَارى وَجَعَلَهُمْ اَنْصَارِى وَاِنَّهُ سَيَجِيْئُ فِى اخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَنْتَقِصُوْنَهُمْ اَلَافَلَا تَنَاكَحُوْهُمْ اَلاَ فَلاَتَنْكِحُوْا اَلِيْهِمْ اَلَا فَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ اَلاَ فَلاَتُسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ حَلَّتْ اللَّعْنَةَ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাকে নির্বাচন করেছেন এবং আমার সাহাবীগণকে নির্বাচন করেছেন। অতঃপর তাদের মধ্যে থেকে আমার শ্বশুর ও জামাতা বানিয়েছেন এবং তাদেরকে আমার আনসার তথা সাহায্যকারী বানিয়েছেন। নিশ্চয় অচিরেই শেষ যামানায় এমন সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে, যারা সাহাবীদের সমালোচনা করবে। সাবধান! এমন লোকদের সাথে বিবাহের সম্পর্ক করবেনা এবং তাদের নারীদের সাথে

৬৩৯. মিশকাত শরীফের প্রান্তটীকা, পৃ.৫৫৩, টীকা নং ৩)
৬৪০. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১হি.), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড, ২, পৃ. ৯০৭, হাদিস নং ১৭২৯ ও পৃ. ৯০৯, হাদিস নং ১৭৩৬।

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না। সাবধান! তাদের সাথে নামায পড়বে না, সাবধান! তাদেরকে সালাম দিওনা, তাদের উপর অভিশাপ অবতীর্ণ হয়েছে।[৬৪১]

عن على بن ابى طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبَّ نبيًّا فاقتلوه ومن سبَّ احدًا من اصحابى فاجلدوه হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কেউ যদি কোন নবীক গালি দেয় তাকে তোমরা মৃত্যুদণ্ড দাও আর যদি কেউ আমার কোন সাহাবীকে গালি দেয় তবে তাকে বেত্রাঘাত কর।[৬৪২]

সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে মনীষীদের অভিমত

আল্লামা ইবনে সালাহ (র.) 'উলূমুল হাদিস' গ্রন্থে লিখেছেন, সাহাবায়ে কিরামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁদের কারোর ন্যায়পরায়ণতা ও আদালত সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা তা কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমা দ্বারা সুপ্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সম্বন্ধে এরশাদ করেছেন, "তোমরা মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত শ্রেষ্ঠ উম্মত।"[৬৪৩]

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (র.) 'আল ইসতিআব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সাহাবায়ে কিরাম হলেন উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম জামাআত। তাঁদের আদালত ও ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে কুরআন ও হাদিসে বহু প্রমাণ রয়েছে। সর্বোপরি নবী করিম ﷺ'র সাহচর্যের জন্য মনোনীত ব্যক্তিগণের তুলনায় অধিক ন্যায়পরায়ণতা আর কে হতে পারে?[৬৪৪]

ইবনে তাইমিয়া ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) থেকে বর্ণনা করেন, সাহাবীদের মন্দ আলোচনা করা, দোষারোপ করা বা খুঁত খুঁজে বের করা কারো জন্যই বৈধ নয়, বরং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।[৬৪৫]

আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম সমালোচনার উর্ধ্বে। তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা প্রশ্নাতীত। রাসূল ﷺ ও তাঁর উম্মতের মধ্যে সাহাবায়ে কিরামই হলেন একমাত্র যোগসূত্র। দ্বীন ও শরীয়তের তাঁরাই হলেন প্রথম ধারক ও বাহক। তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা প্রশ্নের সম্মুখীন হলে দ্বীন ও শরীয়তের অস্তিত্বও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়বে।[৬৪৬]

৬৪১. হাকীম সৈয়্যদ আহমদুল্লাহ নদভী, তারীখে হাদিস ওয়া মুহাদ্দিসীন, উর্দু, খণ্ড, ১, পৃ. ১৯৬।
৬৪২. মুহিব্বুদ্দিন তিবরী (র) (৬৯৪ হি.) আর রিয়াদুন নাদ্বরাহ ফী মানাকীবে আশারা, খণ্ড-১, পৃ. ২৪
৬৪৩. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পৃ. ৮০ বা,ই, ফা।
৬৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৮০।
৬৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।
৬৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

আল্লামা কামাল ইবনে হুমাম (র.) 'আল মুসায়িরা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা মতে সকল সাহাবীর সাধুতা ও ন্যায়পরায়ণতা বিশ্বাস করা, তাঁদের সমালোচনা সর্বতোভাবে পরিহার করা এবং তাদের প্রশংসা করা অবশ্য কর্তব্য।[৬৪৭]

আল্লামা নসফী (র.) 'আল আকাইদুন ন্যাফিয়্যা' গ্রন্থে লিখেছেন যে, মুসলিম উম্মাহ্র আকীদা এই যে, সাহাবায়ে কিরাম সম্বন্ধে শুধু উত্তম আলোচনা করা উচিত। ইমাম আ'যম আবু হানিফা (র.) 'ফিক্হ আকবর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আমরা সাহাবায়ে কিরামের গুণচর্চা ব্যতিরেকে কখনো দোষচর্চা করবোনা। ইমাম তাহাভী (র.) 'আকীদাতুত তাহাভী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যারা সাহাবায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ অথবা তাঁদের কুৎসা রটায় আমরাও তাদেরকে শত্রু বলে মনে করি। আমরা সাহাবায়ে কিরামের কেবল গুণ চর্চা করি। দোষ চর্চা করিনা।[৬৪৮]

ইমাম মালিক (র.) বলেন, যারা সাহাবায়ে কিরামকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়, তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺকে হেয় প্রতিপন্ন করা। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে এ সম্বন্ধে মুসলিম উম্মাহ্র সর্বজন সিদ্ধান্ত এই যে, তাঁদের এসব কর্মকাণ্ড ইজতহাদের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এসব যুদ্ধে সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন। আর আমরা ছিলাম অনুপস্থিত। তাঁরা সম্পূর্ণ অবস্থা জানতেন কিন্তু আমরা জানিনা। সুতরাং যে বিষয়ে সাহাবীগণ একমত আমরা তা অনুসরণ করব। আর যে বিষয়ে তাঁরা দ্বিধাবিভক্ত আমরা তাতে নীরবতা অবলম্বন করব।[৬৪৯]

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত আবু যুর'আ (র.) বলেন, اِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ اَنَّهُ يُنَقِّصُ اَحَدًا مِنَ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْلَمْ اَنَّهُ زِنْدِيْقٌ যখন তুমি এমন ব্যক্তিকে দেখবে, যে রাসূল ﷺ'র সাহাবীগণের সমালোচনা ও মন্দ দিক আলোচনা করছে, তাহলে তুমি বুঝে নিও যে, সে যিন্দীক। কেননা পবিত্র কুরআন ও রাসূল ﷺ'র বাণী তথা হাদিস শরীফ আমাদের নিকট পৌঁছেছে সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে। তাঁদের মন্দ বলা এবং তাঁদেরকে অসত্য মনে করা কুরআন-হাদিসকে বাতিল করার সমতুল্য।[৬৫০]

৬৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৮১।
৬৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।
৬৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।
৬৫০. ইবনে হাজর আসকালানী (র.) (৮৫২ হি.), আল ইসাবা, খণ্ড ১, পৃ. ১১।

চার খলীফার ফযিলত

রাসূল ﷺ'র সাহাবীদের মধ্যে কেবল হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা.) এই চারজনকে খোলাফায়ে আরবা এবং খোলাফায়ে রাশেদীন বলা হয়। ইসলামে এই চারজনকেই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে আসীন করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতাহ'র ২৯ নং আয়াত- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا দ্বারা এই চার খলীফার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর বাণী مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ দ্বারা রাসূল ﷺ উদ্দেশ্যে وَالَّذِينَ مَعَهُ দ্বারা হযরত আবু বকর (রা.), أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ দ্বারা হযরত ওমর, رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ দ্বারা হযরত ওসমান (রা.) এবং تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا দ্বারা হযরত আলী (রা.) উদ্দেশ্য।[৬৫১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَجْتَمِعُ حُبُّ هَؤُلاءِ الأَرْبَعَةِ إِلا فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ : أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কোন মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো অন্তরে ঐ চারজনের প্রতি ভালবাসা একত্রিত হবেনা। ঐ চারজন হলেন, আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা.)।[৬৫২]

قَالَ: حَدَّثَنِي سَفِينَةُ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا» ثُمَّ قَالَ سَفِينَةُ: أَمْسِكْ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ سَنَتَيْنِ وَخِلَافَةَ عُمَرَ عَشْرًا وَخِلَافَةَ عُثْمَانَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَخِلَافَةَ عَلِيٍّ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ قُلْتُ: مُعَاوِيَةُ قَالَ: كَانَ أَوَّلُ الْمُلُوكِ

হযরত সফীনা (রা.) বলেন, একদিন রাসূল ﷺ আমাদেরকে ভাষণ দেয়ার সময় বলেছিলেন, আমার উম্মতের মধ্যে খিলাফত থাকবে ত্রিশ বছর। অতপর বাদশাহী প্রথা চালু হবে। এরপর সফীনা (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফত দু'বছর, ওমর (রা.)'র খিলাফতকাল দশ বছর, ওসমান (রা.)'র খিলাফতকাল বার বছর আর আলী (রা.)'র খিলাফতকাল ছয় বছরের মাধ্যমে মোট ত্রিশ বছর পূর্ণ হল। আমি বললাম, মুয়াবিয়া? তিনি বলেন, তিনি হবেন প্রথম বাদশা।[৬৫৩]

৬৫১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি.), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-১, পৃ. ৪৩৪।
৬৫২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি.), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-১, পৃ. ৪২৭।
৬৫৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.), (২৪১ হি.), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-১, পৃ. ১৬৮, হাদিস-২১৮।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِينَ سِوَى النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَاخْتَارَ لِي مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، فَهَؤُلَاءِ خَيْرُ أَصْحَابِي، وَأَصْحَابِي كُلُّهُمْ خَيْرٌ، وَاخْتَارَ أُمَّتِي عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ "

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা আমার সাহাবীকে মনোনীত করেছেন সমগ্র পৃথিবীবাসীর উপর কেবল নবী-রাসূলগণ ব্যতীত। আমার সাহাবী থেকে আমার জন্য মনোনীত করেছেন চারজনকে। তারা হলেন আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী। আমার সাহাবীদের থেকে তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তবে আমার সকল সাহাবী শ্রেষ্ঠ। আমার উম্মতকে আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য সকল উম্মত থেকে মনোনীত করেছেন।[৬৫৪]

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبُو بَكْرٍ وَزِيرِي وَالْقَائِمُ فِي أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي، وَعُمَرُ حَبِيبِي يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِي، وَأَنَا مِنْ عُثْمَانَ، وَعُثْمَانُ مِنِّي، وَعَلِيٌّ أَخِي وَصَاحِبُ لِوَائِي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ»

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আবু বকর আমার উযীর, আমার পর আমার উম্মতের উপর আমার স্থলাভিষিক্ত হবে। ওমর আমার বন্ধু, সে আমার ভাষায় সত্য কথা বলবে। আমি ওসমানের আর ওসমান আমার। আলী আমার ভাই এবং আমার পতাকার ধারক-বাহক।[৬৫৫]

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله افترض عليكم حبَّ ابى بكر وعمرو عثمان وعلى كما افترض الصلاة والزكاة والصوم والحج فمن انكر فضلهم فلا تقبل منه الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج –

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা.)কে ভালবাসা ফরয করে দিয়েছেন যেভাবে নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জকে ফরয করে দিয়েছেন। অতঃপর যে ব্যক্তি তাঁদের ফযিলতকে অস্বীকার করবে তাদের নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ কোনটিই কবুল করা হবে না।[৬৫৬]

[৬৫৪]. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.), (২৪১ হি.), প্রাগুক্ত, খণ্ড-১, পৃ. ১৭৩, হাদিস- ২২৮।

[৬৫৫]. আবু নুআঈম ইস্পাহানী (র.), (৪৩০ হি.), ফাযায়েলুল খোলাফায়ির রাশেদীন, খণ্ড-১, পৃ. ১৭৯, হাদিস নং-২৩৩

[৬৫৬]. ইমাম বায়হাকী, ফাযায়েলুল আওকাত, খণ্ড-১, পৃ. ৫০

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبى الاوله نظير من مق فابوبكر نظير ابراهيم وعمر نظير موسى وعثمان نظير هارون وعلى بن ابى طالب نظيرى

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক নবীর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে। আবু বকর হল ইবরাহিম (আ)'র দৃষ্টান্ত, ওমর মূসা (আ.)'র, ওসমান হারুন (আ)'র এবং আলী আমার দৃষ্টান্ত।[৬৫৭]

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র ফযিলত

নাম ও নসব

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র মূল নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম, আবু বকর, উপাধি, সিদ্দীক ও আতীক। পিতার নাম ওসমান। পিতার উপনাম আবু কুহাফা, মাতার নাম সালমা, উপনাম উম্মুল খায়র। আবরাহা কর্তৃক মক্কা আক্রমণের প্রায় আড়াই বছর পরে মক্কায় জন্মলাভ করেন।

তিনি জাহেলী যুগেও কোনদিন মূর্তিপূজা করেননি, মদ্যপান করেন নি। ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত শাহ আহমদ রেযা (র.) 'তানযীহুল মকানাতুল হায়দারিয়্যা' গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র পিতা তাঁকে মূর্তি ঘরে নিয়ে মূর্তিগুলো দেখিয়ে বলেন, هذه إِلٰهُكَ السُّمُّ العُلى فَاسْجُدْ لَهَا অর্থাৎ এটি তোমার বড় খোদা, সুতরাং তুমি একে সিজদা কর। পিতা এ কথা বলে বাইরে চলে গেলে তিনি মুর্তিকে সম্বোধন করে বলেন, اِنّى جَائِعٌ فَاَطْعِمْنِى আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে খাবার দাও। اِنّى عَارٍ فَاكْسِنِى আমি বস্ত্রহীন, আমাকে বস্ত্র দাও। তিনি একটি পাথর হাতে নিয়ে বললেন, আমি তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করছি, فَاِنْ كُنْتَ اِلٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ যদি তুমি খোদা হও, তবে তুমি তোমাকে রক্ষা কর। মূর্তি এখনো নীরব থাকল। অতপর তিনি সিদ্ধীকী শক্তি দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করলে মূর্তি ভেঙ্গে পড়ে গেল। এ সময় পিতা এসে এ অবস্থা দেখে বললেন, বৎস! তুমি এ কি করলে? পিতা তাঁকে মায়ের কাছে নিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলে, মাতা বলেন, বাচ্চাকে কিছুই বলবেন না। কেননা, যে রাতে সে জন্মগ্রহণ করেছিল, তখন আমার কাছে কেউ ছিলনা। আমি অদৃশ্য থেকে আওয়ায শুনতে পেলাম যে, يَا اَمَةَ اللهِ عَلى التَّحَقُّقِ اَبْشِرى بِالْوَلَدِ العَتِيْقِ اِسْمُهُ فِى السَّمَاءِ الصِّدِّيْقِ لِمُحَمَّدٍ صَاحِبٌ وَرَفِيقٌ

[৬৫৭]. প্রাগুক্ত, খণ্ড-১, পৃ. ৫১

অর্থাৎ হে আল্লাহর সত্যিকারের বন্ধিনী! তোমাকে সুসংবাদ, সেই আযাদ সন্তানের কারণে, যার নাম আসমানে সিদ্দীক এবং যিনি মুহাম্মদ ﷺ'র সঙ্গী হবেন।[৬৫৮]

তাঁর উপনাম আতীক হওয়ার কারণ হল তাঁর বংশ ও চরিত্র ত্রুটি মুক্ত ছিল বিধায় তাঁকে আতীক বলা হত। হযরত আয়েশা (রা.)'র বর্ণনা মতে এটি রাসূল ﷺ'র প্রদত্ত উপাধি। একদিন রাসূল ﷺ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, هذا عَتِيْقُ اللهِ مِنَ النَّارِ আল্লাহর এই বান্দা দোযখের আগুন থেকে মুক্ত। আয়েশা (রা.)'র অপর বর্ণনায় আছে একদিন রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদের নিয়ে বাইতুল্লাহর আঙ্গিনায় উপস্থিত ছিলেন। এ সময় আবু বকর (রা.) তাশরীফ আনেন, তখন রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন, مَنْ سَرَّه اَنْ يَنْظُرَ الى عَتِيْقِ النَّار فَلْيَنْظُرْ الى هذَا যে কেউ দোযখের আগুন থেকে মুক্ত ব্যক্তিকে যদি দেখতে চায় সে যেন আবু বকরকে দেখে।[৬৫৯]

মি'রাজের ঘটনা শ্রবণমাত্র বিশ্বাস করার কারণে নবী করিম ﷺ তাঁকে সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হলেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমান। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করিম ﷺ'র নবুয়ত প্রকাশের পূর্ব থেকেই তাঁর বন্ধু ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর উত্তম চরিত্র, সত্যবাদিতা, আমানতদারীতা এবং পবিত্রতার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতেন। যখনই রাসূল ﷺ তাঁর কাছে ইসলাম পেশ করলেন সাথে সাথেই নির্দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যিনি ইহকালীন বা জাগতিক ব্যাপারে কোনদিন মিথ্যা ও ভুল কথা বলেননি, তিনি আল্লাহ সর্ম্পকে এবং নবুয়ত সম্পর্কে কিভাবে মিথ্যা বলবেন? তাই তিনি তাৎক্ষনিক মুসলমান হয়ে যান।[৬৬০]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ'র নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, একটি মহান নূর আসমান থেকে বাইতুল্লাহ শরীফের ছাদে অবতীর্ণ হয়। মক্কার প্রতিটি ঘর এ নূরের আলোতে আলোকিত হয়। প্রত্যেক ঘরের নূর একত্রিত হয়ে একটি নূরে পরিণত হয়ে সর্বপ্রথম আমার ঘরে চলে আসে। আর আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম। সকালে আমি এই স্বপ্ন ইহুদি এক পাদ্রীকে বললাম এবং এর ব্যাখ্যা চাইলাম।

৬৫৮. মুফ্তি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.) খুৎবাতে মহররম, পৃ. ৮৫-৮৬
৬৫৯. হাফিয ইবনে আব্দুল বার (র.), ইস্তিয়াব, খণ্ড-৩, পৃ.৯৬৪
৬৬০. মুফ্তি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.), খুৎবাতে মহররম, পৃ. ৮৮

সে বলল, এই স্বপ্নের জ্ঞান আমার কাছে নেই। কিছুদিন পর ব্যবসার উদ্দেশ্যে হাওরা এর গীর্জা যেটি বাহীরা পাদ্রীর বাসস্থান ছিল আমি সেখানে পৌঁছলাম। আমি তার কাছে সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল, তুমি কে? আমি উত্তরে বললাম, আমি কুরাইশ বংশের লোক। সে বলল, আল্লাহ্ তায়ালা তোমার বংশ থেকে একজন পয়গাম্বর প্রেরণ করবেন। তুমি তাঁর উযীর হবে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তুমি তাঁর খলীফা হবে।

যখন রাসূল ﷺ নবী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি বললাম, প্রত্যেক নবী স্বীয় নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে কিছুনা কিছু মু'জিযা পেশ করে থাকেন। আপনার প্রমাণ কি? রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমার নবুয়তের দলীল হল সেই স্বপ্ন যা তুমি দেখেছ। অতপর পাদ্রীর কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছ পাদ্রীর বলল, এই স্বপ্নের জ্ঞান ও গ্রহণযোগ্যতা আমার কাছে নেই। আর বাহিরা এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে করেছে। আর এগুলো আমাকে হযরত জিব্রাইল (আ.) অবহিত করে দিয়েছেন। তখন সাথে সাথে তিনি কালিমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬৬১]

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, জাহেলী যুগে আমি একটি বৃক্ষের নিচে বসেছিলাম। হঠাৎ ঐ বৃক্ষের একটি ডাল আমার দিকে ঝুকে একেবারে আমার নিকটে এসে গেল। আমি মনে মনে বললাম একি হল? তখন ঐ বৃক্ষ থেকে আমার কানে আওয়ায আসল যে, অমুক সময় একজন পয়গাম্বর প্রকাশ হবেন। তোমার উচিত হবে তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে সৌভাগ্য অর্জন করা। আমি বললাম একটু বিস্তারিত বলুন যে, সেই পয়গাম্বর কে হবেন? তার নাম কি। বৃক্ষ থেকে আওয়ায আসল, তিনি হবেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মোত্তালিব ইবনে হাশেম। আমি বললাম, তিনি তো আমার বন্ধু ও প্রিয়জন। আমি এ বৃক্ষ থেকে ওয়াদা নিলাম যে, যখন তিনি প্রকাশ হবেন, তখন এ সম্পর্কে আমাকে যেন অবহিত করা হয়। যখন রাসূল ﷺ'র নবুয়ত প্রকাশিত হল, তখন ঐ বৃক্ষ থেকে আওয়ায আসল যে, হে ইবনে আবু কুহাফা! সর্বাত্মক ও দ্রুত চেষ্টা কর তাঁর প্রকাশের সময় হয়েছে। হযরত মুসা (আ.)'র প্রভূর শপথ! দ্বীন ইসলাম তোমার আগে কেউ গ্রহণ করতে পারবে না। সকাল হলে আমি রাসূল ﷺ'র খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, হে আবু বকর! আমি তোমাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করছি। তিনি বলেন, আমি তখনই اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ بَعَثَكَ بِالحَقِّ سِرَاجًا مُنِيْرًا পড়ে তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁকে সত্যায়িত করেছি।[৬৬২] হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ'র নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে আমি

৬৬১. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উর্দূ, পৃ. ২৫৮
৬৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮-২৫৯

ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গিয়েছিলাম। সেখানে ইযদ সম্প্রদায়ের এক ধনাঢ্য ব্যক্তির কাছে অবস্থান করছিলাম। লোকটি আসমানী কিতাবের আলিম ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় চারশত এর কাছাকাছি। তিনি আমাকে দেখে বললেন, তোমাকে দেখে মনে হয় হেরেমে মক্কা থেকে এসেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কুরাইশ বংশের? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বনী তাইম গোত্রের লোক? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন আরো একটি নিদর্শন রয়ে গেছে। সে বলল, তুমি একটু করে জামা তুলে আমাকে দেখাও। আমি বললাম, আপনার উদ্দেশ্য কি না বললে আমি জামা তুলবনা। তিনি বললেন, আসমানী কিতাবে লিখিত আছে যে, হেরেম শরীফে একজন পয়গাম্বর প্রেরিত হবেন, যাঁর দু'জন সহযোগী হবেন। একজন যুবক হবেন অপরজন জাওয়ানীর বয়স অতিক্রম করবেন। যিনি যুবক হবেন তার বৈশিষ্ট্য হল তিনি দ্বীনের নেশায় মশগুল থাকবেন আর দ্বিতীয় জনের চেহারা চাঁদের ন্যায় উজ্জল হবে এবং শারিরীকভাবে দুর্বল হবেন আর তার পেটে একটি বিশেষ চিহ্ন থাকবে। আমি স্বীয় পেটের কাপড় তুললে তিনি আমার নাভীর উপরে একটি কাল চিহ্ন দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, কা'বার শপথ! তুমিই সেই ব্যক্তি। অতঃপর তিনি আমাকে কিছু উপদেশ দিয়ে বলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে হেফাযত করুন, হিদায়তের প্রতি আগ্রহী হও এবং সেই দ্বীনের প্রতি মনযোগী হও। আল্লাহ তোমার জন্য সহজ করে দিন যা তোমাকে দান করেন।

যখন ইয়েমেনে আমার কাজ সমাপ্ত হল আমি তার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার জন্য আসলাম তখন তিনি আমাকে কতগুলো কবিতা দিয়ে বলেন, এই কবিতাগুলো সেই পয়গাম্বরের খেদমতে পেশ করবে। আমি মক্কায় যখন পৌঁছি তখন রাসূল ﷺ'র নবুয়ত প্রকাশিত হল। কুরাইশের নেতৃস্থানীয় লোকেরা আমার সাথে দেখা করতে আসল। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কি কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখেছ? তারা বলল, এর চেয়ে অধিক আশ্চর্যজনক আর কি হতে পারে যে, আবু তালিবের ইয়াতিম ভাতিজা নবুয়তের দাবী করতেছে? আমরা তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। তুমি আসলে একটা ফায়সালা করবো। আমি তাদেরকে কোন রকম বিদায় দিয়ে রাসূল ﷺ'র খোঁজে বের হলাম। জানতে পারলাম, তিনি হযরত খাদীজা (রা.)'র ঘরে আছেন। আমি সেখানে গিয়ে দরজায় করাঘাত করলাম। রাসূল ﷺ বাইরে তাশরীফ আনলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকেরা বলছে, আপনি নাকি পূর্বপুরুষের দ্বীন ত্যাগ করেছেন। তিনি বললেন, হে আবু বকর সিদ্দীক! আমি আল্লাহর রাসূল, তোমাদের এবং সকল সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত হয়েছি তুমি ঈমান আন। আমি বললাম, আপনার এই দাবীর পক্ষে কি প্রমাণ আছে? রাসূল ﷺ বললেন, সেটিই প্রমাণ যা ইয়েমনে বৃদ্ধ লোকটি তোমাকে বলেছিল। আমি

আরয করলাম, ইয়েমনে আমি অনেক বৃদ্ধের সাক্ষাত লাভ করেছি। আপনি কোন বৃদ্ধের কথা বলছেন? রাসূল ﷺ বললেন, আমি সেই বৃদ্ধের কথা বলছি, যে তোমাকে কিছু কবিতা দিয়েছিল। আমি বললাম, হে আমার বন্ধু! এ ব্যাপারে আপনি কিভাবে অবহিত হলেন? তিনি বললেন, আমাকে সেই ফেরেশ্‌তা বলে দিয়েছেন, যিনি আমার পূর্বে আম্বীয়াদের উপর ওহী নিয়ে আসতেন। তখন আমি তাঁর হাত মোবারক ধরে বললাম اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ ।[৬৬৩]

উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য সিদ্ধান্ত হল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হলেন, اَفْضَلُ الْبَشَرَ بَعْدَ الانْبِيَاءِ তথা আম্বিয়ায়ে কিরামের পর সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন হযরত আবু বকর (রা.)। ইমাম বুখারী (রা.) বুখারী শরীফে بَاب فَضْلِ اَبِي بَكْرٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ তথা 'নবী করিম ﷺ'র পরে হযরত আবু বকর (রা.)'র মর্যাদা নামক পরিচ্ছেদে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- «كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ» আমরা রাসূল ﷺ'র যামানায় সাহাবীদের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদা নিরূপণ করতাম। আমরা সর্বাপেক্ষা মর্যাদা দিতাম আবু বকর (রা.)কে তারপর ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)কে, তারপর ওসমান ইবনে আফফান (রা.) কে।[৬৬৪]

হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যা (রা.) বলেন, قُلْتُ لِأَبِي أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ»، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ عُمَرُ»، وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُثْمَانُ، قُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ؟ قَالَ: «مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» আমি আমার পিতা আলী (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূল ﷺ'র পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে? তিনি বললেন, আবু বকর (রা.)। আমি বললাম এরপর কে? তিনি বললেন, ওমর (রা.)। আমার আশংকা হল যে, এরপর তিনি ওসমান (রা.)'র নাম বলবেন, তাই আমি বললাম, এরপর আপনি? তিনি বললেন, না, আমি তো মুসলমানদের একজন।[৬৬৫]

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى اَحَدٍ اَفْضَلَ مِنْ اَبِى بَكْرٍ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ نَبِيًّا পৃথিবীতে নবীগণ ব্যতীত হযরত আবু বকর (রা.)'র চেয়ে উত্তম কেউ নেই।[৬৬৬]

---

৬৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯-৬১
৬৬৪. ইমাম বুখারী (রা.) (২৬৬), সহীহ বুখারী, খণ্ড ২, পৃ. ৫১৬; হাদিস নং ৩৩৯৩
৬৬৫. ইমাম বুখারী (রা.) (২৫৬ হি.), সহীহ বুখারী, খণ্ড-২, পৃ. ৫১৮, হাদিস নং ৩৪০৬
৬৬৬. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.) খুৎবাতে মহররম, পৃ. ৭৫

একদিন হযরত ওমর (রা.) মিম্বরে আরোহণ করে বলেন, রাসূল ﷺ'র পর হযরত আবু বকর (রা.) সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। যদি কেউ এর বিরোধিতা করে তাহলে সে মিথ্যুক, তাকে মিথ্যা অপবাদের শরয়ী শাস্তি প্রদান করা হবে।[৬৬৭]

হযরত আলী (রা.) বলেন-خَيْرُ هذه الأُمَّة بَعْدَ نَبِيِّهَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ- এই উম্মতের মধ্যে নবীর পর সর্বত্তোম ব্যক্তি হলেন হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)। ইমাম যাহবী (র.) বলেন, হযরত আলী (রা.)'র এই মন্তব্যটি তাঁর থেকে মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৬৬৮]

হযরত আবুল মনসুর বাগদাদী (র.) বলেন, সমস্ত উম্মত একমত যে, রাসূল ﷺ'র পর হযরত আবু বকর (রা.), এরপর হযরত ওমর (রা.), অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) এদের পর হযরত আলী (রা.), তারপর জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী অন্যান্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁদের পর বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীগণ, এরপর উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ। অতঃপর বাইয়াতে রিদওয়ানে উপস্থিত সাহাবীগণ, তারপর অন্যান্য সাহাবীগণ মানুষের মধ্যে উত্তম।[৬৬৯]

عنِ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحْتَ أَنْتَ وَوُزِنَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ فَاسْتاءَ لَهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى فَسَائَهُ ذَالِكَ فَقَالَ: خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ

হযরত আবু বুকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺকে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আকাশ থেকে যেন একটি পাল্লা অবতীর্ণ হল। তাতে আপনাকে ও আবু বকর (রা.)কে ওযন করা হল। তাতে আপনার দিক ভারী হল। পরে আবু বকর ও ওমর (রা.)কে ওযন করা হল। তাতে আবু বকর (রা.)'র দিক ভারী হল। এরপর ওমর (রা.) ও ওসমান (রা)কে ওযন করা হল। এতে ওমর (রা)'র দিক ভারী হল। অতঃপর পাল্লাটি উঠিয়ে নেয়া হল। এই স্বপ্ন শুনে রাসূল ﷺ বিষন্ন হয়ে পড়লেন। অতঃপর বললেন, এটা খেলাফত নবুয়ত, (অর্থাৎ নবুয়ত প্রকৃতির খেলাফতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে) এরপর যাকে ইচ্ছে তাকে রাজত্ব দান করবেন।[৬৭০]

৬৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬
৬৬৮. ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.), তারীখুল খোলাফা, পৃ. ৩১, সূত্র: খুৎবাতে মহররম, পৃ. ৭৬
৬৬৯. ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.), তারীখুল খোলাফা, পৃ. ৩০, সূত্র: খুৎবাতে মহররম, পৃ. ৭৭।
৬৭০. তিরমিযী ও আবু দাউদ, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৫৬০, হাদিস নং ৫৬৮৫।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِجَ بِى الى السَّمآءِ فَمَا مَرَرْتُ بِسَمآءٍ الاَّ وَجَدْتُ اِسْمِى وَاَبُوَ بِكْرٍ الصِّدِّيقُ خَلْفِي

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, মে'রাজ রাতে যখন আমাকে আসমানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন প্রতি আসমান অতিক্রম করার সময় আমি আমার নাম দেখতে পেয়েছি আর আমার পেছনে আবু বকর সিদ্দীককে।[৬৭১]

খলীফাতুর রাসূল ﷺ

একমাত্র হযরত আবু বকর (রা.)ই সরাসরি রাসূল ﷺ'র খলীফা বা প্রতিনিধি। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে তাঁর খলীফা হওয়া সম্পর্কে একাধিক স্থানে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর বাণী- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবেনা।[৬৭২]

উপরোক্ত আয়াত হযরত আবু বকর (রা.)'র এবং তাঁর সঙ্গীদের শানে নাযিল হয়েছে। কারণ রাসূল ﷺ'র ইন্তেকালের পর ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন তিনি। হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা.) বলেন, যখন আবু বকর (রা.) সঙ্গীদের নিয়ে মুরতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হলেন, তখন আমরা সাহাবীরা বলতাম উক্ত আয়াত তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের শানে নাযিল হয়েছিল। সুতরাং উক্ত আয়াতে আবু বকর (রা.)'র খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ রাসূল ﷺ তাঁর রোগ শয্যায় আমাকে বললেন, তোমার পিতা আবু বকর এবং তোমার ভাই (আব্দুর রহমান)কে আমার কাছে ডেকে আন, আমি তাদেরকে বিশেষ একটি লেখা লিখে দেবো। কেননা, আমার ভয় হচ্ছে যে, (খেলাফতের) কোন অভিলাষী অভিলাষ পোষণ করে বসতে পারে এবং কোন

৬৭১. আবু নুআঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০ হি.), ফাযায়েলুল খোলাফায়ির রাশেদীন, খণ্ড-১, পৃ. ৪২।
৬৭২. সূরা মায়িদা, আয়াত; ৫৪।

ব্যক্তি এই দাবী করতে পারে, আমিই (খেলাফতের) হকদার। অথচ সে তার হকদার নয়। আল্লাহ ও ঈমানদার লোকেরা আবু বকর ছাড়া অন্য কারো খেলাফত মেনে নেবে না।[৬৭৩]

عَنْ مَيْمُوْن بْنِ مِهْرَانِ فِى قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ – وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا (التحريم) قَالَ اَسَرَّ اِلَيْهَا اَنَّ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْفَتِى مِنْ بَعْدِيْ

হযরত মাইমুন ইবনে মেহরান (রা.) থেকে বর্ণিত, সূরা তাহরীমের ৩নং আয়াত যার অর্থ হল যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীকে একটি গোপন কথা বলেছিলেন। নবী করিম ﷺ বললেন, স্ত্রীর কাছে গোপন কথাটি ছিল, হযরত আবু বকর আমার পরে খলীফা হবেন।[৬৭৪]

হযরত জুবায়ের ইবনে মুতয়েম (রা.) বলেন, একদিন জনৈক মহিলা রাসূল ﷺ'র কাছে এসে তাঁর সাথে কোন বিষয়ে কথা-বার্তা বলল। রাসূল ﷺ তাকে পুনরায় আসতে বললেন। তখন মহিলা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আবার এসে যদি আপনাকে না পাই, তখন কি করব? মহিলা এর দ্বারা রাসূল ﷺ'র ইন্তেকালের দিকে ইঙ্গিত করেছে। উত্তরে তিনি বললেন, فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ তুমি যদি তখন আমাকে না পাও, তবে আবু বকরের কাছে এসো।[৬৭৫]

উক্ত হাদিসে রাসূল ﷺ মহিলাকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আমার পরে আবু বকর খলীফা নিযুক্ত হবেন। সুতরাং আমার অবর্তমানে তুমি তার কাছেই আসবে। তিনিই আমার পক্ষে কার্য সম্পাদন করবেন। এই বক্তব্য দ্বারা রাসূল ﷺ যে ইলমে গায়ব জানেন তা প্রমাণিত হয়।

হযরত আয়েশা (রা.)কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, যদি রাসূল ﷺ কাউকে খলীফা নির্বাচন করতেন, তাহলে কাকে করতেন? উত্তরে তিনি বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)কে। তাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হল যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র পর রাসূল ﷺ কাকে খলীফা নিয়োগ করতেন? উত্তরে তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.)কে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল এরপর রাসূল ﷺ কাকে খলীফা বানাতেন? উত্তরে তিনি বলেন, আবু উবাইদাহ্ ইবনুল জাররাহ্ (রা.)কে। এরপর হযরত আয়েশা চুপ হয়ে গেলেন।[৬৭৬]

৬৭৩. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি.), সহীহ মুসলিম, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫৫৫, হাদিস নং ৫৬৪৪
৬৭৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি.), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-১, পৃ. ৩৯৯
৬৭৫. বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫৫৫, হাদিস নং ৫৬৪৫
৬৭৬. ইমাম মুসলিম (র.), সহীহ মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ৬০৫৬

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন যে সমাবেশে আবু বকর উপস্থিত থাকবেন, সেখানে তিনি ছাড়া অন্য কারো ইমামতি করা উচিত হবেনা।[৬৭৭]

তাছাড়া রাসূল ﷺ'র অসুস্থাবস্থায় একমাত্র আবু বকর (রা.)কেই তিনি ইমামতির নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল ﷺ'র পর খলীফা হওয়ার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি হলেন হযরত আবু বকর (রা.)।

হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বাইয়াত গ্রহণের প্রাক্কালে হযরত আলী (রা.) বলেছিলেন قَدَّمَكَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم فَمَنْ الَّذِيْ يُؤَخِّرُكَ রাসূল ﷺ আপনাকে অগ্রগামী করেছেন। সুতরাং কে আপনাকে পাশ্চাতে রাখবে?[৬৭৮]

ইবনে যামআ'র হাদিসে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূল ﷺ সকল সাহাবায়ে কিরামকে হযরত আবু বকরের পিছনে নামায পড়তে আদেশ দিলেন। ঘটনাক্রমে এসময় আবু বকর (রা.) উপস্থিত ছিলেন না। ফলে হযরত ওমর (রা.) ইমামতির জন্য অগ্রসর হলেন কিন্তু রাসূল ﷺ বললেন, لَا لَا لَا يَأْبَى اللهُ وَالْمُسْلِمُوْنَ اِلاَّ اَبَا بَكْرٍ يُصَلِّى اَبُوْ بَكْرٍ না, না, না, আল্লাহ ও মুসলমানগণ আবু বকরের উপরই সন্তুষ্ট। তিনি লোকদেরকে নামায পড়াবেন।[৬৭৯]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন (রোগে) পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন। বিলাল (রা.) এসে নামাযের কথা বললেন। নবী করিম ﷺ এরশাদ করলেন, আবু বকরকে বল, লোকদের নিয়ে নামায আদায় করতে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু বকর (রা.) অত্যন্ত কোমল মনের ব্যক্তি। তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন সাহাবীগণকে কিছুই শুনাতে পারবেন না। যদি আপনি ওমর (রা.)কে নির্দেশ দেন (তবে ভাল হয়)। তিনি ﷺ আবার বললেন, লোকদের নিয়ে আবু বকরকে নামায আদায় করতে বল। আমি হযরত হাফসা (রা.)কে বললাম, আপনি রাসূল (স)কে বলুন যে আবু বকর (রা.) অত্যন্ত কোমল মনের ব্যক্তি। তিনি যখন আপনার পরিবর্তে সে স্থানে দাঁড়াবেন, তখন সাহাবীগণকে কিছুই শুনাতে পারবেন না। যদি আপনি ওমর (রা.)কে নির্দেশ (দিতেন তবে ভাল হত)। একথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা ইউসুফের সাথী রমণীদের ন্যায়। আবু বকরকেই লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল, আবু বকর (রা.) লোকদের নিয়ে নামায শুরু করলেন। তখন রাসূল ﷺ একটু সুস্থবোধ করলেন এবং দু'জন সাহাবীর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মসজিদে গেলেন।

৬৭৭. ইমাম তিরমিযী (র.), তিরমিযী শরীফ, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫৫৫, হাদিস নং ৫৬৫২
৬৭৮. আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), (১০৫২ হি.), মাদারেজুন নবুয়ত, সূত্রঃ খুৎবাতে মুহররম, পৃ. ৭২
৬৭৯. জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.), তারীখুল খোলাফা, পৃ. ৪৩

তাঁর দু'পা মোবারক মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। আবু বকর (রা) যখন তাঁর আগমন আঁচ করলেন, পেছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন। রাসূল ﷺ তার প্রতি ইশারা করলেন (পিছে না আসার জন্য)। তারপর তিনি এসে আবু বকর (রা)'র বাম পাশে বসে গেলেন। অবশেষে আবু বকর (রা.) দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন এবং রাসূল ﷺ বসে বসে নামায আদায় করলেন। আবু বকর রাসূল ﷺ'র নামাযের অনুসরণ করেন আর সাহাবীগন হযরত আবু বকর (রা.)'র নামাযের অনুসরণ করছিল।[৬৮০]

হযরত আবু বকর (রা.)'র সাহাবী হওয়া কুরআন দ্বারা প্রমাণিত

সকল সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেবল হযরত আবু বকর (রা.)কে পবিত্র কুরআনে রাসূল ﷺ'র সাহাবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, **إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا** যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফিররা বের করে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন দু'জনের একজন (অপরজন ছিলেন আবু বকর (রা.) যখন তারা সওর গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি তাঁর সঙ্গী (আবু বকর)কে বললেন, চিন্তিত হয়োনা, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।[৬৮১]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সিদ্দীকে আকবরকে **لِصَاحِبِهِ** বলে রাসূল ﷺ'র সাহাবী বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ হিজরতের সময় পর্বতের গুহায় রাসূল ﷺ'র সাথে আবু বকর (রা.)ই ছিলেন। এ কারণে হযরত হোসাইন ইবনে ফযল (র.)বলেন, **مَنْ قَالَ انَّ اَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ كَافِرٌ لِانْكَارِهِ نَصُّ القُرانِ** যে ব্যক্তি বলবে যে, আবু বকর (রা.) রাসূল ﷺ'র সাহাবী নয়, সে কুরআনের দলীল অস্বীকার করার কারণে কাফির হয়ে যাবে।[৬৮২]

হযরত আবু বকর (রা.)কে রাসূল ﷺ স্বয়ং নিজেই সওর গুহার সঙ্গী বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ আবু বকর (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, **اَنْتَ صَاحِبٌ فِى الغَارِ وَصَاحِبِى عَلَ الحَوْضِ** তুমি সওর পর্বতে আমার সঙ্গী ছিলে এবং হাউযে কাওসারেও আমার সঙ্গী হবে।[৬৮৩]

---

৬৮০. ইমাম বুখারী (র.), সহীহ বুখারী, খণ্ড, ১, পৃ. ৯৯, হাদিস নং-৬৭৮
৬৮১. সূরা তাওবা, আয়াত: ৪০
৬৮২. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.), খুৎবাতে মহররম, পৃ. ৭৯
৬৮৩. ইমাম তিরমিযী (র,) (২৭৯ হি.), সুনানে তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৫৫৫, হাদিস নং ৫৬৫১

হযরত আবু দারদা (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ'র দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এসময় সিদ্দীকে আকবর (রা.) এসে সালাম দিয়ে বললেন, আমার এবং ওমরের মধ্যে সামান্য তর্ক-বির্তক হয়েছে। আমি লজ্জিত হয়ে তার কাছে ক্ষমা চেয়েছি কিন্তু তিনি আমাকে ক্ষমা করেনি। রাসূল ﷺ বলেন, হে আবু বকর! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন। একটু পরে হযরত ওমর (রা.) এসে দেখলেন যে, রাসূল ﷺ'র চেহারা মোবারকের রং পরিবর্তন হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে তিনি নতযানু হয়ে আদবের সাথে বসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার চেয়ে আমার অপরাধই ছিল বেশী। তখন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, **انَّ اللهَ بَعَثَنِى اِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ صَدَقْتَ وَوَاسَانِى بِنَفْسِه وَمَاله فَهَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوْلِى صَاحِبِى** আল্লাহ যখন আমাকে তোমাদের নিকট (নবী হিসাবে) প্রেরণ করেছেন, তখন তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে আর আবু বকর আমাকে সত্যায়িত করেছিল এবং তার জান-মাল দিয়ে আমাকে সাহায্য ও চিন্তামুক্ত করেছিল। আজ কি তোমরা আমার এমন সঙ্গীকে পরিত্যাগ করবে? এ বাক্যটি তিনি দু'বার উল্লেখ করেছেন।[৬৮৪]

শ্রেষ্ঠ মুত্তাকী

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন-**إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ** নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাবান হল যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুত্তাকী।[৬৮৫]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা হযরত আবু বকর (রা.)'র গুণকীর্তন করে বলেন- **وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى** আর জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখা হবে তাকে, যে সর্বাধিক মুত্তাকী বা খোদাভীরু। আর যে আত্মশুদ্ধির জন্যে তার ধনসম্পদ দান করে এবং তার উপর কারো কোন প্রতিদান যোগ্য অনুগ্রহ থাকেনা, তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে।[৬৮৬]

উক্ত আয়াতের শানে নুযূল হল- হযরত আবু বকর (রা.) যখন হযরত বিলাল (রা.)কে চড়া মূল্য আদায় করে আযাদ করেছেন, তখন কাফিররা বলতে লাগল যে, নিশ্চয় আবু বকরের উপর বিলালের কোন ইহসান ছিল, যা পরিশোধের লক্ষ্যে এত মূল্য

---

৬৮৪. ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.), তারীখুল খোলাফা, পৃ. ৩৭, সূত্র: খুৎবাতে মহররম, পৃ. ৮১
৬৮৫. সূরা হুজরাত, আয়াত; ১৩
৬৮৬. সূরা আল লায়ল, আয়াত; ১৭-২১

দিয়ে আযাদ করেছেন। তখন আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াত নাযিল করে কাফিরদের কথা খণ্ডন করেন এবং আবু বকর (রা.)'র প্রশংসা করেন। তাঁর গোলাম আযাদের মূল উদ্দেশ্য যে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি তাও আল্লাহ ঘোষণা করেন। আর আয়াতে বর্ণিত الْأَتْقَى শব্দ দ্বারা তিনি যে শ্রেষ্ঠ মুত্তাকী তা ফুটে উঠেছে।

রাসূল ﷺ'র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি

হযরত ওমর (রা.) বলেন, أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ হযরত আবু বকর (রা.) আমাদের সরদার। আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং আমাদের সকলের চেয়ে রাসূল ﷺ'র নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন।[৬৮৭]

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ তাকে "যাতুস সালাসিল" (অভিযান)এর সৈন্যবাহিনীর উপর আমীর নিযুক্ত করে পাঠালেন। (তিনি বলেন) আমি ফিরে এসে রাসূল ﷺ'র কাছে গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, মানুষের মধ্যে কে আপনার কাছে সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, আয়েশা। আমি বললাম, পুরুষের মধ্যে? তিনি বললেন, তার পিতা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কে? তিনি বললেন, ওমর। অতঃপর আমি এভাবে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, তিনিও আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন। এরপর আমি চুপ হয়ে গেলাম এই আশংকায় যে, সম্ভবত আমার নাম সকলের শেষে পড়ে যাবে।[৬৮৮]

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন- إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِه وَمَالِه أَبَا بَكْرٍ وَعِنْدَ الْبُخَارِى اَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ اُخُوَّةُ الاِسْلَامَ وَمَوَدَّتِه لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ وَفِى رَوَايَةٍ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً غَيْرَ رَبِّى لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا লোকদের মধ্যে নিজস্ব সম্পদ ও সাহচর্য দ্বারা আমার প্রতি সর্বাধিক ইহসান করেছেন আবু বকর। বুখারীতে أَبَا بَكْرٍ রয়েছে। যদি আমি কাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তার সাথে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও (দ্বীনি) মুহাব্বত রয়েছে। (তারপর তিনি ঘোষণা দিলেন) মসজিদে আবু বকরের দরজা ছাড়া আর কোন দরজা যেন অবশিষ্ট না থাকে। অপর এক বর্ণনায় আছে, যদি আমার পালনকর্তা ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম।[৬৮৯]

হযরত মেকদাম (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত আকিল ইবনে আবু তালিব (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে কটু বাক্য ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তিনি রাসূল ﷺ'র

৬৮৭. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি.), সুনানে তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৫৫৫, হাদিস নং ৫৬৫০
৬৮৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫৫৫, হাদিস নং ৫৬৪৬
৬৮৯. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৫৫৪, হাদিস নং ৫৬৪৩

আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে তাকে কিছুই বলেননি, তবে রাসূল ﷺকে পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন। আদ্যপ্রান্ত ঘটনা শুনে নবী করিম ﷺ দাঁড়িয়ে বলেন, اَلاَ تَدَعَوْنَ لِى صَاحِبِى مَا شَانُكُمْ وشَانهُ فَوَ اللهِ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ الاَّ عَلى بَابِ بَيْتِه ظُلْمَةٌ الاَّ بَابُ اَبِى بَكْرٍ فَاِنَّ اللهَ عَلى بَابِه النُّورَ فَوَ اللهِ لَقَدْ قُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ اَبُو بَكْرٍ صَدَقْتَ وَاَمْسَكْتُمْ الاَمْوَالَ وَجَادَلِى بِمَالِه وَحَذَ لْتُمُوْنِى وَوَاسَانِى وَاتَّبَعْنِى হে লোক সকল! আমার বন্ধুকে আমার জন্য ছেড়ে দাও। তোমাদের মর্যাদা কোথায়, আর তার (আবু বকরের) মর্যাদা কোথায়? আল্লাহর শপথ! তোমাদের দরজাসমূহ অন্ধকার আবু বকরের দরজা ব্যতীত। কেননা তার দরজা আলোকিত। আল্লাহর শপথ! তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে পক্ষান্তরে আবু বকর আমাকে সত্যায়ন করেছে। তোমরা সম্পদ ব্যয়ে কৃপণতা করেছিলে আর আবু বকর স্বীয় সম্পদ (ইসলামের জন্য) ব্যয় করেছিল। তোমরা আমাকে সাহায্য করনি আর আবু বকর আমাকে সান্তনা দিয়েছে এবং আমার অনুসরণ করেছে।[৬৯০]

রাসূল ﷺ'র প্রতি ভালবাসা

হুব্বে রাসূল ঈমানের পূর্বশর্ত। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْه مِنْ وَالِده وَوَلَده وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হতে পারবেনা, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হই।[৬৯১]

ইসলামের প্রথম যুগে হযরত আবু বকর (রা.)এর অনুরোধে রাসূল ﷺ লোকদেরকে মসজিদে হারামে একত্রিত করেন আর সিদ্দীকে আকবর ভাষণ দিচ্ছিলেন। এ সময় মুশরিকরা চর্তুদিক থেকে এসে আক্রমণ করল। এতে সিদ্দিকে আকবর গুরুতর আহত হন এবং রক্তাক্ত অবস্থায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। অনেকেই মনে করেছিল তিনি ইন্তিকাল করেছেন। সারা দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত বেহুঁশ ছিলেন। হুঁশ আসা মাত্র মুখে রাসূল ﷺ'র নাম উচ্চারণ করলেন। তিনি বেঁচে আছেন জেনে লোকেরা তাঁকে তাঁর মা উম্মুল খায়রের নিকট সংবাদ পাঠাল যে, তার জন্য আহারের ব্যবস্থা করুন। মা কিছু খাবার নিয়ে আসলে তিনি বলতে লাগলেন রাসূল ﷺ'র কি অবস্থা? পরে হযরত ওমর (রা.) এর বোন উম্মে জামিলের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, রাসূল ﷺ ভাল আছেন। তিনি জানতে চাইলেন যে, এখন রাসূল ﷺ কোথায় আছেন? বলা হল তিনি এখন হযরত আরকামের ঘরে আছেন। তখন তিনি বললেন, খোদার কসম! আমি রাসূল ﷺ

৬৯০. ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.), তারীখুল খোলাফা, পৃ. ৩৭, সূত্র: খুৎবাতে মহররম, পৃ. ৮২
৬৯১. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-১২৫, হাদিস নং- ৯

এর সাক্ষাত না করা পর্যন্ত কিছুই আহার করবো না। অতঃপর সন্ধ্যা বেলায় তাঁর মা তাকে নিয়ে হযরত আরকাম (রা.)এর ঘরে নিয়ে রাসূল ﷺএর সাক্ষাত করিয়ে দেন।[৬৯২]

হিজরতের সময় হযরত আবু বকর (রা.) রাসূল ﷺএর কখনো আগে আবার কখনো পিছে পিছে চলতেন। পথ চলতে চলতে রাসূল ﷺ পা মোবারক আহত হয়ে পড়ল। তখন আবু বকর (রা.) তাঁকে কাঁধে নিয়ে প্রায় আড়াই কিলোমিটার উচুঁ সওর পর্বতে নিয়ে যান। পর্বতের গুহায় পৌঁছে প্রথমে তিনি নিজে গুহায় অবতরণ করেন। যাতে সেখানকার কোন কষ্টদায়ক বস্তু রাসূল ﷺকে কষ্ট দিতে না পারে। এখানে তিনি রাসূল ﷺ'র জন্য নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত কায়েম করলেন। অতপর তিনি গুহার ভিতরে গিয়ে কয়েকটি গর্ত দেখেন। তিনি তার গায়ের মূল্যবান চাদর ছিড়ে তা দিয়ে বেশ কয়টি গর্তের মুখ বন্ধ করে দিলেন। অবশেষে কাপড় শেষ হওয়াতে দু'টি গর্ত বন্ধ করতে পারেন নি। তাই তাতে তিনি নিজের দুপা দিয়ে বন্ধ করে গুহাকে নিরাপদ করে রাসূল ﷺকে প্রবেশের অনুরোধ জানান। রাসূল ﷺ তাশরীফ নিয়ে আবু বকরের রানে স্বীয় মাথা মোবারক রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে গর্ত থেকে সাপে আবু বকরের পায়ে দংশন করল। কিন্তু রাসূল ﷺ'র ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে ভেবে সাপের বিষ হজম করতেছেন আবু বকর তবুও রাসূল ﷺকে জাগ্রত করলেন না। অবশেষে তাঁর চোখের পানি রাসূল ﷺএর চেহারা মোবারকে পতিত হলে তিনি জাগ্রত হন আর তাঁর থু থু মোবারক আহত স্থানে লাগিয়ে দিলে সাথে সাথে বিষ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।[৬৯৩]

এরূপ আবু বকর (রা.)এর রাসূল প্রেমের অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত আছে যা দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার ভয়ে বর্ণনা করা হলনা।

হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন তাঁর সম্মুখে হযরত আবু বকর (রা.)এর আলোচনা হল। তখন তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমি আন্তরিকভাবে এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি যে, হায়! আমার গোটা জীবনের আমলসমূহ যদি আবু বকরের জীবনের দিনসমূহের একদিনের আমলের সমান হতো এবং তাঁর জীবনের রাতসমূহের মধ্য থেকে এক রাতের আমলের সমান হতো। তাঁর এ রাত হলো সে রাত, যে রাতে তিনি রাসূল ﷺএর সাথে সওর পর্বতের গুহার দিকে রওয়ানা হন। তাঁরা উভয় যখন ঐ গুহার নিকট পৌঁছল, তখন আবু বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আপনি এখন গুহার ভেতরে ঢুকবেন না, যে পর্যন্ত না আমি আপনার আগে এর ভেতরে প্রবেশ করি। যদি এতে ক্ষতিকর কিছু থাকে, তবে এর ক্ষতি আপনার পরিবর্তে আমার উপর দিয়ে যাক। এই বলে তিনি গুহার ভিতরে ঢুকে পড়লেন এবং এর অভ্যন্ত

৬৯২. ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), তারীখুল খোলাফা, সূত্র: খুৎবাতে মহররম, পৃ-৯৭
৬৯৩. আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.), (১০৫২ হি) মাদারেজুন নবুয়্যত, খণ্ড-২, পৃ-১০৩

রকে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর এর একপাশে কয়েকটি ছিদ্র ছিল। তিনি চাদর ছিড়ে তা দিয়ে ছিদ্রসমূহ বন্ধ করে দিলেন। তবে দু'টি ছিদ্র অবশিষ্ট ছিল। উক্ত ছিদ্র দু'টির মুখে তিনি নিজের পা দু'টি রেখে বন্ধ করলেন। তারপর রাসূল ﷺকে বললেন, প্রবেশ করুন। অতপর তিনি তথায় প্রবেশ করলেন এবং আবু বকরের উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ সময় উক্ত ছিদ্র থেকে আবু বকরের পা দংশিত হল। কিন্তু রাসূল ﷺএর নিদ্রা ভঙ্গ হবে এই আশংকায় তিনি এতটুকু নড়াচড়া করলেন না। তবে তাঁর চোখের পানি রাসূল ﷺএর চেহারা মোবারকে পড়ল। তখন তিনি বললেন, হে আবু বকর! তোমার কি হল? উত্তরে তিনি বললেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক, আমি দংশিত হয়েছি। তখন রাসূল ﷺ তাঁর ক্ষতস্থানে নিজের থু থু লাগিয়ে দিলেন ফলে তিনি যে বিষ যন্ত্রনায় ভুগছিলেন, তা চলে গেল। এরপর (শেষ বয়সে) উক্ত বিষক্রিয়া তাঁর মধ্যে আবার দেখা দিল এবং এটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হল। আর তাঁর দিনের সেই আমলটি হল– রাসূল ﷺ'র ওফাতের পর আরববাসীরা মুরতাদ হয়ে গেল এবং তারা বলল, আমরা যাকাত প্রদান করব না। তখন তিনি বলেছিলেন, "যদি তারা একখানা রশি প্রদানেরও অস্বীকার করে, তবে নিশ্চয় আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব।" তখন আমি বলেছিলাম, হে রাসূল ﷺএর খলীফা! মানুষের সাথে হৃদ্যতা প্রদর্শন করুন এবং তাদের সাথে কোমল ব্যবহার করুন। উত্তরে তিনি আমাকে বলেছিলেন, জাহেলী যুগে তুমি তো ছিলে বড়ই বাহাদুর, এখন ইসলামের পর কি কাপুরুষ হয়ে পড়লে? জেনে রাখো, নিশ্চয় ওহী আসার ছিলছিলা চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং দ্বীন পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এখন দ্বীন হ্রাস পাবে আর আমি জীবিত থাকব? তা হতে পারে না। অর্থাৎ আমার জীবদ্দশায় এরূপ হতে দিব না।[৬৯৪]

قَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ انَّ اَبَا بَكْرٍ لَمْ يُفَضِّلِ النَّاسَ بِانَّهُ كَانَ اَكْثَرُهُمْ صَلَاةً وَصَوْمًا انَّمَا فَضَّلَهُمْ بِشَيْءٍ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ হযরত বকর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) অন্যান্য সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন কোন অধিক পরিমাণে নামায-রোযার কারণে নয় বরং সকলের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন অন্য একটি বস্তু দ্বারা হয়েছে, যা তাঁর অন্তরে বিদ্যমান। (অর্থাৎ রাসূলের প্রতি অগাধ ভালবাসা ও বিশ্বাস দ্বারাই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন।)[৬৯৫]

ইসলামের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ

হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রা.) ইসলামের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করে দিয়ে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ'র নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। সদরুল আফাযিল হাকীম মাওলানা নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী (র.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) যখন চল্লিশ হাজার দীনার আল্লাহর রাস্তায় এভাবে ব্যয় করেছেন যে, দশ হাজার রাতে, দশ হাজার

৬৯৪. ইমাম রযীন (র.) সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৫৫৬, হাদিস নং-৫৬৫৭
৬৯৫. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.), (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-১, পৃ-১৪১

দিনে, দশ হাজার গোপনে আর দশ হাজার প্রকাশ্যে তখন আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন- الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ যারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে রাতে ও দিনে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে, তাদের প্রতিদান তাদের পালনকর্তার নিকট রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তাদের চিন্তার কোন কারণ নেই।[৬৯৬]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِيهِ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ যে কোন ব্যক্তি আমাদের উপর যে কোন প্রকারের এহসান করেছে, আমরা তার প্রতিদান দিয়েছি, আবু বকরের এহসান ছাড়া। তিনি আমাদের প্রতি যেই এহসান করেছেন আল্লাহ তায়ালাই কিয়ামতের দিন তাকে তার প্রতিদান দান করবেন। আর কারো মাল-সম্পদ আমাকে ততখানি উপকৃত করতে পারেনি, যতখানি আবু বকরের মাল-সম্পদ আমাকে উপকৃত করেছে।[৬৯৭]

হযরত ওমর (রা.) বলেন, একদিন রাসূল ﷺ আমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করার নির্দেশ দেন। সে সময় আমার কাছে পর্যাপ্ত সম্পদ ছিল। তখন আমি (মনে মনে) বললাম, (দানের প্রতিযোগিতায়) যদি আমি কোনদিন আবু বকর (রা.)'র উপর জিততে পারি, তবে আজকেই জিততে পারব ওমর (রা.) বলেন, অতপর আমি আমার সম্পদের অর্ধেক নিয়ে রাসূল ﷺ'র খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, পরিবার-পরিজনের জন্য কি পরিমাণ রেখে এসেছ? আমি বললাম, এর সমপরিমাণ। আর আবু বকরের কাছে যা কিছু ছিল তিনি তা নিয়ে উপস্থিত হলেন। এবার রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, হে আবু বকর! مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য কি রেখেছ? উত্তরে তিনি বললেন- أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ আমি তাদের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি। ওমর (রা.) বলেন, তখন আমি (মনে মনে) বললাম, আমি আর কখনো কোন বিষয়ে আবু বকরের উপর জিততে পারব না।[৬৯৮]

ইমাম শা'বী (র.) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হল- إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ যদি তোমরা প্রকাশ্যে সাদকা কর, তবে তা

৬৯৬. সূরা বাকারা, আয়াত-২৭৪
৬৯৭. ইমাম তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৫৫, হাদিস নং-৫৬৪৯
৬৯৮. তিরমিযী ও আবু দাউদ, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৫৫৫, হাদিস নং ৫৬৫৩

কতইনা উত্তম। আর যদি তা গোপন রাখ এবং ফকীরদেরকে দাও, তবে তা তোমাদের বড়ই কল্যাণকর।[৬৯৯] তখন হযরত ওমর (রা.) লোকদের সম্মুখে প্রকাশ্যে তার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে রাসূল ﷺ'র নিকট আসলেন। পক্ষান্তরে হযরত আবু বকর (রা.) গোপনে তার সব সম্পদ নিয়ে রাসূল ﷺ'র কাছে আসলেন। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছ? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওয়াদা রেখে এসেছি। তখন হযরত ওমর (রা.) বলেন, হে আবু বকর! আপনার উপর আমি এবং আমার পরিবার উৎসর্গ! আপনি নেকী অর্জনে সর্বধিক দিয়ে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেলেন।[৭০০]

সৎকাজে অগ্রগামী

যে সব কারণে হযরত আবু বকর (রা.) উম্মতের সর্বত্তোম ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করেন তম্মধ্যে অন্যতম হল তিনি সর্বদা সৎকাজে সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে সম্মোধন করে বললেন- তোমাদের মধ্যে কে আজ রোযাদার? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি। তিনি আবার বললেন, তোমাদের মধ্যে আজকে কে কোন জানাযায় শরীক হয়েছ? আবু বকর (রা.) বলেন, আমি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে আজকে কে মিসকীনকে আহার করায়েছ? উত্তরে আবু বকর (রা.) বলেন, আমি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে আজকে কে কোন রোগীর সেবা করছে? উত্তরে আবু বকর (রা.) বলেন, আমি তখন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ যে ব্যক্তির মধ্যে এসব গুণাবলী একত্রিত হবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৭০১]

হযরত ওমর (রা.) বলেন, তিনি একজন অন্ধ বৃদ্ধা মহিলার কাজ-কর্ম করে দিতেন এবং তার ঘরে পানি ভরে দিতেন। একদিন গিয়ে দেখেন যে, তাঁর পূর্বেই কেউ গিয়ে এ কাজ করে দিয়েছেন। এভাবে বেশ কয়দিন চলল। পরিশেষে একদিন তিনি গোপনে দেখছিলেন যে, তাঁর আগে এসে এ কাজ হযরত আবু বকর (রা.)-ই করে দেন। আর এটি তখনকার ঘটনা যখন তিনি খলীফা ছিলেন। অর্থাৎ একজন খলীফা হয়েও গোপনে এসে হযরত ওমর (রা.)'র সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অসহায় মহিলার কাজ করে দিতেন।[৭০২]

৬৯৯. সূরা বাকারা, আয়াত, ২৭১
৭০০. গোলাম রাসূল সাঈদী, শরহে মুসলিম, খণ্ড-৬, পৃ. ৮৮৮
৭০১. ইমাম মুসলিম (র.), সহীহ মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ৬০৬০
৭০২. ইবনুল আসীর জযরী (র.) (৬৩০ হি.) উসদুল গাবাহ, খণ্ড-৩, পৃ. ২১৬, সূত্র: শরহে মুসলিম, খণ্ড-৬, পৃ. ৮৮৯

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এক চাঁদনী রাতে নবী করিম ﷺ'র মাথা মোবারক আমার কোলে ছিল, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আকাশে যতগুলো নক্ষত্র আছে এ পরিমাণ কারো নেকী হবে কি? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ হবে। ওমরের নেকী এ পরিমাণ। আমি বললাম তবে আবু বকরের নেকী কোথায়? তখন তিনি বললেন, ওমরের সব নেকী আবু বকরের নেকীসমূহের মধ্য থেকে একটি নেকীর সমান।[৭০৩]

রাসূল ﷺ'র প্রতি অগাধ বিশ্বাস

রাসূল ﷺ'র অন্তিমকালে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)'র নেতৃত্বে সাতশ সৈন্যদল সিরিয়ার দিকে প্রেরণ করেন। তাঁরা মদীনার অনতিদূরে 'যী হাশব' নামক স্থানে পৌঁছলে রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেন। এই সংবাদ শুনে মদীনার নিকটবর্তীর দুর্বল মুসলমানরা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যেতে লাগল। তখন সাহাবায়ে কিরামগণ হযরত আবু বকর (রা.)'র নিকট এসে পরামর্শ দিলেন যেন ঐ সৈন্যদলকে ফেরত আনা হোক। এই নাজুক সময়ে এত সংখ্যক সাহাবী মদীনা ত্যাগ করা উচিত হবেনা। ওদিকে রাসূল ﷺ'র ওফাতের সংবাদ শুনে হযরত উসামা মদীনায় ফিরে আসেন। তিনিও সৈন্যদল ফিরিয়ে আনার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরলেন। এটি হযরত আবু বকর (রা.)'র জন্য বড় কঠিন মুহূর্ত ছিল। কিন্তু তিনি রাসূল ﷺ'র প্রতি এমন অগাধ বিশ্বাস পোষণ করতেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তে এতই অটল ছিলেন যে, তিনি বলেছিলেন, যদি হিংস্র প্রাণী কিংবা পাখি আমার পায়ের মাংস ছিঁড়ে খায় তাও আমি মাথা পেতে নেবো কিন্তু রাসূল ﷺ'র সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা এবং তাঁর প্রেরিত সৈন্যদলকে ফিরিয়ে আনা আমি পছন্দ করিনা। এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। অতএব, এ অবস্থায়ও তিনি সৈন্যদল রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেন এবং তারা বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন। তাই হযরত আবু হোরায়রা (রা.) একদিন খোদার শপথ করে বলেন, যদি হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা না হতেন, তাহলে আল্লাহর ইবাদত হতনা। এ কথা তিনি তিনবার উল্লেখ করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আপনি একথা কেন বলছেন? উত্তরে তিনি উপরোক্ত ঘটনা উল্লেখ করেন।[৭০৪]

আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে যে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল তা হল, উসামার সৈন্যদল প্রেরণ করা। মুরতাদ ও যাকাত অস্বীকারকারী এবং ভণ্ডনবী মুসায়ালামাতুল কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আর পবিত্র কুরআনুল করীম সংকলন করা।

৭০৩. রযীন, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫৬০, হাদিস নং ৫৬৮৭

৭০৪. ইমাম বায়হাকী ও ইবনে আসাকের, সূত্র: শরহে মুসলিম, খণ্ড-৬, পৃ. ৮৯০ ও ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.), তারীখুল খোলাফা, পৃ. ৫১, সূত্র: খুৎবাতে মহররম, পৃ. ১০০

ইসমাঈলী স্বীয় সনদে হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺএর ইন্তেকালের পরে কিছু কিছু আরব সম্প্রদায় মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তারা বলেছিল, আমরা নামায পড়ব কিন্তু যাকাত আদায় করব না।

তারপর আমি হযরত আবু বকর (রা.)এর কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! লোক বন্য পশুর ন্যায়। তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করুন। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে সহযোগীতা কামনা করছি আর তুমি আমাকে অপমান করতে এসেছ। তুমি জাহেলী যুগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলে আর ইসলামে দুর্বল হয়ে পড়েছ? নবী করিম ﷺ ইন্তেকাল করেছেন আর ওহীও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারা আমাকে একটি রশি দিতেও যদি অস্বীকার করে যা তারা রাসূল ﷺএর যুগে দিত। তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হাতে তরবারী থাকবে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব।[৭০৫]

অতঃপর হযরত ওমর (রা.)সহ সকল সাহাবায়ে কিরাম স্বীকার করেছেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) যা করেছেন তা সঠিক ছিল। এমনকি হযরত ওমর (রা.) বলেছিলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তায়ালা হযরত আবু বকর (রা.)'র বক্ষ খুলে দিয়েছিলেন এবং তিনি যা করেছেন সঠিক করেছেন।

বদর যুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.)'র পুত্র হযরত আব্দুর রহমান (রা.) মক্কার কাফির দলে ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর পিতা হযরত আবু বকর (রা.)কে বললেন, বদর যুদ্ধে আপনি অনেক বার আমার হাতের নাগালে ছিলেন। আমি ইচ্ছে করলে আপনাকে শহীদ করতে পারতাম, কিন্তু পিতা হিসেবে করিনি। তাঁর উত্তরে সিদ্দীকে আকবর (রা.) বললেন, হে আব্দুর রহমান! যদি আমি তোমাকে আমার হাতের নাগালে পেতাম তাহলে আমি তোমার প্রতি তাকাতাম না বরং তোমাকে হত্যা করতাম। অর্থাৎ তিনি আল্লাহ ও রাসূল ﷺ এবং ইসলামের স্বার্থে নিজের সন্তানকেও বিসর্জন দিতে কুণ্ঠবোধ করতেন না।

ইমাম বায়হাকী (র.) শুআবুল ঈমান গ্রন্থে বলেন, হযরত ওমর (রা.) বলেন, সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের ঈমান এবং হযরত আবু বকর (রা.)এর ঈমান যদি পরিমাপ করা হয় তাহলে হযরত আবু বকর (রা.)এর ঈমানের পাল্লা ভারী হবে।[৭০৬]

হুদায়বিয়ায় ৬ষ্ঠ হিজরিতে মক্কার কাফির ও রাসূল ﷺ'র মধ্যে যে সব শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি হয়েছিল তন্মধ্যে একটি হল-মক্কা থেকে কোন মুসলমান ও কাফির মদীনা চলে যায় তাহলে তাদেরকে মক্কাবাসীদের কাছে ফেরত দিতে হবে। পক্ষান্তরে কোন

৭০৫. গোলাম রাসূল সাঈদী, শরহে মুসলিম, খণ্ড-৬, পৃ-৮৯০

৭০৬. ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি),তারীখুল খোলাফা, পৃ-৪০

মুসলমান যদি মদীনা থেকে মক্কায় চলে আসে তাদেরকে মদীনায় ফেরয পাঠাতে হবে না। বাহ্যিক দৃষ্টিকোণে বিষয়টি সম্পূর্ণ মুসলমানদের বিপক্ষে মনে হয়। এখনো চুক্তিতে উভয় পক্ষের দস্তখত হয়নি। ইত্যবসরে আবু জন্দল (রা.) ইসলাম গ্রহণপূর্বক মক্কাবাসীর নির্যাতনের স্বীকার হয়ে আহত অবস্থায় হুদাবিয়ায় উপস্থিত হয়েছেন। আবু জন্দলের পিতা সুহাইল ইবনে আমর মক্কাবাসীর পক্ষে চুক্তির বিষয়ে কথা বলার জন্য প্রতিনিধি হিসাবে এসেছিল। সে তার ছেলেকে দেখে রাসূল ﷺকে বলল, আপনি আবু জন্দলকে আমার কাছে ফেরত দিন। রাসূল ﷺ বললেন, এখনো চুক্তিপত্রে দস্তখত হয়নি। সুতরাং উক্ত ওয়াদা চুক্তিপত্রে উভয় পক্ষের দস্তখত হয়ে যাওয়ার পরেই কার্যকর হবে। তখন সুহাইল বলল, তাহলে এই সন্ধি হবে না। ফলে রাসূল ﷺ আবু জন্দল (রা.)কে ফেরত দিতে সম্মতি হলেন। এ সময় আবু জন্দল (রা.) উপস্থিত সাহাবাগণকে বললেন, দেখুন, আমাকে মুসলমান হওয়ার অপরাধে কাফিররা কিভাবে প্রহার করেছে। এ অবস্থায় আমাকে তাদের নিকট ফেরত দিলে আমার উপর ভীষণ অত্যাচার করবে– এই বলে তিনি কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলেন। তখন হযরত ওমর (রা.) অধৈর্য হয়ে রাসূল ﷺএর নিকট গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আল্লাহর সত্যিকারের রাসূল নন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর রাসূল। হযরত ওমর (রা.) দ্বিতীয়বার আরয করলেন, আমরা সত্যের উপর আর কাফিররা মিথ্যার উপর নয় কি? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই আমরা সত্যের উপর আর তারা মিথ্যার উপর। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, তাহলে কেন আমরা দ্বীনের ক্ষেত্রে স্ববিরোধী সন্ধি করব? রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন, হে ওমর! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল, আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হতে পারি না আর তিনিই আমার সাহায্যকারী। তারপর হযরত ওমর (রা.) বললেন, আপনি তো বলেছিলেন আমরা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করব। রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ বলেছি, তবে এই বছর করব এরূপতো বলিনি। ওমর (রা.) বললেন, হ্যাঁ, এ বছরের কথা উল্লেখ করেন নি।

অতঃপর হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র নিকট গিয়ে তাঁর সাথেও অনুরূপ কথা বলেছেন। আর তিনিও রাসূল ﷺ'র ন্যায় উত্তর দিয়েছেন। আর বলেছেন হে ওমর! রাসূল ﷺ'র অনুগত হও, আমৃত্যু তাঁর দামান ধরে রাখ, তিনি আল্লাহর সত্য রাসূল এবং তিনিই তাঁর সাহায্যকারী। হযরত আবু বকর (রা.)'র সান্ত্বনামূলক উত্তরে হযরত ওমর (রা.)'র আবেগ ও জযবা ঠাণ্ডা হয়ে গেল এবং তিনি শান্ত হয়ে পড়েন।

এই ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ'র উপর অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল তাঁর। তাঁর প্রতিটি কাজ ও কথার প্রতি বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতেন।

এভাবে মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে মক্কার কাফিররা হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে এসে বলল, আপনার বন্ধু মুহাম্মদ ﷺ বলছেন যে, তিনি নাকি গত রাতে মুহূর্তের মধ্যে বায়তুল মোকাদ্দাস ও সপ্ত আসমান ভ্রমণ করে এসেছে? ঘটনাটি এখনো রাসূল ﷺ'র যবান থেকে শুনেননি তিনি। তবুও কাফিরদেরকে বললেন, اِنِّىْ لَا صَدِّقُه بِاَبْعَدَ مِنْ ذَالِكَ তিনি যদি এর চেয়েও অসম্ভব কিছু বলেন, তবুও আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করব।[১০৭]

জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া

হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বলেন, একবার আমি রাসূল ﷺ'র সাথে মদীনার কোন একটি বাগানে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বাগানের ফটক খুলে দিতে অনুরোধ করল। রাসূল ﷺ বললেন, তার জন্য ফটক খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। অতপর আমি ফটক খুলে দিয়ে দেখলাম, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)। তখন আমি তাঁকে রাসূল ﷺ'র নির্দেশ মতে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম। তিনি আলহামদু লিল্লাহ বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে ফটক খুলে দিতে অনুরোধ করল। রাসূল ﷺ বললেন, আগন্তুক ব্যক্তির জন্য ফটক খুলে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। আমি গিয়ে ফটক খুলে দেখলাম, তিনি হলেন হযরত ওমর (রা.) তখন আমি তাঁকে রাসূল ﷺ'র দেয়া সুসংবাদটি জানিয়ে দিলাম। তিনিও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। অতএব আরেক ব্যক্তি এসে ফটক খুলতে অনুরোধ করল। তখন রাসূল ﷺ আমাকে বললেন তার জন্যে ফটক খুলে দাও এবং তার উপর কঠিন বিপদের আগমনসহ তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। আমি ফটক খুলে দেখলাম তিনি হলেন হযরত ওসমান (রা.)। আমি তাঁকে রাসূল ﷺ যা বলেছিলেন তা জানিয়ে দিলাম। তখন তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। অতপর বললেন আল্লাহই আমার সাহায্যকারী।[১০৮]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, একদিন জিব্রাইল (আ.) আমার কাছে এলেন এবং আমার হাত ধরে আমাকে জান্নাতের ঐ দরজাটি দেখালেন, যে পথে আমার উম্মত প্রবেশ করবে। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, কতইনা আনন্দিত হতাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনার সাথে থেকে উক্ত দরজাটি দেখতে পেতাম। তখন রাসূল ﷺ বললেন– أَمَا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي জেনে রেখো, হে আবু বকর! আমার উম্মতের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১০৯]

---

১০৭. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.), খুৎবাতে মহররম, পৃ. ৯০
১০৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬৩, হাদিস নং- ৫৭০৩
১০৯. আবু দাউদ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৫৫৬, হাদিস নং- ৫৬৫৬

আমীরে হুজ্জাজ

নবম হিজরিতে গাযওয়ায়ে তাবুকের পরে রাসূল ﷺ হযরত আবু বকর (রা.)কে আমীরে হুজ্জাজ বানিয়ে তাঁর নেতৃত্বে তিনশ জনের একটি কাফেলা মক্কায় প্রেরণ করেন। তিনিই এই কাফেলা নিয়ে মক্কায় গিয়ে হজ্জ পালন করেন। তখনও হজ্জ ফরয হয়নি বিধায় এটি ছিল নফল হজ্ব। কারণ অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামের মতে হজ্ব ফরয হয়েছিল নবম হিজরির শেষের দিকে। তাই দশম হিজরিতে নবী করিম ﷺ বিদায় হজ্ব পালন করেন। এই ঘটনায়ও হযরত আবু বকর (রা.)'র শ্রেষ্ঠত্ব এবং নবী করিম ﷺ'র খলীফা বা প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হন।

কুরআন সংকলন

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,ইয়ামামার যুদ্ধে বহু লোক শহীদ হওয়ার পর আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আমাকে ডেকে পাঠালেন। এসময় হযরত ওমর (রা.)ও তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। আবু বকর (রা.) বললেন, ওমর আমার কাছে এসে বলেছেন, ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্তদের মধ্যে হাফেজে কুরআনের সংখ্যা অনেক। আমার আশঙ্কা যে, এভাবে যদি হাফেজে কুরআনগণ শহীদ হয়ে যান। তাহলে কুরআন শরীফের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। অতএব, আমি মনে করি যে, আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিন। আমি ওমরকে বললাম, যে কাজ রাসূল ﷺ করেননি, সে কাজ তুমি কিভাবে করবে? উত্তরে ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! এটা একটা উত্তম কাজ। ওমর কথাটি আমার কাছে বারবার বলতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিলেন এবং এ ব্যাপারে ওমর যা ভাল মনে করলেন, আমিও তা ভাল মনে করলাম। হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, আবু বকর (রা.) আমাকে বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। তোমার ব্যাপারে আমার কোন সংশয় নেই। তাছাড়া তুমি রাসূল ﷺ'র ওহী লেখক ছিলে। সুতরাং কুরআন শরীফের অংশগুলো তালাশ করে একত্রিত কর। যায়েদ (রা.) বলেন, আল্লাহর শপথ! তাঁরা যদি আমাকে একটি পাহাড় একস্থান হতে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিতেন, তাহলেও তা আমার কাছে কুরআন সংকলনের নির্দেশের চেয়ে কঠিন মনে হতনা। তখন আমি বললাম, যে কাজ রাসূল ﷺ করেননি, আপনারা সে কাজ কিভাবে করবেন? আবু বকর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! এটা একটা কল্যাণকর কাজ। এ কথাটি তিনি আমাকে বারবার বলতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আমার বক্ষকেও প্রশস্ত ও প্রসন্ন করে দিলেন সে কাজের জন্য যে কাজের জন্য তিনি আবু বকর ও ওমর (রা.)'র বক্ষকে প্রশস্ত ও প্রসন্ন করে দিয়েছিলেন। এরপর আমি কুরআন অনুসন্ধান কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করলাম এবং খেজুর পাতা, প্রস্তর খণ্ড ও মানুষের বক্ষ থেকে আমি তা সংগ্রহ করতে থাকলাম। এমনকি

আমি সূরা তাওবার শেষাংশ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ আবু খুযায়মা আনসারী (রা.) থেকে সংগ্রহ করলাম। এ অংশটুকু আমি তিনি ব্যতীত অন্য কারো কাছে পাইনি। তারপর সংকলিত সহীফাসমূহ মৃত্যু পর্যন্ত আবু বকর (রা.)'র নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তা ওমর (রা.)'র কাছে সংরক্ষিত ছিল, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। এরপর তা ওমর (রা.)'র কন্যা (রাসূল ﷺ'র স্ত্রী) হযরত হাফসা (রা.)'র কাছে সংরক্ষিত ছিল।[৭১০]

যুদ্ধে অংশগ্রহণ

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) বদর, উহুদ, খন্দক, হুদাইবিয়াসহ সকল যুদ্ধে নবী করিম ﷺ'র সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাবুক অভিযানে রাসূল ﷺ সবচেয়ে বৃহদাকারের পতাকা তাঁর হাতে দিয়েছিলেন। উহুদ ও হুনাইনের যুদ্ধে যখন কতিপয় সাহাবীর পদস্খলন হয়েছিল এবং রাসূল ﷺকে ছেড়ে পলায়ন করেছিলেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) রাসূল ﷺ'র সাথে ছিলেন এবং তাঁকে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করেন। সকল ঐতিহাসিকগণ একমত যে, হযরত আবু বকর (রা.) সকল গযওয়াতে রাসূল ﷺ'র সাথে ছিলেন।[৭১১]

কারামাত

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন আমার পিতা হযরত আবু বকর (রা.) আসহাবে সুফফার তিনজনকে মেহেমান করে ঘরে এনে তাদেরকে খানা খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়ে রাসূল ﷺ'র খেদমতে চলে গেলেন এ সময় আমাদের ঘরে লোক ছিলেন তিনজন। তিনি রাতের খাবার রাসূল ﷺ'র সাথেই খেয়ে নিলেন এবং গভীর রাতে ঘরে ফিরলেন। তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, মেহেমান রেখে আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? তিনি বললেন, তাদের কি এখনো রাতের আহার দাওনি? স্ত্রী বললেন, আপনি না আসা পর্যন্ত তারা আহার খেতে সম্মতি হননি। তাদেরকে ঘরের লোকজন আহার দিয়েছিল। কিন্তু তাদের অসম্মতির নিকট আমাদের লোকজনকে হার মানতে হয়েছে। আব্দুর রহমান বলেন, আমি তাড়াতাড়ি সরে পড়লাম। পিতা আমাকে বকা দিলেন এবং আহার নিয়ে মেহমানদের নিকট গিয়ে খেতে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, وَايْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ اللُّقْمَةِ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ "আল্লাহর কসম! আমরা যখন গ্রাস তুলে নেই তখন দেখি পাত্রের নিচ থেকে খাবার অনেক বেড়ে যায় এমনকি সবাই তৃপ্তি সহকারে খেয়েছে এবং

৭১০. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) সহীহ বুখারী, খণ্ড-২, পৃ. ৭৪৫, হাদিস নং ৪৬২৫
৭১১. ইবনুল আসীর জযরী (র.) (৬৩০ হি.), উসদুল গাবাহ, খণ্ড-৩ পৃ. ২১২

খাবার আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেল।" খাওয়ার পরে আবু বকর (রা.) দেখলেন যে, পাত্রে খাবার পূর্বাপেক্ষা অধিক রয়ে গেছে, তখন স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, এর কারণ কি? স্ত্রী বললেন, এখন খাবার পূর্বের চেয়ে তিনগুণ বেশী রয়েছে। আবু বকর (রা.) তা থেকে কয়েক গ্রাস খেলেন এবং অবশিষ্ট খাবার রাসূল ﷺ'র নিকট নিয়ে গেলেন। ভোর পর্যন্ত সেই খাবার তাঁর নিকটেই ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের (মুসলমানদের) ও অন্য একটি গোত্রের মধ্যে সন্ধি ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়াতে তাদের মোকাবিলা করার জন্য আমাদের বারজনকে নেতা মনোনীত করা হল। প্রত্যেক নেতার অধীনে কয়েকজন লোক ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন, তাদের প্রত্যেকের সাথে কতজন লোকছিল। আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, এদের প্রত্যেকেই এ খাবার থেকে তৃপ্ত সহকারে খেলেন।[৭১২]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা হযরত আবু বকর (রা.) মৃত্যু শয্যায় আমাকে ডেকে অছিয়ত স্বরূপ বলেন, হে আমার প্রিয় কন্যা! আমার যা কিছু সম্পদ আছে ঐগুলো তোমরা ওয়ারিশগণের হয়ে গেছে। আমার সন্তানের মধ্যে তোমরা দুই ভাই আব্দুর রহমান ও মুহাম্মদ তো আছ সাথে তোমার দুই বোনও আছে। সুতরাং আমার সম্পদ তোমরা কুরআনে বর্ণিত বণ্টন অনুযায়ী ভাগ করে নিজ নিজ অংশ নিয়ে নিও। হযরত আয়েশা আরয করলেন, আব্বাজান! আমার তো একটি বোন আসমা আছে দ্বিতীয় বোন কে? তিনি বললেন, তোমরা সৎমা হাবীবা বিনতে খারেজা যিনি বর্তমান গর্ভিতা। তার পেটে কন্যা সন্তান, সে তোমার দ্বিতীয় বোন। তাঁর ইন্তেকালের পর ঠিকই উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করেন।[৭১৩]

উপরোক্ত বর্ণনায় হযরত আবু বকর (রা.)'র দু'টি কারামত প্রকাশ পেয়েছে। এক. তিনি যে অচিরেই মৃত্যুবরণ করবেন তা তিনি বলে দিয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন আমার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক তোমরা ওয়ারিশগণ হয়ে গেছ। দুই. তাঁর স্ত্রীর গর্ভে যে কন্যা সন্তান রয়েছে তা তিনি জন্মের পূর্বেই নিশ্চিতভাবে বলে দিয়েছেন। মানুষের জন্ম-মৃত্যু কখন হবে এবং মাতৃগর্ভে ছেলে না মেয়ে তা সম্পূর্ণ অদৃশ্যের বিষয়। অদৃশ্যের জ্ঞান যদিও আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট, কিন্তু আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাহগণকে এরূপ জ্ঞান দান করেন। আর হযরত আবু বকর (রা.) হলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে অন্যতম। এরূপ অসংখ্য কারামত তাঁর থেকে প্রকাশ পেয়েছে যা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে বর্ণনা করা হয়নি।

৭১২. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি.), সহীহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃ. ৫০৬, হাদিস নং ৩৩২৮
৭১৩. ইমাম মুহাম্মদ (র.) (১৮৯ হি.), মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, পৃ. ৩৪৮, সূত্র: খুৎবাতে মহররম, পৃ. ১০৫-১০৬

খেলাফত ও ওফাত

হাফিয ইবনে আব্দুল বার (র.) বলেন, যেদিন রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেছেন, সে দিনই অনেকেই হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। পরের দিন মঙ্গলবার ব্যাপকভাবে প্রায় সকলেই তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণপূর্বক তাঁকে খলীফা হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। ৬৩ বছর বয়সে দুই বছর দুই মাসের কিছু বেশী সময় পর্যন্ত সফলতার সাথে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের পর তের হিজরি সনে ২২ জমাদিউস সানী মাসে ইন্তেকাল করেন তিনি। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তাঁর অছিয়ত মতে তাঁর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে উমাইস অন্য বর্ণনায় হযরত আলী (রা.) তাঁকে গোসল দেন এবং হযরত ওমর (রা.) নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন। রাতের বেলায় তাঁর অছিয়ত মোতাবেক হযরত আয়েশা (রা.)'র হুজরা শরীফে রাসূল ﷺ'র ডানপাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত আবু বকর (রা.)'র ইন্তেকালের পর কেউ কেউ বলেছেন তাঁকে শহীদগণের পাশে দাফন করা হোক। আবার কেউ কেউ বলেছেন তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হোক। আয়েশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, না, আমি তাঁকে আমার হুজরায় রাসূল ﷺ'র পাশে দাফন করব। আমরা এই মতবিরোধে লিপ্ত আছি ইত্যবসরে আমার তন্দ্রা আসল। আমি কাউকে বলতে শুনেছি যে, "মাহবুবকে মাহবুবের নিকট নিয়ে এসো।" যখন আমার তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল তখন জানতে পারলাম যে, উপস্থিত সকলেই এই আওয়ায শুনেছেন এমনকি মসজিদে উপস্থিত লোকেরাও এই আওয়ায শুনেছেন।[৭১৪]

বর্ণিত আছে যে, ইন্তেকালের পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.) অছিয়ত করেন যে, আমার তাবুতকে রাসূল ﷺ'র রওযা শরীফের নিকটে নিয়ে রাখবে এবং আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ বলে এই বলে নিবেদন করবে যে, হুযূর! আবু বকর আপনার মহান আস্তানা শরীফে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর পাশে দাফনের অনুমতি হলে দরজা অমনি খুলে যাবে। তখন আমাকে রওযার ভিতর নিয়ে যাবে, নতুবা জান্নাতুল বাকীতে দাফন করবে। বর্ণনাকারী বলেন, যখন হযরত আবু বকর (রা.)'র অছিয়ত মোতাবেক আমল করা হল এবং এখনো ঐ বাক্য শেষ হয়নি রওযা শরীফ থেকে পদা উঠে গেল এবং রওযা মোবারক থেকে উচ্চ স্বরে আওয়ায আসল-হাবীবকে হাবীবের নিকট নিয়ে এসো।[৭১৫]

৭১৪. আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৮৯ হি.) শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উর্দু, পৃ. ২৬৩
৭১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

উপরোক্ত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবু বকর (রা.) বিশ্বাস করতেন যে, নিশ্চয় রাসূল ﷺ রওয়া মোবারকে জীবিত আছেন এবং তাঁর পাশে দাফন করার অনুমতি প্রদানের ক্ষমতাও আছে তাঁর। সুতরাং সকল মুসলমানের উচিত হযরত আবু বকর (রা.)'র আক্বীদা-বিশ্বাস পোষণ করা।

হযরত আবু বকর (রা.)কে ভালবাসা উম্মতের উপর ওয়াজিব

عَنْ سَهَلْ بْنِ سَعَدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ اَبِىْ بَكْرٍ وَشُكْرِهِ وَاجِبٌ عَلى اُمَّتِىْ হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আবু বকরকে ভালবাসা এবং তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করা আমার উম্মতের উপর ওয়াজিব।[৭১৬]

হযরত ওমর (রা.)

নাম ও নসবঃ নাম ওমর। **উপনামঃ** আবু হাফস, উপাধি ফারুকে আ'যম। **পিতার নামঃ** খাত্তাব। **মাতার নামঃ** আনতামা যিনি হিশাম ইবনে মুগীরার কন্যা এবং আবু জেহেলের বোন। তিনি হস্তীবাহিনী ঘটনার তের বছর পরে জন্মগ্রহণ করেন। নবুয়তের ষষ্ঠ সালে সাতাশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি পুরুষদের মধ্যে মতান্তরে ঊনচল্লিশ কিংবা চল্লিশতম মুসলমান।

নবী করিম ﷺ'র দোয়ার বরকতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছিলেন– اَللّٰهُمَّ اَعِزِّ الاِسْلَامَ بِاَبِى جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ اَوْ بِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَاَصْبَحَ عُمَرَ فَغَدَا عَلى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْلَمَ ثُمَّ صَلَّى فِى المَسْجِدِ ظَاهِرًا "হে আল্লাহ! আবু জেহেল ইবনে হিশাম অথবা ওমর ইবনুল খাত্তাব দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী কর।" এ দোয়ার পরদিন ভোরে ওমর (রা.) রাসূল ﷺ'র খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর রাসূল ﷺ মসজিদে হারামে প্রকাশ্যে নামায পড়েছেন।[৭১৭]

হাকেমের বর্ণনায় ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম ﷺ এভাবে দোয়া করেছিলেন যে, اَللّٰهُمَّ اَعِزِّ الاِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ خَاصَّةً "হে আল্লাহ! বিশেষত ওমর ইবনুল খাত্তাব দ্বারা ইসলামের সম্মান বৃদ্ধি কর।"[৭১৮]

---

৭১৬. আবু নুআঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০ হি.), ফাযায়েলুল খোলাফায়ির রাশেদীন ও ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.), তারীখুল খোলাফা, পৃ. ৪০

৭১৭. আহমদ ও তিরমিযী, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ-৫৫৭, হাদিস নং- ৫৬৬৬

৭১৮. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.), খুৎবাতে মহররম, পৃ-১০৯

ফারুক উপাধি লাভ

হযরত ওমর (রা.) বলেন, যখন আমি কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে মুসলমান হলাম তখন আমার ইসলাম গ্রহণের খুশীতে হযরত আরকাম (রা.)এর ঘরে উপস্থিত সকলেই এমন উচ্চস্বরে নারায়ে তাকবীর বলেছেন যে, যা মক্কার সব লোকেরা শুনেছে। আমি রাসূল ﷺকে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি সত্যের উপর নেই? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয় সত্যের উপর আছি। আমি বললাম তাহলে এত লোকচুরি কেন? এরপর আমরা সকল মুসলমান ঘর থেকে দুই সারি হয়ে বের হলাম। এক সারির প্রারম্ভে ছিলেন হযরত হামযা (রা.) আর অপর সারির আগে ছিলাম আমি। এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে আমরা সর্বপ্রথম মসজিদে হারামে প্রবেশ করলাম। মক্কার কাফিররা আমাকে এবং হযরত হামযা (রা.)কে মুসলমানদের দলে দেখে ভীষণভাবে ক্ষুন্ন ও চিন্তিত হল। সেই দিনই রাসূল ﷺ হযরত ওমর (রা.)কে "ফারুক" উপাধিতে ভূষিত করেন। কেননা তাঁর দ্বারা ইসলাম প্রকাশিত হয়েছে এবং হক-বাতিলের তথা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য ফুটে উঠেছে।[৭১৯]

ইসলাম গ্রহণ

মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে দেখে মক্কার কাফিররা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত করল যে, মুহাম্মদ ﷺকে হত্যা করা হবে। কিন্তু এ কাজ কে করবে? তারা ঘোষণা করেও কাউকে পাওয়া গেল না। অবশেষে ওমর (রা.) বললেন আমিই হত্যা করব। ওমর (রা.) উঠে তরবারী নিয়ে এ উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পথে নুআঈম ইবনে আব্দুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ওমর! কোথায় যাচ্ছ? উত্তর দিলেন, মুহাম্মদ ﷺকে হত্যা করতে যাচ্ছি। নুআঈম বললেন, তাঁকে হত্যা করে তুমি বণি হাশিম ও বণি যুহরা থেকে নিজেকে কিভাবে রক্ষা করবে? তাঁর বদলায় তারা তোমাকে হত্যা করবে। ওমর (রা.) বললেন, মনে হয় তুমিও পূর্বপূরুষদের ধর্মত্যাগ করেছ। আগে তোমাকেই শায়েস্তা করতে হবে– এই বলে তরবারী উন্মুক্ত করলেন। নুআঈম (রা.) বললেন, হ্যাঁ আমি মুসলমান হয়েছি। তিনিও তরবারী হাতে নিলেন এবং বললেন, তুমি আগে তোমার ঘরের খবর নাও। তোমার বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে যায়েদ পূর্বপূরুষের ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে গেছে। এ কথা শুনে ওমর (রা.) ভীষণ রেগে গিয়ে সোজা বোনের ঘরে চলে যান। সেখানে দরজা বন্ধ করে হযরত খাব্বাব (রা.) স্বামী-স্ত্রী উভয়কে কুরআন মাজীদ পড়াচ্ছেন। ওমর (রা.) দরজা খুলতে বললেন। তাঁর আওয়ায শুনে খাব্বাব (র.) ঘরের এক কোণে নিজেকে গোপন রাখলেন। বোন দরজা খুলে দিলে তিনি ঘরে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি পড়ছ? আর কিসের শব্দ আমি শুনেছি? বোন উত্তর পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করলে ওমর (রা.) বলেন, তোমরা নিজের

---

৭১৯. ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), তারীখুল খোলাফা,পৃ-৭৮, সূত্রঃ খোৎবাতে মহররম, পৃ-১১৩

পূর্বপূরুষের ধর্মত্যাগ করে অন্য ধর্মগ্রহণ করেছ? ভগ্নিপতি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আমরা তা করেছি। কারণ পূর্বপূরুষের ধর্ম ছিল বাতিল আর এই ধর্ম হল সত্য। এইকথা শ্রবণ মাত্র ওমর (রা.) ভগ্নিপতির দাড়ি ধরে মাটিতে ফেলে মারতে লাগলেন বোন বাধা দিতে আসলে তাকে ও এমনভাবে থাপ্পড় দিলেন যে, তিনিও রক্তাক্ত হয়ে গেলেন। বোন বললেন, হে ওমর! আমাদেরকে প্রহার করতেছ এই জন্য যে আমরা মুসলমান হয়ে গিয়েছি। তাহলে শুন, তুমি মারতে মারতে আমাদের শরীর থেকে রক্ত বের করতে পার কিন্তু আমাদের অন্তর থেকে ঈমান বের করতে পারবে না। আমরা কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়েছি, তোমার যা ইচ্ছে কর। বোনের রক্তমাখা মুখে একথা শুনে ওমর (রা.)'র রাগ কিছুটা প্রশমিত হল আর বললেন, তোমরা যে কিতাব পড়েছিলে তা আমাকে দাও, আমি পড়ব। বোন বললেন, তুমি অপবিত্র, এই পবিত্র কিতাব পবিত্র লোকেরাই স্পর্শ করতে পারে। বারংবার বলার পরও পবিত্র কুরআন মাজীদ গোসল করা ব্যতীত তাঁর হাতে দেওয়া হয়নি। অবশেষে গোসল করে কিতাব নিয়ে তিনি সূরা তোয়াহা পড়া আরম্ভ করলেন। যখন إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي পর্যন্ত পৌঁছেন তখন ওমর (রা.) বলেছেন, আমাকে মুহাম্মদ ﷺএর কাছে নিয়ে যাও। একথা শুনে হযরত খাব্বাব (রা.) আত্মপ্রকাশ করলেন এবং বললেন, হে ওমর! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে রাসূল ﷺ দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি ওমর অথবা আবু জেহেল এই দুইজনের মধ্যে যাকে ভালবাসেন তাকে দিয়ে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করুন। মনে হয় রাসূল ﷺএর দোয়া তোমার হকে কবুল হয়েছে। এসময় রাসূল ﷺ সাফা পর্বতের নিকটে হযরত আরকাম (রা.)এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। হযরত খাব্বাব (রা.) ওমর (রা.)কে নিয়ে রাসূল ﷺএর খেদমতে আসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। হযরত আরকাম (রা.)এর ঘরের দরজায় হযরত হামযা, হযরত তালহা (রা.)সহ কয়েকজন সাহাবী দায়িত্বরত ছিলেন। হযরত হামযা (রা.) তাঁকে আসতে দেখে বললেন, ওমর আসছে। আল্লাহ যদি তার কল্যাণ চান তবে আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে। আর যদি তার উদ্দেশ্য অন্য কিছু হয় তাহলে তাকে হত্যা করা আমার জন্য খুবই সহজ কাজ। ইত্যবসরে এ সম্পর্কে রাসূল ﷺএর উপর ওহী নাযিল হয়। ফলে তিনি ঘরের বাইরে তাশরীফ এনে ওমর (রা.)এর আচল ও তরবারী ধরে বললেন, হে ওমর! তুমি লাঞ্ছিত না হওয়া পর্যন্ত কি বিশৃঙ্খলা করতে থাকবে? এ কথা শ্রবণমাত্র ওমর (রা.) কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান।[৭২০]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا اَسْلَمَ عُمَرُ نَزَلَ جِبْرِئِيْلَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَقَدْ اسْتَبْشَرَ اَهْلُ السَّمَآءِ بِاِسْلَامِ عُمَرَ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ

[৭২০]. ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), তারীখুল খোলাফা

করেছেন, তখন হযরত জিব্রাইল (আ.) অবতীর্ণ হয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ ﷺ ওমরের ইসলাম গ্রহণে আসমানবাসী ফেরেশ্তারা স্বাগত জানিয়েছে।[৭২১]

ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি

হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদেরকে নিয়ে সর্বপ্রথম মসজিদে হারামে প্রকাশ্যে নামায পড়েন এবং মুসলমানরা তাদের ইসলাম গ্রহণ প্রকাশ করতে সাহস পেয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করে কুরাইশদের সর্দার আবু জেহেলের ঘরে গিয়ে করাঘাত করেছি। সে ভিতর থেকে বলল, কে? আমি বললাম, আমি ওমর। আমি তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছি। সে আমার ভয়ে দরজা খুলেনি বরং ভিতর থেকে দরজা মজবুত করে বন্ধ করে দিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও দরজা খুলেনি। তারপর আমি অন্যান্য বড় বড় সর্দার ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে একই কথা বললাম। কেউ আমার সামনে এসে নিষেধ করতে সাহস পায়নি।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) মুসলমান হওয়াটা ইসলামের জন্য বিজয় ছিল, তাঁর হিজরত আল্লাহর সাহায্য ছিল এবং তাঁর খিলাফত আল্লাহর রহমত ছিল।

হযরত সুহাইব (রা.) বলেন, যখন হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন তখন ইসলাম প্রকাশিত হল। এর পূর্বে লোকেরা নিজেদের ইসলাম গ্রহণ প্রকাশ করত না। তাঁর ঈমান আনার পর মানুষকে ইসলামের দিকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়া আরম্ভ হয় এবং বায়তুল্লাহ শরীফের পাশে আমরা মজলিস কায়েম করতে পেরেছি। প্রকাশ্যে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পেরেছি, কাফিরদের থেকে প্রতিশোধ নিতে আর তাদের জবাব দিতে সক্ষম হয়েছি।[৭২২]

হিজরত

হযরত ওমর (রা.)এর হিজরত ছিল এক দুঃসাহসিক ঘটনা। হযরত আলী (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.)'ই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে হিজরত করেছেন। তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যে যখন বের হলেন, তখন তরবারী গলায় ঝুলিয়ে নিলেন, কামান কাঁধে নিলেন এবং তীর হাতে নিলেন। তারপর বায়তুল্লায় উপস্থিত হলেন। এসময় সেখানে অনেক কুরাইশ সর্দার বসা ছিল। তিনি নির্ভয়ে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করেন এবং মকামে ইব্রাহিমের নিকটে দু'রাকাত নামায পড়েন। তারপর কুরাইশ সর্দারদের নিকটে এসে

[৭২১]. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.), (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-১ পৃ-২৫৮
[৭২২]. ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), তারীখুল খোলাফা, পৃ-৭৯

একেক জনকে পৃথক পৃথকভাবে বললেন, তোমাদের চেহারা বিকৃত হোক, তোমাদের ধ্বংস হোক, যে ব্যক্তি নিজের মাকে নিঃসন্তান, নিজের সন্তানকে ইয়াতীম এবং নিজের স্ত্রীকে বিধবা করতে চায়, তাহলে সে এখানে আমাকে বাধা দিক। আমার সাথে মোকাবিলা করুক। তিনি এব্যাপারে ঘোষণা করার পরও কোন মায়ের সন্তানের সাহস হয়নি তাঁকে বাধা দেওয়ার। এভাবে তিনি নিরাপদে মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করেন।[৭২৩]

হযরত ওমর (রা.)'র ফযিলত

হযরত উকাবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– لَوْ كَانَ بَعْدِىْ نَبِىٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب আমার পরে যদি কেউ নবী হতেন, তাহলে ওমর ইবনুল খাত্তাবই হতেন।[৭২৪]

উপরোক্ত হাদিসখানা হযরত ওমর (রা.)'র ফযিলতের সর্বোচ্চ দলীল। কারণ এতে প্রতীয়মান হয় যে, ওমর (রা.)'র মধ্যে নবী হবার যোগ্যতা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ খাতেমুন নবী হওয়ার কারণে নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে বিধায় কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবে না।

শয়তান হযরত ওমর (রা.)কে ভয় করে

হযরত আবু বুরাইদা (রা.) বলেন, কোন এক যুদ্ধে রাসূল ﷺ বের হলেন। তিনি যখন ফিরে এলেন, এক হাবসী মেয়ে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মান্নত করেছিলাম, আল্লাহ যদি আপনাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন, তবে আমি দফ বাজিয়ে আপনার সামনে গান গাইব। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন, যদি তুমি এরূপ মান্নত করেই থাক তবে দফ বাজাতে পার। অন্যথায় তা কর না। তারপর সে দফ বাজাতে লাগল। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে প্রবেশ করলেন, তখনও সে দফ বাজাতে রইল। তারপর হযরত আলী (রা.) প্রবেশ করলেন, তখনও সে দফ বাজাতে লাগল। অতপর হযরত ওসমান (রা.) এলেন, মেয়েটি তখনও দফ বাজাতে রইল। কিন্তু যখন হযরত ওমর (রা.) প্রবেশ করলেন, তখন সে দফ বাজানো বন্ধ করে দফটি নিজের নিতম্বর নিচে রেখে দিল এবং এর উপর বসে গেল। তখন রাসূল ﷺ বললেন– اِنَّ الشَّيْطَان لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عمر হে ওমর! নিশ্চয় শয়তান তোমাকে ভয় করে। আমি বসা ছিলাম, আর মেয়েটি দফ বাজাতে লাগল। অতঃপর আবু বকর, আলী ও ওসমান

৭২৩. ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), তারীখুল খোলাফা, পৃ-৭৯
৭২৪. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৫৫৮, হাদিস নং- ৫৬৬৮

আসলেন অথচ মেয়েটি দফ বাজাতেই লাগল। আর হে ওমর! যখন তুমি প্রবেশ করেছ সে দফটি ফেলে দিল।[৭২৫]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল ﷺ বসা ছিলেন, এমন সময় আমরা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের শোরগোল শুনতে পেলাম। তখন রাসূল ﷺ উঠে সেদিকে গেলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন এক (সুদানী) হাবসী বালিকা নাচছে। আর ছেলে-মেয়েরা তাকে ঘিরে তামাশা দেখছে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, হে আয়েশা! এদিকে এসো এবং দেখ। আয়েশা বলেন, আমি গেলাম এবং আমার থুতনী রাসূল ﷺ এর কাঁধের উপর রেখে তাঁর কাঁধ ও মাথার মধ্যখান দিয়ে ঐ বালিকার নাচ দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি তৃপ্তি হয়নি? আমি বললাম না। আমার এই 'না' বলার উদ্দেশ্য ছিল, দেখি তাঁর অন্তরে আমার স্থান কতটুকু আছে। ঠিক এমন সময় সেখানে হযরত ওমর (রা.) উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখামাত্র লোকজন তাঁর কাছ থেকে এদিক-সেদিক সরে পড়ল। তখন রাসূল ﷺ বললেন, اِنِّى لَا نْظُرُ اِلى شَيَاطِيْنِ الجِنِّ وَالاِنْسِ قَدْ فَرُّوْا مِنْ عُمَرَ আমি দেখেছি যে, জ্বিন ও ইনসান শয়তানগুলো ওমরের ভয়ে পলায়ন করেছে।[৭২৬]

হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, একদিন হযরত ওমর (রা.) রাসূল ﷺ'র কাছে হাজির হওয়ার অনুমতি চাইলেন। তখন কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন মহিলা (নবীর বিবিগণ) তাঁর কাছে বসে কথা-বার্তা বলছিলেন এবং তাঁরা উচ্চস্বরে তাঁর কাছ থেকে অধিক (খোরপোষ) দাবী করছিলেন। যখন হযরত ওমর (রা.) প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তখন মহিলারা (তার আগমন দেখে) উঠে তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। এরপর ওমর (রা.) প্রবেশ করলেন। তখন রাসূল ﷺ হাসছিলেন। ওমর (রা.) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখুন (আপনার হাসার কারণ কি?) রাসূল ﷺ বললেন, আমার কাছে যে সব মহিলারা বসা ছিল তাদের আচরণে আমি অবাক হয়েছি। যখন তারা তোমার আওয়ায শুনল তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেল। তখন ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরজন্য আপনিই অধিক হকদার। অর্থাৎ আমার চেয়ে আপনাকে বেশী ভয় ও লজ্জা করা উচিৎ। হযরত ওমর (রা.) মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, হে নিজের প্রাণের দুশমনরা! তোমরা আমাকে ভয় কর অথচ রাসূল ﷺকে ভয় করনা? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, কারণ তুমি রাসূল

৭২৫. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৫৫৮, হাদিস নং- ৫৬৬৯
৭২৬. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৫৮, হাদিস নং-৫৬৭০

ﷺএর চেয়ে অধিক রুক্ষ ও কঠোর ভাষী। তখন রাসূল ﷺ বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! এদের কথা ছাড়, ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ।

مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ শয়তান তোমাকে যেপথে চলতে দেখে, সে তোমার রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা অবলম্বন করে।[৭২৭]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا فِى السَّمَاءِ مَلَكٌ اِلاَّ وَهُوَ يُوَقِّرُ عُمَرَ وَلَا فِى الارْضِ شَيْطَانٌ اِلاَّ وَهُوَ يُفَرِّقُ عُمَرَ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, আসমানে এমন কোন ফেরেশ্‌তা নেই যে ওমর (রা.)কে সম্মান করে না আর পৃথিবীতে এমন কোন শয়তান নেই যে ওমর (রা.)কে ভয় করেনা।[৭২৮]

তাঁর অন্তর ও জিহ্বা সত্যের প্রকাশস্থল

হযরত ওমর (রা.)এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তিনি সর্বদা হক ও ন্যায়কথা বলতেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– **انَّ اللهَ جَعَلَ الحَقَّ عَلى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ** নিশ্চয় আল্লাহ ওমরের মুখে ও অন্তরে হক কথা রেখেছেন। হযরত আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– **انَّ اللهَ وَضَعَ الحَقَّ عَلى لِسَانِ عُمَرَ وَيَقُوْلُ بِه** আল্লাহ তায়ালা ওমরের মুখে সত্য রেখেছেন, আর তিনি সত্য কথাই বলে থাকেন।[৭২৯]

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– **مَا كُنَّا نُعْبِدُ اَنَّ السَّكِيْنَةَ تُنْطِقُ عَلى لِسَانِ عُمَرَ** আমরা অসম্ভব মনে করতাম না যে, ফেরেশ্‌তা (আল্লাহর পক্ষ হতে) হযরত ওমর (রা.)এর মুখে কথা বলে থাকেন।[৭৩০]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– **لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنْ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ** তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে কতিপয় লোক মুহাদ্দিস ছিল। আমার উম্মতের মধ্যে যদি কোন মুহাদ্দিস হয় তাহলে সে ওমরই হবে। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল!

৭২৭. বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ-৫৫৭, হাদিস নং-৫৬৬৬০

৭২৮. ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), তারীখুল খোলাফা, পৃ-৯৬ ও আবু নুআঈম ইস্পাহানী (র.), ফাযায়েলুল খোলাফাইর রাশেদীন, খণ্ড-১ পৃ-৬৪

৭২৯. তিরমিযী ও আবু দাউদ, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ-৫৫৭, হাদিস নং- ৫৬৬৪

৭৩০. ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুয়্যত, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ-৫৫৭, হাদিস নং- ৫৬৬৫

মুহাদ্দিস কাকে বলে? উত্তরে তিনি বললেন, যার মুখ দিয়ে ফেরেশ্‌তারা কথা বলে সেই মুহাদ্দিস হয়। অর্থাৎ যার অন্তরে সত্যের ইলহাম হয় এবং মুখ দিয়ে তা প্রকাশ হয়।[৭৩১]

ওমর (রা.)কে মহব্বত করা রাসূল ﷺকে মহব্বত করাঃ ইমাম তাবরানী (র.) আওসাত গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন–**مَنْ اَبْغَضَ عُمَرَ فَقَدْ اَبْغَضَنِى وَمَنْ اَحَبَّ عُمَرَ فَقَدْ اَحَبَّنِى** যে ব্যক্তি ওমরের সাথে দুশমনী রাখবে সে আমার সাথে দুশমনী রাখল। আর যে ব্যক্তি ওমরকে মহব্বত করবে সে আমাকে মহব্বত করল।[৭৩২]

আল্লাহর মতের সাথে হযরত ওমর (রা.)'র ঐক্যমত

হযরত ওমর (রা.)'র অন্যতম ফযিলত হল অনেক বিষয়ে তাঁর মতের স্বপক্ষে আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাযিল করে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। হযরত আনাস ও ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, তিনটি বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত আমার রবের সিদ্ধান্তের অনুরূপ হয়েছে। এক. আমি বলেছিলাম হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর দাঁড়ানোর স্থানটিকে আমরা যদি নামাযের স্থান নির্ধারণ করে নিতাম। তখন নাযিল হল– **وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى** তোমরা ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর স্থানটিকে নামাযের জন্য নির্ধারণ কর। দুই. আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার বিবিদের ঘরে ভাল ও মন্দ হরেক রকমের লোক আসে। তাই আপনি যদি তাদেরকে পর্দা করার আদেশ করতেন। এরপরেই পর্দার আয়াত নাযিল হয়। তিন. একদিন রাসূল ﷺ'র বিবিগণ (আয়েশা ও হাফ্‌সা (রা.) আত্মাভিমানবশত এক জোট হয়েছিলেন। তখন আমি বললাম, যদি রাসূল ﷺ তোমাদের তালাক দিয়ে দেন, তবে অচিরেই তাঁর রব তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী তাঁকে প্রদান করতে পারেন। এর পর পরই অনুরূপ আয়াত নাযিল হয়।

ইবনে ওমর (রা.)এর অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ওমর (রা.) বলেন, তিন বিষয়ে আমি আমার রবের সাথে একমত হয়েছি। (১) মকামে ইব্রাহিমের ব্যাপারে। (২) পর্দার ব্যাপারে ও (৩) বদরের কয়েদীদের ব্যাপারে।[৭৩৩]

হযরত আলী (রা.) বলেন, কুরআন মাজীদে হযরত ওমর (রা.)'র সিদ্ধান্ত বিদ্যমান। হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, যদি কোন ব্যাপারে লোকদের সিদ্ধান্ত এক রকম

৭৩১. বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ-৫৫৬, হাদিস নং-৫৬৫৮ ও ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি) তারীখুল খোলাফা, পৃ-৮১

৭৩২. তাবরানী, আওসাত, সূত্রঃ খুৎবাতে মহররম, পৃ-১১৮

৭৩৩. বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ-৫৫৮, হাদিস নং-৫৬৭১

আর হযরত ওমর (রা.)এর সিদ্ধান্ত অন্য রকম হয়, তখন কুরআন মাজীদ তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নাযিল হয়।

হযরত মুজাহিদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, কোন বিষয়ে হযরত ওমর (রা.) যে পরামর্শ দিতেন, সে অনুযায়ী কুরআনের আয়াত নাযিল হয়।[৭৩৪]

হযরত ওমর (রা.) বলেন, তাঁর প্রভু তাঁর সাথে একুশটি বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। ইতিপূর্বে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদিসে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। নিম্নে আরো কয়েকটি বিষয় উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করা হল। আবু সুফিয়ান সিরিয়া থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অস্ত্র কিনে ফিরে আসার সংবাদ শুনে রাসূল ﷺ কিছু সংখ্যক সাহাবী নিয়ে তাকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ওদিকে আবু জেহেল মক্কা থেকে একদল সৈন্য দিয়ে আবু সুফিয়ানের সাহায্যার্থে মক্কা থেকে বের হল। আবু সুফিয়ান অন্য পথে কাফেলাসহ নিরাপদে চলে গেল। কিন্তু আবু জেহেল সৈন্যদের নিয়ে রাসূল ﷺএর সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বদরের দিকে যাত্রা করল। এ সংবাদ শুনে রাসূল ﷺ যুদ্ধ করবে কিনা সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। এতে কেউ কেউ অল্প সংখ্যক সৈন্য এবং স্বল্প পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্রের অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধ না করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) বদরে গিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। তখন তাঁর মতের পক্ষে এই আয়াত নাযিল হল– كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ যেভাবে হে মাহবুব! আপনাকে আপনার প্রভু আপনার ঘর থেকে সত্য সহকারে বের করেছেন, আর নিশ্চয় মু'মিনদের একটি দল তাতে অসন্তুষ্ট ছিল।[৭৩৫]

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু ইয়ালা (রা.) বর্ণনা করেন, এক ইহুদি হযরত ওমর (রা.)কে বলল, জিব্রাইল ফেরেশ্তা যার কথা তোমাদের নবী বলেন সেই আমাদের বড় শত্রু। তার উত্তরে হযরত ওমর (রা.) বলেন, مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِيكِيلَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِيْنَ যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশ্তা ও রাসূলগণ এবং জিব্রাইল ও মিকাইলের শত্রু হয়, নিশ্চিতই আল্লাহ সেসব কাফিরের শত্রু। যেসব শব্দ দ্বারা ওমর (রা.) ইহুদিকে উত্তর দিয়েছেন, ঠিক সেই শব্দসমূহসহ কুরআন মাজীদের সূরা বাকারার ৯৮ নং আয়াত নাযিল হয়।[৭৩৬]

---

৭৩৪. ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি) তারীখুল খোলাফা, পৃ-৮৩

৭৩৫. সূরা আনফাল, আয়াত- ৫, (ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), তারীখুল খোলাফা

৭৩৬. ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি) তারীখুল খোলাফা, পৃ-৮৪

পূর্বযুগের শরীয়তে রোযার ইফতার করার পর পানাহার ও স্ত্রী সহবাস এশার নামায পর্যন্ত বৈধ ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এ নিয়ম বহাল ছিল। একদিন রমযান মাসে এশার নামাযের পর ভুলক্রমে ওমর (রা.) স্ত্রী সহবাস করেছেন। এতে তিনি লজ্জিত হয়ে রাসূল ﷺ'র দরবারে হাযির হলেন এবং এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হল– أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের (স্বামীদের) জন্য হালাল করা হয়েছে।[৭৩৭]

বিশর নামক এক মুনাফিকের সাথে এক ইহুদির ঝগড়া হয়েছিল। ইহুদি বলল, চলো আমরা তোমার নবীর কাছে গিয়ে ফায়সালা চাই। মুনাফিক ভাবল যে, তিনি তো সর্বাবস্থায় হক ফায়সালা করবেন, কারো পক্ষপাতিত্ব করবেন না। ফলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে না। তাই সে ঈমানের দাবীদার হয়েও ইহুদিকে বলল, আমরা কা'ব বিন আশরাফকে বিচারক মেনে নেই। ইহুদি ভাল করে জানত যে, কা'ব ঘুষখোর। তার থেকে সঠিক বিচার আশা করা যায় না। কা'ব ইহুদি ব্যক্তির সধর্মীয় হওয়া সত্ত্বেও সে কা'বকে বিচারক মানতে সম্মতি হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে মুনাফিক বিশরকে রাসূল ﷺ এর নিকট বিচারের জন্য আসতে হল। রাসূল ﷺ ন্যায় বিচার করলেন, যা ইহুদির পক্ষে এবং মুনাফিকের বিপক্ষে হয়েছিল। মুনাফিক ইহুদিকে বাধ্য করে হযরত ওমর (রা.)'র নিকট পুনরায় বিচারের জন্য নিয়ে গেল। ইহুদি ওমর (রা.)কে বলল, আমার আর তার ব্যাপারটি রাসূল ﷺ মীমাংসা করে দিয়েছেন। কিন্তু সে রাসূল ﷺএর ফায়সালা মানল না। এখন আপনার কাছে ফায়সালা চায়। ওমর (রা.) বললেন, একটু দাঁড়াও। আমি এক্ষুণি ফায়সালা করছি। তিনি ঘরের ভিতরে গিয়ে তরবারী এনে সেই মুনাফিককে হত্যা করলেন আর বললেন, যে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ'র ফায়সালা মানবে না তার বেলায় আমার ফায়সালা এটাই। তখন সূরা নিসার ৬০নং আয়াত নাযিল হয়। যার অর্থ হল– আপনি কি দেখেননি তাদেরকে যারা দাবী করে যে, আমরা আপনার উপর যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি। কিন্তু তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়।[৭৩৮] অতঃপর কেউ গিয়ে রাসূল ﷺকে বলল, হযরত ওমর (রা.) এমন মু'মিনকে হত্যা করেছেন, যে ফায়সালার জন্য রাসূল ﷺ'র দরবারে হাজির হয়েছিল। তখন রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন, আমি মনে করি না যে, ওমর কোন

---

৭৩৭. সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৭

৭৩৮. তাফসীরে জালালাঈন ও সাভী

মু'মিনকে হত্যা করবে। তখন এ কথার সত্যায়নে আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেছেন– فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে করে। অতপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবেনা এবং তা সন্তুষ্ট মনে মেনে নেবে। [৭৩৯]

হযরত ওমর (রা.)'র শ্রেষ্ঠত্ব

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, একদিন আমি ঘুমিয়েছিলাম। (স্বপ্নে) আমি নিজেকে একটি কূপের পাড়ে দেখতে পেলাম। কূপটির পাড়ে একটি বালতিও ছিল। আমি ঐ বালতি দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কূপ থেকে পানি টেনে তুললাম। তারপর ইবনে আবু কুহাফা (আবু বকর) ঐ বালতি নিলেন এবং এক বা দুই বালতি পানি টেনে তুললেন। তার ঐ বালতি টানার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তার দুর্বলতা ক্ষমা করুন। তারপর ঐ বালতি বিরাটাকার হয়ে গেল এবং ইবনুল খাত্তাব (ওমর) তা নিলেন। আমি কোন শক্তিশালী বাহাদুর ব্যক্তিকেও ওমরের ন্যায় পানি টেনে তুলতে দেখিনি। এমনকি লোকজন ঐ স্থানে উটশাল বানাতে উদ্বুদ্ধ হল। ইবনে ওমর (রা.)এর অপর বর্ণনায় আছে, তারপর ইবনুল খাত্তাব বালতিটা আবু বকরের হাত থেকে নিজের হাতে নিলেন। বালতিটা তার হাতে পৌঁছেই বৃহদাকারে পরিণত হয়ে গেল। আর আমি কোন শক্তিশালী নওজোয়ানকে দেখিনি ওমরের ন্যায় পানি টেনে তুলতে। এমনকি তিনি এত অধিক পরিমাণ পানি তুললেন যে, তাতে সকল পরিতৃপ্ত হয়ে গেল এবং পানির প্রাচুর্যের কারণে লোকেরা ঐ স্থানকে উটশালা বানিয়ে নিল। [৭৪০]

উপরোক্ত হাদিসে আবু বকর (রা.) এক বা দুই বালতি পানি উঠানো দ্বারা তাঁর খেলাফতের সময় অল্প হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর হযরত ওমর (রা.)'র হাতে বালতি বৃহদাকার হওয়া দ্বারা তাঁর খেলাফতকালে ইসলামের শক্তিবৃদ্ধি হওয়া, অসংখ্য শহর বিজয় হওয়া এবং অনেক ধনসম্পদ অর্জিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে হয়েছেও তাই। হযরত জাবির (রা.) বলেন, একদিন ওমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)কে সম্বোধন করে বললেন, يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ হে রাসূল ﷺএর পর সর্বোত্তম মানুষ! তখন আবু বকর (রা.) বললেন, যদি তুমি

[৭৩৯]. সূরা নিসা, আয়াত-৬৫, (ইমাম সুয়ূতী (র.)(৯১১ হি), তারীখুল খোলাফা, পৃ-৮৪
[৭৪০]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৫৭ হাদিস নং-৫৬৬৩

আমার সম্পর্কে এরূপ বল (তাহলে তুমিও জেনে রাখ) আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন–مَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ ওমর অপেক্ষা উত্তম কোন ব্যক্তির উপর সূর্য উদিত হয়না। [৭৪১]

জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া

ইতিপূর্বে হযরত আবু বকর (রা.)'র জীবনীতে সহীহুল বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.)এর হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে হযরত ওমর (রা.)কেও রাসূল ﷺ জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشَفَةً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا بِلَالٌ وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ لِعُمَرَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ عُمَرُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَيْكَ أَغَارُ আমি স্বপ্নে আমাকে দেখলাম যে, জান্নাতে প্রবেশ করছি। হঠাৎ আবু তালহার স্ত্রী রুমায়সাকে দেখতে পেলাম এবং আমি পদচারণার শব্দও শুনতে পেলাম। তখন আমি বললাম, এই ব্যক্তি কে? এক ব্যক্তি বলল, তিনি বেলাল (রা.) আমি একটি প্রাসাদও দেখতে পেলাম, যার আঙ্গিনায় এক মহিলা রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এই প্রাসাদটি কার? এক ব্যক্তি বলল, ওমর ইবনে খাত্তাবের। আমি তাতে প্রবেশ করে দেখার ইচ্ছে করলাম। তখন (হে ওমর!) তোমার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার কথা স্মরণ করলাম। (তাই আর প্রবেশ করিনি) তখন ওমর (রা.) বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গ, হে আল্লাহর রাসূল! আপানার কাছেও কি ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ করতে পারি? [৭৪২]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَبْصَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مُقْبِلَيْنِ فَقَالَ هَذَانِ الْمُقْبِلَانِ سَيِّدَا كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الاَوَّلِيْنَ وَالاٰخِرِيْنَ اِلاَّ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ لَا تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِى

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একদিন দেখলেন যে, হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.) আসছেন। তখন তিনি বললেন, এই আগন্তুক দু'জন নবী রাসূলগণ ব্যতীত পূর্বাপর সকল জান্নাতবাসী বয়স্কদের সর্দার হবেন। হে আলী! তুমি তাদেরকে এ সংবাদ দিওনা। [৭৪৩]

[৭৪১]. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৫৭-৫৮, হাদিস নং-৫৬৬৭
[৭৪২]. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃ-৫২০, হাদিস নং-৩৪১৪
[৭৪৩]. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-১ পৃ-৪২৪

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب سِرَاجُ اَهْلِ الجَنَّةَ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব জান্নাতবাসীদের আলোকবর্তিকা।[৭৪৪]

হযরত ওমর (রা.)'র জ্ঞান ও দ্বীন

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, একদিন আমি ঘুমিয়েছিলাম। আমার কাছে একটি দুধের পাত্র আনা হল। এটা থেকে আমি এত পরিতৃপ্তি হয়ে পান করলাম যে, আমি লক্ষ্য করলাম তৃপ্তি যেন আমার নখগুলো থেকে বের হচ্ছে। তারপর আমি পাত্রের অবশিষ্ট দুধ ওমর ইবনে খাত্তাবকে পান করতে দিলাম। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর দ্বারা আপনি কি ব্যাখ্যা করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন– **العلم**। তথা জ্ঞান।[৭৪৫]

قَالَ ابن مسعود رضى الله عنه لَوْ أَنَّ عِلْمَ عُمَرَ وُضِعَ فِي كِفَّةِ مِيزَانٍ، وَوُضِعَ عِلْمُ أَهْلِ الأَرْضِ فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَ عِلْمُهُ بِعِلْمِهِمْ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, যদি হযরত ওমর (রা.)এর জ্ঞানকে এক পাল্লায় এবং পৃথিবীর জীবিত সকলের জ্ঞান অপর পাল্লায় রাখা হয় তবে অবশ্যই হযরত ওমর (রা.)'র জ্ঞানের পাল্লা সকলের পাল্লার চেয়ে ভারী বা প্রাধান্য পাবে।[৭৪৬]

عَنْ الشَّعْبِيْ قَالَ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ فَانْظُرُوا الى قَوْلِ عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب

হযরত শা'বী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হবে, তখন (সমাধানের জন্য) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)'র মত দেখ।[৭৪৭]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, একদিন আমি ঘুমিয়েছিলাম, স্বপ্নে দেখলাম যে, লোকদেরকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। তাদের গায়ে জামা ছিল। তাদের সামনে ওমর ইবনে খাত্তাবকে উপস্থিত করা হল। তার গায়ে এরূপ একটি লম্বা জামা ছিল যে, তিনি তা হেঁচড়িয়ে চলছিলেন। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর দ্বারা আপনি কি তা'বীর (ব্যাখ্যা) করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, তা হল দ্বীন।[৭৪৮]

৭৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ-৪২৮
৭৪৫. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৫৭, হাদিস নং-৫৬৬২
৭৪৬. তাবরানী, আল কবীর গ্রন্থ ও হাকেম, সূত্র: ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), তারীখুল খোলাফা, পৃ-৯৮
৭৪৭. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-১ পৃ-২৬৪
৭৪৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৫৭, হাদিস নং-৫৬৬১

قَالَ قَبِيْصَةَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَعْلَمَ بِاللهِ وَلَا اَقْرَأَ لِكِتَابِ اللهِ وَلَا اَفْقَهَ فِى دِيْنِ اللهِ مِنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب হযরত কাবীসা ইবনে জাবির (রা.) বলেন, আল্লাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত, কিতাবুল্লাহর অধিক পাঠক এবং আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী হযরত ওমর (রা.)'র চেয়ে অন্য কাউকে দেখিনি।[৭৪৯]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর (রা.) এর লাশ খাটের উপর রাখা হল। খাটটি কাঁধে তুলে নেয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত লোকজন তা ঘিরে দোয়া পাঠ করছিলেন। আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। হঠাৎ একজন আমার কাঁধের উপর হাত রাখায় আমি চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম, তিনি আলী (রা.)। তিনি ওমরের জন্য আল্লাহর অশেষ রহমতের দোয়া করছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে ওমর! আমার জন্য আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় এমন কোন ব্যক্তি আপনি রেখে যাননি, যার আমলের অনুসরণ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করব। আল্লাহর কসম! আমার বিশ্বাস যে, আল্লাহ আপনাকে (কবরে ও জান্নাতে) আপনার সঙ্গীদ্বয়ের (রাসূল ﷺ ও আবু বকরের) সাথে রাখবেন। আমার মনে আছে, আমি বহুবার নবী করিম ﷺকে বলতে শুনেছি। আমি, আবু বকর ও ওমর গেলাম। আমি,আবু বকর ও ওমর প্রবেশ করলাম এবং আমি, আবু বকর ও ওমর বের হলাম।[৭৫০] অর্থাৎ নবী করিম ﷺ প্রায় নিজের সাথে আবু বকর ও ওমর (রা.)'র কথা উল্লেখ করতেন।

রাসূল ﷺ'র সাথে গভীর সম্পর্ক

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ مِنِّى وَاَنَا مِنْ عُمَرَ وَاَحِلُّ حَيْثُ يَحِلُّ عُمَرُ রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, ওমর আমার আর আমি ওমরের। ওমর যা হালাল করেছে, আমি তা হালাল করেছি।[৭৫১]

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ مَعِى وَاَنَا مَعَ عُمَرَ وَالحَقُّ بَعْدَ مَعَ عُمَرَ حَيْثُ كَانَ রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, ওমর আমার সাথে আর আমি ওমরের সাথে। আমার পরে সত্য ওমরের সাথে থাকবে। তিনি যেখানেই থাকুক না কেন।[৭৫২]

ইমাম তাবরানী (রা.) 'আওসাত' গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, مَنْ اَبْغَضَ عُمَرُ فَقَدْ اَبْغَضَنِى وَمَنْ اَحَبَّ عُمَرَ فَقَدْ اَحَبَّنِى যে ব্যক্তি

৭৪৯. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-১ পৃ-৪৩৫
৭৫০. ইমাম বুখারী (র.), (২৫৬ হি) সহীহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃ-৫২০, হাদিস নং-৩৪২০
৭৫১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-১ পৃ-৪৩৫
৭৫২. আবু নুআঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০ হি), ফাযায়েলুল খোলাফায়ে রাশেদীন, খণ্ড-১, পৃ-৩৯, ও আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), মাদারেজুন্নবুয়্যত, খণ্ড-২, পৃ-৪২৬

ওমরের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে সে মূলত আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করল আর যে ব্যক্তি ওমরকে ভালবাসবে, মূলত সে আমাকে ভালবাসল।[৭৫৩]

সিদ্দিকে আকবর (রা.)'র ভালবাসা

قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَا عَلى ظَهْرِ الاَرْضِ رَجُلٌ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ عُمَرَ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, সমগ্র পৃথিবীর বুকে আমার নিকট ওমর (রা.)এর চেয়ে অধিক প্রিয় কেউ নেই।[৭৫৪]

ন্যায়পরায়ণতা: হযরত ওমর (রা.)'র ন্যায়পরায়ণতা সমগ্র বিশ্বে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন ন্যায়ের প্রতিচ্ছবি। তাঁর কাছে আপন-পর, আত্মীয়-অনাত্মীয়, বাদশাহ-গোলাম, উঁচু বংশ-নিচু বংশ সকলের স্থান সমান। একদিন তাঁর ছেলে আবু শাহমা (রা.) নেশাবিহীন মনে করে নাবীয (এক প্রকার পানি) পান করেছিলেন কিন্তু মূলত তা নেশাওয়ালা ছিল। ফলে হযরত ওমর (রা.) তাঁকে গ্রেফতার করে ন্যায়ের ভিত্তিতে শাস্তি দিয়েছিলেন।

সিরিয়ার গাসসানের খ্রিস্টান বাদশা জাবলাহ পাঁচশজনের একটি দল নিয়ে অতি শান শওকতের সহিত হযরত ওমর (রা.)'র কাছে আগমন করেন। অতি মূল্যবান অলংকার পরিধান করে মদীনায় আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হযরত ওমর (রা.)'র সাথে মক্কায় হজ্ব করতে যান। বায়তুল্লাহ তাওয়াফের সময় মাটিতে তার লুঙ্গীর আঁচলে ফাযারা গোত্রের এক ব্যক্তির পা পড়েছে। যার ফলে তার লুঙ্গি খুলে গেল। এতে জাবলা রাগান্বিত হয়ে তাকে থাপ্পড় দিলে লোকটির নাক ফেটে রক্ত প্রবাহিত হল। এই মুকাদ্দমা হযরত ওমর (রা.)'র দরবারে আসলে তিনি জাবলাকে ডেকে বললেন, তুমি ঐ লোকটিকে যে কোন ভাবে সন্তুষ্ট করে নাও, নতুবা তুমি বদলা দেবার জন্য প্রস্তুত থাক। একজন প্রতাপশালী বাদশা হয়ে একজন সাধারণ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করতে হবে তা তিনি মানতে পারলেন না। একথা তিনি হযরত ওমর (রা.)'র নিকট ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, ইসলামে রাজা প্রজার বিধান এক। জাবলা বললেন, আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি আমার মান সম্মান আরো বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যে। এই ফায়সালা তো আমার জন্য মারাত্মক অপমানজনক। ওমর (রা.) বললেন, এটি ইসলামী কানুন, যা আমাদের এবং তোমাদের উপর মানা আবশ্যক। যদি ইজ্জত বহাল রাখতে চাও তাহলে তাকে সন্তুষ্ট করে নাও। না হয় প্রকাশ্যে বদলা দিতে প্রস্তুত হও। জাবলা বললেন, তাহলে আমি পুনরায় খ্রীষ্টান হয়ে যাব। ওমর (রা.) বললেন, তাহলে তো তোমাকে হত্যা করা

৭৫৩. মুফতি জালাল উদ্দীন আহমদ আমজাদী (র.), খুৎবাতে মহররম, পৃ-১১৮
৭৫৪. ইবনে আসাকির, সূত্র: তারীখুল খোলাফা, পৃ-৯৭

আবশ্যক হয়ে পড়বে। কেননা যে মুরতাদ হয়ে যায়, ইসলামে তার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। অবশেষে জাবলা হযরত ওমর (রা.) থেকে চিন্তা-ভাবনার জন্য এক রাতের সময় চেয়ে নিলেন। আর সে রাতেই জাবলা সৈন্যদলসহ গোপনে মক্কা থেকে পালিয়ে যায়। হযরত ওমর (রা.) একজন সাধারণ ব্যক্তির ব্যাপারে এতবড় একজন প্রতাপশালী বাদশাকে বিন্দু মাত্রও ছাড় দেননি।[৭৫৫]

একদিন মিশরের গর্ভনরের শাহজাদা এক ব্যক্তিকে বিনা কারণে প্রহার করেছে। হযরত ওমর (রা.) সেই ব্যক্তিকে দিয়ে শাহজাদাকে সমপরিমাণ প্রহার করায়েছেন। পিতা-পুত্র উভয়ে নিরবতার সহিত এই ন্যায়বিচার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

একদিন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)এর সাথে হযরত ওমর (রা.)এর ঝগড়া হল। এসময় তিনি খলীফার আসনে আসীন ছিলেন। উবাই ইবনে কা'ব (রা.) মদীনার কাযী যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)এর নিকট বাদী হয়ে বিচার চাইলেন আর ওমর (র.) বিবাদী হয়ে বিচারালয়ে হাযির হলেন। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) তাঁকে সম্মান প্রর্দশন করলে তিনি বলেন, এটা তোমার প্রথম অপরাধ এই বলে তিনি উবাই (রা.)এর সাথে বসে পড়লেন। উবাই (রা.)এর কাছে কোন দলীল প্রমাণ ছিলনা। হযরত ওমর (রা.) উবাই (রা.)'র দাবী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তখন উবাই (রা.) হযরত ওমর (রা.)'র থেকে শপথ নিতে চাইলে যায়েদ (রা.) ওমর (রা.)'র মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে উবাই (রা.)কে বললেন, আমীরুল মু'মেনীনকে শপথ করা হতে অব্যহতি দাও। হযরত ওমর (রা.) যায়েদ (রা.)'র এই পক্ষাপাত আচরণে লজ্জিত হলেন এবং বললেন, হে যায়েদ! যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিকট একজন সাধারণ ব্যক্তি ও ওমর সমান হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি কাযীর পদের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।[৭৫৬]

ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ রণকৌশলী হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)'র মত বীরশ্রেষ্ঠকে সামান্যতম অনিয়মের অভিযোগের কারণে হযরত ওমর (রা.) শাসনকর্তার পদ থেকে অব্যহতি দিতে কুণ্ঠবোধ করেননি।

রাসূল ﷺ'র প্রতি ভালবাসা

রাসূল ﷺকে পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে বেশী ভালবাসা পরিপূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক। কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে– قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ

৭৫৫. মুফতি জালাল উদ্দীন আহমদ আমজাদী (র.), খুৎবাতে মহররম, পৃ-১৩৮-৩৯
৭৫৬. মাওলানা ড. মুহাম্মদ আসেম আ'যমী, খোলাফায়ে রাশেদীন, পৃ- ৩০৭-৮

إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ হে রাসূল! আপনি বলুন, যদি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধনসম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।[৭৫৭]

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ তোমাদের মধ্যে কেউ পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবেনা যেই পর্যন্ত না আমি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হব।[৭৫৮]

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, مِنْ اَهْلِه وَمَالِه وَمِنْ نَفْسِه অর্থাৎ তার পরিবার-পরিজন তার ধনসম্পদ এবং তার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় হব।[৭৫৯]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ আমরা একদিন নবী করিম ﷺ'র সাথে ছিলাম। এসময় তিনি ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)এর হাত ধরেছিলেন। ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার প্রাণ ব্যতীত আপনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তখন নবী করিম ﷺ বললেন, না, ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। তোমার কাছে তোমার প্রাণের চেয়ে আমি অধিক প্রিয় হতে হবে। তখন ওমর (রা.) তাঁকে বললেন, আল্লাহর কসম! এখন আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। তখন নবী করিম ﷺ বললেন, হে ওমর! এখন তোমার ঈমান পূর্ণ হয়েছে।[৭৬০]

৭৫৭. সূরা তাওবা, আয়াত-২৫
৭৫৮. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃ-৭
৭৫৯. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), মাদারেজুন নবুয়্যত, খণ্ড-১, পৃ-৩৪৬
৭৬০. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি) সহীহ বুখারী, খণ্ড-২, পৃ-৯৮১, হাদিস নং-৬১৭৮

হযরত ওমর (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)কে বললেন, اَنْ تُسْلِمَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ يُسْلِمَ الخَطَّابُ لِاَنَّ ذَالِكَ اَحَبُّ اِلى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ আপনার ইসলাম গ্রহণ আমার কাছে, আমার পিতা খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের চেয়ে অধিক প্রিয়। কেননা তা রাসূল ﷺ'র নিকট অধিক প্রিয়। অর্থাৎ রাসূল ﷺ'র কাছে যা প্রিয় তা আমার কাছেও প্রিয়। এটাই প্রকৃত ভালবাসার প্রমাণ।[৭৬১]

রাসূল ﷺএর প্রিয় গোলাম হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.)এর পুত্র উসামা (রা.)এর ভাতা ওমর (রা.) নিজের ছেলে আব্দুল্লাহ (রা.)এর থেকে বেশী নির্ধারণ করেন। এতে আব্দুল্লাহ (রা.) আপত্তি জানালে হযরত ওমর (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ উসামাকে তোমার চেয়ে বেশী ভালবাসেন। তাই তাকে আমিও ভালবাসি। এভাবে মাদায়েন থেকে গণীমতের মাল আসলে হযরত ওমর (রা.) বণ্টনে হযরত হাসান ও হোসাইন (রা.)কে নিজের সন্তান আব্দুল্লাহ (রা.)এর থেকে দ্বিগুণ বেশী দেন। তখন আব্দুল্লাহ (রা.) বললেন, যখন এই দু'জন ছোট শিশু ছিল তখন আমি রাসূল ﷺএর সাথে যুদ্ধ করছিলাম। অর্থাৎ আমি বয়সে এদের অনেক বড়। আমার চেয়ে এরা অধিক পাওয়ার কারণ কি? উত্তরে ওমর (রা.) বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে, তুমি বয়সে বড় কিন্তু এঁদের পূর্বপুরুষের যে মর্যাদা তা তোমার বাপ-দাদাদের মধ্যে নেই। তাই তারা অধিক হকদার।[৭৬২]

সফল খলীফা

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে খলীফা আবু বকর (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচনের জন্য বিশিষ্ট মুসলমানদের আহবান করলেন। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত ওসমান ও আলী (রা.) প্রমুখ প্রবীণ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে তিনি হযরত ওমর (রা.)কে তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচন করেন। ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে খলীফা মনোনীত হয়ে ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত প্রায় সাড়ে দশ বছর হযরত ওমর (রা.) সফল খলীফা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর খেলাফতকালে প্রায় অর্ধপৃথিবী মুসলমানদের হস্তগত হয়। পারস্য, বায়জানটাইন, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর, আলেকজান্দ্রিয়াসহ বিশাল বিশাল বহু সাম্রাজ্য বিজয় হয়। সমগ্র বিশ্বের প্রতাপশালী সম্রাটগণ ওমর (রা.)'র ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত থাকত। অথচ এই মুকুটবিহীন সম্রাট একেবারে সাদাসিদে অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় জীবন-

৭৬১. কাযী আয়ায (র.) (৫৪৪ হি), শেফা শরীফ, পৃ-১৮, আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), মাদারেজুন নবুয়্যত, খণ্ড-১,পৃ-৩৫১
৭৬২. মাওলানা ড. মুহাম্মদ আসেম আ'যমী, খোলাফায়ে রাশেদীন, পৃ-৩২৮

যাপন করতেন। জোড়া-তালি যুক্ত কাপড় পরিধান করতেন। কোন বডিগার্ড, নিরাপত্তারক্ষী কিংবা প্রহরী রাখতেন না। নামে মাত্র বায়তুল মাল থেকে ভাতা নিতেন। রাতের বেলায় ছদ্মবেশে প্রজাদের খোঁজ-খবর নিতেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম আমীরুল মু'মেনীন উপাধিতে ভূষিত হন। একদিন রাতের বেলায় খোঁজ-খবর নেওয়ার সময় একটি বাড়ী থেকে আওয়ায শুনতে পেলেন। মা নিজের মেয়েকে বলতেছে, দুধে পানি মিশিয়ে দাও। মেয়ে বলল, মা, আমিরুল মু'মেনীনের আদেশ আপনার মনে নেই? তিনি দুধে পানি মিশাতে নিষেধ করেছেন। মা বলল, আমিরুল মোমেনীন এত রাতে এখানে দেখতে আসবে না। তুমি পানি মিশিয়ে দাও। মেয়ে বলল, মা এরূপ হতে পারে না যে, খলীফার সামনে তাঁর আনুগত্য করব আর পিছনে অবাধ্য হব। এ সময় হযরত ওমর (রা.) এর সাথে হযরত সালেম (রা.)ও ছিলেন। তিনি তাকে বললেন, সালেম! বাড়ীটিকে স্মরণ রাখিও এবং সকালে আমাকে মনে করিয়ে দিও। হযরত সালেম (র.) সকালে তদন্ত করে রিপোর্ট দিলেন যে, এরা দুধ বিক্রি করে চলে। মেয়েটি অত্যন্ত সৎ ও বিধবা যুবতী। মা খুবই গরীব ও অসহায়। তখন ওমর (রা.) তাঁর সন্তানদেরকে ডেকে বললেন, তোমাদের যে কেউ ঐ মেয়েটিকে বিবাহ কর। হযরত আসেম (রা.) সম্মতি প্রকাশ করলে তিনি তার সাথে বিধবা মেয়েটির সাথে আক্দ দিয়ে নিজের পুত্রবধু করে নেন।[৭৬৩]

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) স্বীয় পিতা আসলাম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, এক রাতে হযরত ওমর (রা.) মদীনায় গোপনে প্রজাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার উদ্দেশ্যে চলছিলেন। এক জায়গায় গিয়ে দেখলেন যে, এক মহিলা ঘরে বসে রইল আর তার সন্তানরা তার চতুর্দিকে বসে ক্ষুধায় কান্না করছিল। অপরদিকে পানি ভর্তি একটি পাতিল চুলায় ছিল। তিনি মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই পানির পাত্র আগুনে রাখার কারণ কি? মহিলা উত্তর দিল, বাচ্চাদের ভুলিয়ে রাখার জন্য তা করেছি, যাতে তারা মনে করে যে, খাবার রান্না করা হচ্ছে এবং অপেক্ষা করতে করতে যেন ঘুমিয়ে পড়ে। একথা শুনে ওমর (রা.) কান্না রাখতে পারলেন না। তখনই বায়তুল মালে গিয়ে আটা, ঘি, খেজুর, চর্বি, কাপড় ও কিছু দিরহাম ইত্যাদি নিয়ে একটি বস্তায় ভরে গোলাম আসলামকে বললেন, এই বস্তাটি আমার কাঁধে তুলে দাও। আসলাম বললেন, হে আমীরুল মু'মেনীন! এই বস্তাটি আমি কাঁধে নিয়ে দিয়ে আসি। উত্তরে তিনি বললেন, পরকালে এ ব্যাপারে আমাকেই প্রশ্ন করা হবে। সুতরাং এই বস্তা আমাকেই নিয়ে যেতে দাও, এই বলে তিনি তা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে নিজে খাবার রান্না করে গরীব পরিবারটিকে খাওয়ালেন।[৭৬৪]

৭৬৩. আশারায়ে মুবাশ্শারা, সূত্রঃ খুৎবাতে মহররম, পৃ. ১৪১-৪২

৭৬৪. ইবনুল আসীর জযরী (র.) (৬৩০ হি), উসদুল গাবাহ, খণ্ড-৪, পৃ-৬৭

নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সর্বপ্রথম তিনিই আবিষ্কার ও বাস্তবায়ন করেছেন। যেমন– বায়তুল মাল; আদালত প্রতিষ্ঠা, কাযী নিয়োগ দান, তারিখ ও হিজরি সন প্রবর্তন, আমীরুল মু'মেনীন উপাধি, ভূমি পরিমাপ, নদী খনন, বিজিত রাজ্যসমূহকে বিভিন্ন জেলা ও থানায় বিভক্ত করা, আদমশুমারী, জেলখানা প্রতিষ্ঠা করা, সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা, জামাতে তারাবীহ নামায কায়েম করা, ফরায়েযে 'আউল' এর মাসআলার উদ্ভাবন, ফজরের আযানে "আসসালাতু খায়রুন মিনান নাউম" বৃদ্ধি, মদ্যপানের শাস্তি আশি দুররা নির্ধারণ, জানাযা নামাযে চার তাকবীরের উপর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা ইমাম, মুয়াযযিন এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বেতন নির্ধারণ ইত্যাদি আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি আবিষ্কার করেছেন।[৭৬৫]

হযরত ওমর (রা.)এর কারামত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর (রা.) সারিয়া ইবনে জাবল (রা.)এর নেতৃত্বে নাহাওয়ান্দ এ একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তখন একদিন হযরত ওমর (রা.) জুমার খুৎবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি খুৎবার মাঝখানে উচ্চস্বরে يَا سَارِيَةُ الجَبَلَ বলে তিন বার ডাক দিলেন। এর অর্থ হলো হে সাবিয়া! পাহাড়ের দিকে যাও। নামায শেষে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, খোদার শপথ! আমি এরূপ বলতে বাধ্য হয়েছি। কারণ ইরানে আজারবাইজান শহরে নাহাওয়ান্দ পাহাড়ী এলাকায় হযরত সারিয়া মুসলমানদের নিয়ে যুদ্ধ অবস্থায় আছে। এদিকে কাফেররা তাদের সামনে পেছনে ঘেরাও করে রেখেছে। এটা দেখে আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারিনি। তাই ডাক দিয়ে বলে দিলাম হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে যাও। এই ঘটনার কিছুদিন পর হযরত সারিয়া (রা.)'র দূত একটি চিঠি নিয়ে আসল, যার মধ্যে লিখা ছিল যে, আমরা জুমার দিন কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছিলাম এবং আমাদের পরাজয় প্রায় নিশ্চিত ছিল। এমতাবস্থায় ঠিক জুমার সময় يَا سَارِيَةُ الجَبَلَ শব্দ শুনে আমরা পাহাড়ের দিকে গিয়ে পাহাড়কে পিছনে রেখে যুদ্ধ করতে থাকি। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পরাস্থ করেন। এভাবে আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করি।[৭৬৬]

নাহাওয়ান্দ শহরটি মদীনা শরীফ থেকে একমাসের পথ। হযরত ওমর (রা.) সমজিদে নববীতে খুৎবা দেওয়ার সময় মিম্বর থেকে হযরত সারিয়াকে দেখতে পেলেন,

৭৬৫. ইবনে খলদুন, খণ্ড-৪, পৃ-১৯৪

৭৬৬. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), দালায়েলুন নবুয়্যত, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ-৫৪৬ ও ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১হি), তারীখুল খোলাফা, পৃ-৮৬

যুদ্ধের অবস্থা অবলোকন করেছেন এবং কোন যন্ত্রের সাহায্য ও মাধ্যম ব্যতীত ডাক দিয়ে তাকে সর্তক করে দিয়ে যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন।

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তরে বলল, জুমরাহ অর্থাৎ অগ্নিশিখা। তার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করলে, বলে শিহাব অর্থাৎ অগ্নিস্ফূলিঙ্গ। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কাবিলার নাম কি? উত্তরে বলল, হারকাহ অর্থাৎ আগুন। তার আবাসস্থল কোথায় জানতে চাইলে বলে, হুররাহ অর্থাৎ উষ্ণ বা গরম। তিনি জানতে চাইলেন যে হুররাহ কোথায়? উত্তরে সে বলল, 'যাতে লাযা' অর্থাৎ অগ্নিস্ফূলিঙ্গযুক্ত এলাকা। তার এসব জবাব শ্রবণের পর হযরত ওমর (রা.) বললেন– اَدْرِكْ اَهْلَكَ فَقَدْ احْتَرَقُوْا তোমার পরিবার পরিজনের খোঁজ নাও। তারা সবাই পুড়ে গিয়েছে। অতপর যখন লোকটি ঘরে ফিরে গেল দেখল ঠিকই ঘরে আগুন লেগেছে এবং সব লোক জ্বলে পুড়ে মরে গিয়েছে।[৭৬৭]

হযরত ওমর (রা.)'র আমলে মিশর বিজয় হয় হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) নেতৃত্বে। মিশরবাসীরা এক নির্দিষ্ট দিনে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)'র কাছে এসে বলল, হে আমাদের আমীর! আমাদের নীলনদের ব্যাপারে একটি পুরাতন প্রথা চলে আসতেছে, যা ব্যতীত নদী প্রবাহিত হয় না বরং শুকিয়ে যায়। অথচ আমাদের কৃষি উন্নয়ন নীলনদের উপরই নির্ভরশীল। তিনি তাদের কাছে জানতে চাইলেন যে, এই পুরাতন প্রথাটি কি? তারা বলল, প্রতি বছর এই চলতি মাসের এগার তারিখ আসলে একজন কুমারী কন্যা নির্বাচিত করে তার পিতা-মাতাকে রাযী করে উন্নতমানের মূল্যবান অলংকার ও কাপড় পরিধান করায়ে নীলনদতে নিক্ষেপ করি। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন– اِنَّ هَذَا لَا يَكُوْنُ اَبَدًا فِى الاِسْلَامِ ইসলামে এটা কখনো হতে পারে না। এটি ভিত্তিহীন ও অমূলক পদ্ধতি। ইসলাম এগুলো নিষিদ্ধ করতে এসেছে। তাঁর কথা শুনে সবাই চলে গেল। কিন্তু কিছু দিন পর নির্দিষ্ট তারিখে নীলনদ শুকিয়ে গেল। ফলে অনেকেই দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। আমর ইবনুল আস (রা.) এ ব্যাপারে বিস্তারিত লিখে চিঠি মারফত হযরত ওমর (রা.)কে অবহিত করলেন। চিঠি পাঠ করে হযরত ওমর (রা.) হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)'র নিকট একটি চিঠিতে বলেন, তুমি মিশরবাসীদের খুবই উত্তম জবাব দিয়েছ। আমি এই চিঠির সাথে একটি চিরকুট প্রেরণ করছি। তুমি তা নীলনদে নিক্ষেপ করবে। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) চিরকুট খুলে দেখলেন তাতে নিম্নলিখিত বাক্য লিখা ছিল– مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلى نِيْلِ مِصْرَ اَمَّا

[৭৬৭]. ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১হি), তারীখুল খোলাফা, পৃ-৮৬

بَعْدُ فَاِنْ كُنْتَ تَجْرِىْ مِنْ قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِ وَاِنْ كَانَ اللهُ يُجْرِيْكَ فَاَسْئَلُ اللهَ الوَاحِدَ القَهَّارَ اَنْ يُجْرِيْكَ "আল্লাহর বান্দা আমীরুল মু'মেনীন ওমর এর পক্ষ থেকে মিশরের নীলনদের নিকট প্রেরিত পত্র। হে নীলনদ! যদি তুমি নিজের ইচ্ছায় প্রবাহিত হও তাহলে প্রবাহিত হইও না। আর যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাকে প্রবাহিত করেন তবে আমি প্রতাপশালী এক আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমাকে প্রবাহিত করে দেন।"

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) হযরত ওমর (রা.)'র চিরকুটখানা রাতের বেলায় গিয়ে নীলনদে নিক্ষেপ করেন। মিশরবাসীরা যখন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠল, তখন দেখল যে, আল্লাহ তায়ালা নদীতে এমনভাবে পানি প্রবাহিত করলেন যে পানি ষোল হাত উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে লাগল। এরপর থেকে আর কখনো নীলনদের পানি শুকায়নি এবং মিশরবাসীদের দীর্ঘদিনের কুপ্রথা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।[৭৬৮]

হযরত ওমর (রা.)এর খেলাফতকালে এক অনারবী ব্যক্তি মদিনা শরীফে এসে হযরত ওমর (রা.)কে খোঁজ করছে। তাকে বলা হল যে, তিনি হয়ত শহরের বাইরে অনাবাদী জায়গায় গিয়ে শুয়ে আছেন। লোকটি শহরের বাইরে গিয়ে তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে দেখল যে, তিনি জামা মাথার নিচে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছেন। লোকটি মনে মনে ভাবল তাঁকে এসময় হত্যা করা সহজ হবে। যখন সে তরবারী হাতে নিয়ে তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে তরবারী উত্তোলন করল তখন হঠাৎ অদৃশ্য থেকে দু'টি বাঘ প্রকাশিত হয়ে লোকটির দিকে অগ্রসর হল। এই দৃশ্য দেখে সে চিৎকার দিলে ওমর (রা.) জাগ্রত হলেন। তখন লোকটি তাঁকে সব ঘটনা খুলে বলল এবং মুসলমান হয়ে গেল।[৭৬৯]

হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিক এর সময়কালে যখন রাসূল ﷺ'র রওযা মোবারকের দেয়াল ভেঙ্গে পড়ল তখন লোকেরা তা ৮৭ হিজরি সনে পুনঃ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন। ভিত্তি দেওয়ার জন্য মাটি খননের সময় একটি পা দেখা গেল। এতে সবাই হতভম্ব হয়ে গেল এবং লোকেরা মনে করল এটি সম্ভবত রাসূল ﷺএর পা মোবারক। তখন হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা.) বলেন–لَا وَاللهِ مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِيَ اِلاَّ قَدَمُ عُمَرَ আল্লাহর কসম! এটি নবী করিম ﷺ'র পা মোবারক নয় বরং এটি হযরত ওমর (রা.)'র পা মোবারক।[৭৭০]

প্রায় ৬৪ বছর পর্যন্ত হযরত ওমর (রা.)'র শরীর অক্ষত ও নিখুঁত অবস্থায় অবিকল মাটির নীচে ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্তও কোন পরিবর্তন হবে না।

[৭৬৮]. ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১হি), তারীখুল খোলাফা, পৃ-৮৭
[৭৬৯]. সীরাতে খোলাফায়ে রাশেদীন, সূত্র: খুৎবাতে মহররম, পৃ-১৩২
[৭৭০]. ইমাম বুখারী (র.) সহীহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃ-১৮৬

খেলাফত ও শাহাদাত

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রা.) আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন– اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِى شَهَادَةً فِى سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِى فِى بَلَدِ رَسُوْلِكَ হে আল্লাহ! আমাকে আপনার রাস্তায় শাহাদাত বরণ করার এবং আপনার রাসূল ﷺ'র পবিত্র শহর মদীনায় মৃত্যুবরণ করার তাওফীক দিন।[৭৭১]

তাঁর দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন। তিনি হিজরি ২৩ সালে ২৬ যিলহজ্ব মাসে বুধবারে সকালে ফজর নামাযের জন্য মসজিদে নববীতে গমন করলেন। নামাযের ইমামতির জন্য মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করালেন তারপর তকবীরে তাহরীমা বাঁধলেন। পূর্ব থেকে প্রস্তুত থাকা হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.)এর গোলাম আবু লু'লু ফিরোজ দু'ধারী বিষ মিশ্রিত চুরি দিয়ে তাঁকে আঘাত করল। সাথে আরো তেরজন মুসল্লীকে আহত করল যাদের মধ্যে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছিল। এক ইরাকী ব্যক্তি তাকে কাপড়ে জড়িয়ে ধরলে সে নিজে নিজে আত্মহত্যা করল।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) সংক্ষিপ্তভাবে ফজরের নামায পড়ালেন। অতপর হযরত ওমর (রা.)কে নবীয ও দুধপান করানো হল কিন্তু তা আহত স্থান দিয়ে বের হয়ে গেল। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি আপনার পুত্র আব্দুল্লাহ (রা.)কে আপনার পরে খলীফা নিযুক্ত করুন। উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তুমি আমাকে ভুল পরামর্শ দিচ্ছ। যে নিজের স্ত্রীকে সঠিকভাবে তালাক দেবার যোগ্যতা রাখেনা আমি এমন ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত করব? তারপর তিনি হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবাইর, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, হযরত সা'দ (রা.) প্রমুখগণকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য কমিটি করে দিলেন আর বললেন এদের থেকে কোন একজনকে যেন খলীফা বানানো হয়। এরপর তিনি পুত্র আব্দুল্লাহ (রা.)কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের উপর কত পরিমাণ কর্জ রয়েছে? উত্তরে তিনি বলেন প্রায় ছিয়াশি হাজার দিরহাম। তিনি বললেন, এগুলো আমাদের সম্পদ থেকে আদায় করে দিবে। যদি এর দ্বারা কর্জ পরিশোধ না হয় তাহলে বনু আদী থেকে নেবে। যদি তা দ্বারাও পূর্ণ না হয় তবে কুরাইশদের থেকে নিয়ে কর্জ শোধ করে দিবে। অতঃপর বললেন, হযরত আয়েশা (রা.)কে গিয়ে বল, ওমর তাঁর দুই বন্ধুর পাশে দাফন হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছে। ইবনে ওমর (রা.) গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.)কে পিতার আকাঙ্ক্ষার কথা বললে, আয়েশা (রা.) বললেন- এই স্থানটি আমি নিজের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছিলাম। তবে আজ আমার নিজের চেয়ে হযরত

[৭৭১]. ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১হি), তারীখুল খোলাফা, পৃ-৮৭

ওমর (রা.)'র ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিলাম এই বলে তিনি অনুমতি প্রদান করলেন। এই সংবাদ শুনে তিনি আল্লাহর শোকর করেন আর বললেন আমার ইন্তেকালের পর পুনরায় আয়েশা (রা.) থেকে অনুমতি নিবে। কারণ হতে পারে আমি খলীফা বলে অনুমতি দিয়েছেন। তখনো যদি অনুমতি মিলে তবেই আমাকে সেখানে দাফন করবে অনথ্যায় জান্নাতুল বাকীতে দাফন করবে। ইন্তেকালের পরেও আয়েশা (রা.)'র অনুমতিক্রমে তাঁকে রাসূল ﷺ'র সাথে হযরত আবু বকর (রা.)'র পাশে দাফন করা হয়।

২৩ হিজরি ২৬ যিলহজ্ব বুধবার তিনি আহত হন এবং এর তিনদিন পর দশবছর ছয়মাস চার দিন সফলতার সহিত খেলাফতের গুরুদায়িত্ব পালনের পর ৬৩ বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন।[৭৭২]

মুহাম্মদ ইবনে সা'দ বলেন, হযরত ওমর (রা.) ২৬ যিলহজ্ব ২৩ হিজরি সনে বুধবার আহত হন এবং সোমবার পহেলা মহররম ২৪ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। সেদিনই তাকে দাফন করা হয় এবং হযরত সুহাইব (রা.) তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। তাঁর খেলাফত কাল ছিল দশবছর পাঁচ মাস একুশ দিন।

হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)'র যৌথ ফযিলত

জান্নাতে উচুঁ মর্যাদালাভ

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِى اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءُوْنَ اَهْلَ عِلِّيِّيْنَ كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ فِى اُفُقِ السَّمَآءِ وَاَنَّ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَاَنْعَمَا

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, নিশ্চয় জান্নাতবাসীগণ উচ্চ মর্যাদার অধিকারীগণকে এমনভাবে (মাথা তুলে) পরস্পরকে দেখবে, যেমনিভাবে তোমরা আকাশের দিগন্তে উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখ। আর আবু বকর ও ওমর তাদের মধ্যে হবেন বরং তারা আরো উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হবেন।[৭৭৩]

কিয়ামত দিবসে উভয়ই রাসূল ﷺ'র পাশে থাকবেন

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَاَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرَ اَحَدُهُمَا عَنْ يَمِيْنٍ وَالْاٰخِرُ عَنْ شِمَالِه وَهُوَ اٰخِذٌ بِاَيْدِيْهِمَا فَقَالَ هٰكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

[৭৭২]. ইবনুল আসীর জযরী (র.) (৬৩০ হি), উসদুল গাবাহ, খণ্ড-৪, পৃ-৭৭ এবং মুফতি জালাল উদ্দীন আহমদ আমজাদী (র.), খুৎবাতে মহররম, পৃ. ১৪৪-৪৬

[৭৭৩]. শরহে সুন্নাহ, আবু দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৫৯, হাদিস নং- ৫৬৭৯

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী করিম ﷺ হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। এ সময় হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.) তাঁরা দু'জনের একজন তাঁর ডানে এবং অপরজন তাঁর বামে ছিলেন। আর তিনি তারা উভয়ের হাত ধরে রেখেছিলেন আর বললেন, কিয়ামত দিবসে আমরা এভাবেই উত্থিত হব।[৭৭৪]

হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)'র অনুসরণের নির্দেশ

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَدْرِي مَا بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমি জানিনা কতদিন যাবৎ আমি তোমাদের মাঝে বেঁচে থাকবো। সুতরাং আমার পরে তোমরা আবু বকর ও ওমরের অনুসরণ করো।[৭৭৫]

পৃথিবীতে রাসূল ﷺ'র উযীর

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا لَهُ وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, প্রত্যেক নবীর জন্য আকাশবাসী থেকে দু'জন উযীর এবং পৃথিবীবাসী থেকে দু'জন উযীর ছিলেন। আকাশবাসী থেকে আমার দু'জন উযীর হলেন, হযরত জিব্রাইল ও হযরত মিকাঈল (আ.) আর পৃথিবীবাসী থেকে আমার দু'জন উযীর হলেন, হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর।[৭৭৬]

عَنْ اَبِى اَرْوٰى الدَّوسِىْ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَبْلَ اَبُوْ بَكْرٍ وُعُمَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَمْدُ للهِ الَّذِىْ اَيَّدَنِى بِكُمَا .

হযরত আবু আরওয়া দাওসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি নবী করিম ﷺ'র পাশে বসা ছিলাম। এ সময় হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.) আগমন

৭৭৪. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬০, হাদিস নং- ৫৬৮২ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-১, পৃ-৯৩

৭৭৫. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬০, হাদিস নং-৫৬৮০ ও আবু নুআঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০ হি), ফাযায়েলুল খোলাফায়ে রাশেদীন, খণ্ড-১, পৃ-৯৪

৭৭৬. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬০, হাদিস নং-৫৬৮৪

করলেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি তোমরা দুজনের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করেছেন।[৭৭৭]

উম্মতের শ্রেষ্ঠ দুই ব্যক্তি

عَنْ اَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا؟ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ اَبِىْ بَكْرٍ؟ عُمَرَ

হযরত আবু জুহাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)কে বলতে শুনেছি, নবীর পরে উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কে আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না? তিনি হলেন, হযরত আবু বকর (রা.)। আবু বকর (রা.) এর পরে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কে আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না? তিনি হলেন, হযরত ওমর (রা.)।[৭৭৮]

عَنْ اَبِى جَعْفَرَ مَنْ جَهَلَ فَضْلَ اَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَدْ جَهَلَ السُّنَّةَ

হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)'র মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ, সে মূলত সুন্নত সম্পর্কে অজ্ঞ।[৭৭৯]

হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)'র প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার পরিণাম

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ فِى السَّمآءِ الدُّنْيَا ثَمَانِيْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ اللهَ لِمَنْ اَحَبَّ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَفِى السَّمآءِ الثَّانِيَةِ ثَمَانُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَلْعَنُوْنَ مَنْ اَبْغَضَ اَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, প্রথম আসমানে আশি হাজার ফেরেশ্‌তা আছে যারা সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করতে থাকে, যেই ব্যক্তি আবু বকর ও ওমরকে ভালবাসে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আসমানে আশি হাজার ফেরেশ্‌তা আছে যারা সর্বদা অভিশাপ দেয় সেই ব্যক্তিকে যে আবু বকর ও ওমরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।[৭৮০]

قَالَ اَبُوْ الَا حَوْصِ وَعُمَرِو بْنِ ثَابِتٍ قَالًا سَمِعْنَا اَبَا اِسْحَاقٍ يَقُوْلُ بُغْضُ اَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنَ الكَبَائِرِ

৭৭৭. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-১, পৃ-৭৩ ও আবু নুআঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০ হি), ফাযায়েলুল খোলাফায়ে রাশেদীন, খণ্ড-১, পৃ-৯৬

৭৭৮. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-১, পৃ-৭৬

৭৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৫

৭৮০. আবু নুআঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০ হি), ফাযায়েলুল খোলাফায়ে রাশেদীন, খণ্ড-১, পৃ-১০০

হযরত আবুল আহওয়াস ও আমর ইবনে সাবিত (রা.) বলেন, আমরা আবু ইসহাক (রা.)কে বলতে শুনেছি, হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)এর প্রতি বিদ্বেষ রাখা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।[৭৮১]

قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ اَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ اِيْمَانٌ وَ بُغْضُهُمَا كُفْرٌ রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আবু বকর ও ওমরকে ভালবাসা হল ঈমান পক্ষান্তরে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফুরী।[৭৮২]

ইমাম মুস্তাগফারী (রা.) 'দালায়েলুন নবুয়ত' গ্রন্থে একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করেন, আমরা তিন ব্যক্তি ইয়েমেনে ভ্রমনে বের হলাম। আমাদের মধ্যে একজন ছিল কূফাবাসী। যে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.) সম্পর্কে অত্যন্ত অশোভনীয় কথা-বার্তা বলত। আমরা তাকে সাধ্যমত বুঝাতে চেষ্টা করেছি কিন্তু সে বিরত থাকল না। আমরা যখন ইয়েমেনের কাছাকাছি পৌঁছেছি তখন এক জায়গায় অবস্থান করে ঘুমিয়ে পড়লাম। যাত্রা আরম্ভ করার সময় ঘনিয়ে আসলে আমরা উঠে উযূ করলাম আর কূফাবাসী সঙ্গীকে ঘুম থেকে ডাকলাম। সে উঠে বলতে লাগল আফসোস! তোমরা আমাকে এসময় জাগ্রত করেছ যখন রাসূল ﷺ আমার মাথার দিকে এসে বলছেন– হে ফাসিক! আল্লাহ ফাসিককে লাঞ্ছিত করবেন। এই সফরেই তোমার আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাবে। আমি বললাম, উঠ, উযূ কর। যখনই সে উযূ করতে বসল, তখন তার পায়ের আঙ্গুলসমূহ বিকৃত হওয়া শুরু হল। তার উভয় পা বানরের পায়ের ন্যায় হয়ে গেল। এভাবে ধীরে ধীরে তার সমস্ত শরীর বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আমরা তাকে ধরে উটের পালের সাথে বেঁধে দিলাম এবং গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হলাম। সূর্যাস্তের সময় আমরা এক জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছি যেখানে কিছু বানর ছিল। যখন সে বানর দলকে দেখল অস্থির হয়ে রশি ছিঁড়ে বানর দলের সাথে যোগ দিল। অতঃপর বানর দল সহ আমাদের নিকট আসল। আমরা বললাম ঘটনাতো খারাপ হয়ে গেল। এখন সব বানর তার দোস্ত হয়ে গেল আর সে আমাদের দিকে তাকিয়ে চোখের পানি ফেলে অসহায় হয়ে কান্না করছে। এভাবে এক ঘণ্টা পর বানর দলের সাথে সেও চলে গেল।[৭৮৩]

ইমাম মুস্তাগফারী (রা.) কোন এক সৎ ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কূফায় জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)কে গালি দিত। সে আমাদের সাথে সফরে সঙ্গী হল। আমরা তাকে অনেক বারণ করেছি, বুঝিয়েছি, কিন্তু সে শুনলনা। পরিশেষে আমরা তাকে বললাম, তুমি আমাদের থেকে দূর হয়ে যাও। ফলে সে

[৭৮১]. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-১, পৃ-২৯৩
[৭৮২]. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩৯
[৭৮৩]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উর্দু, পৃ-২৬৮

পৃথক হয়ে গেল। আমরা সফর শেষে ফিরে আসার সময় তার গোলামকে বললাম, তোমার মাওলাকে বল আমার সামনে আসতে। সে বলল, আমার মাওলার উপর এক আশ্চর্য জনক ঘটনা ঘটেছে। তার দু'হাত শুয়রের ন্যায় হয়ে গেছে। আমরা তার কাছে গিয়ে তাকে আমাদের সাথে আসতে বললাম। সে বলল, আমার হাতে এক মারাত্মক সমস্যা হয়েছে। সে হাত দু'টি জামা থেকে বের করলে দেখি তা শুয়রের ন্যায় হয়ে গেল। সে আমাদের সাথে চলতে লাগল। আমরা এমন জায়গায় পৌঁছলাম, যেখানে শুয়রের দল ছিল। সে ঘোড়া থেকে নেমে শুয়র হয়ে অন্যান্য শুয়রের সাথে মিশে গেল। ফলে আমরা তাকে চিনতে পারিনি। তার সম্পদ, রসদ ও গোলামকে আমরা কূফায় নিয়ে এসেছি।[৭৮৪]

এভাবে একজন গাজী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একটি দলের সাথে এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমাদের সাথে তামীম গোত্রের গোলামদের এক ব্যক্তি ছিল। যার নাম আবু হাইয়্যান। সে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)কে গালি দিত। আমরা তাকে অনেক বুঝিয়েছি কিন্তু তা ফলদায়ক হল না। আমরা তাকে এক হাকেমের কাছে নিয়ে গেলাম যিনি আমাদের মনযিলের পাশেই ছিলেন। তিনি বলেন, তাকে তোমরা আমার কাছে রেখে তোমরা চলে যাও। আমরা তাকে তার নিকট রেখে চলে গেলাম। কিছু দূরে গিয়ে দেখি সে আমাদের পিছে পিছে আসতেছে। হাকেম তাকে একটি ঘোড়া ও একটি পোশাক দিয়েছিলেন। সে তা নিয়ে আমাদের কাছে এসে পুনরায় উভয়কে গালি দেওয়া আরম্ভ করে দিল। আর বলছিল হে খোদার দুশমনরা ! কি দেখতেছ? আমরা বললাম, ঠিক আছে তুমি আমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও। সে পৃথক হয়ে চলতে লাগল। হঠাৎ সে রাস্তা থেকে নেমে মলত্যাগ করার জন্য এক জায়গায় বসে গেল। আমরা দেখলাম মধু পোকার দল তার চেহারার সম্পূর্ণ গোশত খেয়ে শুধু হাড্ডিগুলো রেখে দিয়েছে। আমরা চিৎকার করে বললাম এখানে আবু হাইয়্যানের কোন আত্মীয় আছে যে তার তরকা (রেখে যাওয়া সম্পদ) সংরক্ষণ করবে?[৭৮৫]

ইমাম মুস্তাগফারী (রা.) বলেন, পূর্ববর্তী এক বুযুর্গ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমার এক প্রতিবেশী ছিল যে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)কে মন্দ বলত। এক রাতে আমি রাসূল ﷺকে স্বপ্নে দেখি। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর ডানে আর হযরত ওমর (রা.) তাঁর বামে ছিলেন। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এক প্রতিবেশী এই দুইজনের শানে বেয়াদবী করে আমাকে কষ্ট দেয়। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তাকে হত্যা করে দাও। সকাল হলে আমি তার খবর নিতে তার মহল্লায়

[৭৮৪]. প্রাগুক্ত, পৃ-২৬৯
[৭৮৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯-৭০

গিয়ে দেখি তার ঘর থেকে কান্নার চিৎকার আসছে। লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম এখানে কি হয়েছে? জানতে পারলাম যে, গতরাতে তার ঘরে এসে তাকে কেউ হত্যা করেছে।[৭৮৬]

বসরাবাসী এক ব্যক্তি বলেন, আমি মাল-সম্পদ আহওয়াযের প্রধানের কাছে বিক্রি করেছি। লোকেরা আমাকে বলল, সে রাফেযী এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)কে মন্দ বলে। তার কাছে আমার আসা-যাওয়া অব্যাহত ছিল। একদিন সে আমার উপস্থিতিতে তাঁদেরকে মন্দ বলা আরম্ভ করে দিল। আমি তার কাছ থেকে অসন্তুষ্ট ও চিন্তিত হয়ে উঠে আসলাম। এই বেদনায় সেই রাতে আমি আর ইফতারও করিনি। রাতে ঘুমের মধ্যে আমি রাসূল ﷺকে স্বপ্নে দেখলাম এবং আরয করলাম, হে আল্লাহর নবী! দেখুন, ঐ ব্যক্তি হযরত আবু বকর ও ওমরের (রা.) শানে কি বলছে? রাসূল ﷺ বললেন, তার কথা কি তোমার ভাল লাগেনি? আমি বললাম, না। রাসূল ﷺ স্বপ্নে আমাকে বললেন, যাও তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি গেলাম এবং তাকে নিয়ে আসলাম। তারপর তিনি বললেন, তাকে শুইয়ে দাও। আমি তাকে শুইয়ে দিলাম। তারপর তিনি আমাকে একটি চুরি দিয়ে বললেন, তাকে হত্যা কর। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তাকে মেরে ফেলব? এভাবে তিনবার জিজ্ঞাসা করলাম, কারণ কাউকে হত্যা করা আমার জন্য বড় কঠিন কাজ ছিল। তিনি তৃতীয়বার আমাকে বললেন, হ্যাঁ, তাকে হত্যা কর। আমি তাকে হত্যা করলাম। সকালে এই শয়তানের অবস্থা জানতে মনে ইচ্ছে জাগল। আমি তার মহল্লায় পৌঁছে তার ঘর থেকে কান্নার আওয়ায শুনলাম। লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, গত রাতে এক ব্যক্তি এসে বিছানায় তাকে হত্যা করেছে। আমি মনে মনে বললাম, আমিই তো রাসূল ﷺ'র নির্দেশে স্বপ্নে তাকে হত্যা করেছিলাম।[৭৮৭]

ইমাম মুস্তাগফারী (র.) 'দালায়েলুন নবুয়ত' গ্রন্থে এক পূর্ববর্তী বুযুর্গ ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেন। বুযুর্গ লোকটি বললেন, আমি বাল্যকালে এমন এক ব্যক্তির শিষ্য ছিলাম যিনি শিয়া মাযহাবের প্রতি ধাবিত ছিলেন। আমিও তার নির্দেশে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)কে মন্দ বলতে লাগলাম। এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, কিয়ামত সংঘঠিত হল আর লোকেরা রাসূল ﷺএর দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল। হঠাৎ আমার দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়ল। তিনি একস্থানে বসে আছেন। তাঁর ডানদিকে দুই যুলফী বিশিষ্ট একজন বয়স্ক লোক বসা আছেন আর বাম দিকে দুই যুলফী বিশিষ্ট অপর একজন বয়স্ক লোক উপবিষ্ট আছেন। লোকেরা তাকে আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ বলতে লাগল।

[৭৮৬]. প্রাগুক্ত, পৃ-২৭০

[৭৮৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০-৭১

আমিও তাঁর নিকটে গেলাম তাঁকে সালাম দেওয়ার জন্যে। তখন ঐ দুই ব্যক্তি থেকে একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই ব্যক্তি আমাদের কাছে কি চাই? তখন রাসূল ﷺ আমাকে ধরতে চাইলেন আর আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম। এসময় আমার মাথার চুল, দাড়ি ও চোখের ভ্রু ঝরে পড়ে গেল। আমি চার মাস যাবৎ এরকম চুল, দাড়ি ও ভ্রুবিহীন ছিলাম। একদিন আমার এক বন্ধু আমার সাথে দেখা করতে এসেছে। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমার এ অবস্থা কেন? কোন চিকিৎসক দ্বারা তোমার চিকিৎসা সম্ভব হয় নি? আমার মনে হল যে, সে আমার ব্যাপারটি কোন প্রেম–ভালবাসাজনিত ছিল বলে মনে করেছে। তাই আমি তাকে সত্য ঘটনা বলে দিলাম। সে আমাকে বলল, তুমি রাসূল ﷺএর সামনে তাওবা করে ক্ষমা চাওনি কেন? হয়ত তোমার জানা নেই যে, দুরূদ সালাম যা তাঁর উপর পাঠ করা হয়, তা তাঁর খেদমতে পৌঁছানো হয়। তার কথা শুনে আমি একটি তখত ও বদনা নিয়ে উযূ করে দু'রাকাত নামায আদায় করে বললাম, হে আল্লাহ! আমি তাওবা করছি এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)এর ফযিলত মেনে নিচ্ছি। তাওবা করে এখনো এক সপ্তাহ অতিক্রম হয়নি আমার মাথার চুল, দাড়ি এবং ভ্রু পুনরায় উঠতে শুরু করেছে।

জনৈক নেককার বুযূর্গ ব্যক্তি বর্ণনা করেন, আমি সিরিয়ায় এক সফরে ফজরের নামায একটি মসজিদে আদায় করেছি। ইমাম সাহেব নামায শেষে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)কে বদ দোয়া করা আরম্ভ করল। পরবর্তী বছর যখন আমি পুনরায় সিরিয়া গেলাম তখন ঘটনাক্রমে আবার ফজরের নামায ঐ মসজিদে আদায় করতে হয়েছে। ইমাম সাহেব নামায শেষে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)'র জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন। আমি নামাযীদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, একি ব্যাপার! গত বছর এই ইমাম সাহেব হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)কে মন্দ বলেছেন আর আজকে দোয়া করলেন। তারা বলল, আপনি গত বছরের ইমাম সাহেবকে দেখতে চান? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারা আমাকে এমন এক ঘরে নিয়ে গেল যেখানে একটি কুকুর আবদ্ধ আছে। আর ঐ কুকুরের দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। আমি সেই কুকুরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি সেই ইমাম, যে বিগত বছরে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)কে গালি দিতে? সে মাথার ইশারায় বুঝাল যে, হ্যাঁ, আমিই সেই ইমাম।[৭৮৮]

এরূপ অসংখ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যা বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিদ্যমান। এখানে মাত্র কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে কেবল উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য।

[৭৮৮]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, পৃ-২৭২

হযরত ওসমান (রা)

নাম ও বংশ

নাম: ওসমান। **উপনাম:** আবু আমর, উপাধী: যুন নুরাইন। **পিতার নাম:** আফ্ফান। মহানবী ﷺ'র পূর্বপূরুষদের সাথে হযরত ওসমান (রা.)'র পঞ্চম পূর্বপূরুষের যোগসূত্র ছিল। হযরত ওসমান (রা.)'র নানী আব্দুল মোত্তালিবের কন্যা। হযরত ওসমান (রা.)'র মাতা রাসূল ﷺ'র ফুফাত বোন। তিনি ৫৭৩ বা ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে হস্তিবাহিনী ঘটনার ছয় বছর পর জন্মলাভ করেছেন।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত ওসমান (রা.) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)এর আহবানে সাড়া দিয়ে রাসূল ﷺ'র খেদমতে যাবেন এমন সময় স্বয়ং রাসূল ﷺ তার ঘরে এসে ইসলামের প্রতি আহবান করা মাত্র তিনি কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর চাচা হাকাম রশি দিয়ে খুঁটিতে বেঁধে বেদম প্রহার করলেও তিনি তাঁর বিশ্বাসে অটল ছিলেন।

যুন নুরাইন উপাধি লাভ

হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি কোন নবীর দু'কন্যাকে বিবাহ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন নি একমাত্র হযরত ওসমান (রা.) ব্যতীত। কেবল নবী নয় বরং সায়্যেদুল আম্বিয়া ﷺ'র দু'কন্যা বিবাহ করার কারণে তিনি যুননুরাইন তথা দুই জ্যোতির অধিকারী উপাধি লাভ করেন। রাসূল ﷺএর দু'কন্যা হযরত রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুম (রা.) বিবাহিতা ছিলেন। মহানবী ﷺ ইসলাম প্রচারের কারণে বিদ্বেষমূলক তাদের স্বামীরা তাদেরকে তালাক দেয়। হযরত ওসমান (রা.) প্রথমে হযরত রুকাইয়াকে বিবাহ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তিনি হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)কে বিবাহ করেন।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি হযরত ওসমান (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, যদি আমার চল্লিশজন কন্যাও থাকত তবে হে ওসমান! আমি তাদের প্রত্যেককে একের পর এক তোমাকে বিবাহ দিতাম।[৭৮৯]

ইমাম বায়হাকী (র.) স্বীয় সুনানে বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ জু'ফী বর্ণনা করেন, আমাকে আমার মামা হোসাইন জু'ফী জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি কি জান হযরত ওসমান (রা.)কে যুন নুরাইন কেন বলা হয়? আমি বললাম না। তিনি বললেন, হযরত আদম

[৭৮৯]. ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), তারীখুল খোলাফা, পৃ-১০৪

(আ.) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত হযরত ওসমান (রা.) ব্যতীত অন্য কেউ কোন নবীর দু'কন্যা বিবাহ করার সুযোগ পাবেনা। এ কারণেই তাঁকে যুন নুরাইন বলা হয়।[৭৯০]

হিজরত

রাসূল ﷺএর পরামর্শে তিনি স্ত্রী রোকাইয়্যাসহ প্রথমে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তাদের হিজরতের দৃশ্য দেখে নবী করিম ﷺ হযরত আবু বকর (রা.)কে সম্বোধন করে বলেন– يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّهُمَا الاَوَّل مَنْ هَاجَرَ بَعْدَ لُوْطٍ وَاِبْراهِيْمَ হে আবু বকর! এরা দু'জন (ওসমান ও রোকাইয়্যা) হযরত লূত ও হযরত ইব্রাহিম (আ.)র পর সর্বপ্রথম হিজরতকারী। সেখানে দু'বছর থাকার পর একটি ভুল সংবাদের ভিত্তিতে তারা আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় চলে আসেন। পরবর্তীতে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মদীনায় হিজরত করে রাসূল ﷺ'র সাথে মিলিত হন।

ইসলামের জন্য ধনসম্পদ উৎসর্গ

হযরত ওসমান (রা.) মক্কার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন। ইসলামের জন্য তিনি তাঁর ধনসম্পদ অকাতরে ব্যয় করতেন। মদিনার মুসলমানদের পানির অভাব দূর করার জন্য মহানবী ﷺ'এর ইঙ্গিতে তিনি বীরে রুমা নামক একটি কূপ বিশ হাজার দিরহাম ব্যয় করে খনন করে দেন। স্থান সংকুলান না হওয়ায় রাসূল ﷺ মসজিদে নববীর সম্প্রসারণের ইচ্ছে প্রকাশ করলে হযরত ওসমান (রা.) স্বতঃস্ফূর্তভাবে মসজিদ সংলগ্ন স্থান ক্রয় করে মসজিদ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করে দেন। তাবুক যুদ্ধে তিনি দশ হাজার দিরহাম যুদ্ধ তহবিলে দান করেন এবং মুসলিম বাহিনীর জন্য এক হাজার উট প্রদান করেন। এসব বর্ণনা সামান্য ইবারতের পার্থক্য সহকারে তিরমিযী ও আহমদ এর সূত্রে মিশকাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি তাঁর দানে সন্তুষ্ট হয়ে রাসূল ﷺ বলেছিলেন–مَا عَلَى عُثْمَانْ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذه مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذه এ আমলের পর ওসমান যে আমলই করেন তার জন্য তা ক্ষতিকর হবে না। কথাটি তিনি দু'বার বলেছেন।[৭৯১]

জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)'র বর্ণিত হাদিসে যারা রাসূল ﷺ কর্তৃক জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে হযরত ওসমান (রা.)ও ছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদের সাথে দুনিয়ায় কঠিন বিপদের সংবাদও দিয়েছিলেন।[৭৯২]

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ

[৭৯০]. মুফতি জালাল উদ্দীন আহমদ আমজাদী (র.), খুৎবাতে মহররম, উর্দু, পৃ-১৪৮

[৭৯১]. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬১, হাদিস নং- ৫৬৯১

[৭৯২]. মিশকাত শরীফ, পৃ-৫৬৩, হাদিস নং- ৫৭০৩) হাদিসটি সিদ্দীকে আকবরের আলোচনায় পূর্ণাঙ্গ বর্ণিত হয়েছে

হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, প্রত্যেক নবীরই একজন রফীক (সাথী) রয়েছে আর জান্নাতে আমার সাথী হবেন ওসমান। [৭৯৩]

হাকেম হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ওসমান (রা.) রাসূল ﷺ থেকে দু'বার জান্নাত ক্রয় করেছেন। একবার রুমা কূপ ক্রয় করে দ্বিতীয় বার উসরা অভিযানে যুদ্ধের সরঞ্জাম ব্যবস্থা করে। [৭৯৪]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَحْفِرْ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرَهَا عُثْمَانُ وَقَالَ مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَّزَهُ عُثْمَانُ

নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, রুমা কূপটি যে খনন করে দিবে তার জন্য জান্নাত। ওসমান (রা.) তা খনন করে দিলেন। নবী করিম ﷺ আরো বললেন, যে সংকটপূর্ণ যুদ্ধে (তাবুক) যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করবে তার জন্য জান্নাত। ওসমান (রা.) তা করে দেন। [৭৯৫]

ফেরেশ্‌তারা লজ্জা করেন

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল ﷺ উরু বা গোড়ালী থেকে কাপড় খোলা অবস্থায় নিজ গৃহে শুয়েছিলেন। এ সময় হযরত আবু বকর (রা.) ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, তিনি তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন এবং তিনি ঐ অবস্থায় তাঁর সাথে কথা বললেন। অতপর হযরত ওমর (রা.) এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাঁকেও অনুমতি দিলেন। তখনও তিনি ঐ অবস্থায় তাঁর সাথে কথা বললেন। এরপর হযরত ওসমান (রা.) এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলে রাসূল ﷺ উঠে বসে পড়লেন এবং কাপড় ঠিক করে নিলেন। ওসমান (রা.) চলে যাওয়ার পর হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল ﷺকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু বকর (রা.) এলেন তখন আপনি তাঁর জন্য একটুও নড়েননি এবং তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেন নি। অতপর ওমর (রা.) এলেন তাঁর জন্যেও আপনি নড়েননি এবং তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। ওসমান (রা.) আসলে আপনি বসে গেলেন এবং কাপড় ঠিক করলেন, এর কারণ কি? উত্তরে তিনি বললেন, اَلَا اَسْتَحْيِيْ مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِيْ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ আমি কি সেই ব্যক্তিকে লজ্জাবোধ করব না, যাকে ফেরেশ্‌তারাও লজ্জাবোধ করেন। অন্য বর্ণনায় আছে রাসূল ﷺ বলেছিলেন– اِنَّ عُثْمَانَ

[৭৯৩]. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৫৬১, হাদিস নং- ৫৬৮৯
[৭৯৪]. মুফতি জালাল উদ্দীন আহমদ আমজাদী (র.) খুৎবাতে মহররম, পৃ-১৫৯
[৭৯৫]. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃ-৫২২, পরিচ্ছেদ নং- ২০৮৬

رَجُلٌ حَيٌّ وَاِنِّى خَشِيْتُ اَنْ اُذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ اَنْ لَا يَبْلُغَ اِلَيَّ فِى حَاجَتِه ওসমান হলেন একজন অত্যন্ত লজ্জাশীল ব্যক্তি। সুতরাং আমি আশংকা করলাম, যদি আমি তাকে এই অবস্থায় প্রবেশের অনুমতি প্রদান করি। তাহলে তিনি লজ্জায় আগমনের উদ্দেশ্য আমার কাছে ব্যক্ত করতে পারবেন না। [৭৯৬]

ইহ ও পরকালে রাসূল ﷺ'র বন্ধু

عَنْ جَابِرْ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُثْمَانَ اَنْتَ وَلِيَّ فِى الدُّنْيَا وَاَنْتَ وَلِيِّيْ فِى الاخِرَةِ

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ হযরত ওসমান (রা.)কে সম্বোধন করে বলেন, তুমি দুনিয়াতে আমার বন্ধু এবং আখিরাতেও আমার বন্ধু। [৭৯৭]

পরকালে সুপারিশ

عَنِ الحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّان يَوْمَ القِيَامَةِ فِى مِثْلِ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ

হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন ওসমান রবীয়া ও মুদার গোত্রের লোকের সমপরিমাণ লোকের জন্য সুপারিশ করবেন। [৭৯৮]

খিলাফত লাভ

যখন হযরত ওমর (রা.) অন্তিমশয্যায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন তখন সাহাবায়ে কিরামগণ বললেন, হে আমীরুল মু'মেনীন! আপনি অসিয়ত করুন এবং খলীফা মনোনীত করুন। তিনি বললেন, খিলাফতের জন্য এ কয়েকজন ব্যতীত অন্য কাউকে আমি যোগ্যতম পাচ্ছিনা, যাঁদের প্রতি নবী করিম ﷺ তাঁর ইন্তেকালের সময় সন্তুষ্টি ও খুশী ছিলেন। তারপর তিনি তাঁদের নাম বললেন, আলী, ওসমান, যুবায়ের, তালহা, সা'দ ও আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) এবং বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর তোমাদের সাথে থাকবে। কিন্তু সে খিলাফত লাভ করতে পারবে না। তা ছিল শুধু সান্ত্বনাস্বরূপ। খিলাফতের দায়িত্ব যদি সা'দ এর উপর ন্যস্ত হয় তবে তিনি এর জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। তবে তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ যদি খলিফা নির্বাচিত হন তবে তিনি যেন সর্ব বিষয়ে সা'দের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করেন। আমি তাকে (কূফার গর্ভনরের পদ থেকে) অযোগ্য কিংবা খিয়ানতের কারণে অপসারণ করিনি। তারপর তিনি ভাবী খলীফার উদ্দেশ্যে কিছু মূল্যবান

[৭৯৬]. মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৫৬০-৬১, হাদিস নং- ৫৬৮৮
[৭৯৭]. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-১, পৃ-৫০৩, হাদিস নং-৮২১
[৭৯৮]. প্রাগুক্ত, পৃ-৫২৩, হাদিস নং- ৮৬৬

অসিয়ত করেন। হযরত ওমর (রা.)'র দাফন সম্পন্ন হওয়ার (তিনদিন) পর ঐ ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হলেন। তখন আব্দুর রহমান (রা.) বললেন, তোমরা তোমাদের বিষয়টি তোমাদের মধ্য থেকে তিনজনের উপর ছেড়ে দিয়ে নিজেকে অব্যহতি দাও। তখন যুবায়ের (রা.) বললেন, আমি আমার বিষয়টি আলী (র.)'র উপর অর্পন করলাম। তালহা (রা.) বললেন, আমি আমার বিষয়টি ওসমান (রা.)'র উপর অর্পণ করলাম। সা'দ (রা.) বললেন, আমি আমার বিষয়টি আব্দুর রহমান ইবনে আউফের উপর ছেড়ে দিলাম। তারপর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) হযরত ওসমান ও আলী (রা.)কে বললেন, আপনাদের দু'জনের মধ্য থেকে কে এই দায়িত্ব থেকে অব্যহতি পেতে ইচ্ছে করেন? (একজন অব্যাহতি দিলে) অপর জনের উপর দায়িত্ব অর্পন করব। আল্লাহ ও ইসলামের হক আদায় করা তখন তাঁর অন্যতম দায়িত্ব হবে। কে অধিকতর যোগ্য সে সম্পর্কে দু'জনের চিন্তা করা উচিত। তাঁরা দু'জনেই নীরব রইলেন। তখন আব্দুর রহমান (রা.) নিজেই বললেন, আপনারা এ দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করতে পারেন কি? আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি আমি আপনাদের মধ্যকার যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে একটুও কক্রটি করব না। তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ। তিনি তাঁদের একজনের (আলী (রা.)'র) হাত ধরে বললেন, রাসূল ﷺ'র সাথে আপনার যে ঘনিষ্ট আত্মীয়তা এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীতা রয়েছে তা আপনিও ভাল করে জানেন। আল্লাহর ওয়াস্তে এটা আপনার জন্য জরুরী হবে যে, যদি আপনাকে খলীফা মনোনীত করি, তাহলে আপনি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। আর যদি ওসমানকে মনোনীত করি তবে আপনি তাঁর কথা শুনবেন এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকবেন। তারপর তিনি অপরজনের (ওসমান) সাথেও একান্তে অনুরূপ কথা বললেন। এভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করে বললেন, হে ওসমান! আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। তিনি তাঁর হাতে বাইয়াত করলেন। তারপর আলী (র.) বাইয়াত করলেন। এরপর মদীনাবাসীগণ অগ্রসর হয়ে সকলেই বাইয়াত করলেন।[৭৯৯]

ইমাম সুয়ূতী (র.) তারীখুল খোলাফা গ্রন্থে ইবনে আসাকের থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) হযরত আলী (রা.)কে বাদ দিয়ে হযরত ওসমান (রা.)কে এজন্যেই খলিফা মনোনীত করেন, একান্তে তিনি যাদের সাথে পরামর্শ করেছেন তারা প্রত্যেকেই হযরত ওসমান (রা.)কে খিলাফতের যোগ্য বলে মত দিয়েছেন। মুসনাদে ইমাম আহমদ গ্রন্থে হযরত আবু ওয়ায়েল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি হযরত আলী (রা.)কে বাদ দিয়ে হযরত ওসমান (রা.)কে কেন খলীফা নির্বাচন করেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, এতে আমার কোন ত্রুটি নেই। আমি প্রথমে হযরত আলী (রা.)কে

[৭৯৯]. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃ. ৫২৩-২৪, হাদিস নং- ৩৪৩৫

বলেছিলাম, আমি আল্লাহর কিতাব, রাসূল ﷺ'র সুন্নত এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)'র সুন্নত মোতাবেক আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে চাই। তখন আলী (রা.) বলেন, আমি এ দায়িত্বের ক্ষমতা রাখি না। এরপর আমি হযরত ওসমান (রা.)কে একই কথা বলেছিলাম, তখন তিনি তা গ্রহণ করেন।[৮০০]

অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ওমর (রা.) কর্তৃক গঠিত কমিটিসহ বিশিষ্ট মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে মতামত নিয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশের মত ছিল হযরত ওসমান (রা.) খেলাফতের অধিক যোগ্য। তাই আব্দুর রহমান (রা.) ওসমান (রা.)কে খলীফা মনোনীত করেন।[৮০১]

বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও উপস্থিতিদের অন্তর্ভুক্ত

হযরত ওসমান (রা.) বদর যুদ্ধ ছাড়া সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণ হল– যুদ্ধের পূর্বে রাসূল ﷺ'র কন্যা হযরত ওসমান (রা.)'র স্ত্রী হযরত রোকাইয়্যা (রা.) অসুস্থ ছিলেন। রাসূল ﷺ অসুস্থ রুকাইয়্যা (রা.)কে সেবা করার জন্য মদীনা শরীফে হযরত ওসমান (রা.)কে রেখে যান। রাসূল ﷺ হযরত ওসমান (রা.)কে বলেছিলেন– اِنَّ لَكَ اَجْرُ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا اوسَهْمَه বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধার সমপরিমাণ সওয়াব ও গণীমতের অংশ তোমার মিলবে।[৮০২]

উপরোক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বদর যুদ্ধের অনুপস্থিতি হযরত ওসমান (রা.)'র নিজস্ব কারণে ছিল না বরং তা শরীয়ত প্রণেতা আল্লাহর রাসূল ﷺ'র নির্দেশ পালনের জন্যে হয়েছে। যাঁর নির্দেশে যুদ্ধ হয়েছে তাঁর নির্দেশেই তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। রাসূল ﷺ'র আদেশ পালন করা এবং তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করা সহস্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার চেয়ে অধিক কল্যাণকর। তাইতো তাঁকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সওয়াব, ফযিলত ও গণীমতের অংশ প্রদান করা হয়।

বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ না করার কারণ

৬ষ্ঠ হিজরিতে রাসূল ﷺ চৌদ্দশত সাহাবী নিয়ে উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে যিলহজ্ব মাসে তিনি যাত্রা আরম্ভ করেন। মক্কার নয় মাইল অদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে তিনি অবস্থান করেন এবং মক্কাবাসীদের নিকট অতীব সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে হযরত ওসমান (রা.)কে দূত হিসাবে মক্কায় প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল তিনি মক্কাবাসীদেরকে বুঝাবেন যে, রাসূল ﷺ কোন যুদ্ধ করতে

[৮০০]. ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), তারীখুল খোলাফা
[৮০১]. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.), খুৎবাতে মহররম, উর্দু, পৃ-১৬৫
[৮০২]. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), বুখারী শরীফ, পৃ- ৫২৩, হাদিস নং- ৩৪৩৩

আসেননি, কেবল উমরা করে চলে যাবেন। তিনি মক্কায় গিয়ে কুরাইশ সর্দারগণকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা বলল, তুমি যদি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে চাও তো করতে পার তোমাকে বাধা দেওয়া হবেনা। উত্তরে তিনি বললেন যতক্ষণ না রাসূল ﷺ তাওয়াফ করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাওয়াফ করব না। অথচ ঐ সময় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারা বড়ই পূণ্য ও অহংকারের বিষয় ছিল। কিন্তু তিনি মুনিবের প্রতি এতই আনুগত্য ছিলেন যে, মুনিবকে বাদ দিয়ে বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণের ন্যায় সাওয়াবের কাজকেও প্রত্যাখান করেন। কারণ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ পূণ্য ও মর্যাদার তখনই হবে যখন রাসূল ﷺ'র অনুমতি থাকে। কুরাইশরা হযরত ওসমান (রা.)কে আটক করলে মুসলমানদের নিকট সংবাদ আসে কুরাইশরা তাকে শহীদ করেছে। তখন রাসূল ﷺ উপস্থিত সাহাবীদের নিয়ে শপথ করলেন যে, ওসমান হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে কেউ ফিরে যাবে না। এ সময় মুসলমানদের ইস্পাত কঠিন শপথের কথা শুনে তাড়াতাড়ি কুরাইশরা হযরত ওসমান (রা.)কে মুক্ত করে দিয়ে সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন– وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ هَذِهِ لِعُثْمَانَ আর বাইয়াতে রিদওয়ানে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ হল, মক্কার বুকে তাঁর চেয়ে সম্ভ্রান্ত কেউ থাকত, তবে তাকেই তিনি (রাসূল ﷺ) ওসমান (রা.)'র পরিবর্তে মক্কায় পাঠাতেন। অতঃপর রাসূল ﷺ ওসমান (রা.)কে মক্কায় প্রেরণ করেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর বাইয়াতে রিদওয়ান অনুষ্ঠিত হয়। তখন রাসূল ﷺ তাঁর ডান হাতের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এটি ওসমানের হাত। তারপর ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বললেন, এ হল ওসমানের বাইয়াত।[৮০৩]

এখানে হযরতের আদেশেই তিনি মক্কা গিয়েছিলেন আর তাঁর অনুপস্থিতিতেই বাইয়াতে রিদওয়ান হয়েছিল বিধায় তিনি তাতে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে স্বয়ং রাসূল ﷺ নিজের ডান হাত দিয়ে ওসমান (রা.)'র পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করেন। অর্থাৎ বাইয়াতে রিদওয়ানের ফযিলত থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করা হয়নি বরং বলা যেতে পারে যে, এতে অনুপস্থিত থেকে তাঁর ফযিলত আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ তিনি উপস্থিত থাকলে তাঁর নিজের হাত দিয়ে বাইয়াত গ্রহণ করতেন এখন স্বয়ং রাসূল ﷺ'র নবুয়তী

৮০৩. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), বুখারী শরীফ, খণ্ড-১ পৃ- ৫২৩, হাদিস নং- ৩৪৩৩

হাত মোবারকের মাধ্যমে বাইয়াত গ্রহণ করেছে। হযরত ওসমান (রা.) সহস্র হাতের চেয়ে রাসূল ﷺ'র হাত কোটি গুণ শ্রেষ্ঠ ও বরকতময়। হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ যখন বাইয়াতে রিদওয়ানের নির্দেশ দিলেন তখন হযরত ওসমান (রা.) রাসূল ﷺ'র দূত হিসাবে মক্কায় গিয়েছিলেন। লোকেরা রাসূল ﷺ'র হাতে বাইয়াত গ্রহণ করল তখন রাসূল ﷺ বললেন ওসমান আল্লাহর এবং আল্লাহর রাসূলের কাজে গিয়েছেন। সুতরাং রাসূল ﷺ ওসমানের বাইয়াতস্বরূপ। নিজেরই এক হাত অপর হাতের উপর রাখলেন। সুতরাং রাসূল ﷺ'র এক হাত ওসমানের জন্য উত্তম হল লোকদের স্বীয় হাত অপেক্ষা।[৮০৪]

হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা.)'র যৌথ ফযিলত

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ'র যামানায় কাউকে আবু বকরের সমকক্ষ মনে করতাম না। তারপর ওমরকে তারপর ওসমান (রা.)কে। তারপর অন্যান্য সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কিত আলোচনা পরিহার করতাম। তাঁদের মধ্যে একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিতাম না।[৮০৫]

আবু দাউদের এক বর্ণনায় আছে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন– রাসূল ﷺ জীবদ্দশায় আমরা বলতাম– أَفْضَلُ أُمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ নবী করিম ﷺ'র উম্মতের মধ্যে তাঁর পরে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তি হলেন আবু বকর, তারপর ওমর এবং তারপর ওসমান (রা.)।[৮০৬]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا كُنَّا نَخْتَلِفُ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّ الخَلِيْفَةَ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَنَّ الخَلِيْفَةَ بَعْدَ اَبِى بَكْرٍ عُمَرَ وَاَنَّ الخَلِيْفَةَ بَعْدَ عُمَرَ عُثْمَانُ

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ'র যুগে আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য ছিল না যে, রাসূল ﷺ'র পর খলীফা হবেন হযরত আবু বকর (রা.) আর আবু বকর (রা.)এর পর খলীফা হবেন হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)এর পরে খলীফা হবেন হযরত ওসমান (রা.)।[৮০৭]

৮০৪. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬১, হাদিস নং- ৫৬৯২
৮০৫. বুখারী, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৫৫, হাদিস নং- ৫৬৪৮
৮০৬. শেখ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.), (৭৪০ হি), মিশকাত,পৃ-৫৫৫
৮০৭. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-১ পৃ-৯৩

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ اِلاَّ مَكْتُوْبٌ عَلى كُلِّ وَرَقَةٍ مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عُمَرَ الْفَارُوْقِ ، عُثْمَانُ ذُوْ النُّوْرَيْنِ

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, জান্নাতের প্রতিটি বৃক্ষের পাতায় লেখা আছে মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আবু বকর সিদ্দীক, ওমর ফারুক এবং ওসমান যুন নুরাইন।[৮০৮]

কারামত

আল্লামা তাজ উদ্দিন সুবকী (র.) স্বীয় 'তাবকাত' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাস্তায় পথ চলার সময় এক অপরিচিত নারীকে অসৎ উদ্দেশ্যে দেখছিল। এরপর লোকটি হযরত ওসমান (রা.)'র খেদমতে উপস্থিত হল। তাকে দেখা মাত্র তিনি বললেন, লোকেরা এমন অবস্থায় আমার সামনে আসছে যার চোখে যিনার চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে। লোকটি চমকে উঠে বলল, রাসূল ﷺ'র পরও কি আপনার উপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে? তিনি উত্তরে বললেন, এটা ওহী নয় বরং ফেরাসত তথা খোদাপ্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা যা আল্লাহ তায়ালা বিশেষ মু'মিনকে দান করেন। যা দ্বারা তারা অন্তরের খিয়াল ও অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে যায়।[৮০৯]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত ওসমান (রা.) একদিন মসজিদে নববী শরীফে মিম্বরে বসে খুৎবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ করে জাহজাহ গিফারী নামক এক বেয়াদব দাঁড়িয়ে তাঁর হাত থেকে রাসূল ﷺ'র লাঠি মোবারক নিয়ে হাঁটুর সাহায্যে ভেঙ্গে ফেলল। তিনি কিছুই বলেননি কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সেই অসভ্যকে শাস্তি দিতে বিলম্ব করেন নি। ঐ সময়ই তার হাতে ও পায়ে পচন রোগ (ক্যান্সার) আরম্ভ হল যার ফলে এক বছরের মধ্যেই সে মৃত্যুবরণ করল।[৮১০]

হযরত আবু কিলাবা (রা.) বলেন, আমি সিরিয়ায় এক ব্যক্তিকে বারংবার চিৎকার করে করে বলতে শুনেছি– "হায়, আফসোস! আমার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত।" আমি তার কাছে গিয়ে তাকে দেখে অবাক হলাম। কারণ তার দু'পা কাটা, দু'চোখ অন্ধ এবং মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে বারংবার ঐ বাক্য উচ্চারণ করছে। তার করুণ অবস্থা দেখে আমার দয়া হল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার এ অবস্থা কেন এবং কি কারণে তুমি নিজেকে জাহান্নামী বলে নিশ্চিত হয়েছ? সে বলল, আমি বড় হতভাগা। আমার অবস্থা জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি হযরত ওসমান (রা.)'র হত্যাকারীদের মধ্যে ছিলাম। আমি

৮০৮. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-১, পৃ-৪২৩

৮০৯. আল্লামা ইউসূফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, খণ্ড-২, পৃ-৮৬২ ও আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, পৃ-২৭৫

৮১০. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, পৃ-২৭৫ ও আল্লামা ইউসূফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, খণ্ড-২, পৃ-৮৬২

যখন তলোয়ার নিয়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম এবং তাঁর কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম তখন তাঁর বিবি চিৎকার করতে লাগলেন আর আমি তাঁর গালে একটি থাপ্পর মারলাম। এটি দেখে হযরত ওসমান (রা.) এই দোয়া করলেন– আল্লাহ তায়ালা তোমার দু'টি হাত ও দু'পা কেটে দিন। তোমার দু'চোখ অন্ধ করে দেন এবং তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। আমি ওসমান (রা.)'র এই দোয়া শুনে কেঁপে উঠি এবং আমার শরীরের লোম শিহরিয়ে উঠল আর আমি ভয়ে ভীত হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসলাম। ওসমান (রা.)'র চার দোয়ার মধ্যে তিনটি দোয়া কবুল হয়ে গেছে যা বর্তমানে আমি ভুগছি আর আপনিও তা দেখতে পাচ্ছেন। আমার দু'হাত, দু'পা কাটা এবং দু'চোখ অন্ধ। বাকী চতুর্থ দোয়া তথা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া যার অপেক্ষায় আছি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এটিও নিশ্চিতভাবে হবে। তাই আমি বারংবার নিজের অপরাধের জন্য লজ্জিত হয়ে ঐ বাক্য উচ্চারণ করছি।[৮১১]

এক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক অন্ধ ব্যক্তিকে তাওয়াফ অবস্থায় দেখেছি। লোকটি বলছিল, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন, যদিও আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে তোমার, এমন পবিত্র জায়গায় এসব কথা কেন বলছ? সে বলল, আমার থেকে এক বড় গুনাহ সংঘটিত হয়েছে। আমি বললাম সেটি কি? সে বলল, যে দিন হযরত ওসমান (রা.)এর ঘর ঘেরাও করা হয়েছিল, সেদিন আমি একজন সাহাবীর সামনে শপথ করেছি যে, যদি ওসমান শহীদ হয়ে যায় তবে আমি তার খোলা চেহারায় থাপ্পর মারব। যখন লোকেরা তাকে শহীদ করে দিল, তখন আমরা তার ঘরে প্রবেশ করলাম। এ সময় তাঁর চেহারা তাঁর স্ত্রীর কোলে ছিল। আমার এক সঙ্গী তাঁর স্ত্রীকে বলল, তাঁর চেহারা সামান্য উন্মুক্ত করুন। তাঁর স্ত্রী এর উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম, আমি শপথ করেছি যে, তাঁর শাহাদাতের পর তাঁর চেহারায় একটি থাপ্পড় মারব। তাঁর স্ত্রী বললেন, তিনি যে, রাসূল ﷺ'র সাহাবী এবং তাঁর সামনে হযরত ওসমান (রা.)'র অনেক ফযিলত তুলে ধরলেন। এগুলো শুনে আমার সঙ্গীরা চলে গেল কিন্তু আমি তাঁর স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করিনি এবং তাঁর চেহারায় থাপ্পর মেরেছি। তাঁর স্ত্রী বললেন, আল্লাহ যেন তোমাকে ক্ষমা না করেন। তোমার হাত যেন শুকিয়ে যায়, চোখ অন্ধ হয়ে যায়। খোদার কসম আমি এখনো তাঁর ঘরের চৌকাঠ থেকে বের হইনি আমার হাত শুকিয়ে গেল। চোখ অন্ধ হয়ে গেল। এখন আমি জানিনা আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন কি না?[৮১২]

হযরত আবু যর গিফারী (রা.) হযরত ওসমান (রা.) সম্পর্কে সর্বদা উত্তম আলোচনা করতেন আর বলতেন,আমি হযরত ওসমান (রা.)কে সর্বদা উত্তম আলোচনার মাধ্যমে স্মরণ করব। তার কারণ হল একদিন রাসূল ﷺ ঘর থেকে বের হয়ে কোথাও

৮১১. ইযালাতুল খাফা, মাকসাদ, পৃ-২২৭, সূত্রঃ কারামাতে সাহাবা

৮১২. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, পৃ-২৭৭

যাচ্ছিলেন। আমিও তাঁর পিছু নিলাম। তিনি এক জায়গায় গিয়ে বসে পড়লেন আর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু যর! কেন এসেছ? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺই ভাল জানেন। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর (রা.) এসে রাসূল ﷺএর ডান পাশে বসে গেলেন। তিনি তাঁকে আমার ন্যায় প্রশ্ন করলেন এবং অনুরূপ উত্তর দিলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) এসে তাঁর বাম পাশে বসে গেলেন। তিনি তাঁকেও অনুরূপ প্রশ্ন করলেন আর তিনিও অনুরূপ উত্তর দিলেন। এরপর হযরত ওসমান (রা.) এসে হযরত ওমর (রা.) এর ডান পাশে বসে গেলেন। রাসূল ﷺ সাতটি কংকর তুলে নিয়ে হাতের তালুতে রাখলে ঐগুলো তাসবীহ পড়া আরম্ভ করল। এমনকি মৌমাছির ন্যায় ঐগুলো থেকে গুনগুন তাসবীহ'র আওয়ায শুনতে পাই। তিনি ঐগুলো রেখে দিলে আওয়ায বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আবার ঐগুলো নিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে রাখলে সেখানেও মৌমাছির শব্দের ন্যায় তসবীহের আওয়ায শুনেছি। তারপর রেখে দিলে আওয়ায বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে হযরত ওমর (রা.) ও ওসমান (রা.)এর হাতে ঐ পাথরগুলো অনুরূপভাবে তাসবীহ পাঠ করে এবং এই আওয়ায মৌমাছির আওয়াযের ন্যায় আমি নিজে শুনেছি। তখন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন هذه خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ এটি নবুয়তের খেলাফত।[৮১৩]

শাহাদাত

হযরত ওসমান (রা.) যে শাহাদাত বরণ করবেন তা অনেক পূর্বেই রাসূল ﷺ একাধিকবার স্পষ্ট ও ইঙ্গিত সহকারে বলেছিলেন। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একদিন ওহুদ পাহাড়ে আরোহণ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা.)। তাঁদেরকে পেয়ে পাহাড়টি আনন্দে কেঁপে উঠল। রাসূল ﷺ বললেন– اسْكُنْ أُحُدُ أَظُنُّهُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ হে ওহুদ! স্থির হও। আমার মনে হয় তিনি পা দিয়ে পাহাড়কে আঘাত করলেন। তারপর বললেন, তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক এবং দু'জন শহীদ ব্যতীত আর কেউ নেই।[৮১৪]

হযরত মুররাহ ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺকে একদিন ফেৎনা সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি, আর তা যে অতি সন্নিকটে তাও তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি এ কথা বলার সময় একজন ব্যক্তি মাথার উপর কাপড় টেনে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি সেই ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, যে লোকটি যাচ্ছে, সে ঐ ফেৎনার দিন সঠিক পথের উপর থাকবে। রাসূল ﷺএর কথা শুনে আমি

৮১৩. ইমাম সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), আল খাসায়েসুল খুবরা, বৈরুত, খণ্ড-২, পৃ-১২৪ ও আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, পৃ-২৭৭

৮১৪. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃ-৫২৩, হাদিস নং- ৩৪৩৪

লোকটির দিকে গিয়ে দেখি, তিনি হলেন হযরত ওসমান (রা.)। আমি ওসমানের চেহারাখানি রাসূল ﷺ'র দিকে ফিরিয়ে বললাম, ইনিই কি তিনি? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[৮১৫]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ একদিন ফেতনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং হযরত ওসমান (রা.)এর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এ লোকটি উক্ত ফেতনার মজলুম অবস্থায় নিহত হবে।[৮১৬]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূল ﷺ হযরত ওসমান (রা.)কে লক্ষ্য করে বললেন, হে ওসমান! হয়ত আল্লাহ তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন। পরে লোকেরা যদি তোমার জামাটি খুলে ফেলতে চায়, তখন তুমি তাদের ইচ্ছানুযায়ী সেই জামাটি খুলে ফেলবে না।[৮১৭]

এখানে জামা দ্বারা খিলাফত বুঝানো হয়েছে। আর লোকেরা জামাটি খুলে ফেলতে চাওয়া দ্বারা বিদ্রোহী কর্তৃক তাঁকে পদচ্যুত করতে চাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই তিনি বিদ্রোহিদের হাতে শাহাদাত বরণ করেছেন তবুও পদত্যাগ করেন নি।[৮১৮]

হযরত আবু সাহলা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওসমান (রা.) যে সময় গৃহবন্দী ছিলেন, তখন তিনি আমাকে বলেছেন, রাসূল ﷺ আমার প্রতি একটি বিশেষ অসিয়ত করেছেন। অতএব আমি উক্ত অসিয়তের উপর ধৈর্যধারণ করব।[৮১৯]

শাহাদতের বর্ণনা

হযরত ওসমান (রা.)'র খিলাফতের বার বছরের মধ্যে প্রথম ছয় বছর তথা ৬৪৪-৬৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শান্তি শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি, বিজয় ও গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করে। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত শেষ ছয় বছর তথা ৬৫০-৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অসন্তোষ, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, বিদ্রোহ ও পরিশেষে রক্তপাতের কারণ ও মর্মান্তিক কাহিনীতে কলুষিত। অস্তিরমতিত্ব, বিদ্রোহী ভাবাপন্ন মুসলমান হযরত ওসমান (রা.)'র সরলতা, অকৃত্রিম মানবপ্রেম, উদারতা ও ধর্মভীরুতার সুযোগ গ্রহণ করে তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি ভিত্তিহীন তথাকথিত অভিযোগ আনয়ন করে তাঁর পদচ্যুত দাবী করে। রাসূল ﷺ'র অসিয়ত মোতাবেক তাতে তিনি সম্মতি না হলে বিনা মোকাবিলায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন। হযরত ওসমান (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু সারাহ (রা.)কে মিশরের

৮১৫. তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬২, হাদিস নং- ৫৬৯৪

৮১৬. তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬২, হাদিস নং- ৫৬৯৬

৮১৭. তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬২, হাদিস নং- ৫৬৯৫

৮১৮. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) লুমআত শরহে মিশকাত, মিশকাত প্রান্ত টিকা, পৃ-৫৬২, টীকা নং-৩।

৮১৯. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬২, হাদিস নং-৫৬৯৮

গর্ভনর নিযুক্ত করেন। দু'বছর পর স্থানীয় লোকেরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে হযরত আলী (রা.)'র পরামর্শে তিনি তাকে পদচ্যুত করেন এবং জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রা.)কে গর্ভনর নিযুক্ত করেন। মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রা.) প্রায় সাতজনের একটি দল নিয়ে মদীনা থেকে মিশরে ফিরে যাওয়ার পথে হযরত ওসমান (রা.)এর একজন গোলামকে দেখতে পেলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে সারাহর নিকট পাঠানো হচ্ছে। তার থেকে একখানা পত্র পাওয়া গেল যাতে লেখা আছে যখন মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর এবং অমুক অমুক তোমাদের কাছে পৌঁছবে তখন যে কোন কৌশলে তাদেরকে হত্যা করবে এবং আমার পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তুমিই দায়িত্বে বহাল থাকবে। মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর পত্র নিয়ে মদীনায় এসে হযরত আলী, তালহা, যুবায়ের, সা'দ (রা.) প্রমুখ সাহাবীদেরকে পত্র খুলে দেখান। তাঁরা পত্র নিয়ে হযরত ওসমান (রা.)'র নিকট গিয়ে এর সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি খোদার শপথ করে বললেন, আমি এই পত্র লিখিনি এবং অন্য কারো দিয়ে লেখাইনি আর এই গোলামকে পত্র দিয়ে আমি পাঠাইনি। তাঁর শপথের কথা শুনে তারা নিশ্চিত হলেন যে, এটি তাঁর কাজ নয়। কিন্তু ওসমান বিদ্বেষীরা বলতে লাগল, তাহলে নিশ্চয় এটি মারওয়ানের কাজ। তিনিই খলীফার শীল মোহর ব্যবহার করে এ কাজ করেছেন। সুতরাং তারা দাবী জানাল যে, মারওয়ানকে আমাদের হাতে সোপর্দ করে দিন। কাজটি মারওয়ান করেছেন কিনা সন্দেহভাজন ছিল। তাছাড়া কোন সাক্ষী প্রমাণসহ বিচারে অপরাধী সাব্যস্থ হওয়া ব্যতীত একজন ব্যক্তিকে বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দেওয়া যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সংগত নয়। তাই তিনি তা অস্বীকার করলেন।

মুরুব্বী সাহাবাগণ চলে যাওয়ার পর বিদ্রোহীরা হযরত ওসমান (রা.)'র ঘর অবরোধ করে রাখল এমনকি পানি পর্যন্ত বন্ধ করে দিল। হযরত আলী (রা.) তিনপাত্র পানি প্রেরণ করেছিলেন। এই পানি নিয়ে যেতে বনু হাশিম ও বনু উমাইয়্যার কয়েকজন গোলাম আহত হয়েছিলেন। হযরত আলী (রা.) হযরত হাসান ও হোসাইন (রা.)কে তলোয়ার দিয়ে তাঁর পাহারা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। এভাবে হযরত তালহা, যুবাইর (রা.)সহ অনেকেই তাদের সন্তানদেরকে তাঁর দরজায় পাহারা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন যাদের সংখ্যা ছিল আঠারজন। এ সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) কয়েকজন মুহাজির সাহাবীকে নিয়ে হযরত ওসমান (রা.)'র সাথে দেখা করেন এবং বললেন, এই কিছু সংখ্যক বিদ্রোহীকে দমন করার মত শক্তি আমাদের আছে। আপনি শুধু আমাদেরকে সম্মতি দেন। কিন্তু হযরত ওসমান (রা.) বললেন, খোদার কসম এমন কথা বলিওনা, কেবল আমার জন্য ইসলাম কলুষিত হোক, কোন মুসলমানের প্রাণহানী হোক তা আমি চাইনা। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.)এর সকল গোলাম দলে

দলে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তাঁর কাছে নিজের শৌয-বীর্যের কথা বলে বিদ্রোহীদের দমনের অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি চাও এবং আমার প্রদত্ত নিয়ামতের হক আদায় করতে চাও তাহলে হাতিয়ার রেখে বসে পড় আর শুন, তোমাদের মধ্যে যে হাতিয়ার খুলে রেখে দেবে তাকে আমি আযাদ করে দিলাম। আর বললেন– وَاللهِ لَاَنْ اُقْتَلَ قَبْلَ الدِّمَاءِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُقْتَلَ بَعْدَ الدِّمَاءِ আল্লাহর কসম! রক্তপাতের পরে আমার হত্যা হওয়ার চেয়ে রক্তপাতের আগেই হত্যা হওয়াটা আমার কাছে অধিক প্রিয়। তাঁর কথার উদ্দেশ্য হল, আমার শাহাদাত তাকদীরে লিখা আছে। রাসূল ﷺও এর সুসংবাদ দিয়েছেন আমাকে। তোমরা বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেও তবুও আমি নিশ্চিত শহীদ হব। সুতরাং তাদের সাথে যুদ্ধ করে রক্তপাত করা উচিত হবে না।[৮২০]

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর যখন দেখলেন যে, হযরত ওসমান (রা.)'র দরজায় কঠোর নিরাপত্তা প্রহরীর কারণে ভিতরে প্রবেশ অসম্ভব তখন তীর নিক্ষেপ করা আরম্ভ করলেন। এতে হযরত ইমাম হাসান, মারওয়ান, মুহাম্মদ ইবনে তালহা এবং হযরত আলী (রা.)'র গোলাম কানবার তীরবিদ্ধ হয়ে আহত হন। অবশেষে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর দু'জন সঙ্গী নিয়ে এক আনসারীর ঘরের ছাদ দিয়ে লাফিয়ে হযরত ওসমান (রা.)'র ঘরে পৌঁছে গেলেন। এসময় হযরত ওসমান (রা.)'র সাথে তাঁর স্ত্রী নায়লা ব্যতীত কেউ ছিলনা। মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর হযরত ওসমান (রা.)এর দাড়ি ধরলে ওসমান (রা.) বললেন, তোমার পিতা হযরত আবু বকর (রা.) যদি আমার সাথে তোমার এই বেয়াদবীমূলক আচরণ দেখতেন তাহলে তিনি কি বলতেন? এই কথা শুনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর দাড়ি ছেড়ে দিলেন কিন্তু তার সঙ্গী দু'জন এসে অত্যন্ত নির্মমভাবে হযরত ওসমান (রা.)কে শহীদ করে দিল। এ সময় তিনি কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করছিলেন। যখন তলোয়ারের আঘাত লাগল তখন فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ আয়াতের উপর রক্তের ফোটা ছিটে পড়েছিল। স্ত্রী হযরত নায়েলা (রা.) তলোয়ার আটকাতে গিয়ে তাঁর আঙ্গুল কেটে গিয়েছিল।

হযরত আলী (রা.) হযরত ওসমান (রা.)'র শাহাদতের সংবাদ শুনে রাগান্বিত হয়ে হযরত হাসান (রা.)কে থাপ্পর আর হযরত হোসাইন (রা.)কে ঘুষি মেরে জিজ্ঞাসা করলেন– كَيْفَ قُتِلَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْتُمَا عَلَى الْبَابِ আমীরুল মু'মেনীন কিভাবে শহীদ হলেন অথচ তোমরা দু'জনই দরজায় দায়িত্বান ছিলে? হযরত ওসমান (রা.)কে হত্যাকারী দু'জন ব্যক্তির নাম হল হাম্মার ও আসওয়াদ এরা মিশরবাসী ছিল। সত্তর বছর বয়সে

---

৮২০. শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী (র.), তোহফায়ে ইসনা আশারা, সূত্র: খুৎবাতে মহররম, পৃ. ১৭৯-৮০

৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আর ১৮ যিলহজ্ব ৩৫ হিজরি সন মোতাবেক ২০ মে ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে জুমার দিন রোযা অবস্থায় ৮২ বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর নামাযে জানাযায় হযরত যুবায়ের (রা.) ইমামতি করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর খিলাফতকাল ছিল ১২ দিন কম ১২ বছর।[৮২১]

হযরত আলী (রা.)

জন্ম, নাম ও বংশ

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের হাশেমী গোত্রে রাসূল ﷺ'র নবুয়তের দশ বছর পূর্বে অর্থাৎ ৬০০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। **নামঃ** আলী। **পিতার নামঃ** আবু তালেব। **উপনামঃ** আবুল হাসান ও আবু তুরাব। **উপাধিঃ** শেরে খোদা ও হায়দার। তিনি রাসূল ﷺ'র সহোদর চাচাত ভাই। **মাতার নামঃ** ফাতেমা বিনতে আসাদ ইবনে হাশেম। আবু তালেবের স্নেহ ও যত্নে মহানবী ﷺ লালিত পালিত হয়েছিলেন। আবু তালেবের অসচ্ছল অবস্থায় রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.)কে নিজের তত্ত্বাবধানে এনে লালন-পালন করেছিলেন। এ সুযোগে হযরত আলী বাল্যকাল থেকেই রাসূল ﷺ'র সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত আলী (রা.) বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন। অবশ্য কেউ কেউ তাকে হযরত খাদীজা (রা.)এর পর দ্বিতীয় মুসলমান বলে স্বীকৃতি প্রদান করেন। কেননা তাদের মতে রাসূল ﷺ'র নবুয়ত প্রকাশিত হয় সোমবারে আর হযরত আলী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন বুধবারে। ঘটনার বিবরণ হল হযরত আলী (রা.) রাসূল ﷺ ও হযরত খাদীজা (রা.)কে রাতের বেলায় নামায পড়তে দেখে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, এটি আল্লাহর মনোনীত দ্বীন। এর প্রচার প্রসারের জন্য আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আমি তোমাকেও সেই একক খোদার দিকে আহবান করছি যাঁর কোন শরীক নাই এবং তোমাকে এই ইবাদতের আদেশ করছি। হযরত আলী (রা.) বললেন, ঠিক আছে। আমি আমার পিতা আবু তালেবের কাছে জিজ্ঞাসা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ইসলাম প্রকাশ হোক তা রাসূল ﷺ'র মনপুত ছিলনা। তাই তিনি আলী (রা.)কে বললেন, তুমি এক্ষুণি তা প্রকাশ করোনা। রাত অতিক্রান্ত হয়ে সকাল হলে আলী (রা.) রাসূল ﷺ'র কাছে গিয়ে কালিমা পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এসময় তাঁর বয়স হয়েছিল আট থেকে দশ বছর।

[৮২১]. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-১,পৃ-৪৮০

হিজরত

রাসূল ﷺ আল্লাহর নির্দেশে মক্কা থেকে মদীনা শরীফে হিজরতের মনস্থ করলেন তখন হযরত আলী (রা.)কে ডেকে বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের আদেশ এসেছে। সুতরাং আজ রাতেই মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাব। তুমি আজ রাত আমার বিছানায় চাদর নিয়ে ঘুমাবে। তোমার কোন ক্ষতি হবে না। কুরাইশদের যে সব আমানত আমার কাছে সংরক্ষিত আছে তা তুমি মালিকদেরকে আদায় করে মদীনায় চলে আসবে। হযরত আলী (রা.) জানতেন যে, কুরাইশরা আজ রাতেই রাসূল ﷺকে বিছানায় হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। এ কারণেই আল্লাহ তাঁকে বিছানায় শুইতে নিষেধ করেছেন। আজ রাতে রাসূল ﷺ'র বিছানা হত্যার স্থান। এসব জেনেও তিনি রাসূল ﷺএর আদেশ মাথা পেতে নিয়েছেন। কারণ রাসূল ﷺএর প্রতি এতই অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর কথা মিথ্যা হয়না। তিনি বলেছেন, তুমি আমার কাছে গচ্ছিত আমানত মালিকদের ফিরিয়ে দিয়ে মদীনায় হিজরত করবে। তাই তিনি নিঃসংকোচচিত্তে রাসূল ﷺ'র বিছানায় শুয়েছিলেন। রাতের বেলায় কুরাইশরা রাসূল ﷺ'র ঘরে প্রবেশ করে বিছানায় চাদর আবৃত মানুষ দেখে মনে করেছিল মুহাম্মদ শুয়ে আছেন। কেউ বলল, তাঁকে চাদর আবৃত অবস্থায় ঘুমের মধ্যেই হত্যা করে দাও। আবার কেউ বলল, না, শত্রুকে যখন একাকী পেয়েছি তাহলে কাপুরুষের ন্যায় এভাবে হত্যা করব কেন? সকালে ঘুম থেকে উঠলে হত্যা করব। এভাবে সকালে চাদর সরিয়ে দেখে বিছানায় হযরত আলী (রা.) শুয়ে আছেন। তারা মহানবী ﷺকে না পেয়ে তাঁর খোঁজে বেরিয়ে গেল আর হযরত আলী (রা.) নিরাপদে সকালে উঠে আমানত আদায় করে তিন দিন পর মদীনায় হিজরত করেন।

বিবাহ

হিজরতের দ্বিতীয় সনে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে রাসূল ﷺএর দুহিতা হযরত ফাতেমা (রা.)কে আলী (রা.) বিবাহ করেন। হযরত আলী (রা.)এর সাথে রাসূল ﷺ'র সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ট হল। তিনি একাধারে চাচাতো ভাই এবং জামাতা। তাঁদের থেকে হযরত হাসান, হোসাইন ও মুহসিন নামে তিন পুত্র সন্তান এবং জয়নাব ও উম্মে কুলসুম নামে দু'টি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মুহসিন বাল্যকালে ইন্তেকাল করেন। হাসান ও হোসাইন (রা.)'র বংশধরগণকে সৈয়দ বলে আখ্যায়িত করা হয়। হযরত ফাতেমা (রা.) এর জীবদ্দশায় হযরত আলী (রা.) অন্য কোন বিবাহ করেননি।

উভয় জগতে রাসূল ﷺ'র ভাই হওয়ার মর্যাদা লাভ

বংশগতভাবে হযরত আলী (রা.) ছিলেন রাসূল ﷺএর চাচত ভাই। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনেও তিনি রাসূল ﷺ'র ভাই ছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে

বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ মদীনায় হিজরত করার পর মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন। এ সময় হযরত আলী (রা.) অশ্রু সজল নয়নে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার সাহাবীদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দিলেন। কিন্তু আমাকে কারো সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন না। তখন রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন– اَنْتَ اَخِيْ فِى الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ দুনিয়া-আখিরাতে তুমিই আমার ভাই।[৮২২]

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তাবুক অভিযানে রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.)কে মদীনায় নারী ও শিশুদের হেফাজতের জন্য রেখে যেতে চাইলে তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে মদীনায় নারী ও শিশুদের হেফাজতের জন্য আপনার খলীফা বানিয়ে আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন আর আমি যুদ্ধের ফযিলত থেকে বঞ্চিত হব। তখন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى তুমি কি এ বিষয়ে সন্তুষ্ট নও, আমি তোমাকে এমনভাবে ছেড়ে যাচ্ছি, যেভাবে হযরত মূসা (আ.) তাঁর ভাই হারুন (আ.)কে ছেড়ে গিয়েছিলেন। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আমার পরে কোন নবী হবে না।[৮২৩]

উপরোক্ত হাদিস শরীফে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) চল্লিশ দিনের জন্য নিজের ভাই হারুন (আ.)কে বনী ইসরাইলদের জন্য নিজের খলীফা বানিয়ে তূর পর্বতে চলে গিয়েছেন। তাবুক অভিযানে ও রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.)কে খলীফা বানিয়ে রেখে গিয়েছেন। পার্থক্য হলো হারুন (আ.) নবী ছিলেন। রাসূল ﷺ'র পর যেহেতু কোন নবী আসবেনা তাই হযরত আলী (রা.) নবী নন বটে, তবে রাসূল ﷺ'র ভাই।

আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল ﷺ'র সামনে খাওয়ার জন্য একটি ভুনা পাখি রাখা ছিল যা জনৈক আনসারী মহিলা হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। তখন রাসূল ﷺ দোয়া করলেন, اللَّهُمَّ ائْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي هَذَا الطَّيْرَ فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَكَلَ مَعَهُ হে আল্লাহ! আপনার সৃষ্টির মধ্যে যে লোকটি আপনার কাছে অধিকতর প্রিয় তাকে পাঠিয়ে দিন যেন সে আমার সাথে এ পাখিটি খেতে পারে। এরপর পরই হযরত আলী (রা.) এলেন এবং তাঁর সাথে খেলেন।[৮২৪]

৮২২. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬৪, হাদিস নং- ৫৭১২
৮২৩. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬৩, হাদিস নং- ৫৭০৬
৮২৪. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬৪, হাদিস নং- ৫৭১৩

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ খায়বারের যুদ্ধের সময় বললেন, আগামীকাল আমি এই যুদ্ধ পতাকা এমন এক ব্যক্তির হাতে প্রদান করব যার হাতে আল্লাহ তায়ালা খায়বার দূর্গ জয় করাবেন। যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে মহব্বত করেন। অতঃপর ভোর হতেই লোকেরা রাসূল ﷺএর কাছে এসে হাযির হল। তারা প্রত্যেকেই মনে মনে আশা পোষণ করেছিল যে, পতাকা তাকেই প্রদান করা হবে। কিন্তু রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, আলী ইবনে আবু তালিব কোথায়? লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁর চোখ উঠেছে। তিনি বললেন, তাকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠাও। অতঃপর আলীকে আনা হল। তখন রাসূল ﷺ তার উভয় চোখে থুথু লাগিয়ে দিলেন। এতে তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন, যেন তার চোখে কোন রোগ ব্যাধি ছিল না। তারপর তিনি পতাকা তাঁর হাতেই অর্পণ করলেন।[৮২৫]

হযরত আলী (রা.)'র প্রতি মু'মিনের ভালবাসা

عَنْ زِرٍّ بْنِ حُبَيْش قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ﷺ إِلَيَّ أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ

হযরত যিরর ইবনে হোবাইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– হযরত আলী (রা.) বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যিনি বীজ ফাটিয়ে অঙ্কুর বের করেন এবং বীর্য থেকে প্রাণী সৃষ্টি করেন। উম্মী নবী ﷺ আমাকে বলেছেন– একমাত্র মু'মিন ব্যক্তিই আমাকে ভালবাসবে আর একমাত্র মুনাফিকই আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে।[৮২৬]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلَا يَبْغَضُهُ مُؤْمِنٌ

হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কোন মুনাফিক আলী (রা.)কে ভালবাসবে না আর কোন মু'মিন তাঁর সাথে বিদ্বেষ রাখতে পারে না।[৮২৭]

হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ নিশ্চয় আলী আমার থেকে আর আমি আলী থেকে। আর সে প্রত্যেক মু'মিনের বন্ধু।[৮২৮]

৮২৫. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬৩, হাদিস নং- ৫৭০৮
৮২৬. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি), সহীহ মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬৩, হাদিস নং-৫৭০৭
৮২৭. ইমাম আহমদ (র.) (২৪১ হি), মুসনাদ, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬৪, হাদিস নং-৫৭১৯
৮২৮. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬৪, হাদিস নং-৫৭০৯

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু।[৮২৯]

হযরত বারা ইবনে আযিব ও যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূল ﷺ যখন গদীরে খোমে (মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান) অবতীর্ণ করলেন, তখন তিনি হযরত আলী (রা.)এর হাত ধরে বললেন, তোমরা কি জাননা, আমি মু'মিনের কাছে তার প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। এভাবে তিন বার বলার পর বললেন– اللّٰهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ فَلَقِيَهُ عُمَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ هَنِيئًا يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ হে আল্লাহ! আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু। হে আল্লাহ! তুমি সেই ব্যক্তিকে ভালবাস, যে আলীকে ভালবাসে। আর তুমি শত্রুতা পোষণ কর সেই ব্যক্তির সাথে যে আলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে। এরপর যখন হযরত আলী (রা.)'র সাথে হযরত ওমর (রা.)এর সাক্ষাত হয় তখন তিনি তাকে বললেন, ধন্যবাদ, হে আবু তালিবের পুত্র! তুমি সকাল সন্ধ্যা প্রত্যেক ঈমানদার নর-নারীর বন্ধু হয়েছ।[৮৩০]

আলী (রা.)'র অনুসরণ স্বয়ং রাসূল ﷺ'র অনুসরণ

হযরত আবু যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ عَلِيًّا وَمن اطاع فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى عَلِيًّا فَقَدْ عَصَانِي যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করল আর যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতা করল সে মূলত আল্লাহর বিরোধিতা করল। যে ব্যক্তি আলীর অনুসরণ করল সে যেন আমার অনুসরণ করল আর যে ব্যক্তি আলীর অবাধ্য হল সে যেন আমার অবাধ্য হল।[৮৩১]

হযরত সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَحَبَّنِي، ومَن اَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللّٰهَ، وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللّٰهَ যে ব্যক্তি আলীকে ভালবাসল সে মূলত আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল সে মূলত আল্লাহকে ভালবাসল। যে ব্যক্তি আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল মূলত সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল আর যে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল সে মূলত আল্লাহর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করল।[৮৩২]

---

৮২৯. আহমদ ও তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬৪, হাদিস নং- ৫৭১০

৮৩০. আহমদ, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬৫, হাদিস নং-৫৭২৩

৮৩১. ইমাম হাকেম (র.), আল মুস্তাদরাক, খণ্ড-৩, পৃ-১২১

৮৩২. যুরকানী, খণ্ড-৭, পৃ-১৪ এবং মুস্তাদরাক, খণ্ড-৩ পৃ-১৩০, সূত্র: সফীনায়ে নূহ, কৃত: আল্লামা শফী-উকাড়ভী, (র.) পৃ-৫৭

হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي যে ব্যক্তি আলীকে গালী দিল সে মূলত আমাকে গালি দিল।[৮৩৩]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.)কে সম্বোধন করে বলেন, لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَجْنُبُ فِي هذه الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ হে আলী! আমি ও তুমি ছাড়া এ মসজিদে নাপাকী অবস্থায় অন্য কারো প্রবেশ করা বৈধ নয়। অর্থাৎ অপবিত্র অবস্থায় কেবল তাঁরা দু'জনই মসজিদ দিয়ে যাতায়াত করতে পারবেন অন্য কেউ নয়।[৮৩৪]

হযরত আলী (রা.)'র দর্শন ও আলোচনা ইবাদতে শামিল

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– اَلنَّظْرُ اِلى وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَة হযরত আলীর চেহারা দেখা ইবাদত।[৮৩৫]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– ذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ হযরত আলী'র আলোচনা ইবাদত।[৮৩৬]

আলী (রা.) আরবের সর্দার

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ'র পাশে বসা ছিলাম। এ সময় হযরত আলী প্রবেশ করলেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন– هٰذَا سَيِّدُ الْعَرَبِ আলী আরবের সর্দার। আমি বললাম,আমার পিতা মাতা আপনার উপর উৎসর্গ, আপনিই তো আরবের সর্দার।[৮৩৭] তখন তিনি বললেন, আমি সমগ্র পৃথিবীর সর্দার আর তিনি আরবের সর্দার।

অস্তমিত সূর্য পুনঃ উদিত হওয়া

হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ 'সাহবা' নামক স্থানে যোহরের নামায আদায় করেন। হযরত আলী (রা.)কে তিনি একটি কাজে পাঠালেন।

---

৮৩৩. আহমদ, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৫৬৫, হাদিস নং-৫৭১৯

৮৩৪. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬৪, হাদিস নং-৫৭১৭

৮৩৫. ইমাম হাকেম, আল মুস্তাদরাক, পৃ-১৪৬, ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী (র.), আস-সাওয়ায়েকুল মুহাররাকা, পৃ-১২৯ ও কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৬ পৃ-১৫৮, আবু নুআঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০ হি) ফাযায়েলুল খোলাফায়ির রাশিদীন, খণ্ড-১, পৃ-৫৬ হাদিস নং-৩৮

৮৩৬. কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৬, পৃ-১৫৬

৮৩৭. আবু নুআঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০ হি), হুলিয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড-১, পৃ-৬৩ ইবনে হাজর মক্কী (র.), (৯৭৪ হি) আস সাওয়ায়েকুল মুহাররাকা, পৃ-১২০ এবং ইমাম হাকেম (র.) আল মুস্তাদরাক, খণ্ড-৩ পৃ-১২৪

আলী (রা.) যখন ফিরে আসলেন তখন রাসূল ﷺ আসর নামায সমাপ্ত করেন। তিনি হযরত আলী (রা.)'র কোলে মাথা রেখে আরাম করছিলেন। এ অবস্থায় সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। তিনি জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আলী! তুমি আসর নামায পড়েছ? উত্তরে বললেন, না। তখন রাসূল ﷺ দোয়া করলেন– اللهُمَّ إِنَّهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ "، قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَرَأَيْتُهَا غَرَبَتْ ، ثُمَّ رَأَيْتُهَا طَلَعَتْ بَعْدَمَا غَرَبَتْ حَتّى وَقَعَتْ عَلى الجِبَالِ وَعَلى الاَرْضِ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ فَتَوضَّأَ وَصَلّى العَصْرِ ثُمَّ غَابَتْ وَذَالِكَ فِى الصَّهْبَاء হে আল্লাহ! নিশ্চয় আলী তোমার এবং তোমার রাসূলের খেদমতে (অনুগত) ছিল। (যার কারণে আসর নামায পড়তে পারেনি) তুমি অস্তমিত সূর্যকে পুনঃউদিত করে দাও। হযরত আসমা (রা.) বলেন, আমি দেখেছি যে, অস্তমিত সূর্য পুনঃউদিত হল এবং সূর্যের কিরণে পাহাড় ও মাটি আলোকিত হল। হযরত আলী (রা.) উঠে উযূ করে নামায পড়লেন। তারপর সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেল। এ ঘটনা 'সাহবা' নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছে।[৮৩৮]

বীরত্ব

হযরত আলী (রা.) একজন বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁর বীরত্ব, শৌর্য-বীর্য অসীম সাহসিকতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা সর্বজনবিদিত ছিল। তাঁর বীরত্বের কারণে সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারী) এবং শেরে খোদা (আল্লাহর বাঘ) উপাধি লাভ করেন। বদর যুদ্ধসহ প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধে তিনি বীরত্বের পরিচয় দেন। তাঁর বীরত্ব ও রণকৌশলের নৈপূণ্যে সন্তুষ্ট হয়ে রাসূল ﷺ তাঁকে নিজের জুলফিকার তরবারী প্রদান করেন। বদর যুদ্ধে কুরাইশদের বিখ্যাত যোদ্ধাদের মধ্যে বারজনকে জাহান্নামে পাঠিয়েছেন তিনি।

হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (রা.) বলেন– نَادَ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يَوْمَ بَدْرٍ يُقَالُ لَه رِضْوَانٌ لَا سَيْفَ اِلاَّ ذُوْ الفقَارِ وَلَا فَتَى اِلاَّ عَلِيٌّ বদর যুদ্ধের দিন আসমান থেকে রিদওয়ান নামক এক ফেরেশ্তা উচ্চস্বরে বলছিলেন– যুলফিকারের ন্যায় কোন তরবারী নেই, আলীর ন্যায় কোন যুবক নেই।[৮৩৯]

খায়বার যুদ্ধে তিনি আটজন প্রসিদ্ধ বাহাদুর ইহুদীকে হত্যা করেছেন। হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, খায়বার যুদ্ধের এক পর্যায়ে সেখানকার সবচেয়ে বড় আল্-কামুস কিল্লার বৃহদাকারের লৌহাদ্বার নিজের পিঠে তুলে নেন আর মুসলমানগণ তাতে উঠে

৮৩৮. ইমাম তাহাভী (র.) (৩২১ হি), মশকিলুল আসার, খণ্ড-৪ পৃ-৩৮৮ এবং ইমাম যুরকানী (র.) (১১২২ হি), যুরকানী শরীফ, খণ্ড-৫ পৃ-১১৬

৮৩৯. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-৭, পৃ-৩৬৬, সূত্র: সফীরায়ে নুহ, পৃ-৬৭

কিল্লার ভিতরে প্রবেশ করে বিজয় লাভ করেন। পরে তিনি তা নিক্ষেপ করলে তা অনেক দূরে গিয়ে পতিত হয়। লোকেরা চল্লিশজনে চেষ্টা করেও তা সরাতে পারে নি।[৮৪০]

ইবনে আসাকের আবু রাফে থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) খায়বার যুদ্ধে কিল্লার একটি ফটক হাতে নিয়ে যুদ্ধের ডালস্বরূপ ব্যবহার করেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁরই হাতে বিজয় দান করলেন। যুদ্ধের পর আমরা কয়েকজনে চেষ্টা করেও ফটকটি উল্টাতে পারিনি।[৮৪১]

জ্ঞান

হযরত আলী (রা.) ছিলেন জ্ঞান ও বেলায়তের সম্রাট। তাঁর অনেক কথা প্রবাদ-প্রবচন হিসাবে প্রচলিত আছে যা বিজ্ঞজনের নিকট অতীব মূল্যবান বাণী হিসাবে সমাদৃত হয়েছে। তিনি কবিতা আবৃতিতে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– اَنَا دَارُ الحِكْمَةِ وَعَلِىٌّ بَابُهَا আমি জ্ঞান বিজ্ঞানের গৃহ আর আলী সে গৃহের দ্বার।[৮৪২]

তাবরানী ও বাযযার (র.) হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন–اَنَا مَدِيْنَةُ العِلْمِ وَعَلِىٌّ بَابُهَا আমি জ্ঞানের শহর আলী আর তার দরজা। ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন হাদিসখানা হাসান। যারা এটাকে মওযূ বলেছেন তারা ভুল করেছেন।[৮৪৩]

উপরোক্ত হাদিসের মমার্থ হল রাসূল ﷺ ছিলেন ওহীর ধারক-বাহক সমস্ত খোদায়ী জ্ঞান ওহীর মাধ্যমে তাঁর নিকট আসে। আর এই জ্ঞান বিতরণ হয় হযরত আলী (রা.) এর মাধ্যমে। তাই তাঁকে জ্ঞানের শহরের দরজা বলেছেন।

তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, বৈয়াকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রবিদ ছিলেন। যুদ্ধ বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন, কুরআন, হাদীস, দর্শন ও আইনশাস্ত্র প্রভৃতিতে তিনি প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। হাদিস সংগ্রহকারী হিসাবেও তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'দীওয়ানে আলী' আরবী সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। তাঁরই তত্ত্বাবধানে আবুল আসওয়াদ সর্বপ্রথম আরবী ব্যাকরণ সংকলন করেন।

হুদাবিয়ার সন্ধিতে সন্ধিপত্র তিনিই লিখেছেন। রাসূল ﷺ বলেছেন, হে আলী! بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم লিখ। তখন কুরাইশ পক্ষের প্রতিনিধি সাহল ইবনে আমর বলল, 'রহমান' এটা আবার কে? এটা লেখা যাবেনা। বরং আরবের নিয়মানুযায়ী بِاسْمِكَ اَللهُمَّ লিখতে হবে। রাসূল ﷺ বললেন, ঠিক আছে তাই লিখ। তিনি তাই লিখলেন। তারপর

৮৪০. আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), তারীখুল খোলাফা, পৃ-১১৪

৮৪১. প্রাগুক্ত

৮৪২. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃ-৫৬৪, হাদিস নং-৫৭১৫

৮৪৩. আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), তারীখুল খোলাফা, পৃ-১১৪ খুৎবাতে মহররম, পৃ-১৯৮

রাসূল ﷺ বললেন, এখন লিখ এই সন্ধিপত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এবং সাহল ইবনে আমরের মধ্যে সম্পাদিত হচ্ছে। সাহল বলে উঠল, আমরা আপনাকে রাসূলুল্লাহ মানলে তো বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে বাধা দিতাম না এবং আপনার সাথে বিরোধ হত না। সে বলল, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখতে পারবেন। ইতিপূর্বে হযরত আলী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লিখে দিয়েছেন। রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন, হে আলী! মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মুছে সেখানে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখে দাও। হযরত আলী (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মুছতে পারব না। তখন রাসূল ﷺ নিজেই তা মুছে দেন এবং সন্ধি সম্পাদন করলেন।[৮৪৪]

হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে ইয়েমেনে কাযী নিয়োগ দিয়ে প্রেরণ করেন। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অল্প বয়স্ক অনভিজ্ঞ এবং বিচার কার্য সম্পাদন করতে জানিনা। আমি কিভাবে ফায়সালা করব? তারপর তিনি আমার বক্ষে স্বীয় হাত মোবারক রেখে বললেন, اَللّٰهُمَّ اِهْدِ قَلْبَه وَثَبِّتْ لِسَانَه فَوَالَّذِىْ فَلَقَ الْحَبَّةَ مَا شَكَكْتُ فِى قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ হে আল্লাহ! আপনি তার অন্তরকে হেদায়ত তথা সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং তার জিহবাকে দৃঢ় রাখুন। আলী (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম, সেদিন থেকে দু'জনের মধ্যে ফায়সালা করতে বিন্দুমাত্রও আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়নি।[৮৪৫]

প্রথম সারির তাবেঈ হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রা.) বলেন– لَمْ يَكُنْ اَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَقُوْلُ سَلُوْنِىْ اِلاَّ عَلِيًّا। রাসূল ﷺ এর পর সাহাবীদের মধ্যে আলী (রা.) ব্যতীত এমন কেউ নেই যে বলতে পারেন– আমার কাছে তোমরা প্রশ্ন কর।[৮৪৬]

হযরত আলী (রা.) বলেন– عَلَّمَنِىَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَلْفَ بَابٍ يُفْتَحُ كُلُّ بَابٍ اِلَى اَلْفِ بَابٍ আমাকে রাসূল ﷺ জ্ঞানের সহস্র অধ্যায় শিক্ষা দিয়েছেন। প্রত্যেক অধ্যায় থেকে সহস্র অধ্যায় উম্মুক্ত হয়।[৮৪৭]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে কেউ জিজ্ঞাসা করল হযরত আলী (রা.) কেমন লোক ছিলেন? উত্তরে তিনি বলেন– كَانَ مُمْتَلِئٌ جَوْفُه حِكْمًا وَعِلْمًا وَبَاْسًا

৮৪৪. ইমাম মুসলিম (র.), সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, বাবে সূলেহ হুদাবিয়া
৮৪৫. হাকেম, মুস্তাদরাক, খণ্ড-৩, পৃ-১৩৫ ও ইমাম সুয়ূতী (র.), তারীখুল খোলাফা, পৃ-৬৬
৮৪৬. ইবনে হাজর মক্কী (র.) (৯৭৩ হি), আস সাওয়ায়েকুল মুহাররকা, পৃ-১২৫ ও আলাউদ্দীন আলী ইবনে হুসসামুদ্দিন (র.), কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৬, পৃ-৩৬৯
৮৪৭. আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) (৭৭৪ হি), আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-৭, পৃ-৩৬০

তাঁর পেট জ্ঞান, বিজ্ঞান, শক্তি, সামর্থ ও বীরত্বপূর্ণ ছিল। তাছাড়া তিনি রাসূল ﷺএর নিকট আত্মীয়ও ছিলেন।[৮৪৮]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– عَلِيٌّ عَيْبَةُ عِلْمِىْ আলী আমার গোপন জ্ঞানের ভাণ্ডার।[৮৪৯]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন– اِنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ مَا فِيْهَا حَرْفٌ اِلاَّ وَلَه ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَاِنَّ عَلِيًّا عِنْدَه مِنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ কুরআন সাত হরফে তথা সাত কিরাতে অবতীর্ণ হয় এবং প্রত্যেক হরফের একটি বাহ্যিক অর্থ আর একটি বাতেনী অর্থ রয়েছে। প্রত্যেক হরফের জাহেরী ও বাতেনী উভয় অর্থ হযরত আলী (রা.)এর নিকট জানা আছে।[৮৫০]

হযরত মুসলিম ইবনে আউস ও জারিয়া ইবনে কুদামা বলেন, হযরত আলী (রা.) একদিন বলেন– سَلُوْنِىْ قَبْلَ اَنْ تَفْقِدُوْنِى فَاِنِّى لَا اُسْئَالُ عَنْ شَيْءٍ دُوْنَ الْعَرْشِ اِلاَّ اُخْبِرُ তোমরা আমার নিকট জিজ্ঞাসা কর আমাকে হারানোর পূর্বে। কেননা আরশ ব্যতীত যে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করলে আমি তার সংবাদ দেব।[৮৫১]

হযরত আবুত তোফায়েল আসের ইবনে ওয়াসেলা (রা.) বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)এর এক ভাষণে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন– سَلُوْنِىْ فَوَ اللهِ لَا تَسْئَلُوْنِى عَنْ شَيْءٍ يَكُوْنُ اِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلاَّ حَدَّثْتُكُمْ بِه আমার নিকট প্রশ্ন কর, আল্লাহর কসম! কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য যে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করলে আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে বলে দেব।[৮৫২]

আল্লামা মীর সৈয়দ শরীফ (র.) শরহে মাওয়াকিফ গ্রন্থে বলেন, হযরত আলী (রা.) এর নিকট 'জফর' ও 'জামিয়াহ' নামক দু'টি মূল্যবান গ্রন্থ ছিল। যাতে তিনি অক্ষর জ্ঞানের ভিত্তিতে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ঘটনা সংঘটিতব্য সবগুলো লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাঁর আওলাদগণ থেকে প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কিরামগণ এই কিতাবদ্বয় থেকে

৮৪৮. ইবনে আব্দুল বার (র.) (৪৬৩ হি), আল ইস্তিয়াব, খণ্ড-২, পৃ-৪৭৬
৮৪৯. আলাউদ্দিন আলী ইবনে হুসসামুদ্দিন (র.), কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৬, পৃ-১৫৩ ও আস সিরাজুল মুনীর, শরহে আল জামেউস সগীর, পৃ-৪১৭
৮৫০. হাজী খলীফা (১০৬৭ হি) কাশফুয যুনূন ও আবু নুআঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০ হি) হুলিয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড-১, পৃ-৬৫
৮৫১. আলাউদ্দিন আলী ইবনে হুসসামুদ্দিন (র.), কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৬, পৃ-৪০৫
৮৫২. খালিসুল ই'তিকাদ, পৃ-৫৪ ও আর রিয়াদুন নাদ্বরাহ, খণ্ড-২ পৃ-২৬২, সূত্র: আল্লামা শফী উকাড়ভী (র.) সফীনায়ে নূহ, পৃ-৮৪

বিভিন্ন রহস্য উদঘাটন করতেন এবং এর ভিত্তিতে বিধান প্রণয়ন করতেন। খলীফা মামুনুর রশিদ যখন হযরত ইমাম আলী রজা ইবনে মূসা কাযেম (র.)কে তার পরে খলীফা নির্বাচন করে খিলাফতনামা পাঠালেন তখন ইমাম আলী রজা (র.) মামুনুর রশিদকে পত্র মারফত লিখে পাঠান যে, اِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ مِنْ حُقُوْقِنَا مَالَمْ يَعْرِفْه اٰبَائُكَ فَقَبِلْتُ مِنْكَ عَهْدَكَ اِلاَّ اَنَّ الجَفْرَ وَالجَامِعَةَ يَدُ لاَّن عَلى اَنَّه لَا يُتِمُّ নিশ্চয় তুমি আমাদের অধিকার বুঝেছ যা তোমার পূর্বপুরুষগণ বুঝেনি।এইজন্যই আমি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম কিন্তু 'জফর ও জামিয়াহ' গ্রন্থ দু'টি বলছে যে,এই কাজটি পূর্ণ হবে না।[৮৫৩]

ঠিকই ইমাম আলী রজা (র.) খলীফার জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেছেন।

হযরত ওমর (রা.) বলতেন– لَا يُفْتِيَنَّ اَحَدٌ فِى المَسْجِدِ وَعَلِيٌّ حَاضِرٌ হযরত আলী (রা.) এর উপস্থিতিতে কেউ যেন মসজিদে ফত্ওয়া না দেয়।[৮৫৪]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– خُطَبَنَا عُمَرُ رَضى الله عَنْهُ فَقَالَ اَقْضَانَا عَلِيٌّ হযরত ওমর (রা.) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন আর বললেন আমাদের মধ্যে বড় কাযী (বিচারক) হলেন হযরত আলী।[৮৫৫]

হযরত ওমর (রা.)এর সামনে এমন এক পাগল মহিলা আনা হল যে বিবাহের ছয়মাস পর সন্তান প্রসব করল। লোকেরা তার উপর যিনার অভিযোগ আনল। হযরত ওমর (রা.) তাকে পাথর নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত দিলেন। কিন্তু হযরত আলী (রা.) পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে মহিলাকে নিষ্পাপ সাব্যস্ত করে দিলেন। তাছাড়া পাগল শরিয়তের বিধানের বহির্ভূত কথাটিও ওমর (রা.)কে স্মরণ করিয়ে দিলেন। فَتَرَكَ عُمَرُ رَجْمَهَا وَقَالَ لَوْلَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ তখন ওমর (রা.) মহিলাকে পাথর নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করলেন আর বললেন, আজ যদি আলী উপস্থিত না থাকত তবে ওমর ধ্বংস হয়ে যেত।[৮৫৬]

হযরত ওমর (রা.)'র সামনে কোন জটিল মুকাদ্দমা আসলে আর তখন হযরত আলী (রা.) উপস্থিত না থাকলে তিনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন যেন ভুল বিচার না হয়।[৮৫৭]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, اَعْلَمُ اَهْلِ المَدِيْنَةِ بِالْفَرَائِضِ عَلِيٌّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ মদীনা শরীফে ইলমে ফারায়েয সবচেয়ে বেশী জানেন হযরত আলী (রা.)।[৮৫৮]

---

৮৫৩. খালিসুল ইতিকাদ, পৃ-৪৫, সূত্র: আল্লামা শফী উকাড়ভী (র.), সফীনায়ে নুহ, পৃ. ৮৪-৮৫

৮৫৪. ইবনে আব্দুর বার (র.) (৪৬৩ হি), আল ইস্তিয়াব,খণ্ড-২ পৃ-৪৭৫

৮৫৫. ইবনে আব্দুর বার (র.) (৪৬৩ হি), আল ইস্তিয়াব, খণ্ড-২ পৃ-৪৭৫ আবু নুআঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি), হুলিয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড-১, পৃ-৬৫ ইবনে হাজর মক্কী (র.) (৯৭৩ হি), আস সাওয়ায়েকুল মুহররকা, পৃ-১২৪

৮৫৬. ইবনে আব্দুর বার (র.) (৪৬৩ হি), আল ইস্তিয়াব, খণ্ড-২ পৃ-৪৭৪

৮৫৭. আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), তারীখুল খোলাফা, খুৎবাতে মহররম, পৃ-২০৪

৮৫৮. আর রিয়াদুন নদ্বরাহ, খণ্ড-২ পৃ-২৫৬, সূত্র: আল্লামা শফী উকাড়ভী (র.), সফীনায়ে নুহ, পৃ-৯০

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ الْمَسْحِ فَقَالَتْ ائْتِ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَهُوَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي قَالَ فَأَتَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰه ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا

হযরত শুরাইহ ইবনে হানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা.)কে মাসেহর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আলী (রা.)কে নিয়ে এসো, তিনিই এ বিষয়ে আমার চেয়ে বেশী জ্ঞাত। শুরাইহ বলেন, অতঃপর আমি আলী (রা)কে নিয়ে আসলাম, অতঃপর মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি (হযরত আলী) বলেন, রাসূল ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, একদিন এক রাত পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করি আর মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিন রাত।[৮৫৯]

হযরত আলী (রা.)কে ভালবাসার প্রতিদান

হযরত আলী (রা.) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ'র অতি প্রিয় ও স্নেহভাজন ছিলেন। রাসূল ﷺএর অসংখ্য বাণী দ্বারা তা প্রমাণিত। তাই তাকে ভালবাসা তার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ করা ঈমানদারের উচিত। হযরত আলী (রা.)কে নিয়ে উম্মত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কেউ অতি ভালবাসা, প্রদর্শন করতে গিয়ে তাঁকে পূর্ববর্তী তিন খলিফার উপর প্রাধান্য দিয়েছে আবার কেউ তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতঃ তাঁকে গালি দিতেও কুণ্ঠবোধ করেনি। এ উভয়দল ভ্রান্ত ও গোমরাহ। প্রথম দলটির নাম হল 'শীয়া' আর দ্বিতীয় দলটি হল 'খারেজী'। কেবল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতই সঠিক ও মধ্যপন্থী মতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা.) বলেন– لَيُحِبُّنِى قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِى حُبِّىْ وَلَيُبْغِضُنِى قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِى بُغْضِى এক সম্প্রদায় আমাকে অতি মহব্বত করেছে। আমাকে অতি মহব্বতের কারণেই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর এক সম্প্রদায় আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছে। আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণেই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৮৬০]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَثَلِيْ فِى هذه الاُمَّة كَمَثَلِ عِيْسى بن مَرْيَمَ اَحَبَّتْه طَائِفَةٌ وَاَفْرَطَتْ فِى حُبِّه فَهَلَكَتْ وَابْغَضَه طَائِفَةٌ وَاَفْرطَتْ فِى بُغْضه فَهَكَلَتْ وَاَحَبَّتْهُ طَائِفَةٌ فَاقْتَصَدْ حُبِّه فَنَجَتْ

হযরত আলী (রা.) এরশাদ করেন, এই উম্মতের মধ্যে আমি হযরত ঈসা ইবনে মরয়মের ন্যায়। একদল তাকে অতি মহব্বত করার কারণে ধ্বংস হয়েছে আর অপর দল তাঁর প্রতি অতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তৃতীয় একদল তাকে সঠিক ও যথাযথভাবে মহব্বত করত, ফলে তারা মুক্তি পেয়েছে।[৮৬১]

---

৮৫৯. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-২, পৃ-৭০২, হাদিস-১১৯৯

৮৬০. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-২, পৃ-৫৬৫, হাদিস-৯৫২

৮৬১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-২, পৃ-৬০০, হাদিস নং-১০২৫

অন্যান্য ফযিলত

عَنْ أَبِى حَمْزَةَ يَقول سَمِعْتُ زَيْدَ بن أَرْقَمَ ، يَقُولُ : أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلِيُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ

হযরত আবু হামযাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, সর্বপ্রথম নবী করিম ﷺ'র সাথে নামায পড়েছেন হযরত আলী (রা.)।[৮৬২]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَث سِنِيْنَ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّى مَعَه اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ

হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺএর সাথে তিন বছর নামায পড়েছি। যার পূর্বে কোন লোকই তাঁর সাথে নামায পড়েন নি।[৮৬৩]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ قَالَ شَكَوْتُ اِلى رَسُول اللهِ ﷺ حَسَدَ النَّاسُ اِيَّاىَ فَقَالَ اَمَا تَرْضى اَنْ تَكُوْنَ رَابِعَ اَرْبَعَةٍ اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ اَنَا وَاَنْتَ وَالحَسَنُ وَالحُسَيْنُ وَاَزْوَا جِنَا عَنْ يَمَائِنَا وَعَنْ شِمَالِنَا وَذَرَارِيُّنَا خَلْفَ اَزْوَاجِنَا وَشِيْعَتُنَا من وَرَائِنَا

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার প্রতি কিছু লোকের হিংসা সম্পর্কে আমি রাসূল ﷺকে অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, হে আলী! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি সেই চারজনের একজন হবে যারা প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে? আমি, তুমি, হাসান ও হোসাইন। আমাদের বিবিরা থাকবে আমাদের ডান ও বাম পাশে। আমাদের সন্তানরা থাকবে আমাদের বিবিদের পিছনে আর আমাদের ভক্তরা থাকবে আমাদের পিছনে।[৮৬৪]

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَمَرَنِى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِحُبِّ اَرْبَعَةٍ وَاَخبَرَنِى اَنَّه يُحِبُّهُمْ اِنَّكَ يَا عَلِيُّ مِنْهُمْ اِنَّكَ يَا عَلِيُّ مِنْهُمْ .

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে আদেশ করেন যে, চারজনকে ভালবাসতে আর আমাকে অবহিত করেছেন যে, আল্লাহও তাদেরকে ভালবাসেন। হে আলী! নিশ্চয় ঐ চারজনের মধ্যে তুমিও আছ। হে আলী! ঐ চারজনের মধ্যে তুমিও আছ।[৮৬৫]

عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدِيْ فِى لَيْلَتِىْ فَعَدَتْ عَلَيه فَاطِمَةُ وَعَلِيٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا عَلِيُّ اَبْشِرْ فَاِنَّكَ وَاَصْحَابُكَ وَشِيْعَتُكَ فِى الجَنَّةِ

হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পালার রাতে একদিন নবী করিম ﷺ আমার নিকট ছিলেন। সকালে হযরত ফাতেমা ও আলী (রা.)

৮৬২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-২, পৃ-৬০৯, হাদিস নং-১০৪০
৮৬৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-২, পৃ-৬৮২, হাদিস নং-১১৬৬
৮৬৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-২, পৃ-৬২৪, হাদিস নং-১০৬৮
৮৬৫. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-২, পৃ-৬৪৮, হাদিস নং-১১০৩

আসলেন। রাসূল ﷺ বললেন, হে আলী! সুসংবাদ শুন, তুমি, তোমার সঙ্গী সাথী এবং তোমার ভক্ত অনুরক্তরা জান্নাতে থাকবে।[৮৬৬]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَاَيْتُ عَلى بَابِ الجَنَّةِ مَكْتُوْبًا لَا اِلهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ ، عَلِيٌّ اَخُوْ رَسُوْلِ اللهِ .

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমি (মি'রাজ রাতে) জান্নাতের দরজায় লেখা দেখেছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং আলী রাসূলুল্লাহর ভাই।[৮৬৭]

হযরত জাবির (রা.) থেকে অনুরূপ আরো একটি হাদিস বর্ণিত আছে, যাতে এ বাক্যটি বৃদ্ধি আছে উপরোক্ত বাক্যটি জান্নাতের দরজায় লিখা আছে আসমানসমূহ সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্ব থেকে।[৮৬৮]

اِنَّ فَاطِمَةَ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ وَقْعَتِ المِعْرَاجِ فَقَالَتْ بِاَبِى وَ اُمِيّ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الَّذِيْ رَاَيْتَ لِىْ فَقَالَ يَا فَاطِمُ اَنْتَ خَيْرُ نِسَاءِ البَرِيَّةِ وَسَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الجَنَّةِ قَالَتْ يَا اَبَه فَمَا لِعَلِيٍّ ؟ قَالَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الجَنَّةِ فَقَالَتْ يَا اَبَه فَمَا لِلْحَسَنِ وَالحُسَيْنِ؟ قَالَ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الجَنَّةِ .

রাসূল ﷺ মি'রাজ থেকে আগমনের পর হযরত ফাতেমা (রা.) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গ, আমার ব্যাপারে আপনার মত কি? তখন তিনি বললেন, হে ফাতেমা! তুমি পৃথিবীর মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং জান্নাতে মহিলাদের সর্দার। ফাতেমা (রা.) বললেন– আলীর অবস্থা কি? তিনি বললেন, সে জান্নাতবাসীদের একজন। ফাতেমা (রা.) বললেন, হাসান এবং হোসাইনের অবস্থা? তিনি বললেন, তারা জান্নাতের যুবকদের সর্দার।[৮৬৯]

عَنْ اَبِى الحَمْرَا مَوْلى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ كُنَّا حَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فَطَلَعَ عَلِيُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلى ادَمَ فِى عِلْمِه وَ الِي نُوْحٍ فِى فَهْمِه وَاِلى اِبْرَاهِيْمَ فِى خُلُقِه فَلْيَنْظُرْ اِلى عَلِيّ بن اِبِى طَالِبٍ .

রাসূল ﷺএর মাওলা হযরত আবুল হামরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূল ﷺএর পাশে বসা ছিলাম। অতঃপর হযরত আলী ইবনে আবু তালেব

৮৬৬. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-২, পৃ-৬৫৪, হাদিস নং-১১১৫
৮৬৭. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-২, পৃ-৬৬২, হাদিস নং-১১৩০
৮৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ-৬৬৮, হাদিস নং- ১১৩৪
৮৬৯. আবু নুআঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০ হি), ফাযায়েলুল খোলাফায়ির রাশেদীন, খণ্ড-১, পৃ-৫৩, হাদিস-৩৩

(রা.) আগমন করলেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, যদি কেউ আদম (আ.)কে তাঁর জ্ঞানে, নূহ (আ.)কে তাঁর মেধায় এবং ইব্রাহিম (আ.)কে তাঁর চরিত্রে দেখতে চায়, সে যেন আলী ইবনে আবু তালেবকে দেখে।[৮৭০]

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيْبِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ كُنَّا اَنَا وَ عَلِيٌّ نُوْرًا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ ادَمَ بِاَرْبَعَةَ عَشَرَ اَلْفَ عَامٍ فَلَمَّا خَلَقَ ادَمَ قَسَمَ ذَالِكَ النُّوْرَ جُزْئَيْنِ فَجُزْءٌ اَنَا وَجُزْءُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلام .

হযরত সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার প্রিয় মাহ্বুব রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি– আমি এবং আলী আদম সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহর সামনে একটি নূর ছিলাম। যখন আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.)কে সৃষ্টি করলেন তখন তিনি সেই নূরকে দু'ভাগে ভাগ করলেন। এর একভাগ হলাম আমি আর অপর ভাগ হল আলী।[৮৭১]

খিলাফত ও শাহাদাত

হযরত ওসমান (রা.) বিদ্রোহীদের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হওয়ার পর সমগ্র ইসলামী রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে খলীফার দায়িত্ব গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলনা। মিশরীয় শক্তিশালী বিদ্রোহীদলের নেতা ইবনে সাবা হযরত আলী (রা.)কে সমর্থন করল। অপর দিকে কূফাবাসীরা যুবায়েরকে এবং বসরাবাসীরা তালহা (রা.)কে সমর্থন দিল। পরিশেষে সকলেই ঐক্যমত হয়ে হযরত আলী (রা.)কে এই পদের জন্য আহবান করলে তিনি বলেন– اَكُوْنُ وَزِيْرًا بِكُمْ خَيْرٌ مِنْ اَنْ اَكُوْنَ اَمِيْرًا مَنْ اَخْتَرْتُمْ رَضِيْهُ আমি আমীর হওয়ার চেয়ে উযীর হওয়াটাকে অধিক পছন্দ করি। তোমরা যাকে মনোনীত কর আমি তাতে সন্তুষ্ট।[৮৭২]

অতঃপর ওসমান (রা.)এর শাহাদতের তৃতীয় কিংবা পঞ্চম দিন মদীনার বিশিষ্ট নাগরিকদের অনুরোধে হযরত আলী (রা.) ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জুন, ৩৫ হিজরি ১০ যিলহজ্ব খলীফার পদে অধিষ্ঠিত হন।

পরবর্তীতে বিদ্রোহীদের চাপে হযরত যুবায়ের ও তালহা (রা.) ওসমান (রা.)এর হত্যার বিচার নিয়ে হযরত আলী (রা.)এর বিরোদ্ধাচরণ করেন। পরবর্তীতে জঙ্গে জামাল তথা উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত যুবায়ের ও তালহা (রা.) শাহাদাতবরণ করেন। ইসলামের সর্বপ্রথম বিচ্ছিন্নতাবাদী খারেজী সম্প্রদায় ইসলামের ঐক্য সংহতি ও শক্তি ধ্বংস করার

৮৭০. আবু নুআঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০ হি), ফাযায়েলুল খোলাফায়ির রাশেদীন, খণ্ড-১, পৃ-৫৯, হাদিস-৪২
৮৭১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-২, পৃ-৬৬২, হাদিস-১১৩০
৮৭২. ইবনে খালদুন, খণ্ড-৪, পৃ-২৫৪

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তারা হযরত আলী, আমীরে মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আস (রা.)কে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে হত্যা করার পরিকল্পনা করল। আব্দুর রহমান ইবনে মুলজাম হযরত আলী (রা.)কে, বারক ইবনে আব্দুল্লাহ আমীরে মুয়াবিয়া (রা.)কে এবং আমর ইবনে বকর হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)কে ১৭ রমযান আক্রমণ করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করল। সৌভাগ্যক্রমে হযরত মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আস (রা.) বেঁচে গেলেও হযরত আলী (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। আব্দুর রহমান ইবনে মুলজাম ১৫ রমযান রাতে কূফায় জামে মসজিদের সেই দরজায় লুকিয়ে থাকল যেই দরজা দিয়ে হযরত আলী (রা.) প্রবেশ করেন। পূর্ব নিয়মানুযায়ী তিনি মসজিদে যাত্রার পথে يَا اَيُّهَا النَّاسُ الصلوة الصلوة হে লোক সকল, নামায, নামায বলছিলেন। এ সময় অভিশপ্ত ইবনে মালজুমের বিষাক্ত ছুরির অব্যর্থ আঘাতে ৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ২৪ জানুয়ারী, চল্লিশ হিজরি ১৭ রমযান হযরত আলী (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে খোলাফায়ে রাশেদুনের পরিসমাপ্তি ঘটে। শুক্রবার সকালে তিনি আহত হন, শুক্র ও শনিবার তিনি জীবিত ছিলেন কিন্তু রবিবার রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অপর বর্ণনায় আছে ১৯ রমযান শুক্রবার আহত হন আর ২১ রমযান রবিবার ইন্তেকাল করেন। তিনি চার বছর আট মাস নয় দিন খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন এবং তেষট্টি বছর হায়াত পেয়েছিলেন। ইমাম হাসান,হোসাইন ও আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) তাঁকে গোসল দেন এবং ইমাম হাসান (রা.) নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন।

তাঁর কবর মোবারক খারেজীদের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গোপন রাখা হয়েছিল। শরীক বলেন, ইমাম হাসান (রা.) তাঁর লাশ মোবারক কূফা থেকে মদীনায় স্থানান্তর করেছেন। মুবাররদ বলেন, এক কবর থেকে অপর কবরে স্থানান্তরিত হওয়া প্রথম লাশ হল হযরত আলী (রা.)'র লাশ মোবারক। ইবনে আসাকের বলেন, হযরত আলী (রা.)এর লাশ মদীনায় রাসূল ﷺ'র পাশে দাফনের জন্য একটি উটের পিঠে করে পাঠানো হয়েছিল তখন রাতের বেলা ছিল। পথে উট কোথাও হারিয়ে গিয়েছিল ফলে তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাই ইরাকবাসীরা বলে হযরত আলী (রা.) মেঘে তাশরীফ নিয়েছেন। কেউ কেউ বলে অনেক খোঁজা-খুঁজির পর উটটি 'তায়' নামক স্থানে পাওয়া গিয়েছিল এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়েছিল।[৮৭৩]

কারামত

দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত

বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা.) ঘোড়ায় আরোহণ করার সময় যখন এক পা এক রেকাবে রাখতেন তখন কুরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করেতন অপর পা

৮৭৩. জালাল উদ্দীন সূয়ুতী (র.) (৯১১ হি), তারীখুল খোলাফা, পৃ-১২০, সূত্র: খুৎবাতে মহররম, উর্দু, পৃ-২১৭

অন্য রেকাবে রাখার আগেই পুরো কুরআন তিলাওয়াত শেষ করতেন। অন্য বর্ণনায় আছে তিনি ঘোড়ায় পূর্ণাঙ্গভাবে বসার পূর্বেই কুরআন তিলাওয়াত সমাপ্ত করতেন।[৮৭৪]

অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান

হযরত আলী (রা.) কূফার জামে মসজিদে ফজর নামাযের পর জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, অমুক গ্রামে যাও, যেখানে একটি মসজিদ আছে যার পাশে একটি ঘরে এক পুরুষ ও নারী ঝগড়া করছে। তুমি গিয়ে তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো। লোকটি গিয়ে তাদেরকে ঝগড়া করা অবস্থায় পেল এবং তাদেরকে খলীফার দরবারে নিয়ে এল। তিনি তাদেরকে বললেন, আজ তোমাদের ঝগড়া দীর্ঘ সময় ধরে চলছিল। পুরুষ লোকটি বলল, হে আমীরুল মু'মেনীন! আমি এই মহিলাকে বিয়ে করেছি। কিন্তু যখনই আমি তার কাছে গেলাম তখনই তার প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা হল। সম্ভব হলে আমি তাকে মুহূর্তের মধ্যে ত্যাগ করতাম। সে আমার সাথে ঝগড়া আরম্ভ করে দিল। ইত্যবসরে আপনার লোক ফরমান নিয়ে উপস্থিত হল। তিনি উপস্থিত সকলকে চলে যেতে বললেন কারণ বিষয়টি একান্ত গোপনীয় ছিল। তিনি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তাকে (পুরুষটি) পূর্ব থেকেই চিনতে? সে না বলে উত্তর দিল। তিনি বললেন, যখন আমি পরিচয় দেবো তখন চিনবে তবে কোন কথা মিথ্যা বলবেনা। মেয়েটি সম্মতি প্রকাশ করলে তিনি বলেন, তুমি অমুকের মেয়ে অমুক না? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার এক চাচাত ভাই ছিল, সে তোমাকে ভালবাসত। একরাতে তুমি কোন কাজে বের হয়েছিলে, সে তোমার সাথে যিনা করেছে। ফলে তুমি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গিয়েছিলে। এঘটনা তোমার মাকে বলেছ কিন্তু তোমার পিতা থেকে গোপন করেছিলে। সন্তান প্রসবের সময় হলে তোমার মা তোমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যায়। সেখানে তোমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম হয়েছিল। তুমি তাকে একটি কম্বলে পেঁচিয়ে দেওয়ালের পেছনে জনপথে নিক্ষেপ করেছিলে। যেখানে একটি কুকুর এসে বাচ্চাকে ঘ্রাণ নিচ্ছিল তখন তুমি কুকুরকে একটি পাথর নিক্ষেপ করেছিলে যা বাচ্চার মাথায় গিয়ে পড়েছিল। ফলে তার মাথা ফেটে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। তোমার মা স্বীয় ওড়না ছিড়ে বাচ্চার মাথায় বেঁধে দিল। তারপর তোমরা চলে এসেছ আর তার কোন সন্ধান পাওনি। মহিলা বলল, সবকথা সত্য হে আমীরুল মু'মেনীন! কিন্তু এঘটনা আমি এবং আমার মা ছাড়া অন্যকেউ জানতনা। তিনি বললেন, সকাল হলে অমুক গোত্রের লোক যাত্রা পথে বাচ্চাটা পেয়ে সঙ্গে নিয়ে গেল এবং তাদের কাছে লালিত-পালিত হয়ে যুবক হল আর তাদের সাথে কূফায় আগমন করল। এখন সে তোমাকে বিবাহ করেছে।

[৮৭৪]. আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, পৃ-২৮০

তিনি যুবককে বললেন, একটু মাথা খুলে দেখাও। সে মাথা খুলে দেখালে দেখা গেল আহতের নিদর্শন আদৌ বিদ্যমান। তখন হযরত আলী (রা.) বললেন, হে যুবক! ইনি তোমার মা আর মহিলাকে বললেন, এ তোমার স্বামী নয় বরং তোমার সন্তান। আল্লাহ তাকে হারাম কাজ থেকে বিরত রেখেছেন।[৮৭৫]

হযরত আলী (রা.) হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.)কে কারবালার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অনেক পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমার কলিজার টুকরা হোসাইনকে তোমার চোখের সামনেই শহীদ করবে কিন্তু তুমি তাকে কোন সাহায্য করতে পারবেনা। যখন হোসাইন (রা.) শাহাদাত বরণ করেন তখন বারা (রা.) বলেন, আমীরুল মু'মেনীন ঠিকই বলেছিলেন। হযরত হোসাইন (রা.) শহীদ হলেন আর আমি তাঁর কোন সাহায্যই করতে পারলামনা। তিনি একথা বলে লজ্জিত হতেন।[৮৭৬]

ফুরাত নদীর আনুগত্য

একদিন কূফাবাসীরা আরয করল, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ বছর ফুরাত নদীর পানি অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে যাওয়াতে আমাদের খেত-খামার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কতই না ভাল হত পানি হ্রাসের জন্য যদি একটু দোয়া করতেন। তিনি উঠে ঘরে তাশরীফ নিলেন। লোকেরা ঘরের দরজায় তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে। হঠাৎ করে তিনি রাসূল ﷺ'র জুব্বা মোবারক পরিধান করেন। মাথায় পাগড়ী বেঁধে, লাঠি মোবারক হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হলেন। একটি ঘোড়ায় আরোহণ করে ফুরাত নদীর দিকে যাত্রা করলেন আর লোকেরা পায়ে হেঁটে তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগল। ফুরাত নদীর তীরে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নেমে দ্রুত দু'রাকাত নামায আদায় করে উঠে লাঠি মোবারক হাতে নিয়ে ফুরাত নদীর ব্রীজের উপর উপস্থিত হলেন। এ সময় হযরত হোসাইন (রা.)ও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি লাঠি মোবারক পানির দিকে ইশারা করলেন, সাথে সাথে পানি এক ফিট নিচে নেমে গেল। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এতটুকুই কি হবে? তারা বলল না, হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি পুনরায় লাঠি মোবারক দিয়ে ইশারা করলে পানি আরো এক ফিট নিচে নেমে গেল। এভাবে পানি তিন ফিট নিচে নেমে গেলে লোকেরা বলল, এতটুকুতেই যথেষ্ট হবে।[৮৭৭]

সূর্য পুনঃ উদিত হওয়া

হযরত আলী (রা.) বাবেল শহরের দিকে যাত্রা করলেন এবং ফুরাত নদী পার হয়ে সঙ্গীদের নিয়ে আসরের নামায পড়ার মনস্থ করলেন। সঙ্গীরা আপন আপন সাওয়ারী নিয়ে নদী পার হতে আরম্ভ করল। এদিকে সূর্য অস্ত গেল এবং সকলের আসর নামায

[৮৭৫]. আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, পৃ.২৮১-৮২
[৮৭৬]. প্রাগুক্ত, পৃ-২৮৬
[৮৭৭]. আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, পৃ. ২৮২-৮৩

কাযা হয়ে গেল। সঙ্গীরা তাঁর সমালোচনা করতে লাগল। তিনি যখন এই সমালোচনা শুনলেন তখন সূর্য পুনঃউদিত হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ তার দোয়া কবুল করলেন। সূর্য পুনঃউদিত হল, আসরের সময় হল এবং সকলেই নামায আদায় করল। যখন তিনি নামায শেষে সালাম ফিরান তখনই সূর্য পুনঃঅস্তমিত হল এবং সূর্য্য থেকে ভয়ানক এক আওয়ায আসতে লাগল। ফলে সকলেই ভীত হয়ে গেল এবং সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও ইস্তেগফার পড়তে লাগল।[৮৭৮]

হযরত আলী (রা.) এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে, সে হযরত আলী (রা.)এর সংবাদ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)'র নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। সে শপথ করে এ অভিযোগ অস্বীকার করল। তখন তিনি বললেন, তুমি যদি মিথ্যা শপথ করে থাক তবে যেন আল্লাহ তায়ালা তোমাকে অন্ধ করে দেন। এখনো এক সপ্তাহ অতিক্রম হয়নি সে লাঠি ধরে অন্ধ অবস্থায় ঘর থেকে বের হল।[৮৭৯]

একদিন হযরত আলী (রা.) উপস্থিত লোকদেরকে কসম দিয়ে বললেন, যারা রাসূল ﷺএর বাণী مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা– শুনেছ তারা সাক্ষ্য দাও। এ সময় উপস্থিত বারজন আনসারী সাক্ষ্য দেন। একব্যক্তি সে রাসূল ﷺ থেকে এ বাণী শুনেছিল কিন্তু সাক্ষ্য দেয় নি। হযরত আলী (রা.) বললেন, তুমিই তো এই বাণী শুনেছ সাক্ষ্য দিচ্ছনা কেন? সে বলল, আমি শুনেছি তবে তা ভুলে গিয়েছি। হযরত আলী (রা.) দোয়া করলেন, হে পরওয়ারদিগার! যদি এ ব্যক্তি মিথ্যা বলে তাহলে তার চেহারায় এমন শ্বেত রোগ দাও যা পাগড়ী দিয়েও যেন ঢাকতে না পারে। বর্ণনাকারী বলেন, খোদার শপথ! আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছি। তার উভয় চোখের মধ্যখানে শ্বেত রোগের চিহ্ ছিল। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বলেন, আমিও ঐ মজলিসে উপস্থিত ছিলাম এবং ঐ হাদিস শুনেছি কিন্তু সাক্ষ্য দেইনি বরং গোপন করেছি। ফলে আল্লাহ আমাকে দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন। আমি সাক্ষ্য না দেওয়ার কারণে সর্বদা লজ্জিত হতাম এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও মাগফিরাত কামনা করতাম।[৮৮০]

হযরত আলী (রা.)'র বিরোদ্ধাচরণের পরিণাম

দালায়েলুন নবুয়ত গ্রন্থে ইমাম মুস্তাগফারী (র.) হযরত খারাস ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ'র জীবদ্দশায় একবার তার মাথা ব্যাথা হয়েছিল। তিনি তার দু'চোখের মাঝখানের কপালের চামড়া ধরলেন এবং সেখানে সজারুর কাটার ন্যায়

৮৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ-২৯২
৮৭৯. আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, পৃ-২৯২
৮৮০. আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, পৃ-২৯৩

চুল গজাল আর ব্যাথা দূরীভূত হল। যেদিন খারেজী সম্প্রদায় হযরত আলী (রা.)'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল খারাস তাদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। তখন তার কপাল থেকে চুল পড়ে গেল। সে বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়ল। লোকেরা বলতে লাগল হযরত আলী (রা.)'র বিরোদ্ধাচরণের ফলে তোমার এই অবস্থা। সে তাওবা ও ইস্তেগফার করলে চুল পুনরায় উঠল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে প্রথম বার চুল গজাতে দেখেছি এবং চুল ঝরে পড়ার পর পুনরায় উঠতে দেখেছি।[৮৮১]

হযরত ইমাম মুস্তাগফারী (র.) এক সৎব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একরাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে সমস্ত সৃষ্টি হিসাবের স্থানে একত্রিত হল। আমি পুলসিরাতের নিকটে পৌঁছলাম এবং পুলসিরাত পার হয়ে গেলাম। হঠাৎ আমার দৃষ্টি রাসূল ﷺ'র উপর পড়ল। তিনি হাউযে কাউসারের পাশে বসে আছেন আর হাসান ও হোসাইন (রা.) লোকদেরকে পানি পান করাচ্ছিলেন। আমিও তাদের কাছে গিয়ে পানি চাইলাম কিন্তু আমাকে পানি দিলেন না। আমি রাসূল ﷺএর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি একটু বলুন, যেন আমাকে পানি দেন। তিনি বললেন, তোমাকে পানি দেবে না। আমি আরয করলাম কেন? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তোমার এক প্রতিবেশী আলীকে গালী দিত আর তুমি তাকে বারণ করতে না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি প্রাণের ভয়ে তাকে বারণ করতাম না। রাসূল ﷺ আমাকে একটি ছুরি দিয়ে বলেন, যাও, তাকে হত্যা করে এসো। আমি স্বপ্নের মধ্যেই গিয়ে তাকে হত্যা করেছি এবং রাসূল ﷺ'র খেদমতে ফিরে এসে বলেছি, আপনার আদেশ পালন করেছি। তখন তিনি বললেন, হে হাসান! তাকে পানি দাও। হযরত হাসান (রা.) আমাকে পানির পাত্র দিয়েছেন কিন্তু আমার মনে নেই আমি পানি পান করেছি কিনা। ইত্যবসরে আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম। আমি ভীত অবস্থায় উযূ করে নামায পড়তে আরম্ভ করলাম। সকালে লোকেরা হৈ চৈ করে বলতে লাগল অমুক ব্যক্তিকে রাতে ঘুমের মধ্যে কে এসে হত্যা করে দিল। প্রশাসনের লোকজন এসে নির্দোষ প্রতিবেশীদেরকে ধরে নিয়ে গেল। আমি মনে মনে বললাম, সুবহানাল্লাহ! এই স্বপ্নতো আমিই দেখেছিলাম যা আল্লাহ তায়ালা সত্য প্রমাণিত করে দিলেন। তারপর আমি হাকেমের কাছে গিয়ে আমার স্বপ্নের কথা বিস্তারিত বললে নিরাপরাধ লোকদের ছেড়ে দিলেন।[৮৮২]

৮৮১. আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, পৃ-২৯৭
৮৮২. আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, পৃ-২৯৮।

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর ফযিলত

সকল সাহাবী জান্নাতী। তবে রাসূল ﷺ নির্দিষ্ট করে দশজন বিশিষ্ট সাহাবীকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيدٌ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, সাঈদ ইবনে যায়েদ এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ জান্নাতী।[৮৮৩]

عن ابى ذر قال دخل رسول الله ﷺ منزل عائشة فقال يا عائشة الا ابشرك ؟ قالت بلى يا رسول الله قال ابوك فى الجنة ورفيقه ابراهيم وعمر فى الجنة ورفيقه نوح وعثمان فى الجنة ورفيقه انا وعلى فى الجنة ورفيقه يحى بن زكريا وطلحة فى الجنة ورفيقه داؤد والزبير فى الجنة ورفيقه اسماعيل وسعد بن ابى وقاص فى الجنة ورفيقه سليمان بن داؤد وسعيد بن زيد فى الجنة ورفيقه موسى بن عمران وعبد الرحمن بن عوف فى الجنة ورفيقه عيسى بن مريم وابو عبيد بن الجراح فى الجنة ورفيقه ادريس عليه السلام ثم قال يا عائشة أنا سيد المرسلين وابوك افضل الصديقين وأنت ام المؤمنين .

হযরত আবু যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)'র ঘরে প্রবেশ করে বলেন, হে আয়েশা! আমি কি তোমাকে সুসংবাদ দেবো না? আয়েশা (রা.) বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই দেবেন হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল ﷺ বললেন, তোমার পিতা জান্নাতে যাবে এবং জান্নাতে তাঁর সঙ্গী হবেন ইব্রাহীম (আ). ওমর জান্নাতে যাবে আর জান্নাতে তাঁর সঙ্গী হবেন নূহ (আ.), ওসমান জান্নাতে যাবে জান্নাতে তাঁর সঙ্গী হবো আমি। আলী জান্নাতে যাবে, জান্নাতে তাঁর সঙ্গী হবেন ইয়াহিয়া ইবনে যাকারিয়া (আ.)। তালহা জান্নাতে যাবে, জান্নাতে তার সঙ্গী হবেন দাউদ (আ.)। যুবাইর জান্নাতে যাবে আর তাতে তার সঙ্গী হবেন ইসমাইল (আ.)। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস জান্নাতে যাবে তাঁর সঙ্গী হবেন সোলাইমান ইবনে দাউদ। সাঈদ ইবনে যায়েদ জান্নাতে যাবে তার সঙ্গী হবেন মুসা ইবনে ইমরান। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ জান্নাতে

[৮৮৩]. ইমাম আহমদ, তিরমিযী, বগভী (র) মাসাবীহ গ্রন্থে, সূত্র: আর রিয়াদুন নদ্বরাহ খণ্ড. ১ পৃষ্ঠা-৩৫

যাবে তার সঙ্গী হবেন ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ জান্নাতে যাবে তার সঙ্গী হবেন ইদ্রিস (আ.)। অতঃপর বললেন, হে আয়েশা! আমি হলাম সাইয়্যেদুল মুরসালীন তথা সকল নবী রাসূলগণের সর্দার আর তোমার পিতা হল সিদ্দীকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তুমি হলে মু'মিনদের মাতা।[৮৮৪]

এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ

▪ মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী (র.)	৫ জমাদিউস সানি ৬৭২ হিজরি
▪ ইমাম গাজ্জালী (র.)	১৪ জমাদিউস সানি ৫০৫ হিজরি
▪ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)	২২ জমাদিউস সানি ১৩ হিজরি
▪ হযরত খাজা বাকিবিল্লাহ (র.)	২৫ জমাদিউস সানি ১০২২ হিজরি

[৮৮৪]. মুহিব্বুদ্দিন তিবরী (র) (৬৯৪ হি.), আর রিয়াদুন নাদ্বরাহ, খণ্ড. ১, পৃ. ৩৫

রজব

রজব মাস হল আশহুরুল হুরুম তথা সম্মানিত চার মাসের অন্যতম মাস। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির দিন হতে কাল আপন অবস্থায় আবর্তিত হচ্ছে। বার মাসে এক বছর। তন্মধ্যে চারটি মাস হল সম্মানিত মাস। তিনটি যথা যুলকদ, যুল হাজ্জাহ ও মুহররম মাস হল ধারাবাহিক আর অপরটি হল রজব মাস যাকে মুদ্বর মাসও বলা হয়। এটি জমাদিউস সানী ও শাবান মাসের মধ্যখানে অবস্থিত।[৮৮৫]

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– إِنَّ رَجَبَ شَهْرُ اللَّهِ وَيُدْعَى الْأَصَمَّ، وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ يُعَطِّلُونَ أَسْلِحَتَهُمْ وَيَضَعُونَهَا، فَكَانَ النَّاسُ يَأْمَنُونَ وَتَأْمَنُ السُّبُلُ، وَلَا يَخَافُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَنْقَضِيَ নিশ্চয় রজব মাস হল আল্লাহর মাস। এ মাসকে বধির মাস বলা হয়। জাহেলী যুগের লোকেরা রজব মাস আসলে তাদের যুদ্ধাস্ত্র অকেজো এবং নষ্ট করে ফেলত। ফলে লোকেরা নিরাপদে বসবাস করতো এবং যাতায়াত পথও নিরাপদ থাকত। রজব মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত পরস্পর পরস্পরকে ভয় করতো না।[৮৮৬] অর্থাৎ রজব মাসের সম্মানার্থে জাহেলী যুগের লোকেরা যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ রাখতো ফলে মানুষ নিরাপদে বসবাস এবং যেখানে সেখানে যাতায়াত করতে পারতো। রজব মাসের ফযিলত সম্পর্কে নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ: رَجَبٌ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ নিশ্চয় জান্নাতে একটি নদী আছে যার নাম রজব। এই নদীর পানি দুধের চেয়েও শুভ্র এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। যে ব্যক্তি রজব মাসে একদিন রোযা রাখবে আল্লাহ তায়ালা তাকে ঐ নদীর পানি পান করাবেন।[৮৮৭]

নবী করিম ﷺ আরো বলেন– مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ كَانَ كَصِيَامِ سَنَةٍ، وَمَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ غُلِّقَتْ عَنْهُ سَبْعَةُ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ صَامَ

৮৮৫. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী, ইবনে রজব (র.), লাতায়েফুল মাআরিফ, খণ্ড-১, পৃ-১৮৪, ও ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি) ফাযায়েলুল আওয়কাত, পৃ-৮০, হাদিস নং-১

৮৮৬. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), ফাযায়েলুল আওকাত, পৃ-৮৫

৮৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৯০, হাদিস নং-৮

عَشَرَةَ أَيَّامٍ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، وَمَنْ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا سَلَفَ فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكَ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ» وَفِي رَجَبٍ حُمِلَ نُوحٌ فِي السَّفِينَةِ، فَصَامَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَمَرَ مَنْ مَعَهُ أَنْ يَصُومُوا وَجَرَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِلَى آخِرِ ذَلِكَ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنَ الْمُحَرَّمِ যে ব্যক্তি রজব মাসে একদিন রোযা রাখবে সে যেন এক বছর রোযা রাখল। আর যে ব্যক্তি সাত দিন রোযা রাখবে তার জন্য জাহান্নামের সাতটি দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি আটদিন রোযা রাখবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি দশটি রোযা রাখবে সে আল্লাহর কাছে যা চাইবে তা দেবেন। যে ব্যক্তি পনের দিন রোযা রাখবে আসমান থেকে এক আহবানকারী আহবান করবে– তোমার পূর্ববর্তী সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তুমি এখন নতুন করে আমল আরম্ভ কর। তোমার পাপসমূহকে পূণ্যে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়েছে। আর যে ব্যক্তি আরো বেশী রোযা রাখবে ও আমল করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে আরো বাড়িয়ে দেবেন। রজব মাসেই হযরত নূহ (আ.) নৌকায় আরোহণ করেছিলেন। তখন তিনি নিজেই রোযা রেখেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গীদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ দেন। তাদেরকে নিয়ে নৌকা ছয় মাস চলার পর মুহররমের দশ তারিখে মুক্তি লাভ করেন।[৮৮৮]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «خِيرَةُ اللَّهِ مِنَ الشُّهُورِ شَهْرُ رَجَبٍ، وَهُوَ شَهْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَنْ عَظَّمَ شَهْرَ رَجَبٍ فَقَدْ عَظَّمَ أَمْرَ اللَّهِ، وَمَنْ عَظَّمَ أَمْرَ اللَّهِ أَدْخَلَهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَأَوْجَبَ لَهُ رِضْوَانَهُ الْأَكْبَرَ، وَشَعْبَانُ شَهْرِي فَمَنْ عَظَّمَ شَهْرَ شَعْبَانَ، فَقَدْ عَظَّمَ أَمْرِي، وَمَنْ عَظَّمَ أَمْرِي كُنْتُ لَهُ فَرَطًا وَذُخْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ أُمَّتِي، فَمَنْ عَظَّمَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَعَظَّمَ حُرْمَتَهُ وَلَمْ يَنْتَهِكْهُ وَصَامَ نَهَارَهُ وَقَامَ لَيْلَهُ وَحَفِظَ جَوَارِحَهُ خَرَجَ مِنْ رَمَضَانَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ يَطْلُبُهُ اللَّهُ بِهِ» রজব মাস। এটি আল্লাহর মাস। যে ব্যক্তি এ মাসকে সম্মান করবে সে আল্লাহর আদেশকে সম্মান করল। আর যে আল্লাহর আদেশকে সম্মান করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতুন নাঈম নামক বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাবেন এবং তার জন্য আল্লাহর সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি আবশ্যক হবে। শাবান আমার মাস। যে ব্যক্তি শাবান মাসকে সম্মান করবে আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য নাজাতের উসীলা হবো। আর রমযান মাস হল আমার উম্মতের মাস। যে ব্যক্তি রমযান মাসকে সম্মান করবে, রমযান মাসের সম্মান অক্ষুন্ন

৮৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ-৯৩, হাদিস নং-৯

রাখবে, দিনের বেলায় রোযা রাখবে আর রাতের বেলায় নামায পড়বে আর রমযান মাসের যাবতীয় করণীয় কার্যক্রমকে সংরক্ষণ করবে রমযান মাস চলে যাবে কিন্তু তার মধ্যে এমন কোন গুনাহ থাকবে না যা সম্পর্কে আল্লাহ পাকড়াও করবেন।[৮৮৯]

হযরত সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– **فِي رَجَبٍ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَقَامَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ كَانَ كَمَنْ صَامَ مِنَ الدَّهْرِ مِائَةَ سَنَةٍ** রজব মাসে এমন একটি দিন ও রাত রয়েছে সে দিনে রোযা রাখলে এবং সে রাতে নামায পড়লে একশত বছর রোযা ও একশত বছর নামাযের সাওয়াব পাবে। আর সে দিনটি হল ২৭শে রজব। এ দিনেই আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ ﷺ এর নবুয়ত প্রকাশ করেছেন।[৮৯০]

হযরত আনাস (রা.) নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন–তিনি বলেন– **فِي رَجَبٍ لَيْلَةٌ يُكْتَبُ لِلْعَامِلِ فِيهَا حَسَنَاتُ مِائَةِ سَنَةٍ وَذَلِكَ لِثَلَاثٍ بَقِينَ مِنْ رَجَبٍ فَمَنْ صَلَّى فِيهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، مِائَةَ مَرَّةٍ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ، وَيُصْبِحُ صَائِمًا، فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءَهُ كُلَّهُ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ فِي مَعْصِيَةٍ** রজব মাসে এমন একটি রাত রয়েছে, সে রাতে ইবাদতকারী একশত বছর ইবাদত করার সমান নেকী অর্জন করবে। আর সে রাতটি হল ২৭শে রজব। যে ব্যক্তি সে রাতে ১২ রাকাত নামায পড়বে, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোন একটি সূরা পাঠ করবে। অতঃপর একশত বার "সুবাহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবর" পড়বে এবং একশত বার ইস্তেগফার পড়বে ও নবী করিম ﷺ এর উপর একশত বার দুরূদ শরীফ পড়বে এবং সে নিজের জন্য দুনিয়া-আখিরাতের যা ইচ্ছে দোয়া করবে আর পরের দিন রোযা রাখবে আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহের দোয়া ব্যতীত সব দোয়া কবুল করবেন।[৮৯১]

হযরত আবু কিলাবা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– **فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ لِصُوَّامِ رَجَبٍ** রজব মাসে রোযা পালনকারীর জন্য জান্নাতে একটি মহল রয়েছে।[৮৯২]

[৮৮৯]. প্রাগুক্ত, পৃ-৯৫, হাদিস নং-১০
[৮৯০]. প্রাগুক্ত, পৃ-৯৬, হাদিস নং-১১
[৮৯১]. প্রাগুক্ত, পৃ-৯৭, হাদিস নং-১২
[৮৯২]. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), শুআবুল ঈমান, ৩/৩৬৮, সূত্র: লাতায়েফুল মাআরিফ, খণ্ড-১, পৃ-১৯৫

قال ابو بكر الوراق البلخى شهر رجب شهر الزرع وشهر شعبان شهر السقى للزرع وشهر رمضان حصاد الزرع وعنه قال مثل رجب مثل الريح ومثل شعبان مثل الغيم ومثل رمضان مثل المطر

আবু বকর ওয়াররাক বালখী (রা.) বলেন– রজব মাস হলো বীজ বপনের মাস, শাবান হলো ক্ষেতে পানি দেওয়ার মাস আর রমযান মাস হল ফসল কাটার মাস। তিনি আরো বলেন– রজব মাস হল বাতাসের ন্যায় এবং শাবান মাস হল মেঘের তুল্য আর রমযান হল বৃষ্টির তুল্য।[৮৯৩]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রজব মাস আগমন করতো তখন নবী করিম ﷺ বলতেন, হে আল্লাহ! রজব ও শাবান মাসকে আমাদের জন্য বরকত মণ্ডিত করুন আর আমাদেরকে রমযান মাস নসীব করুন।[৮৯৪]

মি'রাজ

মি'রাজ সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ'র অন্যতম বিস্ময়কর শ্রেষ্ঠ মু'জিযা, যা অন্য কোন নবী রাসূলের ভাগ্যে জুটেনি। মি'রাজ অর্থ হলো ঊর্ধ্ব গমনের সিঁড়ি। মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্সা পর্যন্ত ভ্রমণকে বলা হয় আসরা যা পবিত্র কুরআন মজীদ দ্বারা প্রমাণিত। এটাকে বিশ্বাস করা আবশ্যক এবং অস্বীকার করা কুফরী আর অস্বীকারকারী হবে কাফির। মসজিদে আকসা থেকে সপ্ত আসমান পর্যন্ত ভ্রমণ মুতাওয়াতির কিংবা মশহুর হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত বিধায় এটার অস্বীকারকারী হবে বিদআতী ও ফাসিক। লা মকান পর্যন্ত ভ্রমণ এবং মি'রাজের বিভিন্ন আশ্চর্যজনক ঘটনাসমূহ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সাব্যস্ত তাই ঐগুলোর অস্বীকারকারী মূর্খ, বঞ্চিত ও হতভাগা হিসেবে বিবেচিত হবে।[৮৯৫]

মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণকে বলা হয় আসরা। মসজিদে আকসা তথা বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে সপ্ত আসমান পর্যন্ত ভ্রমণকে বলা হয় মি'রাজ আর আসমান থেকে 'কাবা কাউসাইন' পর্যন্ত ভ্রমণকে বলা হয় ইরাজ।[৮৯৬] মসজিদে হারাম

[৮৯৩]. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫ হি), লাতায়েফুল মাআরিফ, খণ্ড-১, পৃ-২০০
[৮৯৪]. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), ফাযায়েলুল আওকাত, পৃ-১০০, হাদিস নং-১৫
[৮৯৫]. আল্লামা তাফতাযানী (র.) (৭৯১ হি), শরহে আকাঈদে নসফী, পৃ. ১০৪-১০৫, করাচী ও শায়খ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), মাদারিজুন্নুবুয়্যত, খণ্ড-১, পৃ-১৮৯
[৮৯৬]. খাজা নিজামউদ্দীন দেহলভী (র.) (৭২৫ হি), ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ, খণ্ড-৪, পৃ-৩৫০

থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সূরা বনী ইসরাঈলের শুরুতে বর্ণনা দিয়ে বলেন– سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ। পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বিশেষ বান্দাকে রাত্রির কিছু অংশে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি– যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী, দর্শনশীল।[৮৯৭]

যে কোন ভ্রমণ কাহিনীতে সাধারণত সাতটি বিষয়ের উল্লেখ থাকে। যথা– ১. ভ্রমণ কে করায়েছেন? ২. ভ্রমণ কে করেছেন? ৩. ভ্রমণ কোথা হতে করলেন? ৪. ভ্রমণ কোথা পর্যন্ত করলেন? ৫. ভ্রমণ কখন করেছেন? ৬. ভ্রমণ কতক্ষণ সময় পর্যন্ত করেছেন? ও ৭. ভ্রমণ কি উদ্দেশ্যে করলেন?

আল্লাহ তায়ালা উপরোক্ত আয়াতে সবগুলো উল্লেখ করেছেন। ১. সুবহান তথা পুত-পবিত্র মহান আল্লাহ তায়ালা ভ্রমণ করায়েছেন। ২. ভ্রমণ তাঁর বিশেষ বান্দা মুহাম্মদ ﷺ করেছেন। ৩. মসজিদে হারাম থেকে ভ্রমণ করেছেন। ৪. মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন। ৫. রাতের বেলায় ভ্রমণ করেছেন। ৬. রাত্রে মাত্র অল্প সময়ে এবং ৭. আল্লাহর নির্দশন দেখানোর উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করানো হয়েছে।

সুবহান শব্দের অর্থ হলো আল্লাহ সমস্ত অসম্ভব থেকে পাক ও মুক্ত। অর্থাৎ তাঁর জন্য অসম্ভব বলতে কিছুই নেই। মুহূর্তের মধ্যে বাইতুল মোকাদ্দাস, সপ্ত আসমান ও লা মকান পর্যন্ত যাওয়া-আসা এবং জান্নাত-জাহান্নামসহ আল্লাহর অসংখ্য কুদরতী নির্দশন পরিদর্শন করা কোন মাখলুকের জন্য অসম্ভব হলেও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর জন্য মোটেই অসম্ভব নয়। তাই তিনি মি'রাজের ঘটনা সুবহান শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেন।

মি'রাজের ঘটনায় بعبده বলার কারণ

মি'রাজের ঘটনায় আল্লাহ তায়ালা برسوله না বলে بعبده বলার কারণ হলো– রাসূল বলা হয় যিনি আল্লাহর নিকট থেকে বান্দার নিকট আগমন করেন পক্ষান্তরে 'আবদুন' বলা হয় যিনি বান্দাদের নিকট থেকে আল্লাহর নিকট গমন করেন। এখানে আল্লাহর নিকট থেকে আসা নয় বরং আল্লাহর নিকট যাওয়ার ব্যাপার, তাই এখানে بعبده বলা হয়েছে। এর দ্বিতীয় কারণ হলো রাসূল ﷺ এর এই বিরাট মর্যাদা প্রাপ্তির কারণ হলো উবুদিয়ত। অর্থাৎ বান্দা যখন আল্লাহর নিকট বিনয়ী হয় তখন আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তৃতীয় কারণ হলো রাসূল ﷺ'র এই মর্যাদা দেখে যেন কেউ তাঁকে খোদা বা

[৮৯৭]. সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত-১

খোদার সন্তান না বলে। যেভাবে হযরত ঈসা (আ.)কে আসমানে তুলে নেয়ার কারণে ঈসায়ীরা তাঁকে খোদা বলে গোমরাহ হয়েছিল।

চতুর্থ কারণ হলো 'আবদ' বলার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মি'রাজ ঘুমে, স্বপ্নে বা রূহানীভাবে নয় বরং জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মি'রাজ হয়েছিল। কারণ আবদ বলা হয় শরীর ও রূহ উভয়ের সমষ্টিকে। কেবল রূহের উপর আবদ এর ব্যবহার হয়না। মি'রাজ সংঘটিত হয় বিশুদ্ধ মতানুযায়ী হিজরতের এক বছর পূর্বে রজব মাসের ২৬ তারিখ দিবাগত ২৭ তারিখ রাতে।

ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ (র.) এর বর্ণনা মতে মি'রাজ হাতীমে কা'বা থেকে আরম্ভ হয়েছিল। ইমাম নাসাঈ'র অন্য বর্ণনা মতে এবং ইমাম আবু ইয়ালা ও ইমাম তাবরানীর বর্ণনা মতে হযরত উম্মে হানী বিনতে আবু তালেবের ঘর থেকে হয়েছে। উভয় বর্ণনার মধ্যে সমাধান হলো, তিনি প্রথমে উম্মে হানীর ঘরে শুয়ে ছিলেন অতঃপর সেখান থেকে উঠে হাতীমে কাবায় চলে যান এবং সেখান থেকেই মি'রাজ আরম্ভ হয়। কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে নিজের ঘর থেকে মি'রাজ হয়েছে। এ উত্তর হল উম্মে হানী হল তাঁর চাচাত বোন সুতরাং নিসবতের কারণে উম্মে হানীর ঘরকে নিজের ঘর বলেছেন। মি'রাজের ব্যাপারে তিনটি প্রসিদ্ধ মত পরিলক্ষিত হয়। ১. মি'রাজ ছিল রূহানী এবং তা স্বপ্নে হয়েছিল। ২. মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত জাগ্রত অবস্থায় আর বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে আসমান পর্যন্ত রূহানী মি'রাজ ছিল। ৩. অধিকাংশ ওলামাদের মতে রাসূল ﷺ'এর সর্বস্থরের মি'রাজ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে হয়েছিল। অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা, মুতাকাল্লিমীন ও মুফাস্‌সিরীণগনের মত এটিই।[৮৯৮]

রাসূল ﷺএর মি'রাজ হয়েছিল ৩৪বার। তম্মধ্যে একবার সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় আর বাকীগুলো স্বপ্নে রূহানীভাবে হয়েছিল।[৮৯৯] রূহুল বয়ান গ্রন্থে উল্লেখ আছে- قال الشيخ الاكبر قُدس سره اَنَّ معراجه عليه السلام اربع وثلاثون مرَّةً واحدةً بجسده والباقى بروحه শেখে আকবর কুদ্দিসা সিররূহু বলেন– রাসূল ﷺ'র মি'রাজ হয়েছিল ৩৪বার তম্মধ্যে একবার হয়েছিল সশরীরে বাকীগুলো রূহানীভাবে।[৯০০]

সশরীরে মিরাজের দলীল

১. মি'রাজের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা عبده বলেছেন, 'আবদুন' শব্দটি শরীর ও রূহ উভয়ের সমষ্টিকে বুঝায়। ২. আয়াতে اسرى বলা হয়েছে। আর اسرى বলা হয় রাতের

[৮৯৮]. কাযী আয়ায (র.) (৫৪৪ হি), শেফা শরীফ, পৃ-১১৩ ও আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), মাদারিজুন নবুয়্যত, খণ্ড-১, পৃ-১৮৯

[৮৯৯]. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), মাদারিজুন নবুয়্যত, খণ্ড-১, পৃ-১৯০

[৯০০]. জালালাইন শরীফের প্রান্তটীকা, পৃ-২২৮ ও আল্লামা আলী ইবনে বুরহান উদ্দীন হালভী (র.) (১৪০৪ হি), সীরাতে হালভীয়্যা, পৃ-৪০৪

ভ্রমণকে। তাও রূহের জন্য ব্যবহার হয়না। ৩. হাদিস শরীফে বুরাক নামক বাহনের কথা বলা হয়েছে। বাহন প্রয়োজন হয় শরীরের জন্য, রূহের জন্য নয়। ৪. রূহানী মি'রাজ হলে এটি এক বিরাট মু'জিযা হতোনা। কারণ রূহানী মি'রাজ বহুবার হয়েছে এবং এটা অসম্ভব কিছু নয়। ৫. রূহানী মি'রাজ হলে কাফিররা অবিশ্বাস করতোনা এবং একদল দুর্বল মু'মিন মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হতোনা। শারিরীক মি'রাজের কথা শুনে তারা এটাকে অসম্ভব মনে করে পথভ্রষ্ট হয়েছিল। পক্ষান্তরে আবু বকর (রা.) তা অকপটে বিশ্বাস করার কারণে সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত হন। ৬. আল্লাহ তায়ালা সূরা নাজমের ১৭নং আয়াতে এ সম্পর্কে বলেন- مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং সীমালঙ্ঘন করেনি। উক্ত আয়াতে البصر শব্দটি দ্বারা বাহ্যিক চোখের কথা বলা হয়েছে, অন্তরের চোখের কথা নয়।[৯০১] ৭. বাইতুল মোকাদ্দাসে সকল নবীগণের ইমামতি করা শারিরীক মি'রাজের প্রমাণ বহন করে।

পবিত্র কুরআনে মি'রাজকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সীমারেখা নির্ধারণের কারণ

পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মসজিদে আকসা পর্যন্ত মি'রাজ হয়েছে। এর দ্বারা আসমান ও লা মকান পর্যন্ত মি'রাজ অস্বীকার করা যাবেনা। কারণ এগুলো এমন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যেগুলোর বর্ণনাকারী ৩১জন সাহাবী। ইমাম সুয়ূতী (র.) খাসায়েসুল কোবরা গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ২৫২ পৃষ্ঠায় এদের নামসহ উল্লেখ করেছেন। আর পবিত্র কুরআনে শুধু মসজিদে আকসার কথা উল্লেখ করার কারণ হলো মক্কার কাফিররা মসজিদে আকসা দেখেছিল এবং এর সম্পর্কে তাদের অনেকের জ্ঞান ছিল। এ কারণেই মি'রাজের ঘটনা শুনার পর তারা রাসূল ﷺ'র নিকট এর কিছু নিদর্শন বর্ণনার দাবী করে। আর তিনি তার সঠিক বর্ণনা দিলে তারা অন্তত মনে মনে হলেও মি'রাজ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। যদি এত অল্প সময়ে এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম হয় তাহলে আসমানে ভ্রমণ করাও সম্ভব।

মি'রাজের ঘটনার বর্ণনা বিভিন্ন হওয়ার কারণ

মি'রাজের ঘটনা একত্রিশ জন সাহাবী থেকে হাদিসের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। কোন বর্ণনায় পরিপূর্ণভাবে মি'রাজের ঘটনা উল্লেখ করা হয়নি। বুখারীর কোন বর্ণনায় মসজিদে আকসা যাওয়ার কথা উল্লেখ নেই বরং এর উল্লেখ করেছেন ইমাম মুসলিম ও নাসাঈ (র.)। কোন বর্ণনায় বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনার উল্লেখ নেই। এবং কোন কোন বর্ণনায় বুরাকে আরোহণের কথা উল্লেখ নেই। এভাবে হযরত মুসা (আ.)কে কবরে

[৯০১]. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ কুরতুবী (র.) (৬৬৮ হি.), আহকামুল কুরআন, খণ্ড. ১০, পৃ. ২০৮

দেখার কথা ইমাম বুখারী উল্লেখ করেননি বরং এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম, নাসাঈ এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ। সিহাহ সিত্তাহর বর্ণনায় বরযখের ঘটনা দেখার উল্লেখ নেই বরং এগুলো ইমাম বায়হাকী, ইবনে জারীর, হাকিম, ইবনে কাসীর, আল্লামা হালভীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন। বর্ণনার মতভেদের কারণ হলো রাসূল ﷺ বহুবার বহু সাহাবায়ে কিরামের সামনে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা দিয়েছেন। প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। ফলে রেওয়ায়েতে মতবিরোধ ও ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।

মি'রাজের ধারাবাহিক ঘটনা

বুখারী শরীফে মালিক ইবনে সা'সা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর নবী মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- একদিন আমি কা'বা ঘরের হাতিমের অংশে কিংবা হাজরে আসওয়াদের পাশে শুয়েছিলাম। হঠাৎ একজন আগন্তুক আমার নিকট এলেন এবং আমার হলকুমের নিম্নদেশ থেকে নাভী পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন। তারপর আগন্তুক আমার হৃদপিণ্ড বের করলেন। তারপর আমার নিকট একটি স্বর্ণের পাত্র আনা হল যা ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। তারপর আমার হৃদপিণ্ডটি (যমযমের পানি দ্বারা) ধৌত করা হলো এবং ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে যথাস্থানে পুনরায় রেখে দেয়া হলো। তারপর সাদা রঙের একটি বাহন আমার নিকট আনা হলো যা আকারে খচ্চর থেকেও ছোট ও গাধা থেকে বড় ছিল। জারুদ বললেন- হে আবু হামযা! এটিই কি বুরাক? হযরত আনাস (রা.) বললেন, হ্যাঁ। সেটি একেক কদম রাখে দৃষ্টির শেষ প্রান্তে। আমাকে তার উপর সওয়ার করানো হলো। তারপর আমাকে নিয়ে জিব্রাইল (আ.) চললেন। প্রথম আসমানে নিয়ে দরজা খুলতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা হলো কে? তিনি বললেন, জিব্রাইল, আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, তাকে কি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন বলা হলো তাঁর জন্য খোশ আমদেদ, উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তারপর আসমানের দরজা খুলে দেয়া হলো। আমি সেখানে পৌঁছে আদম (আ.)'র সাক্ষাত পেলাম। জিব্রাইল (আ.) বললেন, ইনি আপনার আদি পিতা আদম (আ.), তাকে সালাম করুন। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেককার পুত্র ও নেককার নবীর প্রতি খোশ আমদেদ। তারপর দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হলো কে? তিনি বললেন, জিব্রাইল। জিজ্ঞাসা করা হলো আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হলো তাকে কি আমন্ত্রণ করা হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, তারপর বলা হলো তার জন্য খোশ আমদেদ, উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তারপর দরজা খুলে দেওয়া হলো। যখন তথায় পৌঁছলাম, তখন সেখানে

ইয়াহিয়া ও ঈসা (আ)'র সাক্ষাত পেলাম। তারা দু'জন ছিলেন পরস্পরের খালাত ভাই। জিব্রাইল (আ.) বললেন, এরা হলেন ইয়াহিয়া ও ঈসা (আ.)। তাঁদেরকে সালাম করুন। তখন আমি তাঁদের সালাম করলাম। তাঁরা উত্তর দিলেন। তারপর বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি খোশ আমদেদ। এরপর তিনি আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে গেলেন। সেখানে পৌঁছে জিব্রাইল (আ.) বললেন, দরজা খুলে দাও। তাকে বলা হলো কে? তিনি বললেন, জিব্রাইল। জিজ্ঞাসা করা হলো আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হলো তাঁকে কি আমন্ত্রণ করা হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, তারপর বলা হলো তাঁর জন্য খোশ আমদেদ, উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তারপর দরজা খুলে দেওয়া হলো। আমি সেখানে পৌঁছে ইউসূফ (আ.)কে, দেখতে পেলাম। জিব্রাইল (আ.) বললেন, ইনি ইউসূফ (আ.) তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনিও জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্কার ভাই, নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তারপর আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানে পৌঁছলেন আর দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হলো কে? তিনি বললেন, জিব্রাইল। জিজ্ঞাসা করা হলো আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হল তাঁকে কি আমন্ত্রণ করা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন বলা হলো তাঁর প্রতি খোশ আমদেদ, উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। দরজা খুলে দেয়া হলো। আমি ইদ্রিস (আ.)এর কাছে পৌঁছলে জিব্রাইল (আ.) বললেন, ইনি ইদ্রিস (আ.) তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনিও জবাব দিলেন। তারপর বললেন, নেককার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি খোশ আমদেদ। এরপর জিব্রাইল (আ.) আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিব্রাইল। জিজ্ঞাসা করা হল আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হল তাঁকে কি আমন্ত্রণ করা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন বলা হলো তাঁর প্রতি খোশ আমদেদ, উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তথায় পৌঁছে হারুন (আ.) কে পেলাম। জিব্রাইল (আ.) বললেন, ইনি হারুন (আ.) তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, তিনিও জবাব দিলেন এবং বললেন নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি খোশ আমদেদ। তারপর আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিব্রাইল। জিজ্ঞাসা করা হল আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হল তাঁকে কি আমন্ত্রণ করা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ফেরেশ্‌তারা বললেন, তাঁর প্রতি খোশ আমদেদ। উত্তম আগন্তুক এসেছেন। সেখানে আমি মূসা (আ.) কে পেলাম। জিব্রাইল (আ.) বললেন ইনি মূসা (আ.), তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, তিনিও জবাব দিলেন এবং

বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি খোশ আমদেদ। আমি যখন অগ্রসর হলাম তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন, আমি এজন্য কাঁদছি যে, আমার পর একজন যুবককে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। যাঁর উম্মত আমার উম্মত থেকে অধিক সংখ্যায় জান্নাতে যাবে। তারপর জিব্রাইল (আ.) আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানে পৌঁছেন এবং দরজা খুলে দিতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিব্রাইল। জিজ্ঞাসা করা হল আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হল তাঁকে কি আমন্ত্রণ করা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো তাঁর প্রতি খোশ আমদেদ। উত্তম আগন্তুকের আগমন হয়েছে। সেখানে ইব্রাহিম (আ.)কে দেখতে পেলাম। জিব্রাইল (আ.) বললেন, ইনি আপনার পিতা তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন নেক্কার পুত্র ও নেক্কার নবীর প্রতি খোশ আমদেদ। তারপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত উঠানো হলো। দেখতে পেলাম উহার ফল হাজর এলাকার মোটকার ন্যায় এবং পাতাগুলো হাতির কানের মত। আমাকে বলা হলো এ হলো সিদরাতুর মুনতাহা (যা জড় জগতের শেষ প্রান্ত) সেখানে আমি চারটি নহর দেখতে পেলাম যাদের দু'টি ছিল অপ্রকাশ্য আর দু'টি ছিল প্রকাশ্য। আমি জিব্রাইল (আ.)কে জিজ্ঞাসা করলাম। এ নহরগুলো কী? উত্তরে বললেন, অপ্রকাশ্য দু'টি হলো জান্নাতের দু'টি নহর আর প্রকাশ্য দু'টি হলো নীল নদী ও ফুরাত নদী। তারপর আমার সামনে বায়তুল মামুর প্রকাশ করা হলো। এরপর একটি শরাবের পাত্র, একটি দুধের পাত্র ও একটি মধুর পাত্র পরিবেশন করা হলো। আমি দুধের পাত্র গ্রহণ করলাম। তখন জিব্রাইল (আ.) বললেন, এটি হল ফিতরাত তথা দ্বীন-ই-ইসলাম। আপনি ও আপনার উম্মতগণ এর উপর প্রতিষ্ঠিত। তারপর আমার উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হলো। আমি ফিরে আসার সময় মুসা (আ.)এর পাশ দিয়ে আসার প্রাক্কালে তিনি বললেন– আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কি আদেশ করেছেন? আমি বললাম, আমাকে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের আদেশ করা হয়েছে। মূসা (আ.) বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায়ে সক্ষম হবে না। আল্লাহর কসম, আমি আপনার আগের লোকদের পরীক্ষা করেছি এবং বনী ইসরাইলের হেদায়তের জন্য অনেক পরিশ্রম করেছি। তাই আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের বোঝা হাল্কা করার জন্য আবেদন করুন। আমি ফিরে গেলাম। ফলে দশওয়াক্ত সালাত হ্রাস করে দিলেন। আমি আবার মূসা (আ.)'র নিকট ফিরে এলাম। তিনি আবার আগের মত বললেন, আমি পুনরায় ফিরে গেলাম। ফলে আল্লাহ দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দিলেন। ফিরার পথে মূসা (আ.)এর নিকট পৌঁছলে তিনি আবার পূর্বোক্ত কথা বললেন,

আমি আবার ফিরে গেলাম। আল্লাহ তায়ালা আরো দশওয়াক্ত সালাত হ্রাস করলেন। আমি মূসা (আ.)এর নিকট ফিরে এলাম। তিনি আবার ঐ কথা বললেন, আমি আবার ফিরে গেলাম। তখন আমাকে দৈনিক দশওয়াক্ত সালাতের আদেশ দেওয়া হল। আমি তা নিয়ে ফিরে এলাম। এবারও মূসা (আ.) আগের মত বললেন, আমি আবার ফিরে গেলাম তখন আমাকে পাঁচওয়াক্ত সালাতের আদেশ দেওয়া হল। তারপর মূসা (আ.)এর নিকট ফিরে এলাম। তিনি বললেন আমাকে কি আদেশ করা হয়েছে? আমি বললাম আমাকে দৈনিক পাঁচওয়াক্ত সালাত আদায়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে। মূসা (আ.) বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে সক্ষম হবে না। আপনার পূর্বে আমি লোকদের পরীক্ষা করেছি। বনী ইসরাইলের হেদায়তের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি। আপনি আপনার প্রভুর নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরো সহজ করার আবেদন করুন। রাসূল ﷺ বললেন, আমি আমার প্রভুর নিকট অনেক বার আবেদন করেছি, এতে আমি লজ্জাবোধ করছি। আর আমি এতেই সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তা মেনে নিয়েছি। এরপর তিনি বললেন, আমি যখন মূসা (আ.)কে অতিক্রম করে অগ্রসর হলাম, তখন জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিলেন, আমি আমার অবশ্য পালনীয় আদেশটি জারি করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের উপর লঘু করে দিলাম।[৯০২]

উপরোক্ত হাদিস শরীফে আসমানের ফেরেশতা কর্তৃক হযরত জিব্রাইল (আ.)ও রাসূল ﷺ'র পরিচয় জিজ্ঞাসা করা অপরিচিতের কারণে নয় বরং তাযীম ও সম্মানার্থে ছিল।

বাইতুল্লাহ থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণকাহিনী

রাসূল ﷺ 'বোরাক' নামক জান্নাতী বাহনে আরোহন করে মসজিদে আকসার দিকে রওয়ানা হন। অধিক খেজুর বৃক্ষ সম্বলিত ভূমিতে পৌছলে জিব্রাইল (আ.) বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! সওয়ারী থেকে নেমে এখানে নামায পড়ুন। তিনি সেখানে নামায পড়লেন আর জিব্রাইল (আ.) বললেন– আপনি ইয়াসরবে (মদীনায়) নামায পড়েছেন। একদিন এই স্থান আপনার আবাস স্থল হবে। তারপর তাঁর সওয়ারী এক শুভ্র স্থানে পৌছলে জিব্রাইল (আ.) বললেন, হুযুর! এখানেও নামায পড়ুন। তিনি নামায পড়লেন। জিব্রাইল (আ.) বললেন, আপনি মাদয়নে নামায পড়েছেন। সেখান থেকে বায়তুল লাহম পৌছলে সেখানেও জিব্রাইল (আ.)'র কথা মতো সওয়ারী থেকে অবতরণ করে নামায পড়লেন। জিব্রাইল (আ.) বললেন, এখানে হযরত ঈসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সওয়ারী চলন্ত অবস্থায় এক বৃদ্ধা দৃষ্টিগোচর হলে রাসূল (স) জিব্রাইল (আ.)কে জিজ্ঞাসা

---

[৯০২]. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পৃ-৫৪৮, ইন্ডিয়া, হাদিস নং-৩৬০৮

করলেন এ কে? জিব্রাইল (আ.) বললেন– আপনি চলুন। তিনি চলতে লাগলেন। পথে এক বৃদ্ধ দেখলেন সে আহবান করতে লাগল, হে আল্লাহর রাসূল! এদিকে তাশরীফ আনুন। কিন্তু জিব্রাইল (আ.) বললেন– আপনি চলুন। অতঃপর তিনি এমন দলের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন যারা তাঁকে **السلام عليك يا اوّل السلام عليك يا اخر** ও **السلام عليك يا حاشر** বলে সালাম দিচ্ছিলেন। জিব্রাইল (আ.) বললেন, আপনি এদের সালামের জাওয়াব দিন। তিনি তাদের সালামের জবাব দিলেন। এরপর জিব্রাইল (আ.) বললেন– পথে আপনি যে বৃদ্ধাকে দেখেছেন তা হলো দুনিয়া। এখন দুনিয়ার বয়স মাত্র এতটুকু বাকী আছে যতটুকু ঐ বৃদ্ধার বয়স বাকী আছে। যদি আপনি তার আহবানে সাড়া দিতেন তাহলে আপনার উম্মত দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিতো। আর যে শব্দ করে আপনাকে আহবান করছিল সে ছিল ইবলিস শয়তান। যদি আপনি তার ডাকে সাড়া দিতেন তাহলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো। আর যে দল আপনাকে সালাম করেছিলেন তারা হলেন– হযরত ইব্রাহিম, মূসা, ও ঈসা (আ.)। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে– তাঁর যাত্রা হযরত মূসা (আ.)এর পাশ দিয়ে হয়েছিল।

وهو قائم يصلى فى قبره এ সময় তিনি স্বীয় কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। মাদারেজুন নবুয়ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে হযরত মূসা (আ.) রাসূল ﷺকে দেখে বলেছিলেন اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল'।

মুজাহিদগণের সাক্ষাত

রাসূল ﷺ পথে এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন– যারা যেদিন ফসলের বৃক্ষ রোপন করতেন সেদিনই ফসল কাটতেন এবং সাথে সাথে বৃক্ষ পুনরায় ফসলে পূর্ণ হয়ে যেতো। তিনি জিব্রাইল (আ.)কে জিজ্ঞাসা করেন– এরা কারা? তিনি উত্তরে বললেন– এরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী। তাদের নেকী সাতশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেন। তারা যা কিছু ব্যয় করে আল্লাহ তায়ালা উত্তম প্রতিদান দান করেন এবং উত্তম রিযিক প্রদান করেন।

বে-নামাযীদের সাক্ষাত

অতঃপর তিনি এমন একদলের পাশ দিয়ে গমন করেছিলেন যাদের মাথা পাথরের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছে এবং পুনরায় মাথা পূর্বাবস্থায় হয়ে যায় আর বিরামহীনভাবে এ আযাব চলছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন– হে জিব্রাইল! এরা কারা? তিনি বললেন– এরা ঐসব লোক যারা ফরয নামায আদায় করতো না।

যাকাত অনাদায়কারীর সাক্ষাত

অতঃপর তাঁর গমন এমন একদলের পাশ দিয়ে হয়েছিল যাদের লজ্জাস্থানের সম্মুখ ও পিছনের দিকে চেড়া কাপড় দিয়ে ঢাকা এবং চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় চরছে আর কাঁটা, যক্কুম ও জাহান্নামের পাথর খাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা? জিব্রাইল (আ.) বললেন– এরা ঐসব লোক যারা স্বীয় সম্পদের যাকাত আদায় করতনা। আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর যুলুম করেননি এবং আপনার প্রতিপালক স্বীয় বান্দার উপর যুলুমকারী নন।

ব্যভিচারীদের দেখা

অতঃপর তাঁর গমন এমন একদলের পাশ দিয়ে হয়েছিল যাদের সম্মুখে একটি ডেকসীতে রান্না করা উন্নত মানের গোশত রয়েছে এবং অপর একটি ডেকসীতে কাঁচা দুর্গন্ধযুক্ত গোশত বিদ্যমান। কিন্তু তারা দুর্গন্ধযুক্ত গোশত খাচ্ছে আর রান্না করা গোশত খাচ্ছেনা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- এরা কারা? জিব্রাইল (আ.) উত্তর দিলেন– এরা আপনার উম্মতের ঐসব লোক যাদের নিকট পুত-পবিত্র স্ত্রীগণ থাকা সত্ত্বেও নষ্টা মহিলাদের নিকট যেতো এবং তাদের নিকট সকাল পর্যন্ত রাত্রিযাপন করতো। এভাবে এরা ঐসব মহিলা যারা স্বীয় হালাল ও পবিত্র স্বামীদের নিকট থেকে উঠে অবৈধ পুরুষদের নিকট গমন করতো সকাল পর্যন্ত সারা রাত তাদের সাথে থাকতো।

লোভীর দর্শন

অতঃপর তাঁর গমন এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে হয়েছিল যে লাকড়ির এক বিরাট বোঝা একত্রিত করে রাখল যা সে উঠাতে অক্ষম। কিন্তু তবুও সে লাকড়ি খুঁজে এনে বোঝা বড় করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন– এ কে? উত্তরে জিব্রাইল (আ.) বললেন– এ আপনার উম্মতের এক ব্যক্তি যার দায়িত্বে অনেক লোকের হক ও আমানত রক্ষিত ছিল যা আদায়ে সে সক্ষম ছিলনা। অথচ তবুও সে আরো হক ও আমানত গ্রহণ করে বোঝা ভারী করেছে।

আমলবিহীন অসৎ বক্তার দর্শন

অতঃপর এমন এক দলের পাশ দিয়ে তাঁর গমন হয়েছিল যাদের ঠোঁট লোহার কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। যখন একবার কাটে সাথে সাথে তা পুনরায় পূর্বের ন্যায় হয়ে যায় আর এভাবে চলতে রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন– এরা কারা? উত্তরে জিব্রাইল (আ.) বললেন– এরা মানুষকে পথভ্রষ্টকারী বক্তা। যারা নিজেদের বক্তব্য অনুযায়ী নিজেরা আমল করে না।

অশ্লীল ভাষীর দর্শন

অতঃপর একটি পাথরের পাশ দিয়ে তাঁর গমন হয়েছিল যে পাথর থেকে একটি বড় বলদ গরু বের হয় এবং পুনরায় সেই পাথরের ভিতর প্রবেশ করতে চায় কিন্তু প্রবেশ করতে পারেনা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি? উত্তরে জিব্রাইল (আ.) বললেন– এটি ঐ ব্যক্তির অবস্থা যে মুখ থেকে কোন মন্দ কথা উচ্চারণ করলো তারপর এজন্য লজ্জিত

হলো এবং ঐ মন্দ কথাকে পুনরায় মুখের ভিতর ফিরিয়ে নিতে চায় কিন্তু সে তা ফিরিয়ে নিতে অক্ষম।

জান্নাতের আওয়ায শ্রবণ

অতঃপর তিনি এক উপত্যাকা দিয়ে গমন করছিলেন। সেখানে ঠাণ্ডা পবিত্র স্বর্গীয় বাতাস এবং মেশকের সুগন্ধি আসছিল। আর একটি আওয়ায শুনলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি? উত্তরে জিব্রাইল (আ.) বললেন– এটি জান্নাতের আওয়ায। জান্নাত বলতেছে যে, হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা আপনি আমাকে দেন। কেননা আমার যাবতীয় নিয়ামত যা জান্নাতীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে তা অনেক বেশী হয়ে গিয়েছে। এখন আমার অধিবাসীদেরকে আমাকে দিয়ে দিন যাতে তারা ঐসব নিয়ামত ভোগ করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বললেন– তোমাকে দেওয়া হবে প্রত্যেক মুসলমান মু'মিন নর-নারীকে যারা আমার উপর এবং আমার রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছে আর যারা আমার সাথে কাউকে শরীক করেনি। যারা আমাকে ছাড়া আর কাউকে খোদা মানেনি এবং আমাকে ভয় করতো। তারা নিরাপদে থাকবে আর যা আমার কাছে চাইবে তা আমি তাদেরকে দেবো। আর যারা আমাকে কর্জ দেবে আমি তার বিনিময় দেবো এবং যারা আমার উপর ভরসা করবে আমি তাদেরকে যথেষ্ট করে দেবো। আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমি ওয়াদা খেলাফী করি না। নিশ্চয় মু'মিন সফল হবে। আর আল্লাহ তায়ালা হলেন সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টিকর্তা ও বরকতমণ্ডিত। জান্নাত একথা শুনে বলেছে– আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।

দোযখের আওয়ায শ্রবণ

অতঃপর তাঁর গমন এমন এক উপত্যকা দিয়ে হলো, যেখান থেকে এক ভয়ানক আওয়ায শুনতে পেলেন এবং দুর্গন্ধ অনুভব করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এটি কি? উত্তরে জিব্রাইল (আ.) বললেন– এটি জাহান্নামের আওয়ায। জাহান্নাম বলছে– হে আল্লাহ! আমার সমস্ত আযাব ও আযাবের উপকরণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমার গভীরতা অনেক দীর্ঘ হয়েছে আর আমার উষ্ণতাও বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং আমাকে যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমাকে দেন। আল্লাহ তায়ালা বললেন– প্রত্যেক মুশরিক ও কাফির নারী-পুরুষ এবং অহংকারী যারা কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করতো তাদেরকে তোমাকে দেওয়া হবে। দোযখ বলেছে, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।

ইহুদী-নাসারা এবং দুনিয়ার আহবান

রাসূল ﷺ বলেন– এক আহবানকারী আমাকে ডানদিক থেকে আহবান করে বলল, আপনি আমার দিকে দেখুন। আমি আপনার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করবো। আমি তার আহবানে সাড়া দেইনি। তারপর অপর একজন আহবানকারী বাম দিক থেকে অনুরূপভাবে আহবান করলো। আমি তার আহবানেও সাড়া দেইনি। তারপর তিনি একজন মহিলা দেখলেন যার বাহুদ্বয় বিবস্ত্র ছিল এবং সে সম্পূর্ণ সুসজ্জিত ছিল। সেও বলল, হে মুহাম্মদ! আমার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা

করবো। তিনি তার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেননি। জিব্রাইল (আ.) বললেন– প্রথম জন ছিল ইহুদীদের আহবানকারী। যদি আপনি তার ডাকে সাড়া দিতেন তাহলে আপনার উম্মত ইহুদী হয়ে যেতো আর দ্বিতীয়জন ছিল নাসারাদের আহবানকারী যদি আপনি তার ডাকে সাড়া দিতেন তবে আপনার উম্মত নাসারা হয়ে যেতো এবং তৃতীয় মহিলা ছিল দুনিয়া। তার ডাকে সাড়া দিলে আপনার উম্মত দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিতো।

সূদী ব্যক্তিদের দর্শন

অতঃপর তাঁর গমন এমন এক দলের পাশ দিয়ে হলো, যাদের পেট এতই বড় যে, যখনই দাঁড়াতো সাথে সাথে পড়ে যেতো। জিব্রাইল (আ.) বললেন– এরা সূদখোর।

ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণকারীর দর্শন

অতঃপর তাঁর গমন এমন এক দলের পাশ দিয়ে হলো– যাদের ঠোঁটগুলো উটের ঠেঁটের ন্যায় বৃহদাকারের। আগুনের স্ফূলিঙ্গ তারা গলদ করণ করছে আর তা মলদ্বার দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। জিব্রাইল (আ.) বললেন– এরা ঐ সব লোক যারা ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতো।

ব্যভিচারিণীর দর্শন

অতঃপর তাঁর গমন এমন এক দলের পাশ দিয়ে হলো যাদেরকে তাদের বক্ষদেশের ব্রেস্টের সাথে বাধা অবস্থায় ঝুলন্ত রাখা হয়েছিল। এরা হলো ব্যভিচারিনী নারী।

চোগলখোরের দর্শন

অতঃপর তাঁর গমন এমন একদলের পাশ দিয়ে হলো যাদের পাশ থেকে গোশত কাটা হচ্ছে। এরা হলো চোগলখোর।

বাইতুল মোকাদ্দাসে পৌছা

রাসূল ﷺ বাইতুল মোকাদ্দাসে পৌছে আম্বিয়ায়ে কিরামগণ যেখানে তাঁদের সাওয়ারী বাঁধতেন সেখানে বোরাক বাঁধলেন। তারপর তিনি মসজিদে আকসায় তাশরীফ নিলেন। সেখানে তাঁকে স্বাগতম জানানোর জন্য সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম উপস্থিত ছিলেন। সকলেই তাঁকে দেখে প্রশংসা করলেন, রাসূল ﷺএর উপর দুরূদ পাঠ করলেন এবং সকলেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিলেন। তারপর আযান ও ইকামত দেওয়া হলো এবং আম্বিয়ায়ে কিরামগণ কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন আর ইমাম কে হবেন সেই অপেক্ষায় রইলেন। বড় বড় আম্বিয়াগণ ইমামতির আশা করেছিলেন। কিন্তু জিব্রাইল (আ.) ইমামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺএর হাত ধরে সকলের ইমাম বানিয়ে

দিলেন। তিনি সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের ইমামতি করলেন। কেউ কেউ এই নামায ও ইমামতি মি'রাজ থেকে আসার সময় পথের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন।

আম্বিয়ায়ে কিরামগণ কর্তৃক আল্লাহর প্রশংসা

এসময় হযরত ইব্রাহিম, হযরত মূসা, হযরত দাউদ, হযরত সোলায়মান, হযরত ঈসা (আ.) এবং সর্বোপরি হুযুর ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করেন ও নিজের উপর আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতের বর্ণনা দেন। রাসূল ﷺ বলেন– الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَرْسَلَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَأَنْزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ لِلنَّاسِ، وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا، وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ، وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন এবং সকলের জন্য সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী বানিয়েছেন। আর আমার উপর ফোরকান নাযিল করেছেন যার মধ্যে সব কিছুর বর্ণনা রয়েছে। আমার উম্মতকে সর্বোত্তম উত্তম বানিয়েছেন যাদেরকে মানুষের হেদায়তের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদেরকে মধ্যমপন্থী বানিয়েছেন। আর যিনি আমার বক্ষ খুলে দিয়েছেন আমার থেকে বোঝা হাল্কা করে দিয়েছেন, আমার স্মরণকে সুউচ্চ করে দিয়েছেন এবং আমাকে দিয়ে নবুয়তের ধারাবাহিকতা আরম্ভ করেছেন আর আমাকে দিয়েই তা সমাপ্তি করেছেন।

বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে সপ্ত আসমানে ভ্রমণ

এ সম্পর্কে বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদিসে বিস্তারিত ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, যাতে বিভিন্ন আসমানে বিভিন্ন নবীগণের সাথে সাক্ষাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। আর এসব সাক্ষাত ছিল দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে অর্থাৎ সশরীরে। এব্যাপারে জালালাইন শরীফের প্রান্তটীকায় বর্ণিত আছে যে– لقى ادم اي بروحه وجسده معًا كبقية الانبياء الاتى ذكرهم فى السموات السبع فاجتمع النبى صلى الله عليه وسلم بهم باجسادهم وارواحهم بعد ان اجتمع بهم كذالك فى جملة الانبياء فى بيت المقدس রাসূল ﷺ হযরত আদম (আ.)এর সাক্ষাত করেছিলেন তাঁর আত্মা ও দেহের সমন্বয়ে যেভাবে সপ্ত আসমান পর্যন্ত অন্যান্য নবীগণের সাথে সশরীরে সাক্ষাত করেছেন। নবী করিম ﷺও সশরীরে রূহ ও দেহের সমন্বয়ে তাঁদের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন বাইতুল মোকাদ্দাসে যেভাবে সশরীরে সাক্ষাত করেছিলেন।[৯০৩]

[৯০৩]. তাফসীরে জালালাইনের প্রান্তটীকা, পৃ-২২৯

আসমানসমূহে বিভিন্ন নবীগণের সাথে রাসূল ﷺ'র সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কারণ অপরিচিত হওয়ার কারণে নয় বরং তাঁর সম্মান বৃদ্ধির কারণে পরিচয় করে দেওয়া হয়েছিল। যেভাবে রাসূল ﷺ ইন্তিকালের পূর্বে তিনি জিব্রাঈলের সাথে মিকাঈল (আ.)'র পরিচয় করে দিয়েছিলেন। এরূপ ঘটনা অসংখ্য। রাসূল ﷺ একেক আসমানে অসংখ্য ফেরেশ্তাকে কিয়াম, রুকু, সিজদা ও কুয়ুদ অবস্থায় আল্লাহর যিকরে রত দেখেছেন এবং জানতে পেরেছেন তাদের সৃষ্টি থেকেই তারা এভাবে আল্লাহর যিকর ও ইবাদতে মশগুল রয়েছেন। জিব্রাইল (আ.)এর অনুরোধে তিনি এসব ইবাদতের সওয়াব লাভের অনুরূপ ইবাদত উম্মতের জন্য আল্লাহর নিকট আবেদন করলে আল্লাহ তা মনজুর করলেন এবং নামাযের মধ্যে এসব কাজ ফরয করে দেন।

সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছা

আল্লামা নিযামউদ্দীন নিশাপুরী (র.) সিদরাতুল মুনতাহার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন– فَالْمُنْتَهِي حِيْنَئِذٍ مَوْضِعٌ لَا يَتَعَدَّهُ مَلَكٌ وَلَا يَعْلَمُ مَا وَرَاءَهُ اَحَدٌ وَاِلَيْهِ اِنْتَهِي اَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ এটি এমন স্থান যার অতিক্রম ফেরেশ্তারা করতে পারেন না এবং এর পরে কি আছে তাও কারো জানা নেই। শোহদাগণের রূহ এ পর্যন্ত আসতে সক্ষম।[৯০৪]

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে– إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا» অর্থাৎ পৃথিবী থেকে যে সব আমল উপরে যায় তা সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে অতঃপর সেখান থেকে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয় আর উপর থেকে যেসব আহকাম অবতীর্ণ হয় তাও এখান পর্যন্ত আসে অতঃপর সেখান থেকে তা গ্রহণ করা হয়।[৯০৫]

তিনি আরো বলেন– اِنَّ جِبْرَائِيْلَ تَخْلُفُ عَنْهُ فِيْ مَقَامٍ وَلَوْ دَنَوتُ اَنْمِلَةً لَاحْتَرِقْتُ এক স্থানে পৌঁছে জিব্রাইল (আ.) পিছনে পড়ে গেলেন এবং (বললেন) যদি আমি এক আংগুল পরিমাণও অগ্রসর হই তাহলে আমি পুরে যাবো।[৯০৬]

আল্লামা আব্দুল ওহাব শা'রানী (র.) মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী (র.) থেকে বর্ণনা করেন, অতঃপর নবী করিম ﷺকে সিদরাতুল মুনতাহার দিকে উর্দ্ধগমন করানো হয়েছে। এটি একটি বৃক্ষ। এটির ফল মোটকার ন্যায় বৃহদাকারের এবং এটির পাতা

৯০৪. আল্লামা নিযামউদ্দীন হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ (র.) (৭২৮ হি),তাফসীরে নিশাপুরী, খণ্ড-২৭, পৃ-৩১

৯০৫. মুসলিম, শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৫২৯

৯০৬. প্রাগুক্ত, পৃ-৩০), অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল হাক্কী (র.) (১১৩৭হি), রুহুল বয়ান, খণ্ড-৯, পৃ-২২৪, কাযী আয়ায (র.) (৫৪৪ হি), শেফা শরীফ, খণ্ড-১,পৃ-১২৬, এবং মোল্লা আলী ক্বারী (র.) (১০১৪ হি), শরহে শেফা, নসীমুর রিয়াযের প্রান্ত টীকা, খণ্ড-২, পৃ-৩১০

হাতির কানের ন্যায়। তিনি তা দেখেছেন এবং আল্লাহর নূর দ্বারা তা আবৃত ছিল। এর পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ বর্ণনা দিতে কেউই সক্ষম নন। নূরের প্রচণ্ড তজল্লীর কারণে চোখ পূর্ণাঙ্গভাবে আয়ত্ব করতে পারে না। তিনি দেখলেন যে, সিদরাতুল মুনতাহার শিকড় থেকে চারটি নদী প্রবাহিত হলো। দু'টি নদী প্রকাশ্য ছিল বাকী দু'টি ছিল বাতেনী। জিব্রাইল (আ.) বলেছেন, প্রকাশ্য নদী দু'টি হলো নীল এবং ফুরাত নদী আর অপ্রকাশ্য দু'টি জান্নাতের দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল। নীল ও ফুরাত নদীদ্বয়ও কিয়ামতের দিন জান্নাতে চলে যাবে এবং এ দু'টি জান্নাতে মধু ও দুধের নদী হবে। ইবনে আরবী (র.) আরো বলেন– এ নদীদ্বয় থেকে পানকারীগণের বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান অর্জিত হবে। বনী আদমের আমলসমূহ সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছে স্তব্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে না। এটি আত্মাসমূহের অবস্থান স্থল। যা কিছু নীচে অবতরণ করে এটি সেগুলোর প্রান্ত সীমা এবং উপর থেকে কোন কিছু এর নীচে আসতে অক্ষম। আর যা কিছু নীচ থেকে উপরে উঠে এটি সেগুলোরও প্রান্তসীমা। নীচ থেকে কোন বস্তু উপরে উঠতে অক্ষম। এখানেই জিব্রাইল (আ.)'র অবস্থানস্থল। সেখানে পৌঁছে নবী করিম ﷺ বোরাক থেকে অবতরণ করেন এবং তাঁর জন্য সবুজ রঙের 'রফরফ' নামক আসন পেশ করা হয়েছে। তিনি রফরফে উঠে বসলে জিব্রাইল (আ.) রফরফের সাথে অবতীর্ণ ফেরেশতাদের নিকট রাসূল ﷺকে সোর্পদ করে দেন। নবী করিম ﷺ জিব্রাইল (আ.)কে সঙ্গে সম্মুখে অগ্রসর হতে বললেন, কিন্তু জিব্রাইল (আ.) বললেন, আমি সক্ষম নই। যদি আমি এক কদম অগ্রসর হই তাহলে জ্বলে যাবো। আমরা প্রত্যেক ফেরেশ্তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। হে মুহাম্মদ ﷺ! আল্লাহ তায়ালা তাঁর নির্দশনসমূহ দেখানোর জন্য আপনাকে ভ্রমণ করাচ্ছেন। আপনি তাতে অমনযোগী হবেন না। তারপর জিব্রাইল (আ.) তাঁকে বিদায় জানান আর তিনি রফরফে ঐ ফেরেশ্তার সাথে রওয়ানা হলেন। রফরফ তাঁকে নিয়ে 'মকামে ইস্তাওয়া' পর্যন্ত পৌঁছে। সেখানে তিনি কলম চালনার শব্দ শুনেছেন যেগুলো দিয়ে আল্লাহর সে সব বিধান লেখা হচ্ছে, যা তিনি তার স্বীয় সৃষ্টির জন্য প্রেরণ করেন। তিনি ঐসব ফেরেশ্তাদেরকে দেখেছেন যারা আমলসমূহ লিখেন। প্রত্যেক কলম একজন ফেরেশ্তা। আল্লাহ তায়ালা বলেন– তোমরা যা কিছু আমল কর আমি সেগুলো লিখে রাখি। অতঃপর তিনি নূরের মধ্যে তীব্রগতিতে অগ্রসর হলেন।

ফলে যে ফেরেশ্তা তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিনিও পশ্চাতে রয়ে গেলেন। যখন তিনি সঙ্গে কাউকে দেখতে পান নি তখন সামান্য বিচলিত হয়ে উঠেন এবং ঐ নূরের জগতে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন আর বুঝতে পারছেনা এখন কি করবেন? এখানে ফেরেশ্তা ও রফরফ কিছুই নেই কেবল তিনি একাকী আর সব দিকে নূর আর নূর। তিনি অস্থির হয়ে ডানে-বামে ঝুঁকছেন। এসময় তিনি দীদারে এলাহীর অনুমতি প্রার্থনা করেন

যাতে আল্লাহর বিশেষ অবস্থার সম্মুখে প্রবেশ করতে পারেন। তখন আবু বকর (রা.)'র আওয়াযের ন্যায় আওয়ায আসল– قِفْ يَا مُحَمَّدُ فَاِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي "হে মুহাম্মদ থামুন, আপনার প্রতিপালক সালাত পড়তেছেন।" তিনি এ আওয়ায শুনে অবাক হলেন এবং মনে মনে ভাবলেন– আমার প্রতিপালক কি নামায পড়েন? তাঁর অন্তরে যখন অবাক সৃষ্টি হলো এবং আবু বকর (রা.)'র আওয়ায শুনে তিনি কিছুটা স্বস্তিবোধ করলেন তখন তাঁর সামনে هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ আয়াত পাঠ করা হল যার অর্থ হল, "তিনি (আল্লাহ) এমন সত্তা যিনি তোমাদের উপর সালাত (রহমত) পড়েন এবং তাঁর ফেরেশ্তাগণও সালাত পড়েন।" তখন নবী করিম ﷺএর মনে আসল যে, এখানে সালাত দ্বারা নামায উদ্দেশ্য নয় বরং আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়া উদ্দেশ্য। অতঃপর তিনি আল্লাহর বিশেষ সম্মুখে প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত হন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর উপর অহী নাযিল করেন অর্থাৎ কথা বললেন, যা যা বলার ছিল। তিনি আল্লাহর সেই নুরানী তজল্লী দেখেছেন যা তিনি ব্যতীত অন্য কেউ দেখেননি।[৯০৭]

কোন কোন বর্ণনায় আছে আল্লাহ তায়ালা আহবান করেছিলেন– اُدْنُ يَا اَحْمَد اُدْنُ يَا مُحَمَّد হে আহমদ ও মুহাম্মদ! আরো নিকটে এসো। তখন আমার রব আমাকে এত নিকটে নিয়ে গেলেন যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى অর্থাৎ তিনি আল্লাহর অতি নিকটে গেলেন। তখন উভয়ের মাঝে মাত্র দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরো কম।[৯০৮]

আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺএর ভীতি দূরীভূত করার জন্য আবু বকর (রা.)'র আকৃতিতে একজন ফেরেশ্তা সৃষ্টি করে তাঁরই আওয়াযের ন্যায় আওয়ায করে এরূপ বলার ব্যবস্থা করেছেন।[৯০৯]

রাসূল ﷺএর আগে-পরের সকল জ্ঞান অর্জন

রাসূল ﷺ যখন আরশ এলাহীতে অবস্থান করেন তখন আরশ থেকে এক ফোঁটা তাঁর মুখে প্রদান করা হয়। ফলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল জ্ঞান তাঁর অর্জিত হলো। যেমন হাদিস শরীফে আছে– ثُمَّ دُلَّ لِي قَطْرَةً مِن العَرْشِ فَوَقَعَت عَلى لِسَانِي فَمَا ذَاقَ الذَّانِقُوْنَ شَيْئًا قطُّ اَحْلَى مِنْهَا فَانْبَأْنِى اللهُ بِهَا نَبأَ الاوَّلِيْنَ وَالاخِرِيْنَ وَنَوَّرَ قَلْبِىْ অতঃপর আমার

[৯০৭]. আল্লামা আব্দুল ওহাব শা'রানী (র.) (৯৭৩ হি), আল ইয়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির, খণ্ড-২, পৃ. ৩৮-৩৯, মিশর

[৯০৮]. সূরা নাজম, আয়াত. ৮-৯

[৯০৯]. আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), মাদারেজুন নবুয়্যত, খণ্ড-১,পৃ-২০৩ ও বুরহান উদ্দিন হালবী (র.), সীরাতে হালবিয়্যা, খণ্ড-১, পৃ-২৪৪

জন্য এক ফোঁটা আরশ থেকে ফেলা হয়েছে যা আমার মুখে পতিত হলো। কোন স্বাদ গ্রহণকারী কখনো এরূপ স্বাদ গ্রহণ করেনি। এর ফলে আল্লাহ তায়ালা আমাকে আগে-পরের সব সংবাদ প্রদান করেন এবং আমার অন্তরকে আলোকিত করেছেন।[৯১০]

রাসূল ﷺ আল্লাহর সকল গুণে গুণান্বিত হওয়া

আলেমে রাব্বানী আল্লামা ইমাম শা'রানী (র.) বলেন– انه اذا مَرَّ على حضرات الاسماء الالهية صار متخلقًا بصفاتها فاذا مَرَّ على الرحيم كان رحيمًا او على الغفور كان غفورًا او على الكريم كان كريمًا او على الحليم كان حليمًا او على الشكور كان شكورًا او على الجَوَّادِ كان جَوَّادًا وهكذا انما يرجع من ذالك المعراج الاَّ هو فى غاية الكمال রাসূল ﷺ যখন আল্লাহর বিশেষ নামসমূহ অতিক্রম করেছেন তখন তিনি ঐ নামসমূহের বিশেষণে বিশেষিত হয়েছিলেন, 'গাফুর' এর উপর দিকে অতিক্রম করার সময় 'গাফুর' করিম এর উপর দিয়ে অতিক্রম করার সময় 'করিম', 'হালিম' এর উপর দিয়ে অতিক্রম করার সময় 'হালিম' 'শাকুর' এর উপর দিয়ে অতিক্রম করার সময় 'শাকুর' 'জাওয়য়াদ' এর উপর দিয়ে অতিক্রম করার সময় 'জাওয়য়াদ' হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মি'রাজ থেকে ফিরেছেন সকল গুণে পূর্ণ গুণান্বিত হয়ে।[৯১১]

মি'রাজের প্রমাণ

হাফিয ইবনে কাসীর (র.) মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের সূত্রে হযরত উম্মে হানী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন– রাসূল ﷺ মি'রাজ থেকে এসে এর পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন এবং তিনি কুরাইশদের এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে ঘর থেকে বের হতে চাইলে আমি তাঁর দামান ধরে বললাম, তারা এ ঘটনা শুনলে আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। কিন্তু তিনি গিয়ে কুরাইশদের নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করলে তারা তা অস্বীকার করল। বায়হাকীর বর্ণনামতে আবু জেহেল সকলকে বলতে লাগল যে, বাইতুল মোকাদ্দাস এখান থেকে এক মাসের পথ। যাওয়া-আসা করতে কমপক্ষে দুই মাস সময় লাগবে। আর মুহাম্মদ নাকি রাতের অল্প সময়ে তা ভ্রমণ করে এসেছেন। জুবাইর ইবনে মুতআম বলেন– হে মুহাম্মদ! সত্যিই যদি আপনি এ রাতে সেখানে গিয়ে থাকেন তাহলে এই মুহূর্তে আপনি এখানে থাকতেন না। এক ব্যক্তি বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি কি অমুক জায়গায় আমাদের উটগুলো দেখেছেন? তিনি বললেন– হ্যাঁ আমি দেখেছি যে, তাদের একটি উট হারিয়ে গেছে আর তারা সেটি খুঁজছে। ঐ ব্যক্তি বলল - অমুক গোত্রের

[৯১০]. আবদুর রহমান সফূরী (র.), নুযহাতুল মাজলিস, পৃ-১২২, আনওয়ারে মুহাম্মদিয়া, পৃ-৩৪৮ ও মাদারেজুন নবুয়ত, খণ্ড-১, পৃ-২০৩

[৯১১]. আল্লামা আব্দুল ওহাব শা'রানী (র.) (৯৭৩ হি), আল ইয়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির, খণ্ড-২, পৃ-৩৬

উটগুলোর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তাদেরকে অমুক জায়গায় দেখেছি। তাদের লাল রঙের একটি উটের পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাদের নিকট পানি ভর্তি পেয়ালা ছিল যা আমি পান করে ফেলেছি। তখন লোকটি বলল, আচ্ছা বলুনতো তাদের উটনী কয়টি ছিল এবং এদের রাখাল ছিল কারা? তিনি বললেন, আমি ঐগুলোর গণনার দিকে দৃষ্টি দেইনি। তবে এ সময় ঐ সব উট ও রাখালকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। তিনি গুণে গুণে উটের সংখ্যা ও রাখালের নাম বলে দিলেন। তিনি আরো বললেন- আবু কুহাফার সন্তান তথা আবু বকরের রাখালও রয়েছে এবং সকালে এরা ওয়াদীয়ে সানিয়ায় পৌঁছে যাবে। তারা সকালে সেখানে গিয়ে তার কথা সত্য কিনা যাচাই করতে অপেক্ষা করতে লাগল। ঠিকই যথাসময়ে উটগুলো এসে গেল। তারা রাখালদের নিকট রাসূল ﷺ'র বর্ণিত কথাগুলো জিজ্ঞাসা করলে তারা সবগুলো সত্য বলে সাক্ষ্য দিল। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি এই ঘটনাকে বিশ্বাস করি। সুতরাং ঐ দিনই তার উপাধি সিদ্দিক হলো। [৯১২]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ যখন সকালে মুশরিকদেরকে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করলেন, তারা হযরত আবু বকর (রা.)'র নিকট গিয়ে বলল, হে আবু বকর! তোমাদের নবী বলছেন যে, তিনি নাকি গতরাতে এক মাসের দূরত্বের সফর করে পুনরায় ফিরে এসেছেন। এখন তুমিই বল তিনি এগুলো কি বলছেন ? হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, তিনি যদি সত্যিই এরূপ বলে থাকেন তবে সত্য বলেছেন। আমি তা বিশ্বাস করি। আমি তাঁর এর চেয়েও অসম্ভব কথাও বিশ্বাস করি। তিনি আসমান থেকে আগত বিষয়ের সংবাদ দেন আর আমি তাও বিশ্বাস করি।[৯১৩] বায়হাকীর বর্ণনায় আছে- মুশরিকদের এক ব্যক্তি বলল, বাইতুল মোকাদ্দাস সম্পর্কে আমি সবচেয়ে অধিক জ্ঞাত। সে বলল- হে মুহাম্মদ! আপনি বলুন বাইতুল মোকাদ্দাসের দালান, অবস্থা, স্বরূপ ও সেটি পাহাড়ের কতটুকু নিকটে? তখন আল্লাহ তায়ালা বাইতুল মুক্কাদাসকে তুলে এনে তাঁর সামনে রাখলেন তিনি চোখে দেখে দেখে বাইতুল মোকাদ্দাস সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেন। লোকটি শুনে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। তখন সে তার সঙ্গীদের নিকট গিয়ে বলল, মুহাম্মদ নিজের দাবীতে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।[৯১৪]

ইমাম বুখারী (র.) হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, যখন কুরাইশরা আমার মি'রাজকে অস্বীকার করল তখন আমি কা'বার

৯১২. হাফিয এমাদ উদ্দিন ইবনে কাসীর (র.) (৭৭৪ হি.), তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড. ৪, পৃ .২৭৬
৯১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮
৯১৪. ইমাম বায়হাকী (রা.) (৪৫৮হি.), দালায়েলুল নবুয়াত, খণ্ড.২, পৃ.৩৯৬, বৈরুত ও ইবনে কাসীর (রা.), (৭৭৪হি.), তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড. ৪, পৃ. ২৫৪, বৈরুত

মীযাবে রহমতের নীচে দাঁড়িয়ে গেলাম। فَجَلَّى اللّٰهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য বাইতুল মোকাদ্দাসকে উন্মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর দেখে দেখে আমি এর নির্দশনসমূহের সংবাদ দিলাম।[৯১৫]

হাফিয আবু নঈম ইস্পাহানী দালায়েলুন নবুয়্যত গ্রন্থে স্বীয় সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাইযী থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ হযরত দাহইয়া ইবনে খলীফাকে কায়সারে রোমের নিকট প্রেরণ করেন। হারকাল বাদশা আবু সুফিয়ান সখর ইবনে হারবকে ডেকে পাঠান। এ সুযোগে আবু সুফিয়ান হারকাল বাদশাহর নিকট রাসূল ﷺ এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার প্রয়াস চালায়। সে বলল, হে বাদশা! আমি তাঁর (মুহাম্মদ) সম্পর্কে এমন তথ্য দেবো যাতে তিনি যে মিথ্যুক তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। হারকাল বললেন– বল, সে তথ্য কি? আবু সুফিয়ান বলল, তিনি (মুহাম্মদ) দাবী করেন যে, একরাতে নাকি তিনি মক্কা থেকে আপনাদের মসজিদ মসজিদে আকসায় এসেছেন এবং ঐ রাতেই সকাল হওয়ার পূর্বে আমাদের নিকট ফিরে এসেছেন। মসজিদে আকসার খাদেম এসময় বাদশা'র পাশে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি বললেন, আমি ঐরাত সম্পর্কে জানি। বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জান? তিনি বললেন, প্রতিরাতে আমি ঘুমানোর পূর্বে মসজিদের দরজা বন্ধ করি। ঐ রাতে আমি সব দরজা বন্ধ করেছি কিন্তু একটি দরজা বন্ধ করতে পারিনি। মিস্ত্রি ডাকলাম, তারা দেখে বলল– এই দরজার উপরিভাগের চৌকাঠ নীচের দিকে দাবিয়ে গেছে। এখন আমরা তা ঠিক করতে পারবো না। সকালে এসে ঠিক করে দেবো। ফলে ঐ রাতে দরজার উভয় কপাট খোলা রেখে আমি চলে গেলাম। সকালে এসে দেখি মসজিদের পাশে পাথরে একটি গর্ত এবং এখানে সাওয়ারী বাধার চিহ্ন পেয়েছি আর দরজা কোন মেরামত ছাড়াই বন্ধ করা গেল। আমি সঙ্গীদের বললাম গতরাত এই মসজিদে নামায আদায় করা হয়েছে।[৯১৬]

দীদারে এলাহী ও আল্লাহর দর্শন লাভ

সকল আম্বীয়ায়ে কিরামের মধ্যে কেবল মুহাম্মদ মোস্তাফা ﷺকে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় দীদার ও দর্শন দ্বারা ধন্য করেছেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে সূরা 'নাজমে' বর্ণিত হয়েছে। উক্ত সূরায় ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলূসী (রা.) বলেন, হযরত হাসান বসরী (রা.)'র মতে উক্ত আয়াতে উভয় সর্বনাম আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। এভাবে وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى তিনি (রাসূল ﷺ)

৯১৫. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী, খণ্ড-১,পৃ-৫৪৮, করাচী
৯১৬. হাফিয ইবনে কাসীর (র.) (৭৪৪ হি), তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৪, পৃ-২৭৯ বৈরুত

তাঁকে (আল্লাহকে) দ্বিতীয়বার দেখেছেন সিদরাতুল মুনতাহায়।[৯১৭] এ আয়াতেও ه সর্বনাম আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়েছে।

হযরত হাসান বসরী (রা.) শপথ করে বলেন যে, রাসূল ﷺ আল্লাহকে দেখেছেন।[৯১৮]

ইমাম বুখারী (রা.) আরো স্পষ্টভাবে বিশুদ্ধ হাদিসে বলেছেন- حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، وَدَنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ، فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى এমনকি রাসূল ﷺ সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছেন এবং রাব্বুল ইজ্জত জাব্বার তাঁর নিকটবর্তী হলেন, অতঃপর আরো নিকটবর্তী হলেন, ফলে তিনি তাঁর থেকে দুই ধনুকের কিংবা এর চেয়ে অধিক নিকটবর্তী হলেন।[৯১৯]

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى রাসূল ﷺ যা দেখেছেন তা তাঁর অন্তর মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনি।[৯২০]

ইমাম নববী (র.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ذهب الجمهور من المفسرين الى ان المراد انه رأي ربه سبحانه অধিকাংশ মুফাসসীরীনগণের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূল ﷺ তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন।[৯২১]

হযরত ইকরামা (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন رَأَيْتُ رَبِّيَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى আমি আমার মহান পবিত্র প্রভুকে দেখেছি।[৯২২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অনুরূপ হাদিস ইমাম তিরমিযী, ইমাম মুসলিম, ইবনে হিব্বান, ইবনে জারীর তাবারী, ইমাম হাকেম, হাফিয নুরুদ্দীন হায়শামী প্রমুখ বড় বড় মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

হাফিয নুরুদ্দীন ইবনে আব্বাস (রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন– ان محمدًا صلى الله عليه وسلم رأي رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِبَصَرِهِ وَمَرَّةً بفواده নিশ্চয় মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রবকে দু'বার দেখেছেন। একবার কপালের চোখে আরেকবার অন্তরের চোখে।[৯২৩]

---

৯১৭. সূরা নাজম, আয়াত ১৩
৯১৮. সৈয়দ মাহমুদ আলুসী (র.), (১২৭০হি.), তাফসীরে রূহুল মায়ানী , খণ্ড.২৭, পৃ.৪৫, বৈরুত
৯১৯. ইমাম বুখারী (রা.)(২৫৬হি.), সহীহ বুখারী, খণ্ড.২, পৃ. ১১২০, করাচী
৯২০. সূরা নাজম, আয়াত, ১১
৯২১. ইমাম নববী (র.), শরহে মুসলিম, পৃ.৯৭
৯২২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১হি.), মুসনাদে আহমদ, খণ্ড-১, পৃ.২৮৫

তাফসীরে সাবী গ্রন্থে বলা হয়েছে- اُختُلِفَ فِي تلك الرُّوية فقيل راه بعينه حقيقة وهو قول الجمهور الصحابة والتابعين আল্লাহর সেই দর্শন নিয়ে ওলামাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন তিনি আল্লাহ তায়ালাকে বাস্তবিকভাবে স্বচক্ষে দেখেছেন। আর এটিই অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেঈদের মত।[৯২৪]

আল্লামা হালভী বলেন- اختلف فى رويته صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى تلك الليلة فاكثر العلماء على وقوع ذالك الى انه صلى الله عليه وسلم راه عزّ وجلّ بعين راسه মি'রাজের রাতে রাসূল ﷺ তাঁর রবকে দেখার বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ ওলামাগণের মতে তিনি আল্লাহকে কপালের চোখে দেখেছেন।[৯২৫]

ইমাম নববী (রা.) বলেন- ان الراجع عند اكثر العلماء اَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي ربه بعين رأسه ليلة الاسراء অধিকাংশ ওলামাগণের বিশুদ্ধ ও প্রাধান্য মত হলো মি'রাজ রাতে নবী করিম ﷺ তাঁর প্রতিপালককে নিজের চোখে দেখেছেন।[৯২৬]

এ ব্যাপারে ফায়সালামূলক সিদ্ধান্ত দেন আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.)। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ মি'রাজের রাতে আল্লাহ তায়ালাকে কপালের চোখে দেখেছেন কিনা তা সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) তা অস্বীকার করেন কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা.)এর পক্ষে মত দিয়েছেন। এ দু'জনের প্রত্যেকের সাথে একদল সাহাবী যোগ দিয়েছেন। এভাবে তাবেঈগণের মধ্যেও দু'দলে বিভক্ত হয়েছেন আবার একদল এ ব্যাপারে নিরবতা পালন করেন। তবে অধিকাংশ ওলামা ইবনে আব্বাস (রা.)এর মতের পক্ষ অবলম্বন করেন। ইমাম নববী (রা.) লিখেছেন যে, অধিকাংশ ওলামাগণের পছন্দনীয় মত হলো নবী করিম ﷺ মি'রাজের রাতে নিজ চোখে আল্লাহ তায়ালাকে দেখেছেন। আর ইবনে আব্বাস (রা.) এই মত রাসূল ﷺ থেকে শ্রবণ করে বলেছেন। পক্ষান্তরে হযরত আয়েশা (রা.) এটিকে কেবল নিজস্ব ইজতিহাদ দ্বারা অস্বীকার করেছেন। ইবনে ওমর (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.)'র কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, হ্যাঁ, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তায়ালাকে দেখেছেন আর ইবনে ওমর (রা.) তার কথাটি মেনে নিয়েছেন। অধিকাংশ সুফীয়ায়ে কিরামের মতও অনুরূপ।[৯২৭]

কেউ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)কে জিজ্ঞাসা করেছেন হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মনে করে যে, মুহাম্মদ ﷺ স্বীয় রবকে দেখেছেন, তা হলে সে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। এখন কোন দলীল দ্বারা হযরত আয়েশা (রা.)'র

---

৯২৩. হাফিয নুরুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর (রা.), (৮০৭হি.) মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড-১. পৃ.৭৮, বৈরুত
৯২৪. তাফসীরে সাবী, পৃ.১১৬
৯২৫. আলী ইবনে বুরহান উদ্দিন হালবী (রা.), সীরাতে হালবী, খণ্ড ১, পৃ.৪৫০
৯২৬. ইমাম নববী (রা.), (৬৭৬হি.), শরহে মুসলিম, খণ্ড.১, পৃ.৯৭, করাচী
৯২৭. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), (১০৫২হি.), আশআতুল লুমআত, খণ্ড.৪, পৃ.৪৩১

মত খণ্ডন করা যাবে? উত্তরে তিনি বলেন, স্বয়ং নবী করিম ﷺ'র বাণী দ্বারা খণ্ডন করা হবে। কেননা তিনি বলেছেন, আমি আমার রবকে দেখেছি। রাসূল ﷺ'র বাণী আয়েশা (রা.)'র বাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।[৯২৮]

মোটকথা হলো- ইমাম হাসান বসরী, ইবনে দাহইয়া, ইমাম আহমদ, আবুল হাসান আশআরী, ইমাম নববী, কাযী আয়ায, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী, শিহাবউদ্দিন সুহরাওয়ার্দী, সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ তাসতারী, মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) প্রমুখ ওলামা মাশায়েখগণ ইবনে আব্বাস (রা.)'র মত গ্রহণ করেছেন।[৯২৯]

সালাত বা নামায

সালাত আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দোয়া, রহমত, ইস্তিগফার ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট রুকন, দোয়া ও যিকরসমূহকে বিশেষ পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ে আদায় করাকে সালাত বা নামায বলা হয়।[৯৩০]

নামায সার্বজনীন ইবাদত। ঈমানের পরে হলো আমল। আর আমলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো নামায। অন্যান্য আমলসমূহ হয়ত জীবনে একবার কিংবা বছরে একবার কিন্তু নামায প্রতিদিন এবং দৈনিক পাঁচবার ফরয। সকল ইবাদতের যাবতীয় উপকরণ ও পদ্ধতি নামাযে বিদ্যমান।

মুফতি আহমদ ইয়ার খান (র.) বলেন, নামায অন্যান্য ইবাদতের উপর শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ হলো– ১. নামায অবস্থায় কোন দুনিয়াবী কাজ করা যায় না। কেননা এতে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নামাযীর আয়ত্বে থাকে। ২. অন্যান্য ইবাদতে দুনিয়াবী কাজও সংঘটিত হয়। হজ্বে ব্যবসা, রোযায় দুনিয়াবী কাজ-কর্ম হয়ে থাকে। কিন্তু নামাযে এসব কিছু হয়না। ফলে নামাযে একাগ্রতা বেশী থাকে। ৩. নামায জাহেরী ও বাতেনী উভয় প্রকারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আদায় করা হয় পক্ষান্তরে রোযা কেবল মুখ ও পেট দ্বারা আদায় হয়ে যায়। ৪. নামায সকল ফেরেশ্‌তাদের ইবাদতের সমষ্টি রূপ। নামায সমস্ত মাখলুকের ইবাদতের সমষ্টি রূপ। যেমন বৃক্ষ দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকে, চতুষ্পদ জন্তু রুকু অবস্থায় এবং পোকা-মাকড় সিজদা অবস্থায় থাকে এবং ব্যাঙ বসা অবস্থায় থাকে।

৯২৮. আলী ইবনে বুরহান উদ্দিন হালবী (র.), (১৪০৪হি.) সীরাতে হালবীয়া, পৃ. ৪৫২ও আব্দুল হক মুহদ্দিস দেহলভী (রা.), মাদারেজুন নবুয়াত, পৃ. ২০৮

৯২৯. শেফা শরীফ, পৃ. ১২০৩/১২২০, শহরে মুসলিম (নববীর) , পৃ. ৯৭, সীরাতে হালবী, পৃ. ৪৫২. মাদারেজ খণ্ড-১, পৃ. ২০৮-২০৯, আল ইয়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির, খণ্ড-১, পৃ-১২৮, আওয়ারিফুল মাআরিফ,পৃ. ৩৩৪-৩৩৫ এবং মাকতুবাতে ইমাম রাব্বানী, প্রথম দফতর, খণ্ড-৫, পৃ. ৪১-৪২

৯৩০. মুফতি আমীমূল ইহসান (র.) (১৯৭৪ সাল), কাওয়ায়েদুল ফিক্‌হ, পৃ-৩৫১

৫. নামায ধনী-গরিব সকলের উপর ফরয। পক্ষান্তরে হজ্ব ও যাকাত গরীবের উপর ফরয নয় এবং রোযা মুসাফিরের ও অসুস্থ অক্ষম ব্যক্তির উপর ফরয নয়। ৬. নামায প্রতিদিন আদায় করতে হয় পক্ষান্তরে হজ্ব জীবনে একবার আর রোযা ও যাকাত বছরে একবার। ৭. নামায নামাযীর জীবনধারা পাল্টিয়ে দেয়। নামাযীকে সর্বদা স্বীয় শরীর ও কাপড় পবিত্র রাখতে হয় এবং দিনরাত সর্বদা নামাযের চিন্তায় থাকতে হয়। সুতরাং নামাযী সর্বদা ইবাদতে ব্যস্ত থাকে। কেননা ইবাদতের চিন্তাও ইবাদত।[৯৩১]

মূলতঃ উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য দৈনিক নামায ছিল পঞ্চাশ ওয়াক্ত। মি'রাজ রাতে হযরত মূসা (আ.)'র সুপারিশক্রমে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ ওয়াক্তে কমিয়ে আনলেন। তবে আল্লাহর বানী– مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا "যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করবে তার জন্য দশগুণ অনুরূপ আমলের সাওয়াব লিপিবদ্ধ হবে।" এই নীতিমালার ভিত্তিতে পাঁচওয়াক্ত আদায় করে দশগুণ তথা পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব প্রাপ্ত হবে। নামায পাঁচওয়াক্ত হওয়ার কারণ হলো দিনে-রাতে এই পাঁচটি ওয়াক্তের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাছাড়া এই পাঁচওয়াক্ত নামায বিভিন্ন নবীগণের স্মরণ ও স্মৃতিকে জীবন্ত করে রাখে। হযরত আদম (আ.) পৃথিবীতে আগমন করে প্রথমে রাত দেখে বিচলিত হয়ে গেলেন। যখন সকাল আলোকিত হলো শোকরানাস্বরূপ দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। এটি ফযরের নামায হলো। হযরত ইব্রাহিম (আ.) নিজের প্রাণপ্রিয় পুত্রের কুরবানীর পরিবর্তে দুম্বা পেলেন। ফলে পুত্রের প্রাণ বেঁচে গেল এবং কুরবানী কবুল হওয়ার শুকরিয়াস্বরূপ চার রাকাত নামায পড়লেন। এটি যোহর হলো। হযরত উযাইর (আ.) একশ বছর পরে জীবিত হয়ে চার রাকাত নামায আদায় করেন। তা আসর হলো। কেননা তিনি আসরের সময় জীবিত হয়েছেন। হযরত দাউদ (আ.)'র তাওবা কবুল হওয়ার শুকরিয়াস্বরূপ সূর্যাস্তের পর চার রাকাতের নিয়তে নামায শুরু করেন কিন্তু তিন রাকাত পড়ে ক্ষান্ত হয়ে পড়েন এবং তিন রাকাতেই সালাম ফিরিয়ে ফেলেন। ফলে তা মাগরীব হলো এবং আমাদের নবী করিম ﷺ এশার নামায আদায় করেছেন।[৯৩২]

নামাযের বিধান

নামায ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» ইসলামের ভিত্তি হলো পাঁচটি বস্তুর উপর। প্রথমটি হলো আল্লাহর

৯৩১. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) (১৩৯১ হি.), আসরারুল আহকাম, পৃ-০৮

৯৩২. তাহাভী শরীফ, সূত্র: মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) (১৩৯১ হি.), আসরারুল আহকাম, পৃ-০৯

একত্ববাদে এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া। দ্বিতীয়টি হলো নামায প্রতিষ্ঠা করা আর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমটি হলো যথাক্রমে যাকাত আদায় করা, হজ্ব করা ও রমযান মাসে রোযা রাখা।[৯৩৩]

সাধারণত প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম নর-নারীর উপর দৈনিক নির্ধারিত সময়ে পাঁচওয়াক্ত নামায ফরযে আইন। তবে জুমার দিন যোহরের পরিবর্তে জুমার দু'রাকাত ফরযে আইন। সকল ওলামা একমত যে, পুরুষ স্বপ্ন দোষ হলে আর নারী ঋতুবর্তী হলে সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক বলে গণ্য হবে। এদের উপর নামাযসহ ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কোন মুসলমান যদি নামাযকে অস্বীকার করে কিংবা নামায সম্পর্কে হটকারীতা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ নামায যে ফরয তা কুরআন-হাদীসের অসংখ্য অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

নামায ফরয হওয়ার দলীল

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।[৯৩৪]

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে নামায প্রতিষ্ঠা করা মু'মিনদের অবশ্য কর্তব্য।[৯৩৫]

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– اعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর, পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় কর, রমযান মাসে রোযা রাখ, তোমাদের প্রতিপালকের ঘর বাইতুল্লাহ শরীফে হজ্ব আদায় কর, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় কর, তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৯৩৬]

হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।[৯৩৭]

নামাযের ফরযিয়াত, ওয়াক্ত ও রাকাতসমূহ কুরআন, হাদিস, এজমা ও কিয়াস তথা দলীল চতুষ্টয়ের দ্বারা সুপ্রমাণিত। এগুলোর কোন একটিকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

৯৩৩. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-১২
৯৩৪. সূরা বাকারা, আয়াত-৪৩
৯৩৫. সূরা নিসা,আয়াত-১০৩
৯৩৬. আল্লামা কাসানী (র.) (৫৮৭ হি), বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড-১, পৃ-৮৯
৯৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৯০

নামাযের গুরুত্ব ও ফযিলত

পবিত্র কুরআন-হাদিসে নামায সম্পর্কে এতবেশী গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে অন্য কোন আমল সম্পর্কে তা পরিদৃষ্ট হয় না। হাদিস শরীফে নামাযকে দ্বীনের স্তম্ভ বলা হয়েছে। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন–

اَلصَّلوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ فَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِيْن নামায হলো দ্বীন ইসলামের স্তম্ভ বিশেষ। সুতরাং যে নামায আদায় করল, সে নিশ্চয় মূলত; ধর্মকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করল। আর যে নামায তরক করল, সে নিঃসন্দেহে ধর্মকেই ধ্বংস করল।[৯৩৮]

নামায উত্তম আমল

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি নবী করিম ﷺকে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহর কাছে কোন আমলটি সর্বোত্তম? উত্তরে তিনি বললেন– اَلصَّلوةُ عَلى وَقْتِهَا সময়মত নামায আদায় করা।[৯৩৯]

নামায ঈমানের নিদর্শন

নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الايْمَانِ الصَّلواة প্রত্যেক কিছুর একটি নিদর্শন আছে আর ঈমানের নিদর্শন হলো নামায।[৯৪০]

নামায নামাযীকে যাবতীয় অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে

সাধারণত নামাযী ব্যক্তি সৎ, সরল এবং যাবতীয় সচ্চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকে এবং যাবতীয় মন্দ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে। কারণ নামায মুসল্লীকে যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ নিশ্চয় নামায বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে।[৯৪১]

হাদিস শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– كَانَ الرَّجُلُ يُصَلِّي الخَمْسَ مَعَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَا يَدَعُ شَيْئًا مِنَ الفَوَاحِشِ اِلاَّ اَرْتَكَبَهُ فَاخْبِرَ النبى صلى الله عليه وسلم بِذَالِكَ فَقَالَ انَّ صَلَاتَهُ تَنْهَاهُ يَوْمًا فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ تَابَ وَحَسَّنَ فَقَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ انَّ صَلَاتَهَ تَنْهَا يَوْمًا জনৈক ব্যক্তি নবী করিম ﷺএর সাথে দৈনিক পাঁচওয়াক্ত নামায আদায়

৯৩৮. ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মদ হালবী (র.) (৯৫৬ হি), শরহে মুনিয়্যাতুল মুসাল্লী, পৃ-১৬
৯৩৯. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৫৮
৯৪০. ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মদ হালবী (র.) (৯৫৬ হি), শরহে মুনিয়্যাতুল মুসাল্লী, পৃ-১৬
৯৪১. সূরা আনকাবুত, আয়াত-৪৫

করতেন কিন্তু সব ধরণের অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকতো। নবী করিম ﷺকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হলে তিনি বলেন, নিশ্চয় তার নামায তাকে একদিন তা থেকে বিরত রাখবে। কিছুদিন পর লোকটি তাওবা করল এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলো। অতঃপর নবী করিম ﷺ বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, তার নামায তাকে একদিন তা থেকে বিরত রাখবে?[৯৪২]

নামায দ্বারা গুনাহ মাফ হয়

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, الصَّلَوَاتِ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ পাঁচওয়াক্ত নামায, এক জুমা থেকে অপর জুমা এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী গুনাহসমূহ মোচনকারী, যদি নামাযী কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকে।[৯৪৩]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا তোমাদের মত কি, যদি তোমাদের কারো দরজার সামনে একটি নদী থাকে আর সে ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁচবার নদীতে গোসল করে তবে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে? উত্তরে তারা বললেন, না, তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বললেন, পাঁচওয়াক্ত নামাযও অনুরূপ। আল্লাহ তায়ালা নামাযের দ্বারা বান্দার গুনাহ মাফ করে যাবতীয় পাপ মুক্ত করে দেন।[৯৪৪]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের প্রথমাংশে। নিশ্চয় নেক কাজ গুনাহকে দূরীভূত করে দেয়।[৯৪৫]

হাদিস শরীফে ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

انَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِي هَذَا قَالَ لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ وَفِي رِوَايَةٍ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي

৯৪২. আব্দুর রহমান সফূরী (র.) (৮৯৪ হি), নুযহাতুল মাজালিস, খণ্ড-১, পৃ-৮৭
৯৪৩. মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৫৭
৯৪৪. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৫৭
৯৪৫. সূরা হুদ, আয়াত-১১৪

জনৈক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুম্বন করল অতঃপর নবী করিম ﷺ'র নিকট এসে তা ব্যক্ত করল। তখন উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! নামাযের দ্বারা গুনাহ মাফের এ সুসংবাদ কেবল আমার জন্যে? নবী করিম ﷺ বললেন, আমার সকল উম্মতের জন্য। অন্য বর্ণনায় আছে আমার উম্মতের যারাই এ আমল করবে তাদের সকলের জন্য।[৯৪৬]

হযরত আবু যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত– أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّ الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَهَافَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ নবী করিম ﷺ একদিন শীতের মৌসুমে বের হলেন। প্রচণ্ড শীতের কারণে বৃক্ষের পাতা ঝরে পড়ছে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বৃক্ষের দু'টি ডাল ধরে বললেন, হে আবু যর! আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, মুসলমান বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যখন নামায পড়ে তখন এই বৃক্ষের পাতা ঝরার ন্যায় বান্দার গুনাহ ঝড়ে পড়ে।[৯৪৭]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছি। আমাকে শরীয়ত মোতাবেক শাস্তি প্রদান করুন। তিনি তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি। নামাযের সময় হলে লোকটি রাসূল ﷺ এর সাথে নামায আদায় করল। নামায শেষে লোকটি পুনরায় দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছি। আপনি কিতাবুল্লাহর বিধান মোতাবেক আমাকে শাস্তি দিন। তিনি বললেন– أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ তুমি কি আমাদের সাথে নামায পড়নি? সে বলল, হ্যাঁ, পড়েছি। রাসূল ﷺ বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমার গুনাহ অথবা তোমার শাস্তি ক্ষমা করে দিয়েছেন।[৯৪৮]

একদিন হযরত ঈসা (আ.) ভ্রমণে বের হলেন এবং আল্লাহর কুদরতী নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করতে করতে একটি তীরে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তিনি একটি সুন্দর পাখি দেখেন যেটি নিজেকে নিজে ময়লা আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত করে নাপাক ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যেতো আবার নদীতে গিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতো। এভাবে পাখিটি পাঁচবার

৯৪৬. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৫৮
৯৪৭. মুসনদে আহমদ (র.) সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৫৮
৯৪৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৫৮

ময়লাযুক্ত হয়ে পাঁচবার নদীতে গিয়ে পাক-পবিত্র হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)এর রহস্য উদঘাটন করতে অক্ষম হয়ে পড়লে আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাইল (আ.)কে প্রেরণ করেন। তিনি ঈসা (আ.)কে সালাম দিয়ে বলেন, হে আল্লাহর নবী! পাখিটির এরূপ করার রহস্য হলো শেষ যামানার নবী মুহাম্মদ ﷺ'র উম্মতের এরূপ অবস্থা হবে। তারা আপাদ-মস্তক গুনাহের আবর্জনায় লিপ্ত হয়ে এই পাখিটির ন্যায় নামায নামের সমুদ্রে ডুব দিয়ে পাঁচবার গোসল করলে যাবতীয় গুনাহ মার্জিত হয়ে পাক-পবিত্র হয়ে যাবে।[৯৪৯]

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে– اِنَّ العَبْدَ اِذَا قَامَ اِلي الصَّلوة وَقَالَ اللهُ اَكْبَرُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ বান্দা যখন নামাযে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলে নিয়ত বাঁধে তখন সে গুনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়ে যায় যেভাবে মাতৃগর্ভ থেকে আগমনের দিন পাপমুক্ত ছিল।[৯৫০]

নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– مَنْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلى اللهِ بِقَلْبِهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার প্রতি মনোযোগের সাথে দু'রাকাত নামায আদায় করবে, সে তার গুনাহসমূহ থেকে সেদিনের মত হয়ে বেরিয়ে আসবে যেদিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছিল।[৯৫১]

ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে মারফু হাদিসে বর্ণনা করেন– إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أُتِيَ بِذُنُوبِهِ فَوَضَعَتْ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ عَاتِقِهِ فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَتْ حَتّى لَا يَبْقى مِنْهَا شَيْءٌ নিশ্চয় বান্দা যখন দাঁড়িয়ে নামায আরম্ভ করে তখন সে তার মাথা কিংবা কাঁধে গুনাহ নিয়ে আগমন করে। সে রুকু-সিজদা করার সময় ঐসব গুনাহ ঝরে পড়ে ফলে তার কোন গুনাহই অবশিষ্ট থাকেনা।[৯৫২]

নামায বালা-মুসিবত দূরীভূত করে

হযরত হোযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– كَانَ النَّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَزَنَهُ اَمْرٌ فَرَجَعَ الى الصَّلوةَ নবী করিম ﷺ কোন বিষয়ে চিন্তিত ও পেরেশান হলে নামায আদায় করতেন।[৯৫৩] কারণ নামায মু'মিনের জন্য প্রশান্তিস্বরূপ। নামাযী নামাযে দাঁড়ালে

[৯৪৯]. আব্দুর রহমান সফূরী (র.) (৮৯৪ হি), নুযহাতুল মাজালিস, খণ্ড-১, পৃ-৯০
[৯৫০]. মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ সোলায়মান আল হাছানী, নামাযের হাকীকত, পৃ-৪৭
[৯৫১]. ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (র.) (৩৭৩ হি), তানবীহুল গাফেলীন, বৈরুত, পৃ-১৭৮
[৯৫২]. আল্লামা শা'রানী (র.) (৯৭৩হি), কাশফুল গুম্মাহ, খণ্ড-১, পৃ-৬৯
[৯৫৩]. আবু দাউদ, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ-১১৭

দুনিয়াবী যাবতীয় চিন্তা মুক্ত হয়ে আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধন করে। যখন চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হতো তখন নবী করিম ﷺ তৎক্ষণাত নামাযে রত হয়ে যেতেন। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামগণও যেকোন বিপদাপদে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি মনযোগী হতেন। ফলে সমস্ত বিপদাপদ থেকে মুক্তিলাভ করতেন।

'নুযহাতুল মাজালিস' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, বনী ইসরাইলের এক মহিলা বড়ই নেককার, পরহেযগার ও নিয়মিত নামাযী ছিলেন। কিন্তু তার স্বামী ছিল বড় কাফির ও যালিম। সে তার স্ত্রীকে নামায থেকে বাঁধা দিত। কিন্তু স্ত্রী নামায ছাড়েন নি। স্বামী পরিশেষে ষড়যন্ত্র করল যেন স্ত্রীকে নামায থেকে বিরত রাখা যায়। সে কিছু জিনিস স্ত্রীকে দিয়ে বলল এগুলো ঘরের কোন স্থানে সংরক্ষণ করে রাখ। প্রয়োজন হলে তোমার থেকে চেয়ে নেবো। স্ত্রী জিনিসগুলো নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিলেন। কিছু দিন পর স্বামী জিনিসগুলো স্ত্রীর অগোচরে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। ওদিকে আল্লাহ তায়ালা তার অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন এবং তিনি তাঁর বান্দাকে কিভাবে সাহায্য করেন দেখুন। ঐ জিনিসটি সমুদ্রে একটি মাছে খেয়ে ফেলে। এক জেলের জালে মাছটি ধরা পড়লে সে বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে যায়। ঘটনাক্রমে ঐ মাছটি সেই মহিলার স্বামী ক্রয় করে এনে স্ত্রীকে রান্না করার জন্য দিল। স্ত্রী স্বামীর রাখা আমানতের জিনিস মাছের পেটে পেলেন এবং অবাক হয়ে গেলেন। অতঃপর জিনিসটি পূর্বের নির্ধারিত স্থানে সযত্নে রেখে দেন। স্বামী তার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী স্ত্রীর কাছে জিনিসটি চাইলে স্ত্রী সেটি এনে স্বামীকে দিলেন। এতে স্বামী আশ্চর্য হলো যে, এটি তো আমি সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিলাম। এটি আবার এখানে আসল কিভাবে? অত্যাচারী স্বামী ভাবল যে, নিশ্চয় এখানে স্ত্রীর কোন কারসাজি রয়েছে। সে উপদেশ গ্রহণের পরিবর্তে অত্যাচার আরো বাড়িয়ে দিল। স্ত্রীকে জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করল যাতে পুরে ছাই হয়ে যায়। আগুনে নিক্ষেপ হওয়ার সময় স্ত্রী আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করল, হে আল্লাহ! আমি সর্বদা নামায আদায় করেছি। নামাযের সাদকায় আজ আমাকে রক্ষা কর। আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেছেন জ্বলন্ত আগুনের অঙ্গারকে আল্লাহ তায়ালা শীতল করে দেন।[৯৫৪]

কিয়ামত দিবসে সবাগ্রে নামাযের হিসাব নেয়া হবে

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ

[৯৫৪]. আব্দুর রহমান সফূরী (র.) (৮৯৪ হি), নুযহাতুল মাজালিস, খণ্ড-১, পৃ-৯

لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى هذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম হিসাব গ্রহণ করা হবে নামাযের। যদি এটি নির্ভুল ও সঠিক পাওয়া যায় তাহলে সে সফলকাম হবে আর যদি এটিতে গলদ পাওয়া যায় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি তার ফরযের মধ্যে কমতি থাকে তাহলে মহান আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোন নফল আছে কিনা? এর সাহায্যে তার ফরযের কমতি পূরণ করে দাও। তারপর সমস্ত আমলের হিসাব এভাবেই হবে। ইমাম তিরমিযী (র.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে হাসান বলেছেন।[৯৫৫]

নামায মু'মিনের জন্য মি'রাজ

বান্দা যখন তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা দুনিয়াবী কাজ থেকে কান ধরে বিরত হয়ে একাগ্রচিত্তে নামাযে দাঁড়িয়ে যায় তখন সে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়। তার সূরা ফাতিহা ও কিরাত পড়া হলো আল্লাহর সাথে কথপোকথন, সে সিজদা করে আল্লাহর কুদরতী কদমে, যেমন হাদিস শরীফে আছে– اِنَّ السَّاجِدَ يَسْجُدُ فِيْ قَدَمَي الرَّحْمنِ নিশ্চয় সিজদা কারী আল্লাহর কুদরতী কদম মোবারকেই সিজদা করে।[৯৫৬] এ কারণে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন– اَلصَّلوٰاة مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ নামায মু'মিনের মি'রাজ।[৯৫৭] এজন্য নামাযে অত্যন্ত খুশু-খুযূ, পাক-পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করতে হয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন– اِنَّ العَبْدَ اِذَا قَامَ اِلي الصَّلوةِ فَاِنَّمَا هُوَا بَيْنَ يَدَيْ الرحمنِ فَاِذا الْتَفَتْ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ اِلى مَنْ تَلْتَفِتَ اِلى خَيْرٍ مِنِّى اَقْبِلْ يَا ابْنَ آدَمَ فَاَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ تَلْتَفِتُ اِلَيْهِ বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে মূলত আল্লাহ তায়ালার একেবারে সম্মুখে দাঁড়ায়। অতএব মুসল্লি যখন নামাযে আল্লাহর ধ্যান বাদ দিয়ে অন্য কোন দিকে মনযোগী হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন– তুমি কি আমার চেয়ে উত্তম কিছুর দিকে মনযোগী হচ্ছ? হে আদম সন্তান! তুমি আমারই দিকে মনযোগী হও। কারণ তুমি যেদিকে মনযোগী হচ্ছ আমি তার চেয়ে অধিক উত্তম।[৯৫৮]

---

[৯৫৫]. আল্লামা ইমাম নববী (র.) (৬৭৬ হি), রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৪৩৩, হাদিস নং-১০৮১, বৈরুত
[৯৫৬]. আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), জামেউস সগীর
[৯৫৭]. তাফসীরে রুহুর বয়ান, খণ্ড-৬, পৃ-৪৫, তাফসীরে নিশাপুরী, খণ্ড-১, পৃ-৫৩, তাফসীরে হক্কী, খণ্ড-৮, পৃ-৪৫৩
[৯৫৮]. মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ সোলায়মান আল হাছানী, নামাযের হাকীকত, পৃ-৩৩

হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন– اَلْعَبْدُ اذَا قَامَ اِلى الصَّلوةِ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوابُ السَّمَاءِ وَكُشِفَتْ لَهُ اَلْحُجُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّه تَعَالِى বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং ঐ নামাযী বান্দা ও আল্লাহর মধ্যকার পর্দা তুলে নেয়া হয়। (ফলে বান্দা অন্তর চোখে আল্লাহর নূরানী দর্শনে বিভোর হয়ে পড়ে)।[৯৫৯]

নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন– إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে দাঁড়ায় তখন সে যেন সামনের দিকে থুথু না ফেলে কেননা যতক্ষণ সে তার মুসাল্লায় থাকে ততক্ষণ সে আল্লাহর সাথে মুনাজাত তথা গোপন কথায় লিপ্ত থাকে।[৯৬০]

নামায বেহেস্তের চাবিকাঠি

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন– مِفْتَاحُ الجَنَّةِ الصَّلوة জান্নাতের চাবি হল নামায।[৯৬১]

নামায নামাযীর জন্য নূর, দলীল ও নাজাত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন– مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ যে ব্যক্তি যথাযথভাবে নামায আদায় করবে তার জন্য নামায কবর, হাশর ও পুলসিরাতে নূর বা জ্যোতি হবে (হিসাবের সময়) তার পক্ষে দলীল হবে এবং কিয়ামত দিবসে নামায তার জন্য মুক্তির সনদ হবে।[৯৬২]

নামাযের ফযিলতের উপর কেবল আহলে বাইতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস আছে, যার সূত্র হলো হযরত ইমাম জাফর সাদেক (র.) তাঁর পিতা হযরত ইমাম বাকের (র.) থেকে, তিনি তাঁর পিতা হযরত জয়নুল আবেদীন (র.) থেকে, তিনি তাঁর পিতা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) থেকে, তিনি তাঁর পিতা হযরত আলী (রা.) থেকে, তিনি নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, اَلصَّلوٰاةُ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَحُبُّ المَلَائِكَةِ وَسُنَّةُ الاَنْبِيَاءِ وَنُوْرُ المَعْرِفَةِ وَاَصْلُ الاِيْمَانِ وَاِجَابَةُ الدُّعَاءِ وَقَبُوْلُ الاَعْمَالِ وَبَرْكَةٌ فِي الرِّزْقِ وَسِلَاحٌ عَلى الاَعْدَاءِ وَلِلشَّيْطَانِ وَشَفِيْعٌ بَيْنَ صَاحِبِهَا وَبَيْنَ مَلَكِ المَوْتِ وَنُوْرٌ فِى قَلْبِهِ وَفِرَاشٌ تَحْتَ جَنَّتِهِ وَجَوابُ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ وَمُوْنِسٌ فِي قَبْرِهِ الى يَوْمِ القِيَامَةَ فَاِذا كَانَتْ القِيَامَةَ كَانَتْ الصَّلوة

---

[৯৫৯]. প্রাগুক্ত, পৃ-৩২
[৯৬০]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ-৬৯
[৯৬১]. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), মুসনাদে আহমদ
[৯৬২]. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি), মুসনাদে আহমদ, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ-৫৮

ظِلًّا فوقه وتاجًا على رأسِه وَلِبَاسًا على بدنه وَنُوْرًا يسعى بين يديْهِ وسِترًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّار وحجة للمؤمنين بين يدي ربّ العالمين وثقلًا فى المِيْزَان وجوازًا على الصراط ومفتاحًا للجنة لانّ الصلوة تحميد وتسبيح وتقديس تعظيم وقراة ودعاء وتمجيد নামায আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উপকরণ, ফেরেশ্‌তাদের প্রিয়ভাজন হওয়ার মাধ্যম, নবীগণের সুন্নত, আল্লাহর পরিচয় লাভের আলোকবর্তিকা, ঈমানের মূল, দোয়া কবুল হওয়ার উত্তম উসীলা, আমল কবুল হওয়ার উসীলা, রিযিকে বরকত হয়, শত্রু ও শয়তানের বিরুদ্ধে বড় হাতিয়ার, মৃত্যু সহজ করার জন্য আজরাঈল (আ.)কে সুপারিশকারী হবে, অন্তরে নূর হবে, জান্নাতে বিছানা হবে, কবরে মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের উত্তর হবে, কিয়ামত পর্যন্ত কবরে বন্ধু হবে, কিয়ামত দিবসে মুসল্লীর মাথার উপর ছায়া হবে, মুসল্লীর মাথার তাজ হবে, নামাযীর শরীরের পোশাক হবে, নামায আলোর মশালস্বরূপ নামাযী আগে আগে চলতে থাকবে, নামাযী ও জাহান্নামের মাঝখানে আড়াল হবে, আল্লাহর সামনে দলীলস্বরূপ উপস্থিত হবে, মীযানে ভারী হবে, পুলসিরাত পার হওয়ার ছাড়পত্র হবে এবং জান্নাতের চাবিকাঠি হবে। কেননা নামায হলো (আল্লাহর) প্রশংসা করা, তাসবীহ পড়া, পবিত্রতা বর্ণনা করা, সম্মান প্রদর্শন করা, কিরাত পড়া, দোয়া করা এবং মাহাত্ম্য প্রকাশ করা।[৯৬৩]

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, مَنْ حَافَظَ عَلى الصَّلوةِ اَكْرَمَه اللهُ بِخَمْسِ خِصَالٍ يُرْفَعُ عَنْهُ ضَيْقِ المَوْتِ وَعَذَابِ القَبْرِ وَيُعْطِيْه بِيَمِينه وَيَمُرُّ عَلى الصَّراطِ كَالْبَرْقِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بغَيْرِ حِسَابٍ যে ব্যক্তি (পাঁচওয়াক্ত) নামায আদায়ে যত্নবান হয়, আল্লাহ তাকে পাঁচটি নিয়ামত প্রদান করেন। ১. মৃত্যুর কঠিন যন্ত্রণা লাঘব করা হয়। ২. কবর আযাব তুলে নেয়া হয়। ৩. আমলনামা ডান হাতে প্রদান করা হবে। ৪. বিদ্যুৎগতিতে পুলসিরাত অতিক্রম করবে এবং ৫. বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৯৬৪]

ফজর ও আসর নামাযের ফযিলত

হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন– مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ যে ব্যক্তি দু'টি ঠাণ্ডা সময়ে তথা ফজর ও আসর নামায পড়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৯৬৫]

হযরত আবু যুহাইর উমারা ইবনে রুওয়াইবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي

৯৬৩. মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ সোলায়মান আল হাছানী, নামাযের হাকীকত, পৃ-৩৭ ও ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (র.) (৩৭৩ হি), তানবীহুল গাফেলীন, আরবী, বৈরুত, পৃ-১৭৬

৯৬৪. আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (র.) (৮৫২ হি.), আল মুনাব্বিহাত

৯৬৫. বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ ইমাম নববী (র.) (৬৭৬ হি), রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৪২৪, হাদিস নং-১০৪৭

الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজর) ও সূর্যাস্তের পূর্বে (আসর) নামায পড়ে সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবেনা। অর্থাৎ ফজর ও আসর।[৯৬৬]

হযরত বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন– مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করল তার আমল বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।[৯৬৭]

নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার ফযিলত

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنْ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ

যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, আল্লাহ তার জন্য বেহেস্তে মেহেমানদারীর আয়োজন করেন। যতবার সে সকালে বা সন্ধ্যায় যায় ততবারই।[৯৬৮]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন– مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً যে ব্যক্তি নিজের ঘর থেকে পবিত্রতা অর্জন করে আল্লাহর কোন একটি ঘরের দিকে যায় আল্লাহর ফরযসমূহ থেকে কোন একটি ফরয আদায় করার জন্য, তখন তার এক পদক্ষেপে একটি গুনাহ মাফ হয় এবং অপর পদক্ষেপে তার এক ধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি হয়।[৯৬৯]

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মসজিদে নববীর চারপাশে কিছু খালি জায়গা ছিল। বণি সালেমা গোত্র (সেই জমি কিনে) মসজিদের কাছে স্থানান্তরিত হতে চাইল। এ সংবাদ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর কাছে পৌঁছলে তিনি তাদের বললেন– আমরা জানতে পারলাম, তোমরা নাকি মসজিদের সন্নিকটে স্থানান্তরিত হতে চাও। তারা বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এরকম ইচ্ছে করছি। তিনি বললেন, يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ হে বনী সালেমা! তোমরা তোমাদের নিজেদের বর্তমানে স্থানেই অবস্থান কর। তোমাদের মসজিদে আসা-যাওয়ার পদক্ষেপগুলো লিখিত হচ্ছে। এ কথা শুনে তারা বলল, তাহলে আমাদের স্থানান্তরিত হওয়ায় মধ্যে আমাদের

৯৬৬. মুসলিম, সূত্রঃ ইমাম নববী (র.) (৬৭৬ হি), রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৪২৪, হাদিস নং-১০৪৮

৯৬৭. বুখারী, সূত্রঃ প্রাগুক্ত, পৃ-৪২৫, হাদিস নং-১০৫২

৯৬৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ ইমাম নববী (র.) (৬৭৬ হি), রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৪২৬, হাদিস নং-১০৫৩

৯৬৯. মুসলিম, সূত্রঃ প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১০৫৪

কি-ইবা আনন্দিত করতে পারে?[৯৭০] উক্ত হাদিস শরীফ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া-আসার প্রতি কদমে সাওয়াব লিখা হয়। যত দূর থেকে মসজিদে আসবে তত বেশী সাওয়াব প্রাপ্ত হবে।

হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ নিশ্চয় নামাযের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রতিদান পাবে সেই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে বেশী দূর থেকে হেঁটে নামাযে আসে। অতঃপর যে আরো বেশী দূর থেকে আসবে, সে আরো বেশী প্রতিদান পাবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে (জামাআতে) নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশী প্রতিদান পায়, যে একাকী নামায পড়ে অতঃপর ঘুমিয়ে পড়ে।[৯৭১]

হযরত বুরাইদা (রা.) নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, بَشِّرْ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অন্ধকারে পায়ে হেঁটে মসজিদে আগমনকারীগণকে কিয়ামত দিবসের পরিপূর্ণ আলোর সুসংবাদ দাও।[৯৭২]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় জানাব না, যার মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহসমূহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? সাহাবায়ে কিরামগণ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন– إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ অসুবিধাজনক অবস্থায় পরিপূর্ণ উযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী পদক্ষেপ করা এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করা এটিই হচ্ছে তোমাদের সীমান্ত প্রহরা, এটিই হচ্ছে তোমাদের সীমান্ত প্রহরা।[৯৭৩]

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى{ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } যখন তোমরা কোন লোককে মসজিদে যাতায়াতে অভ্যস্ত দেখ তখন তার ঈমানদারীর সাক্ষ্য দাও। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- কেবল তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করে, যারা আল্লাহর উপর এবং শেষদিনের উপর ঈমান এনেছে।[৯৭৪]

---

৯৭০. প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১০৫৬
৯৭১. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃ-৪২৭, হাদিস নং-১০৫৭
৯৭২. আবু দাউদ ও তিরমিযী, সূত্র: প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১০৫৮
৯৭৩. মুসলিম, সূত্র: প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১০৫৯
৯৭৪. সূরা তাওবা,আয়াত-১৮, ইমাম তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। (তিরমিযী, সূত্র: প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১০৬০

নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযিলত

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– إِنَّ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ তোমাদের কোন ব্যক্তি নামায পড়ার পর নিজের জায়নামাযে (পরবর্তী নামাযের জন্য) বসে থাকে তার উযূ না ভাঙ্গা পর্যন্ত ফেরেশ্তারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। ফেরেশ্তারা বলেন, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন, হে আল্লাহ! তাকে দয়া করুন।[৯৭৫]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এক রাতে রাসূল ﷺ এশার নামায মধ্যরাত পর্যন্ত বিলম্ব করে পড়লেন। নামাযের পর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন– صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا সকল লোক নামায পড়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু তোমরা যখন থেকে নামাযের অপেক্ষায় আছ তখন থেকে নামাযের মধ্যেই আছ। অর্থাৎ নামাযের জন্য অপেক্ষা করা নামায আদায়ের সমান সওয়াব।[৯৭৬]

জামাআতে নামায পড়ার ফযিলত

জামাআতের সাথে নামায আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং ওয়াজিবের কাছাকাছি। পবিত্র কুরআনে নামাযের ব্যাপারে -وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ তথা নামায কায়েম কর বলেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো সম্মিলিতভাবে জামাআতের সাথে নামায প্রতিষ্ঠা কর। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন– وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ তোমরা রুকুকারীদের তথা নামাযীদের সাথে নামায আদায় কর।[৯৭৭]

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً জামাআতের সাথে নামায পড়া একাকী নামায পড়ার চেয়ে সাতাশগুণ বেশী মর্যাদাপূর্ণ।[৯৭৮]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক অন্ধ ব্যক্তি নবী ﷺ এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন কোন লোক নেই যে আমাকে মসজিদে আনা-নেয়া করতে পারে। সে রাসূল ﷺ'র কাছে আবেদন করল যেন মসজিদে না এসে ঘরে নামায পড়তে পারে। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। যখন লোকটি

---

৯৭৫. বুখারী, সূত্র: ইমাম নববী (র.), (৬৭৬ হি), রিয়াদুস সালেহীন, বৈরুত, পৃ-৪২৮, হাদিস নং-১০৬২
৯৭৬. বুখারী, সূত্র: প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১০৬৩
৯৭৭. সূরা বাকারা, আয়াত-৪২
৯৭৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: ইমাম নববী (র.) (৬৭৬ হি), রিয়াদুস সালেহীন, বৈরুত, পৃ-৪২৮, হাদিস নং-১০৬৪ ও মিশকাত শরীফ, পৃ-৯৫

চলে যাচ্ছিল তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আযান শুনতে পাও? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তুমি সাড়া দাও। অর্থাৎ জামাআতের সাথে নামায পড়ার জন্য মসজিদে চলে এসো।[৯৭৯]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম মুয়াযযিন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মদীনায় বিষাক্ত প্রাণী ও হিংস্র পশুর যথেষ্ট উৎপাত দেখা যাচ্ছে। (ফলে মসজিদে না আসার কোন সুযোগ আছে কিনা?) রাসূল ﷺ বললেন, তুমি যখন হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ শুনবে তখন নামাযের জন্য চলে আসবে।[৯৮০] উক্ত হাদিসদ্বয়ে নবী করিম ﷺ অন্ধ সাহাবীকেও মসজিদে না আসার অনুমতি দেননি এবং পথঘাট অনিরাপদ হলেও মসজিদে এসে জামাআতে নামায পড়ার তাগীদ দিয়েছেন।

হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি– যে গ্রাম বা জনবসতিতে তিনজন লোকও অবস্থান করে, অথচ তারা জামাআতে নামায প্রতিষ্ঠা করে না, তাদের উপর শয়তান সওয়ার হয়ে যায়। সুতরাং জামাআতে নামায পড়া তোমাদের জন্য আবশ্যক। কেননা দলছুট বকরীকেই বাঘে ধরে খায়।[৯৮১]

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি– مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআতের সাথে পড়ল সে যেন অর্ধরাত অবধি নামায পড়ল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ল সে যেন সারা রাত নামায পড়ল।[৯৮২]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا যদি তারা এশা ও ফজরের নামাযের মধ্যে কী ফযিলত আছে তা জানত, তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দু'টি নামাযের জামাআতে শামিল হত।[৯৮৩]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে চল্লিশ দিন যাবৎ জামাআত সহকারে প্রথম

৯৭৯. মুসলিম, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৪২৯, হাদিস নং-১০৬৬ ও মিশকাত শরীফ, পৃ-৯৫
৯৮০. আবু দাউদ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৯৭ ও রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৪২৯, হাদিস নং-১০৬৭
৯৮১. আবু দাউদ ও নাসাঈ, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৪৩০, হাদিস নং-১০৭০ ও মিশকাত শরীফ, পৃ-৯৬
৯৮২. মুসলিম ও তিরমিযী, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৪৩১, হাদিস নং-১০৭
৯৮৩. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৪৩১, হাদিস নং-১০৭২

তাকবীরের সাথে নামায পড়বে, তার জন্য দু'টি মুক্তি লেখা হবে। এক. জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং দুই. মুনাফেকী থেকে মুক্তি।[৯৮৪]

হযরত আবু বকর ইবনে সুলায়মান (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন হযরত ওমর (রা.) ফজরের জামাআতে সুলায়মান ইবনে আবু হুসামাহ (রা.)কে দেখেন নি। ওমর (রা.) সকালে বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। আর সুলায়মান (রা.)'র ঘর ছিল মসজিদ ও বাজারের মধ্যবর্তী স্থানে। হযরত ওমর (রা.) সুলায়মান (র.)'র মাতার সাথে সাক্ষাত করেন এবং তার ছেলে সকালে ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে না যাওয়ার কারণ জানতে চাইলেন। মাতা বলল, সে সারারাত ইবাদতে মশগুল ছিল। সকালে প্রচণ্ড ঘুম আসাতে ঘুমিয়ে পড়ল, যার ফলে জামাআতে শামিল হতে পারেনি। তখন ওমর (রা.) বললেন, لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً ফজরের নামায জামাআতে আদায় করা আমার নিকট সারা রাত ইবাদত করার চেয়ে উত্তম ও প্রিয়।[৯৮৫]

জামাআত পরিত্যাগ করার পরিণতি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি কাল কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাথে মুসলিম হিসাবে সাক্ষাত করতে ভালবাসে তার সেই সব নামাযগুলোর গুরুত্ব দেয়া কর্তব্য, যেগুলোর জন্য আযান দেওয়া হয়। কারণ আল্লাহ তোমাদের নবী ﷺএর জন্য কিছু হিদায়তের বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নামায এই হিদায়তের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যদি তোমরা নিজেদের ঘরে নামায পড়তে থাক, যেমন এই সব ব্যক্তি জামাআত ছেড়ে নিজেদের ঘরে একাকী নামায পড়ে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর বিধান ত্যাগ করলে। আর তোমাদের নবীর বিধান ত্যাগ করলে অবশ্যই তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে। আমরা আমাদের লোকদের এমন অবস্থা দেখছি যে, তাদের মধ্যে একমাত্র পরিচিত মুনাফিক ছাড়া আর কেউ জামাআত ত্যাগ করতো না। আর কোন কোন লোক এমনও আছে যে, দু'জন লোকের সহায়তায় তাকে (মসজিদে) আনা হত এবং নামাযের কাতারে দাড় করিয়ে দেয়া হত।[৯৮৬]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ, অবশ্যই আমি সংকল্প করেছি, আমি কাঠ সংগ্রহ করার নির্দেশ দেবো, তারপর নামাযের আদেশ দেবো এবং এজন্য আযান দেয়া হবে। আর আমি ঐ

৯৮৪. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-১০২
৯৮৫. ইমাম মালিক (র.) (১৭৯ হি) সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৯৭
৯৮৬. মুসলিম, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৪৩০, হাদিস নং-১০৬৯ ও মিশকাত শরীফ, পৃ. ৯৬-৯৭

সব লোকদের নিকট যাব যারা জামাআতে উপস্থিত হয়নি এবং তাদের বাড়ী-ঘর তাদের সামনেই জ্বালিয়ে দেবো।[৯৮৭]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى যে ব্যক্তি আযান শুনে মসজিদে আসতে অপারগ হয় এবং কোন ওযরও না থাকে তাহলে তার একাকী মসজিদবিহীন আদায়কৃত নামায কবুল করা হবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ওযর কি? উত্তরে তিনি বললেন, ভয় ও রোগ-ব্যাধি।[৯৮৮]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– যদি জামাআত ত্যাগকারীদের ঘরে নারী ও শিশু সন্তান না থাকত তবে আমি ঐসব ঘর জ্বালিয়ে ফেলতে নির্দেশ দিতাম।[৯৮৯]

জামাআত পরিত্যাগকারীর মৃত্যুর পর বিষাক্ত সাপের আযাব

হযরত আবু বকর (রা.)'র সময়কালে জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হলে লোকেরা জানাযা নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হল। হঠাৎ তারা অনুধাবন করল যে, তার কাফনের ভিতর কি যেন নড়াচড়া করছে। লোকেরা দেখল যে, তার গলায় ভেড়ীর ন্যায় পেঁচিয়ে আছে একটি বিষাক্ত সাপ। সেটি তার গোশত খাচ্ছে আর রক্ত পান করছে। লোকেরা যখন সেটাকে মারতে চাইল তখন সাপ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ বলে বলতে লাগল আমাকে কেন মারছেন? আমার কোন অপরাধ নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা আমাকে হুকুম দিয়েছেন যেন তাকে কিয়ামত পর্যন্ত আযাব দেই। লোকেরা বলল, তার অপরাধ কি? সাপ বলল– ثَلَاثُ خَطَايَا الْأُوْلَى كَانَ اذا سَمِعَ الاَذَانَ لَا يُحَيِّ الجَمَاعَةَ وَالثَّانِيَةُ لَا يُخْرِجُ الزَّكواةَ مِنْ مَالِه والثَّالِثَةُ لَا يُسْمَعُ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ وَهَذَا جزائُهُ তার তিনটি গুনাহ রয়েছে। একটি হলো যখন সে আযান শুনত জামাআতে নামাযের জন্য মসজিদে যেতো না। দ্বিতীয়টি হলো– সে তার সম্পদের যাকাত দিতনা এবং তৃতীয়টি হলো সে আলেমদের কথা শুনত না। সুতরাং তার শাস্তি এটিই।[৯৯০]

'আল-মানার' গ্রন্থে বলা হয়েছে, জামাআত সহকারে নামায আদায় করা হলো আদায়ে কামেল বা পরিপূর্ণ আদায় আর একাকী নামায পড়া হলো আদায়ে কাসের তথা অসম্পূর্ণ আদায়। এর ব্যাখ্যায় মোল্লা জীওন (র.) বলেন– فَانَّهُ ادَاءٌ عَلى حَسْبِ مَا شُرِعَ فَانَّ

৯৮৭. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৪২৯, হাদিস নং-১০৬৮ ও মিশকাত শরীফ, পৃ-৯৫
৯৮৮. আবু দাউদ ও দারে কুতনী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৯৬
৯৮৯. মুসনদে আহমদ (র.), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৯৭
৯৯০. দুররাতুন নাসেহীন, পৃ-৩০৭, সূত্র: মাওয়ায়েযে রেজভীয়্যাহ, পৃ-১০০

الصَّلوة مَا شُرِعَتْ الا بِجَمَاعَةٍ لِاَنَّ جِبْرِئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَ الرَّسُوْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالجَمَاعَةِ فِي يَوْمَيْنِ কেননা জামাআতে নামায আদায় করা হলো শরীয়ত সম্মত আদায়। কারণ নামায জামাআত সহকারে শরীয়তের বিধান হয়েছে। জিব্রাইল (আ.) রাসূল ﷺকে দু'দিন যাবৎ নামাযের তালীম দিয়েছিলেন জামাআত সহকারে।[৯৯১]

জামাআতে নামাযের উদ্দেশ্যে দৈনিক পাঁচবার মসজিদে যাওয়া-আসা করলে শারিরীক ব্যায়াম হয়ে যায় শরীরের সুস্থতার জন্য অত্যন্ত উপকারী। তাছাড়া একই ইমামের অনুগত ও অনুসরণের মাধ্যমে জামাআতে নামায পড়লে শৃঙ্খলাবোধ ও আনুগত্যের প্রশিক্ষণ হয়। মুসল্লিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় এবং মুসলিম ঐক্যের ভীত সুদৃঢ় হয়। এছাড়াও ইহকালীন ও পরকালীন আরো অনেক উপকারীতা রয়েছে। সুতরাং নামায পরিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামায আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপরিহার্য।

নামায তরক করার পরিণতি

নামায তরক করা কবীরা গুনাহ এবং অস্বীকার করা কুফরী। কোন অবস্থাতেই নামায পরিত্যাগ করা জায়েয নেই। নামায তরককারীকে সাহাবায়ে কিরাম কুফরী মনে করতেন। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে– فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا অতঃপর তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং অচিরেই জাহান্নামের গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে।[৯৯২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন غى জাহান্নামের একটি গুহার নাম। জাহান্নামও এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, غى জাহান্নামের একটি গর্তের নাম। এতে সমগ্র জাহান্নামের চেয়ে অধিক আযাবের সমাবেশ রয়েছে। নামায তরককারীদের সেই গর্তে নিক্ষেপ করা হবে।

কুরআনে আরো বলা হয়েছে, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না।[৯৯৩]

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি– মানুষের এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায ত্যাগ করা।[৯৯৪]

৯৯১. আবুল বারাকাত নসফী (র.) ও মোল্লা জীওন (র.), নুরুল আনোয়ার, পৃ-৪০
৯৯২. সূরা মরিয়ম,আয়াত-৫৯
৯৯৩. সূরা মুদ্দাস্‌সির, আয়াত. ৪২-৪৩
৯৯৪. মুসলিম, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৪৩৩, হাদিস নং-১০৭৮

হযরত বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ , فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» আমাদের এবং তাদের (মুনাফিক) মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে তা হচ্ছে নামায। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল সে কুফরী করল।[৯৯৫]

হযরত শফীক ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, যিনি একজন তাবেঈ ছিলেন এবং যার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সবাই একমত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺএর সাহাবীগণ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করা কুফরী মনে করতেন না। অর্থাৎ তারা নামায ত্যাগ করাকে কুফুরী মনে করতেন।[৯৯৬]

হযরত মুয়ায ইবনে জাবল (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তম্মধ্যে একটি হল, وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا؛ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ ফরয নামাযকে ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিওনা। কেননা যে ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায ছেড়ে দেবে সে আল্লাহর দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।[৯৯৭]

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– الَّذِي يَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিল সে স্বীয় পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত হল।[৯৯৮]

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ، وَلَا بُرْهَانًا، وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ، وَفِرْعَوْنَ، وَهَامَانَ، وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ আর যে ব্যক্তি নামায সংরক্ষণ করবেনা নামায তার জন্য নূর, দলীল এবং মুক্তিদানকারী হবে না। আর কিয়ামত দিবসে তার হাশর হবে কারূন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে।[৯৯৯]

মাজালীসুল আবরার গ্রন্থে বর্ণিত আছে, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– مَنْ تَرَكَ الصَّلواةَ مَضَى وَقْتِهَا ثُمَّ قَضَى عُذِّبَ فِى النَّار حَقْبًا وَالحَقْبُ ثَمَانُوْنَ سَنَةً والسَّنَةُ ثَلَاثُ مأة وَسِتُّوْنَ يَوْمًا كُلُّ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ যে ব্যক্তি অবহেলাবশত নামায তরক করল ফলে

৯৯৫. প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১০৭৯
৯৯৬. তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৪৩৩, হাদিস নং-১০৮০
৯৯৭. আহমদ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-১৮
৯৯৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৬০
৯৯৯. আহমদ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫৮-৫৯

নামাযের ওয়াক্ত চলে গেল অতঃপর নামায কাযা আদায় করল, তাকে জাহান্নামে এক 'হাকবা' পরিমাণ সময় শাস্তি ভোগ করতে হবে। এক 'হাকবা' পরিমাণ হবে (পরকালের হিসাবে) আশি বছরের সমান। আর প্রত্যেক বছর হবে ৩৬০ দিনের এবং প্রতিটি দিন হবে (দুনিয়ার) এক হাজার বছরের সমান। এ হিসাবে তিন লক্ষ ষাট হাজার বছরের সমান হবে পরকালের এক বছর। এ অনুপাতে পরকালের আশি বছর হবে দুনিয়াবী দু' কোটি আটাশি লক্ষ বছরের সমান। এটা কেবল এক ওয়াক্ত নামায অবহেলা বশত কাযা করলে। আর ইচ্ছাকৃত ভাবে তরক করলে কত 'হাকবা' দোযখের আগুনে জ্বলতে হবে তা আল্লাহই ভাল জানেন।

বর্ণিত আছে যে, একদিন নবী করিম ﷺ তাঁর সাহাবীদের সাথে বসে আছেন। এ সময় এক আরব্য যুবক কাঁদতে কাঁদতে মসজিদের দরজায় এসে দাঁড়াল। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, হে যুবক! তুমি কাঁদছ কেন? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন। তাকে গোসল দেওয়ার ও কাফন পরিধান করানোর কোন লোক নেই। তিনি হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)কে পাঠান। তারা গিয়ে দেখেন মৃত ব্যক্তির চেহারা কালো শুকরের ন্যায় হয়ে গেল। তাঁরা রাসূল ﷺএর নিকট এসে আরয করলেন, আমরা তাকে কাল শুকরের ন্যায় দেখছি। অতঃপর নবী করিম ﷺ মৃতের কাছে দাঁড়িয়ে দোয়া করেন ফলে সে পূর্বের ন্যায় হয়ে গেল। তারপর তিনি তার জানাযা পড়ালেন। লোকেরা তাকে দাফন করতে গিয়ে দেখেন তার চেহারা পুনরায় কাল হয়ে গেছে। তখন রাসূল ﷺ যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার পিতা দুনিয়াতে কি কাজ করত? যুবক বলল– كَانَ تَارِكُ الصَّلواةِ فَقَالَ يَا اَصْحَابِى اُنْظُرُوا حَالَ مَنْ تَرَكَ الصَّلواةَ يَبْعَثُهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِثْلَ الخِنْزِيْرِ الأَسْوَدِ نَعُوْذُ بِاللهِ تَعَالِي مِنْهُ তিনি জীবদ্দশায় নামায তরককারী ছিলেন। অতঃপর নবী করিম ﷺ বললেন– হে আমার সঙ্গীরা! তোমরা বে-নামাযীর অবস্থা দেখ, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বেনামাযীকে কাল শুয়রের ন্যায় উঠাবে। আমরা আল্লাহর কাছে তা থেকে আশ্রয় চাই।[১০০০]

নামাযে খুশু-খুযূ তথা বিনয় ও একাগ্রতা

নামাযে বিনয় ও একাগ্রতাকে খুশু-খুযূ বলা হয়। এটি নামাযের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আল্লাহ তায়ালা বলেন–قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ নিশ্চয়ই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র।[১০০১]

১০০০. বাহজাতুল আনওয়ার, সূত্র: মাওয়ায়েযে রেজভীয়্যাহ, খণ্ড-১, পৃ-১২৮
১০০১. সূরা মু'মিনুন, আয়াত. ১-২

خشوع শব্দের আভিধানিক অর্থ হল স্থিরতা। পরিভাষায় অন্তর এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতাকে خشوع বলা হয়। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– خشوع হল অন্তরের ভয় এবং শরীরের স্থিরতা। অর্থাৎ নামাযে অন্তর এবং শরীরকে স্থির রাখা, হাত, পা, চোখ ইত্যাদি এদিকে-সেদিকে নাড়াচাড়া না করা। নবী করিম ﷺ এক ব্যক্তিকে নামাযে দাড়ি নিয়ে খেলতে দেখে বললেন–«لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ» যদি ঐ ব্যক্তির অন্তরে খুশু থাকত। তবে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো স্থির থাকত।[১০০২]

ইমাম কুরতুবী (র.) নামাযে খুশু ফরয বলেছেন। কিন্তু ইমাম নববী (র.) বলেছেন সুন্নাত। আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, নামাযে খুশু পরিত্যাগ করা মাকরূহ। নামায শুদ্ধ হলেও নামায কবুল হওয়ার জন্য খুশু শর্ত। হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْخُشُوعُ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً তোমাদের দ্বীন থেকে প্রথমে যা হারাবে তা হল খুশু আর শেষে যা হারাবে তা হল নামায। আর ইসলামের বাঁধনগুলো একটি একটি করে এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে।[১০০৩]

হাকীম তিরমিযী হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– إِذَا قَامَ أَحَدكُمْ فِيْ الصَّلواة فَلْيُسْكِنْ أَطْرَافَه لَا يَتَمَيَّلُ تَمَيَّلُ الْيَهُود فَإِنَّ سُكُونَ الْأَطْرَافِ فِي الصَّلواة مِنْ تَامِ الصَّلواة তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ালে যেন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো স্থির রাখে। ইহুদীদের ন্যায় নামাযে না হেলে। কেননা নামাযে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতা নামায পূর্ণাঙ্গ হওয়ার কারণ।[১০০৪]

নামাযে অলসতা প্রদর্শন করা মুনাফেকীর আলামত

আল্লাহ তায়ালা বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا নিশ্চয় মুনাফিকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুত তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায় একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।[১০০৫] অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন– فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্পর্কে

১০০২. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), শুআবুল ঈমান
১০০৩. মুস্তাদরাক, লিল হাকেম
১০০৪. রুহুল মায়ানী
১০০৫. সূরা নিসা, আয়াত-১৪২

বেখবর।[১০০৬] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে।[১০০৭]

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যদি কোন ব্যক্তি ওয়াক্ত মত নামায আদায় করে, নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে উযূ করে এবং কিয়াম, রুকু ও সিজদা ইত্যাদি খুশু-খুযূর সাথে আদায় করে তবে তার নামায দীপ্তিময় উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং নামাযীর জন্য এ বলে দোয়া করতে থাকে, তুমি যেমনিভাবে আমার হিফাযত করলে আল্লাহ তায়ালাও অনুরূপভাবে তোমার হিফাযত করুন। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি ওয়াক্ত মত নামায আদায় না করে, পরিপূর্ণভাবে উযূ না করে এবং রুকু-সিজদা ইত্যাদি খুশু-খুযূর সাথে আদায় না করে তবে তার এ নামায কৃষ্ণবর্ণ হয়ে উঠে এবং এই মর্মে বদদোয়া করে যে, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন, যেমন তুমি আমাকে ধ্বংস করলে। তার এ নামাযকে পুরানো কাপড়ের মত পেছিয়ে তার মুখে সজোরে নিক্ষেপ করা হয়।[১০০৮]

ধীর-স্থিরভাবে নামায আদায় করা

ধীর-স্থিরভাবে নামায আদায় করা খুশু-খুযূর অন্তর্ভুক্ত। অন্তরে খুশু-খুযূ থাকলেই নামাযে ধীর-স্থিরতা আসে। আর এটি ইমাম শাফেঈ (র.)'র মতে, ফরয। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (রা.)'র মতে ওয়াজিব। নামাযে তাড়াহুড়া করা মুনাফিকের চরিত্র। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا সে সূর্যের অপেক্ষায় বসে থাকে। যখন সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখানে থাকে, তখন উঠে দ্রুত চারটি ঠোকর মারে অর্থাৎ তাড়া-হুড়া করে চারটি সিজদা দিয়ে দু'রাকাত নামায পড়ে। সে নামাযে অল্পই আল্লাহর যিকর করে। অর্থাৎ তাসবীহ ইত্যাদি কম করেন।[১০০৯]

ধীর-স্থিরের সাথে নামায আদায় না করলে নামায পরিপূর্ণভাবে আদায় হয়না। নবী করিম ﷺ এক মুসল্লীকে তাড়াহুড়া করে রুকু-সিজদা যথাযথভাবে আদায় না করে নামায পড়তে দেখে তাকে পুনরায় নামায পড়তে নির্দেশ দেন এবং তাড়া-হুড়া করে আদায়কৃত নামায হয়নি বলে উল্লেখ করেন।[১০১০]

১০০৬. সূরা মাউন; ৪-৫
১০০৭. সূরা তাওবা, আয়াত-৫৪
১০০৮. তাবরানী ও ইবনে হাজর মক্কী (র.) জাওয়াজির, খণ্ড-১, পৃ-১৬৬
১০০৯. মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ: ৬০
১০১০. বুখারী ও মুসলিম সুত্র: মিশকাত শরীফ পৃ:৭৫

হযরত হোযাইফা (রা.) রুকু-সিজদা পরিপূর্ণভাবে অনাদায়কারী এক মুসল্লীকে দেখেন। নামায শেষে তাকে ডেকে বলেন, তুমি নামায পড়নি। অর্থাৎ তোমার নামায হয়নি।[১০১১]

হযরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, সবচেয়ে বড় চোর হল যে তার নামাযে চুরি করে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে তার নামাযে কিভাবে চুরি করে? قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا তিনি বলেন- সে নামাযে রুকু-সিজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করেনা।[১০১২]

আনীসুল ওয়ায়েযীন গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে– একদিন হযরত আলী (রা.)'র পায়ের গোড়ালীতে তীরবিদ্ধ হয়েছিল। লোকেরা অনেক চেষ্টা করেও সেটি বের করতে পারেনি। কিন্তু যখন নামাযে দাঁড়ালেন তখন সেই তীর লোকেরা বের করে আনেন কিন্তু তিনি নামাযে এতই ধ্যানে মগ্ন ছিলেন যে, তার মোটেই খবর ছিলনা। খুশু-খুযূ হলো নামাযের প্রাণ। প্রাণবিহীন দেহের যেমন কোন মূল্য নেই তেমনি খুশু-খুযূ বিহীন নামাযের আল্লাহর কাছে কোন মূল্য নেই। হাদিস শরীফে আছে, اعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও, তবে এতটুকু মনে কর যে, অন্তত তিনি তোমাকে দেখছেন। নামাযে দাঁড়ানো আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো। নামাযে সিজদা করা মানে হল আল্লাহর কদমে সিজদা করা। সুতরাং অত্যন্ত বিনয়, নম্র ও আদবের সাথে এবং ধীর-স্থিরভাবে নামাযের আরকানসমূহ আদায় করতে হবে যাতে মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার সামনে কোন ধরণের বেয়াদবী পরিলক্ষিত না হয়। তবেই এই নামায আল্লাহ কবুল করবেন এবং এর পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন।

মসজিদ

মসজিদ আল্লাহর ঘর। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতর স্থান। মসজিদকে কেন্দ্র করেই মানুষের উপর আসমানী রহমত বর্ষিত হয়। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের উত্তরসূরী অলি-আল্লাহগণ এ মসজিদকে কেন্দ্র করেই নিজেদের দাওয়াত ও হিদায়াতের কাজ সম্পাদন করতেন। তবে পূর্বকালে মসজিদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। শেষ নবীর কদমের উসিলায় আল্লাহ তায়ালা সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে মসজিদ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়েছেন। হেদায়াতের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে মসজিদ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সকল অধ্যায়ের সঙ্গে

১০১১. বুখারী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ:৮৩
১০১২. মুসনদে আহমদ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ:৮৩

জড়িত। রাসূল ﷺ'র যুগে প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ কাজসহ বিয়ে শাদী ও দৈনন্দিন নামায আদায় মসজিদেই সম্পাদিত হত। মসজিদ নির্মার্ণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো আল্লাহর ইবাদত ও যিকর করা, মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ কায়েম করা, তাদের পরস্পরের মধ্যে সহমর্মিতা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করা। মসজিদ মানুষের অন্তরের পবিত্রতার অনুভূতি সৃষ্টি করে। কারণ এতে অপবিত্র অবস্থায় প্রবেশের অনুমতি নেই। সুতরাং সকল মুসলমানের মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

মসজিদের সংজ্ঞা: الموضع الذى يسجد منها وبيت الصلواة وهو اصطلاحا الارض التى جعلها المالك مسجدًا بقوله جعلته مسجدًا وافرز طريقة واذن بالصلواة فيه فان صلى واحد زال ملكه মসজিদ হলো সিজদা করার স্থান এবং নামাযের ঘর। পরিভাষায় ঐ স্থানকে মসজিদ বলা হয়, যার মালিক এই বলে বানিয়ে দিল যে, আমি ওটাকে মসজিদ বানালাম এবং ঐ স্থানে যাওয়ার রাস্তাও পৃথক করে দেয় এবং নামায পড়ার জন্য অনুমতি দিয়ে দেয়। যদি একজনও নামায পড়ে তাহলে মালিকের মালিকানা চলে যাবে।[১০১৩]

মসজিদ নির্মাণ, পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ

মসজিদ আল্লাহর ঘর। আল্লাহ নিজে এসে যেমন মসজিদ নির্মাণ করেন না ঠিক তেমনি তার পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনাও নিজে করেন না। বরং যারা তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং তদানুযায়ী কাজ করে তারাই মসজিদ নির্মাণ ও এর পরিচালনা করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ কেবল তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি এবং নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় ও আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। তাদেরই সৎ পথপ্রাপ্তির আশা আছে।[১০১৪]

আল্লাহর ঘরে আল্লাহর কথা নিঃসংকোচে বলার অধিকার থাকবে। কারো অনুরাগ কিংবা রাগের বশবর্তী হয়ে আল্লাহর নির্দেশের খেলাফ কোন কথা বলা যাবে না এবং কোন কাজ করা যাবে না। মসজিদে ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের কোন এখতিয়ার নেই। একমাত্র কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী মসজিদ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রিত হবে।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঈমান ও আমল শর্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন– مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ এমন হতে পারেনা

১০১৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র.), কাওয়ায়েদুল ফিকহ্, পৃ-৪৮৩
১০১৪. সূরা তাওবা, আয়াত-১৮

যে, মুশরিকরা আল্লাহর মসজিদ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করবে যখন তারা নিজেদের কুফরী স্বীকৃতিদাতা। তাদের সকল কর্ম নিষ্ফল এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে থাকবে।[১০১৫]

মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– مَنْ بَنَى لِلَّه مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّة যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।[১০১৬]

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَان، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} তোমরা যখন কোন ব্যক্তিকে মসজিদ নির্মাণ ও পরিচর্যা করতে দেখ, তখন তোমরা তার ঈমান সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পার। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন, কেবল সেই ব্যক্তিই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে, যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে।[১০১৭]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, «أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا» আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় স্থান হল মসজিদসমূহ আর সবচেয়ে অপছন্দনীয় হল বাজারসমূহ।[১০১৮]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, «إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الجَنَّةِ فَارْتَعُوا». قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللَّه وَمَا رِيَاضُ الجَنَّة؟ قَالَ: «المَسَاجِدُ»، قِيْلَ: وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّه وَالحَمْدُ للَّه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» যখন তোমরা জান্নাতের বাগান অতিক্রম কর তখন তার ফলসমূহ ভোগ কর। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের বাগান কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন মসজিদসমূহ হল জান্নাতের বাগান। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল হে আল্লাহর রাসূল! এর ফল ভোগ করার অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলেন– (মসজিদে বসে নিম্মোক্ত দোয়া পাঠ করা)[১০১৯] «سُبْحَانَ اللَّه وَالحَمْدُ للَّه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ»

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে মসজিদ ছাড়া সমস্ত পৃথিবী বিলীন হয়ে যাবে। আর এই মসজিদসমূহ একটি অপরটির সাথে মিলিত হয়ে এক স্থানে অবস্থান করবে। অর্থাৎ মসজিদসমূহ ধ্বংস হবে না।[১০২০]

১০১৫. সূরা তাওবা, আয়াত-১৭
১০১৬. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ,পৃ-৬৮
১০১৭. তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৬৯
১০১৮. মুসলিম,সূত্র: মিশকাত শরীফ,পৃ-৬৮
১০১৯. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৭০
১০২০. তিবরানী, কানযুল উম্মাহ

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মসজিদের সাথে ভালবাসা রাখে আল্লাহ তায়ালাও তার সাথে ভালবাসা রাখেন।[১০২১]

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবসে বলবেন, আমার প্রতিবেশীরা কোথায়? ফেরেশ্তারা বলবেন,আপনার প্রতিবেশী কারা? আল্লাহ বলবেন, মসজিদ সমূহকে আবাদকারীরা হচ্ছে আমার প্রতিবেশী।[১০২২]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর ঘর হল মসজিদ। আল্লাহ নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন যে, তার ঘরে আগমনকারীকে সম্মান করা অর্থাৎ ক্ষমা ও দয়া করা।[১০২৩]

মসজিদের আদব

মসজিদ পবিত্র স্থান। তাই মসজিদের পবিত্রতা বজায় রাখা প্রত্যেক মুসল্লীর কর্তব্য। মুশরিকরা যেহেতু নাপাক তাই মসজিদে প্রবেশ করা তাদের জন্য অনুমতি নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র, সুতরাং এ বছরের পর যেন তারা মসজিদুল হারামের কাছেও না আসে।[১০২৪]

মুসল্লী মসজিদে যাওয়ার সময় পাক-পবিত্র হয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে সম্ভব হলে সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে যাবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার সময় সুন্দর পোশাক পরিধান করবে।[১০২৫]

আল্লাহ আরো বলেন, وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ আমি ইব্রাহিম ও ইসমাঈলকে আদেশ দিয়েছিলাম আমার ঘর পবিত্র রাখতে।[১০২৬]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– «أَمَرَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ» রাসূল ﷺ মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ

১০২১. তিবরানী, সূত্র: নামাযের হাকীকত, পৃ-৪৩২ ও আল জামেউস সগীর লিস সুয়ূতী, সূত্র: শরহে মুসলিম, খণ্ড-২, পৃ-৩১
১০২২. হুলিয়াতুল আউলিয়া, সূত্র: শরহে মুসলিম, খণ্ড-২, পৃ-৩২
১০২৩. তিবরানী, আল-মু'জামুল কবীর, সূত্র: শরহে মুসলিম, খণ্ড-২, পৃ-৩২
১০২৪. সূরা তাওবা, আয়াত-২৮
১০২৫. সূরা আরাফ, আয়াত-২৯
১০২৬. সূরা বাকারা,আয়াত-১২৫

নির্মাণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি আরো নির্দেশ দিয়েছেন, মসজিদসমূহ যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা হয়।[১০২৭]

যেসব খাদ্য ও পানীয় বস্তু পানাহার করলে মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ হয় সে সব বস্তু পানাহার করে মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى، مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ» যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধময় বৃক্ষ (পিঁয়াজ) খাবে সে যেন মসজিদের কাছে না আসে। কেননা যেসব কারণে মানুষের কষ্ট হয় ঐসব কারণে ফেরেশ্তাদেরও কষ্ট হয়।[১০২৮]

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «مَنْ أَخْرَجَ أَذًى مِنَ الْمَسْجِدِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু বিদূরিত করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।[১০২৯]

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করিম ﷺ বলেছেন, مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ যে ব্যক্তি কাঁচা রসূন কিংবা কাঁচা পিঁয়াজ খেলো, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে এবং সে যেন তার ঘরে বসে থাকে।[১০৩০]

হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– তোমরা মুক্ত রাখবে তোমাদের মসজিদকে তোমাদের শিশুদের, তোমাদের উন্মাদদের, তোমাদের অনিষ্টকারী দুষ্টদের, তোমাদের ক্রয়-বিক্রয়, তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ, তোমাদের উচ্চকণ্ঠ, তোমাদের শাস্তির বিধান ও তোমাদের তলোয়ারবাজী থেকে। তোমরা মসজিদের দ্বারে উযূর পানির ব্যবস্থা রাখবে এবং মসজিদের সমাবেশ সুগন্ধিময়ী রাখবে।[১০৩১]

হযরত আমর ইবনে শু'আইব (রা.) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর পিতামহ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে, হারানো বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন।[১০৩২] ই'তিকাফের নিয়ত ব্যতীত মসজিদে পানাহার করা ও নিদ্রা যাওয়া মাকরূহ।

১০২৭. আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৬৯
১০২৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ৬৮-৬৯
১০২৯. ইবনে মাজাহ, সুনান, বাবু তাতহীরিল মাসাজিদ, সূত্র: ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা, বা.ই.ফা, পৃ-৬৫
১০৩০. বুখারী শরীফ, সূত্র: ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা, বা.ই.ফা, পৃ-৭২
১০৩১. ইবনে মাজাহ, সুনান, সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃ-৬৭
১০৩২. মিনহায, পৃ-৬৬৭, সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃ-৭২

يُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ اَكَلٌ وَنَوْمٌ اِلَّا الْمُعْتَكِف ই'তিকাফকারী ব্যতীত অন্যদের জন্য মসজিদে আহার করা এবং নিদ্রা যাওয়া মাকরূহ।[১০৩৩]

হযরত আবু উসাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, সে যেন তখন নবীর উপর সালাম পেশ করে অতঃপর বলবে হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন। তারপর যখন বের হবে, তখন বলবে হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার দয়া প্রার্থনা করি।[১০৩৪]

মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাকাত 'দুখুলুল মসজিদ' নফল নামায পড়া মসজিদের আদবের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» তোমাদের কেউ যখন মসজিদে আসবে, সে যেন উপবেশনের পূর্বে দু'রাকাত (নফল) নামায আদায় করে নেয়।[১০৩৫]

এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ

▪ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.)	১/২২ রজব	৬০ হিজরি
▪ হযরত নকী আলী খান (র.)	২ রজব	
▪ ইমাম শাফেঈ (র.)	১/৪ রজব	২০৪ হিজরি
▪ হযরত মুছা কাযেম (র.)	২ রজব	১৮৬ হিজরি
▪ হযরত মঈন উদ্দীন চিশতী (র.)	৬ রজব	৬৩২ হিজরি
▪ হযরত শাম্স তিবরিযী (র.)	৯ রজব	
▪ হযরত আব্বাস (রা.)	১২ রজব	৩২ হিজরি
▪ হযরত আজিজুল হক শেরে বাংলা (র.)	১২ রজব	১৩৮৯ হিজরি
▪ ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.)	১৩ রজব	২০৯ হিজরি
▪ হযরত জাফর সাদেক (র.)	১৫ রজব	১৪৮ হিজরি
▪ হযরত জুনাইদ বোগদাদী (র.)	২৭ রজব	২৯৭ হিজরি
▪ ইমাম মুসলিম (র.)	২৪ রজব	২৬১ হিজরি
▪ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযিয (র.)	রজব	১০১ হিজরি
▪ ইমাম কুদুরী (র)	রজব	৪২৮ হিজরি

১০৩৩. আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী, ফত্ওয়া, খণ্ড-১, পৃ-১৯৪, সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃ-৭৪
১০৩৪. ইমাম মুসলিম, মুসলিম শরীফ, পৃ-২৫১, দারমী, সুনান, খণ্ড-১, পৃ-৩২৪, সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃ-৬৪
১০৩৫. বুখারী ও মুসলিম, কিতাবুস সালাত, সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃ-৬৪

শাবান

শাবান মাসের ফযিলত

শাবান মাস রজব ও রমযান মাসের মধ্যবর্তী মাস। এর পূর্বের মাস রজব হল সম্মানিত চার মাসের এক মাস আর পরের মাস হল সর্বোত্তম মাস রমযান মাস। শাবান শব্দের অর্থ হল শাখা-প্রশাখা। অর্থাৎ বৃদ্ধির উপর বৃদ্ধি হওয়া। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে এ মাসের নাম শাবান রাখার কারণ হল এ মাসে রোযা পালনকারী শাখা-প্রশাখার ন্যায় বেশী সাওয়াব প্রাপ্ত হয়। ফলে এ মাসের রোযাদার জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১০৩৬]

হযরত ওসামা ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! إِنِّي أَرَاكَ تَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا لَا أَرَاكَ تَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا تَصُومُ فِيه، قَالَ: «أَيُّ شَهْرٍ؟» قُلْتُ: شَعْبَانُ، قَالَ: «شَعْبَانُ بَيْنَ رَجَبٍ وَشَهْرِ رَمَضَانَ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، تُرْفَعُ فِيه أَعْمَالُ الْعِبَادِ، فَأُحِبُّ أَنْ لَا يُرْفَعَ عَمَلِي إِلَّا وَأَنَا صَائِمٌ আমি আপনাকে একটি মাসে এত বেশী রোযা রাখতে দেখি অন্য মাসে এভাবে রোযা রাখতে দেখিনা। নবী করিম ﷺ বললেন, কোন মাসে? আমি বললাম, শাবান মাসে। তিনি বললেন, শাবান হলো রজব ও রমযান মাসের মধ্যবর্তী মাস। এ মাসে মানুষ অলস থাকে। অথচ এ মাসে বান্দার আমলসমূহ উঠানো হয়। অতএব আমি পছন্দ করি যে, আমার আমল যখন উঠানো হবে তখন আমি রোযাদার থাকি।[১০৩৭]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, أَحَبُّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ، ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ রাসূল ﷺএর কাছে প্রিয় মাস হল শাবান মাস। এ মাসে তিনি রোযা রাখতেন অতঃপর রমযান মাসে পৌঁছে যেতেন।[১০৩৮]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " صَوْمُ شَعْبَانَ تَعْظِيمًا لِرَمَضَانَ " قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ কেউ জিজ্ঞাসা করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন রোযা উত্তম? তিনি বললেন, শাবান মাসের রোযা উত্তম (নফল) রমযানের সম্মানার্থে। জিজ্ঞাসা করল– কোন সাদকা উত্তম? তিনি বললেন, রমযান মাসের সাদকা উত্তম।[১০৩৯]

[১০৩৬]. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), মা ছাবাতা বিস্‌সুন্নাহ, পৃ-১৮৮
[১০৩৭]. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), ফাযায়েলুল আওকাত, পৃ-১১৬, হাদিস নং-২১
[১০৩৮]. প্রাগুক্ত, পৃ-১১৩, হাদিস নং-১৯
[১০৩৯]. প্রাগুক্ত, পৃ-১১৪, হাদিস নং-২০

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ " রাসূল ﷺ একাধারে (এতবেশী) রোযা রাখতেন (শাবান মাসে) আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর রোযা পরিত্যাগ করবেন না। আবার কখনো এমনভাবে রোযা ছেড়ে দিতেন, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর রোযা রাখবেন না। আমি রাসূল ﷺকে রমযান ব্যতীত কোন পুরা মাসে রোযা রাখতে দেখিনি এবং শাবান মাসের চেয়ে কোন মাসে বেশী রোযা রাখতে দেখিনি।[১০৪০]

উক্ত হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী করিম ﷺ রমযান মাসের পর সবচেয়ে বেশী রোযা রাখতেন শাবান মাসে।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ শাবান মাসে বেশী রোযা রাখতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে শাবান মাসে বেশী রোযা রাখতে দেখেছি। উত্তরে তিনি বললেন– انَّ هذَا الشهرَ يُكْتَبُ فِيه لِمَلَكِ الْمَوْتِ مَنْ يَقْبِضُ فأنا لا اُحِبُّ اَنْ يُنْسَخَ اِسْمِى اِلاَّ وَاَنَا صَائِمٌ এ মাসে কারা কারা মৃত্যুবরণ করবে, তাদের তালিকা আজরাঈল (আ.)কে প্রদান করা হয়। অতএব আমি চাই যে, আমার নামটি লিপিবদ্ধ হোক রোযাদার অবস্থায়।[১০৪১]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ اِذَا دَخَلَ شَعْبَانُ اَكِبُوا على المصَاحِفِ فَقَرَؤوهَا শাবান মাস আসলে মুসলমানগণ কুরআনের প্রতি মনোনিবেশ দিত অতঃপর কুরআন তিলাওয়াত করত।[১০৪২]

মোটকথা হল রমযান মাসের পরিপূর্ণ ফযায়েল ও বরকত অর্জনের জন্য শাবান মাস থেকে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। রোযা, নামায, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদত করে ইবাদতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে রমযানে ভালভাবে ইবাদত বন্দেগীর পূর্ণস্বাদ লাভ করতে পারবে।

মন্দ কাজ

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয় اخلاق حسنه তথা চারিত্রিক গুণের উৎকর্ষতার মাধ্যমে। সৎচরিত্রের দ্বারা যেমন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব

[১০৪০]. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), খণ্ড-১, পৃ-২৬৪, হাদিস নং-১৮৪৪
[১০৪১]. আবু ইয়ালা (র.) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে ৮/৩১১-৩১২/৪৯১১, সূত্র: লাতায়েফুল মাআরিফ, খণ্ড ১, পৃ-২১৯
[১০৪২]. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫ হি), লাতায়েফুল মাআরিফ, খণ্ড-১, পৃ-২২১

লাভ করে তেমনি অসৎ চরিত্র দ্বারা হাইওয়ান তথা জীবজন্তুর চেয়ে নিকৃষ্ট হয়ে যায় মানুষ। মন্দ চরিত্রের লোককে কেউ পছন্দ করে না এমনকি অতি আপনজনও তাকে ঘৃণা করে। ফলে মন্দ কাজগুলো চিহ্নিত করে সম্পূর্ণ পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন। আর এই মন্দ কাজগুলো হচ্ছে হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, পরনিন্দা, অহংকার, মিথ্যা, রিয়া, রাগ, তোষামোদ, গালি-গালাজ, মদ, জুয়া ইত্যাদি। এইসব মন্দ কাজের খারাপ পরিণতি সম্পর্কে কুরআন-হাদিসে বিশদ বর্ণনা রয়েছে এবং ঐগুলো পরিত্যাগ করার কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মন্দ কাজের পরিচিতি ও পরিণতি সম্পর্কে কোরান-হাদিসের আলোকে নিম্নে আলেচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

হাসাদ

حسد তথা হিংসা-বিদ্বেষ। **حسد** শব্দের অর্থ হলো কারো নেয়ামত ও সুখ দেখে দগ্ধ হওয়া ও তার অবসান কামনা করা। ইমাম নবভী (র.) বলেন, অন্যের প্রাপ্ত নেয়ামতের অপসারণ কামনা করাই হল হাসাদ।[১০৪৩]

এই হিংসা হারাম ও মহাপাপ। শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী (র.) বলেন আসমানে সর্বপ্রথম সংঘটিত গুনাহ হিংসা যা অভিশপ্ত শয়তান থেকে প্রকাশিত হয়েছে আদম (আ.) এর বিরুদ্ধে আর পৃথিবীতেও সর্বপ্রথম সংঘটিত গুনাহ হিংসা যা আদম (আ.)এর পুত্র হাবীলের বিরুদ্ধে কাবিল থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[১০৪৪] এই হিংসার কারণেই হযরত ইউসূফ (আ.)কে তার ভাইয়েরা স্বীয় পিতা ইয়াকুব (আ.) থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছেদ করে রেখেছিল। ইহুদি-নাসারা দ্বীন ইসলামকে অস্বীকার করেছে হিংসার কারণে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا অর্থাৎ আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশত চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোন রকমে কাফির বানিয়ে দেয়।[১০৪৫] হিংসার কারণেই রাসূল ﷺ এর উপর যাদু করা হয়েছিল। তাই কুরআনে বলা হয়েছে– وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি) হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।[১০৪৬] হিংসা এমন এক মারাত্মক ব্যাধি যার কোন ঔষধ নাই, চিকিৎসা নাই। হিংসুক নিজেই হিংসার আগুনে জ্বলে সর্বদা। হিংসার আগুন অপরকে পুড়াতেও পারে না পুড়াতেও পারে কিন্তু সে আগুনে হিংসুক নিজে জ্বলবে এতে কোন সন্দেহ নাই। হিংসুকের কোন ইবাদত আল্লাহর দরবারে

১০৪৩. রিয়াদুস সালেহীন পৃ. ৫৯১
১০৪৪. তাফসীরে আজিজি ২৯৭ পৃষ্ঠা
১০৪৫. সূরা বাকারা, আয়াত-১০৯
১০৪৬. সূরা ফালাক, আয়াত-৫

কবুল হওয়া তো দূরের কথা পৌঁছবেও না। কেননা হিংসা হিংসুকের যাবতীয় ইবাদত নষ্ট করে দেয়। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাক। কেননা হিংসা মানুষের সৎকর্মসমূহকে খেয়ে (নষ্ট করে) ফেলে, যেমনিভাবে আগুন খেয়ে ফেলে কাঠকে।[১০৪৭] অন্যত্র নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– «لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ» তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে রেখো না, তোমরা আল্লাহর বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রতি তিনদিনের বেশী সময় পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা জায়েয নাই।[১০৪৮] নবী করিম ﷺ হিংসা-বিদ্বেষকে দ্বীন মুণ্ডনকারী মারাত্মক ব্যাধি হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ،وَالْبَغْضَاءُ: هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের ব্যাধি তোমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে তা হল হিংসা-বিদ্বেষ। এটি মুণ্ডনকারী ব্যাধি। নবী ﷺ বলেন, আমি চুল মুণ্ডনকারী বলছিনা বরং দ্বীন মুণ্ডনকারী।[১০৪৯]

ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেন– হযরত মূছা (আ.) একদিন এক ব্যক্তিকে আরশে আ'জমের ছায়ায় দেখে আল্লাহর কাছে আরয করলেন– হে আল্লাহ! এই ভাগ্যবান ব্যক্তি কে? উত্তর দিলেন– তিনটি আমল দ্বারা সে নৈকট্য অর্জন করেছে। (১) সে কখনো কারো প্রতি হিংসা করেনি। (২) সে কোন দিন পিতা-মাতার অবাধ্য হয়নি। (৩) সে কোন দিন চোগলখোরী করেনি।[১০৫০]

হিংসুক উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। হিংসুকের হিংসার কারণে হিংসাকৃত ব্যক্তির নেয়ামত বন্ধ হবে না বরং বাড়বে। ফলে যত নেয়ামত বাড়বে তত হিংসুকের অন্তরের জ্বলন বেড়ে যাবে। হিংসার আগুন অন্যকে জ্বালাবে কিনা সন্দেহ কিন্তু হিংসুককে জ্বালাবে নিঃসন্দেহে। কারো নিয়ামত দেখে হিংসা হওয়া মানে আল্লাহর বণ্টনে নারাজ হওয়া। ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেন– হযরত যাকারিয়া (আ.) এর বাণী: আল্লাহ তায়ালা বলেন– আমার বান্দার প্রতি প্রদত্ত নেয়ামত দেখে হিংসা করা মানে আমার বণ্টনে নারাজ

১০৪৭. আবু দাউদ
১০৪৮. বুখারী ও মুসলিম
১০৪৯. মেশকাত, ৪২৮ পৃষ্ঠা
১০৫০. ইমাম গাজ্জালী (র.), এয়াহ ইয়াউল উলুম

হওয়া।[১০৫১] আল্লাহর কাজে নারাজ হওয়া কুফরী। আর পরকালের ক্ষতি হল দুনিয়ায় হিংসার কারণে তার সব আমল নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে কিয়ামত দিবসে আমলবিহীন উঠবে। অথবা হিংসুকের আমল হিংসাকৃত ব্যক্তির আমলনামায় লিখা হবে ফলে হিংসুককে আমলবিহীন অবস্থায় জাহান্নামে যেতে হবে। হিংসা এমন এক ভয়ঙ্কর ব্যাধি যে, অজ্ঞ লোক তো বটেই, বড় বড় সাধক দরবেশকেও কব্জ করে নেয়। এমনকি তাদেরকে দুনিয়াতে সর্বনাশ করে পরকালে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেয়। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, ছয় প্রকারের লোক ছয়টি কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আরবগণ স্বজনপ্রীতির কারণে, আমীর উমরার দল নির্যাতন-নিপীড়নের কারণে, ব্যবসায়ীগণ খেয়ানতের কারণে, পল্লীবাসীরা মূর্খতার কারণে এবং পীর ও আলেমগণ হিংসার কারণে।[১০৫২]

ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেন, হিংসা সাধারণত পাঁচটি ক্ষতি করে। যথা: (১) পূণ্য বিনষ্ট করে। (২) পাপ ও নাফরমানীর প্রেরণা যোগায়। (৩) দুশ্চিন্তার উদ্ভয় ঘটায়। অধিকন্তু পাপ বৃদ্ধি করে। (৪) হিংসার প্রভাবে হিংসুকের হৃদয় দৃষ্টিহীন হয়ে যায়। (৫) অবমাননা ও লাঞ্ছনার অভিশাপ ডেকে আনে।[১০৫৩] অতএব হিংসা সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য, তবে ঈর্ষা জায়েয। ঈর্ষা বলা হয় নেয়ামতের অধিকারী ব্যক্তির নেয়ামত ধ্বংস কামনা না করে নিজেই অনুরূপ নেয়ামত লাভের প্রত্যাশা করা। যেমন কারো ধন দৌলত, জ্ঞান-গরিমা, তাকওয়া পরহেজগারী দেখে ওদের মত নিজের জন্যও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। এটা মন্দ নয় বরং উত্তম। যেমন হাদিস শরীফে আছে– আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা নবীও নন শহীদও নন কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদের মর্যাদা দেখে নবীগণ ও শহীদগণ আল্লাহর কাছে ঈর্ষা করবেন।[১০৫৪] তাই হিংসা পরিত্যাগ করে ঈর্ষা গ্রহণ করে দুনিয়া আখেরাতের সফলতা অর্জনে সর্বদা প্রচেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন।

রিয়া

রিয়া শব্দের অর্থ হল লোক দেখানো। মূলত মানুষকে উত্তম চরিত্র দেখিয়ে তাদের অন্তরে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করাকে রিয়া বলে। ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেন– লোক দেখানো ইবাদতের মাধ্যমে নিজের মহত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করাই হল রিয়া। জেনে রেখো রিয়া হারাম আর রিয়াকারী আল্লাহ তায়ালার নিকট অভিশপ্ত।[১০৫৫] রিয়া এক

[১০৫১]. খুৎবাতে গাজ্জালী, পৃষ্ঠা-১০২
[১০৫২]. ইমাম গাজ্জালী (র.), মিনহাযুল আবেদীন, বাংলা, পৃষ্ঠা-১১৬
[১০৫৩]. প্রাগুক্ত
[১০৫৪]. মেশকাত, পৃষ্ঠা–৪২৬
[১০৫৫]. ইমাম গাজ্জালী (র.), তাশকীলে কিরদার, উর্দু, পৃ.১৭৬

প্রকারের ধোঁকা ও প্রতারণা বিধায় হারাম। রিয়াকারীর অন্তরে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ভয়ের চেয়ে দুর্বল বান্দার ভয় বেশী। আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান হওয়ার চেয়ে বান্দার নিকট মর্যাদাবান হওয়ার প্রবণতা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এমনকি রিয়াকারী আল্লাহকে বাদ দিয়ে বান্দাকে খুশী করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। এদিক দিয়ে রিয়াকারী বান্দাকে আল্লাহর চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়। ফলে এটা শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এইজন্য নবী করিম ﷺ রিয়াকে শিরকে আসগর বা শিরকে খফী বলেছেন। হিংসার ন্যায় এটাও অন্তরের ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক ব্যাধি। এই ব্যাধি থেকে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা বড় বড় সূফী সাধকগণও বাঁচতে পারেনি। ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেন, রিয়াকারী একজন বান্দাহকে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আল্লাহর চেয়ে বড় শক্তিশালী মনে করে অথবা বান্দার নৈকট্য অর্জন করা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেয়ে বেশী উত্তম মনে করে। নতুবা এমন রাজাধিরাজ মহান আল্লাহর উপর অন্যকে কেন প্রাধান্য দেবে?[১০৫৬] আল্লাহ তায়ালা ও নবী করিম ﷺ যথাক্রমে কুরআন ও হাদিস শরীফে এই মারাত্মক অন্তর ব্যাধি থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীদের যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বেখবর; যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয়না।[১০৫৭] রিয়া মুনাফিকের অভ্যাস। তারা ইসলামী রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা ভোগের জন্য মুসলমানদের দেখানোর জন্য নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত বন্দেগী করতো। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন তাদের উদ্দেশ্য ছিলনা। আল্লাহ পাক বলেন– إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا অবশ্যই মুনাফিকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুতঃ তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায় একান্ত শিথিলতা ও লোক দেখানোর জন্য– আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।[১০৫৮]

নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– ان ادنى الرياء شرك নিশ্চয় বিন্দু পরিমাণ রিয়াও শিরক।[১০৫৯] হযরত সাদ্দাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন হুযূর ﷺ এর খেদমতে হাজির হলাম। তাঁর চেহারা মোবারক বিষন্ন দেখে জিজ্ঞাসা করলাম এর কারণ কি? তিনি বললেন আমার পরে উম্মত মুশরিক হওয়ার সম্ভাবনা করছি। আমি

[১০৫৬]. ইমাম গাজ্জালী (র.), তাশকীলে কিরদার, উর্দু, পৃ. ১৮৩
[১০৫৭]. সূরা মাউন, আয়াত ৪-৭
[১০৫৮]. সূরা নিসা, আয়াত ১৪২
[১০৫৯]. ইমাম গাজ্জালী (র.), তাশকীলে কিরদার, উর্দু, পৃ. ১৭৮

বললাম হুযূরের পরে কি উম্মত শিরকে লিপ্ত হবে? উত্তরে হুযূর ﷺ বললেন, তারা তো নিশ্চয় চন্দ্র-সূর্য, পাথর মূর্তিপূজা করবেনা তবে আমলে রিয়া করবে। আর রিয়াই হল শিরক। অতঃপর এই فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا আয়াত তিলাওয়াত করেন।[১০৬০] নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশী ভয় করছি তাহল শিরকে আসগর। উপস্থিত সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! শিরকে আসগর কি? উত্তরে বললেন– الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ يُجَازَى الْعِبَادُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ خَيْرًا؟ শিরকে আসগর হল রিয়া। আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবসে যখন বান্দাদের আমলের প্রতিদান দেবেন তখন রিয়াকারীদের বলবেন তোমরা প্রতিদানের জন্য ঐসব ব্যক্তিদের কাছে যাও যাদেরকে দেখানোর জন্য আমল করেছিলে।[১০৬১] রিয়াকারীর কোন আমল আল্লাহ কবুল করবেন না। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَمَلًا فِيهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ رِيَاءٌ আল্লাহ এমন আমল কবুল করবে না যার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ রিয়া থাকবে।[১০৬২] রাসূল ﷺ আরো এরশাদ করেন– কিয়ামতের দিন মোহরাঙ্কিত করা কিছু আমলনামা আনা হবে তখন আল্লাহ ফেরেশ্তাদেরকে বলবেন ঐ আমলনামাকে নিক্ষেপ করে দাও। ফেরেশ্তা আল্লাহর দরবারে আরয করবেন হে আল্লাহ আপনার ইজ্জত ও জালালের কসম, আমাদের তো ঐ আমলনামা ভালই মনে হচ্ছে। আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ, কিন্তু ঐ আমল তো অন্যের জন্য করেছে। আমি শুধু ঐসব আমল গ্রহণ করি যা খালেসভাবে শুধু আমার জন্যই করেছে।[১০৬৩] হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মাখলুকের ফায়সালা করবেন। প্রত্যেক দল তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হবেন। তখন আল্লাহ কুরআন তেলাওয়াতকারী ক্বারী, শহীদ এবং সম্পদশালীদের তলব করবেন। প্রথমে ক্বারীকে জিজ্ঞেস করবেন তুমি যা জানতে তা মোতাবেক কতটুকু আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে আমি দিবা-রাত্রি নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ বলবেন– তুমি মিথ্যা বলেছ। এতে তোমার উদ্দেশ্য ছিল লোকে তোমাকে ক্বারী বলুক। সুতরাং তোমাকে ক্বারী বলা হয়েছে। তারপর ধনীকে আহবান করবেন এবং বলবেন আমি যা কিছু তোমাকে দিয়েছি তা তুমি কোথায় খরচ

[১০৬০]. সূরা কাহাফ, আয়াত- ১১০; গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দু, পৃ. ৪৫১
[১০৬১]. ইমাম গাজ্জালী (র.), তাসকীলে কিরদার, উর্দু, পৃ. ১৭৮
[১০৬২]. প্রাগুক্ত
[১০৬৩]. আব্দুল কাদের জিলানী (র.), গুনিয়াহ, উর্দু, পৃ. ৪৫১

করেছ? উত্তরে সে বলবে তা আমি গরীব আত্মীয়-স্বজনের জন্য খরচ করেছি এবং দান খয়রাত করেছি। আল্লাহ বলবেন তুমি মিথ্যুক। ঐসব কাজে তোমার উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে দানশীল বলা। সুতরাং তোমাকে দানশীল বলা হয়েছে। অতঃপর শহীদদের আহবান করে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কেন জিহাদে শরীক হয়েছ এবং কেন মারা গিয়েছ? উত্তরে বলবে হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য তোমার রাস্তায় জিহাদ করেছি। শেষ পর্যন্ত জিহাদে মৃত্যুবরণ করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তোমার উদ্দেশ্য এটা ছিলনা বরং তোমার উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে বীর বাহাদুর বলা। সুতরাং তোমাকে বাহাদুর বলা হয়েছে। এ কথা বলার পর রাসূল ﷺ আফসোস করে বললেন– হে আবু হোরায়রা! কিয়ামতের দিন সৃষ্টির মধ্যে এই তিন প্রকারের লোকই সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।[১০৬৪]

রিয়াকারী প্রতারক

রিয়া এক ধরনের প্রতারণা। রিয়াকারী কেবল মানুষের সাথে নয় স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার সহিত প্রতারণা করতে চায়। তাই সেই বড় প্রতারক। জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺকে জিজ্ঞাসা করলেন কিয়ামত দিবসে আমার নাজাতের উসিলা কি হবে? উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, তুমি আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করোনা। লোকটি বলল, আমি কিভাবে আল্লাহকে ধোঁকা দেবো? নবী করিম ﷺ বললেন– (ধোঁকার নিয়ম হল) কাজতো আল্লাহ যা হুকুম করেছেন তাই করবে কিন্তু উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু। রিয়া থেকে বেঁচে থাক, কেননা রিয়া হচ্ছে শিরক। কিয়ামত দিবসে সমস্ত মাখলুকের সামনে রিয়াকারীদেরকে চারটি নামে ডাকা হবে (১) হে কাফের (২) হে পাপী (৩) হে দাগাবাজ এবং (৪) হে ক্ষতিগ্রস্থ! তোমার সমস্ত আমল বরবাদ, তোমার প্রতিদান হয়ে গিয়েছে। আজ তোমার জন্য কিছুই নেই। হে প্রতারক! তুই যার জন্যে আমল করেছিলে আজ তার কাছ থেকে সওয়াব আদায় কর।[১০৬৫] আরো বর্ণিত আছে যে, রোজ কিয়ামতে এরূপ একটি প্রকাশ্য ঘোষণা শুনা যাবে যে, তারা আজ কোথায় যারা মানুষের ইবাদত করত? দাঁড়িয়ে যাও এবং যাদের ইবাদত করতে তাদের নিকট থেকেই প্রতিদান গ্রহণ কর।[১০৬৬]

রিয়াকারীর জন্য বেহেশ্ত হারাম

রিয়া মুনাফিকের চরিত্র। আর মুনাফিকের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। তাছাড়া রিয়াকে যেহেতু মহানবী শিরক বলেছেন সেহেতু রিয়াকারী হবে মুশরিক। আর এর জন্য বেহেশত চিরস্থায়ী ভাবে হারাম। ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ

[১০৬৪]. আব্দুল কাদের জিলানী (র.), গুনিয়াহ, উর্দু, পৃ. ৪৫৩
[১০৬৫]. আব্দুল কাদের জিলানী (র.), গুনিয়াহ, উর্দু, পৃ. ৪৫৫
[১০৬৬]. ইমাম গাজ্জালী (র.), মিনহাযুল আবেদীন, বাংলা, পৃ. ২৩২

করেন– কিয়ামত দিবসে বেহেশত কথা বলার শক্তি পাবে এবং ঘোষণা করে জানিয়ে দেবে যে, কৃপণ ও রিয়াকারীদের জন্য আমি হারাম।[১০৬৭] গাউসে পাক (র.) বলেন– হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– আল্লাহ তায়ালা যখন জান্নাতে আদমকে সৃষ্টি করলেন তন্মধ্যে এমন নিয়ামত সমূহ সৃষ্টি করেছেন যা না কোন চোখে দেখেছে, না কোন কানে শুনেছে, না কোন মানুষের অন্তরে খেয়াল এসেছে। তারপর তাকে বললেন– হে আদন! তোমার কিছু বলার থাকলে আমাকে বল। তখন জান্নাতে আদন বলবে– قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْن মু'মিনরাই সফলকাম তারপর বলবে, আমি প্রত্যেক কৃপণ ও রিয়াকারের উপর হারাম।[১০৬৮]

হযরত আদি ইবনে হাতেম (রা.) বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন কিছু লোককে কঠিন আযাব দেয়া হবে। আল্লাহ তাদেরকে বলবেন– তোমরা আমার সামনে বড় বড় গুনাহ করতে কিন্তু যখন মানুষের সাথে মিলতে তখন নম্র–ভদ্র হয়ে যেতে। তোমরা লোকদেরকে ভয় করতে কিন্তু আমাকে ভয় করতে না, তোমরা লোকদেরকে বড় মনে করতে আমাকে বড় মনে করতে না। আমার ইজ্জতের শপথ! আজ আমি তোমাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি দেবো।[১০৬৯]

রিয়া থেকে বাঁচার উপায়

আগেই বলা হয়েছে যে, রিয়া আমলকে নষ্ট করে দেয়, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে দেয় পরকালে জাহান্নামী বানিয়ে দেয় এবং এটি একটি অদৃশ্য মারাত্মক অন্তর ব্যাধি। সুতরাং এই ব্যাধি থেকে প্রত্যেক মুসলমানকে বেঁচে থাকতে হবে। রিয়া থেকে বাঁচার উপায় হল– **প্রথমত:** রিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে যেহেতু অন্যের কাছ থেকে মান-মর্যাদা প্রশংসা ইত্যাদি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে বিধায় প্রথমে রিয়াকারের অন্তর থেকে ঐ ধ্বংসশীল আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো ধুয়ে মুছে ফেলে দিতে হবে। **দ্বিতীয়ত:** রিয়া হল ইখলাসের বিপরীত। অর্থাৎ যার অন্তরে রিয়া আছে তার অন্তরে ইখলাস নাই। ইখলাস অর্জন করলে রিয়া দূরীভূত হবে। সুতরাং ইখলাসের মাধ্যমে রিয়া থেকে বাঁচা সম্ভব। **তৃতীয়ত:** যেহেতু এসব গুনাহের মূল উৎসাহ প্রদানকারী হল নফস শয়তান। সেহেতু সর্বদা তার বিপরীত কাজ করতে হবে। ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেন– ইবাদতেচ্ছু ব্যক্তির চতুর্থ শত্রু হল নফসে আম্মারা। সুতরাং তাকে এই শত্রুর আওতা থেকে পরিত্রাণ লাভ করা একান্ত জরুরী এবং তা ভারী কঠিন। **চতুর্থত:** এই ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য আরেক উপায় হল হক্কানী রাব্বানী আলেমে দ্বীন ও পীর-মোর্শেদের সান্নিধ্যে গিয়ে তাযকিয়ায়ে নফস বা

[১০৬৭]. ইমাম গাজ্জালী (র.), মিনহাযুল আবেদীন, বাংলা, পৃ. ২৩২
[১০৬৮]. আব্দুল কাদের জিলানী (র.), গুনিয়াহ, উর্দু, পৃ. ৪৫৫
[১০৬৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪

আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ করা। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– তোমরা এমন আলেমের মজলিসে বস যিনি পাঁচটি (ধ্বংসাত্মক) বস্তু থেকে নিস্কৃতি দিয়ে পাঁচটি (কল্যাণকর) বস্তুর প্রতি উৎসাহিত করেন। যথা: ১. দুনিয়ার প্রেম থেকে বের করে তাকওয়া পরহেজগারীর প্রতি উৎসাহিত করে। ২. রিয়া থেকে মুক্ত করে ইখলাসের শিক্ষা দেয়। ৩. অহংকার থেকে নিস্কৃতি দিয়ে নম্রতার শিক্ষা দেয়। ৪. অলসতা মুক্ত করে উপদেশ দেয়ার প্রতি উৎসাহিত করে এবং ৫. অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের প্রতি উৎসাহিত করে।[১০৭০] **পঞ্চমত:** এই মারাত্মক ব্যাধি থেকে বাঁচার সর্বশেষ পন্থা হল মহান আল্লাহর দরবারে রিয়ামুক্ত হওয়ার জন্য সর্বদা দোয়া করা। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ভাল-মন্দ করা না করার কোন ক্ষমতা কারো নাই। রিয়া থেকে বাঁচার উপরোল্লেখিত উপায়গুলো অব্যাহত রাখার সাথে দোয়াও চালু রাখতে হবে। এ বিষয়ে অনেক দোয়া হাদিস শরীফ সহ বিভিন্ন দোয়াগ্রন্থে বর্ণিত আছে।

নবী করিম ﷺ নিজেও এভাবে দোয়া করতেন– «اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ، وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ، وَلِسَانِي مِنَ الكِذْبِ، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ» হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে নেফাক থেকে, আমার আমলকে রিয়া থেকে, আমার জিহবাকে মিথ্যা থেকে এবং আমার চোখকে খিয়ানত থেকে পবিত্র রাখ। চোখের খিয়ানত ও অন্তরের গোপন অবস্থা সম্পর্কে তুমি অবিহিত।[১০৭১] মনে রাখতে হবে যে, রিয়া নামক এই ব্যাধিটি মূর্খদের চেয়ে আলেম, আবেদ, দানশীল, নেককার, পরহেজগার ব্যক্তির মধ্যে বেশী পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভের জন্য প্রত্যেককে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা, সর্বদা সচেতন ও সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন।

অহংকার

অহংকার, অহমিকা ও আত্মম্ভরীতা। আর এগুলো হল 'কিবর' ও 'তাকাব্বুর'। ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেন, অহংকার অর্থ হচ্ছে মানুষ ভাল গুণে নিজেকে অন্যের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা। আর যখনই কারো মনে এই ধারণা জন্মায় তখনই তার নফস ফুলে যায়। তারপর তার কথা-বার্তা,কাজ-কর্ম ও চাল-চলনে তা ফুটে উঠে। যেমন- চলার সময় আগে আগে চলা, মজলিসে উঁচু আসনে বসা, অন্যদেরকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা, সালাম না দেয়া, কেউ তাকে সালাম না দিলে রাগ করা, কেউ সম্মান না করলে অসন্তুষ্ট হওয়া, উপদেশ দিলে নাক ছিটকানো, সত্যকে জেনেও অমান্য করা ও সর্বদা মানুষকে লাঞ্ছিত

[১০৭০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১
[১০৭১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১ ও আদ দাওয়াতুল কবীর

করা ইত্যাদি। অহংকার পতনের মূল। অহংকারীকে কেউ পছন্দ করেনা বরং ঘৃণা করে। এটা শয়তানের চরিত্র। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ সে (শয়তান) অস্বীকার করল এবং অহমিকা দেখাল, ফলে সে কাফেরদের দলভুক্ত হল।[১০৭২] সর্বপ্রথম অহংকারের কারণে শয়তানের হাজার বছরের ইবাদত নষ্ট হয়ে মূহূর্তের মধ্যে কাফিরে পরিণত হয়েছে।

অহংকারের কুফল

ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেন– অহংকার দ্বারা মানুষের হাজারো প্রকার ক্ষতি হয়। তম্মধ্যে চারটি ক্ষতি তো আবশ্যম্ভাবী। এক. অহংকারী সত্য লাভ হতে বঞ্চিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ আমি দুনিয়ার না-হক অহংকারীদেরকে আমার নিদর্শন থেকে বিমুখ রাখবো।[১০৭৩] অহংকারীর অন্তরে আল্লাহ মোহরাঙ্কিত করে দেন। ফলে আল্লাহর আহকামের মারেফাত লাভের ব্যাপারে অন্তরে কালো পর্দা পড়ে যায়। আল্লাহ বলেন– كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ এভাবেই আল্লাহ অহংকারী ও দাম্ভিকদের অন্তরকে মোহরযুক্ত করে দেন।[১০৭৪]

দুই. অহংকারীগণ আল্লাহর আযাবের শিকার হয়। আল্লাহ বলেন– إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অহংকারীদের পছন্দ করেন না।[১০৭৫] বর্ণিত আছে– হযরত মূছা (আ.) আরয করলেন, হে মাবুদ! আপনি দুনিয়ায় কোন লোকের প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশী অসন্তুষ্ট? আল্লাহ পাক জবাব দিলেন– যার অন্তরে অহমিকা রয়েছে, যার কথায় দাম্ভিকতা আছে।[১০৭৬]

তিন. অহংকারীদের প্রাপ্তি দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি। বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে গর্ব ও দম্ভ প্রকাশ করে আল্লাহ তাকে ন্যায়ভাবেই অপদস্থ করেন।[১০৭৭] রাসূলে পাক ﷺ এরশাদ করেন– «لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ مَعَ الْجَبَّارِينَ، فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ» মানুষ নিজেকে সর্বদা বড় ভাবতে থাকে। এভাবে সে একদিন আল্লাহর দরবারে দাম্ভিক অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

[১০৭২]. সূরা বাকারা, আয়াত–৩৪
[১০৭৩]. সূরা আরাফ, আয়াত–১৪৬
[১০৭৪]. সূরা কাফির, আয়াত-৩৫
[১০৭৫]. সূরা নাহল, আয়াত–২৩
[১০৭৬]. ইমাম গাজ্জালী (র.), মিনহাযুল আবেদীন, বাংলা, পৃ. ১২০
[১০৭৭]. ইমাম গাজ্জালী (র.), মিনহাযুল আবেদীন, বাংলা, পৃ. ৩৪৪

তখন তার উপর ঐসকল আযাব-গযব নাযিল হতে থাকে যা পূর্বেকার দাম্ভিকদের উপর নাযিল হয়েছিল।[১০৭৮] রাসূলে পাক ﷺ এরশাদ করেন– «مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ غَضْبَانُ» যে ব্যক্তি অন্তরে নিজেকে বড় ভাবে, চালচলনে অহংকারী ভঙ্গী প্রর্দশন করে, যখন সে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে তখন আল্লাহপাক তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন।[১০৭৯]

চার. অহংকারী নিশ্চিত জাহান্নামী। আল্লাহ তায়ালা বলেন– إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে অচিরেই তারা লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১০৮০] হাদিসে কুদসীতে আছে আল্লাহ বলেন– الكِبْرِيَاءُ ردائى والعظمة ازارى فمن نازعنى واحدًا مِنْهَما القيته فى جهنم ولا ابالى অহংকার আমার চাদর, মহত্ব ও বড়ত্ব আমার পায়জামা। অতএব যে এতদুভয়ের কোন একটি নিয়ে যদি আমার সাথে টানাটানি করে তবে লা-পরওয়া (খোদা) আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।[১০৮১] অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে যে, مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، أَكَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকবে আল্লাহ তাকে উল্টামুখী জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[১০৮২]

হাদিস শরীফে আরো বর্ণিত আছে– لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ যে ব্যক্তির অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেনা।[১০৮৩] দুনিয়াতে যেহেতু অহংকারীরা মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, অপমানিত লাঞ্ছিত করে সেহেতু কিয়ামত দিবসে কোটি কোটি মানুষের সামনে আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করবেন। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– «يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ أَمْثَالَ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، يُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ مِنْ جَهَنَّمَ يُسَمَّى يُولَسَ، تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةِ الْخَبَالِ» কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে ছোট পিপিলিকার ন্যায় একত্রিত করা হবে, কিন্তু আকৃতি হবে

[১০৭৮]. ইমাম গাজ্জালী (র.), মুকাশিফাতুল কুলুব, বাংলা, পৃ. ৩৪৪
[১০৭৯]. প্রাগুক্ত, পৃ.–৩৪৮
[১০৮০]. সূরা আল মু'মিন, আয়াত–৬০
[১০৮১]. মুসলিম শরীফ ও ইমাম গাজ্জালী (র.), মুকাশিফাতুল কুলুব, খণ্ড, ১ম, পৃ. ৩৪৩
[১০৮২]. ইমাম গাজ্জালী (র.), মুকাশিফাতুল কুলুব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৪৩
[১০৮৩]. মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪৩৩

মানুষের। চারিদিক থেকে অপমান-লাঞ্ছনা তাদেরকে ঘিরে ধরবে। জাহান্নামের 'বাওলাস' নামক এক কারাগারের দিকে তাদেরকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তাদের উপর আগুনের উপর আগুন হবে এবং তাদেরকে 'জ্বিনাতুল খাবাল' নামক দোযখীদের দেহগলিত পঁচা রক্ত ও পুঁজ পান করানো হবে।[১০৮৪]

অহংকারের কারণ

ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেন, মানুষ সাধারণত সাতটি গুণাবলি নিয়ে অহংকার করে। তম্মধ্যে দু'টি দ্বীনি। যথা: ১. ইলমের ২. ইবাদত ও আমলের। আর বাকীগুলো দুনিয়াবী। তা হল– ৩. বংশের ৪. সুন্দরের ৫. সম্পর্কের ৬. শক্তি-সামর্থের ও ৭. অনুসারী ও সাহায্যকারীদের।[১০৮৫]

অহংকার প্রতিকারের উপায়

নিজেকে বড় মনে করা ও বড় বলে প্রকাশ করা থেকে অহংকার সৃষ্টি হয়। আর এই মারাত্মক রোগটি পাওয়া যায় সৎগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে। পক্ষান্তরে নিজেদেরকে ছোট ও নগণ্য মনে করা এবং নিজের সৎগুণাবলী গোপন রাখার মাধ্যমে বিনয়ের সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রথমে তাকে বিনয়ী হতে হবে। নিজের চেয়ে অপরকে প্রাধান্য দিতে হবে। অন্যের ভাল কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে হবে। বুঝতে হবে যে, যেসব গুণাবলি নিয়ে সে অহংকার করছে তা তার নিজস্ব নয় বরং খোদা প্রদত্ত এবং চিরস্থায়ী নয় ক্ষণস্থায়ী। নফসের চাহিদার বিপরীত করতে হবে। একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) মাথায় লাকড়ির বোঝা নিয়ে লোক সম্মুখে বাজারে গমন করেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো আল্লাহ আপনাকে উচ্চতর মর্যাদা দান করেছেন তা সত্ত্বেও আপনি কেন এই কষ্ট করছেন। উত্তরে তিনি বলেন, اردت ان ادفعَ كبر عن نفسى নফস হতে অহংকার দূর করার চেষ্টা করছি।[১০৮৬]

নিজেকে এবং আল্লাহকে চিনতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, তার উৎপত্তি এক ফোঁটা নাপাক তরল বীর্য থেকে এবং সমাপ্তি দূর্গন্ধময় গলিত লাশ দ্বারা। কুরআন-হাদিসে দুনিয়া-আখেরাতে অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা পড়তে হবে, শুনতে হবে। প্রয়োজনে হক্কানী-রব্বানী আলেম ও পীর মাশায়েখের সান্নিধ্যে গিয়ে চরিত্র সংশোধন করার মাধ্যমে অহংকারের প্রতিকার সম্ভব। বস্তুতঃ অহংকার নিতান্ত নিম্নপর্যায়ের লোকেরাই করে থাকে। বিনয় ও নম্র স্বভাব তারাই অবলম্বন করে যারা অভিজাত ও উচ্চ পর্যায়ের।[১০৮৭]

১০৮৪. মিশকাত, পৃ. ৪৩৩
১০৮৫. ইমাম গাজ্জালী (র.), তাশকীলে কিরদার, উর্দু, পৃ. ২০৮
১০৮৬. ইমাম গাজ্জালী (র.), মুকাশিফাতুল কুলুব, বাংলা, পৃ. ১২
১০৮৭. ইমাম গাজ্জালী (র.), মুকাশিফাতুল কুলুব, বাংলা, পৃ. ১২৮

অহংকার শয়তানী চরিত্র। কুফরী কাজ, মূর্খ ও নির্বোধের স্বভাব এবং খোদার অভিশাপ। অতএব কোন জ্ঞানী, বিবেকবান ও ভদ্রলোকের পক্ষে কোন অবস্থাতেই অহংকার করা শোভা পায়না। জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী কবির উপদেশ হচ্ছে– দম্ভ অহংকার কেবল আহমক যারা তারাই করতে পারে। তুমি যদি জানতে অহংকারের মধ্যে কি ধ্বংসাত্মক বিষ লুক্কায়িত রয়েছে, তবে তুমি কখনো অহংকার করতে না। বস্তুত অহংকার যেমন মানুষের দ্বীন-ধর্মকে ধ্বংস করে দেয়, তেমনি বুদ্ধি-বিবেক ও মান-সম্মান বিনাশ করে দেয়। তাকওয়া, বিনয়ী, নম্রতা ও আল্লাহর কাছে অহংকার থেকে মুক্তি কামনার মাধ্যমে অন্তরকে এ কুস্বভাব থেকে মুক্ত রাখা একান্ত প্রয়োজন।

উজব

'উজব' শব্দের অর্থ হল আত্মপ্রশংসা বা আত্মগর্ব। এটা অহংকারের প্রাথমিক স্তর। ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেন– অন্যের দিকে লক্ষ্য না করে নিজেকে মহতি গুণের অধিকারী বলে ধারণা করাকে 'উজব' বলা হয়।[১০৮৮] তিনি আরো বলেন– উজব বা আত্মম্ভরিতার প্রকৃত পরিচয় হল ইবাদত করে নিজের ব্যাপারে আত্মগৌরববোধ করা। ওলামায়ে কেরাম আত্মগৌরবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন জিনিস কোন সৃষ্টি অথবা কোন নফসের সাথে জাত্যাভিমান ও বুর্যুগী জাহির করাকে আত্মগৌরব বলা হয়।[১০৮৯] মোটকথা নিজের মধ্যে কোন গুণ সৌন্দর্য ও মহত্ব দেখে গর্বিত হওয়া এবং আল্লাহর উপর ভরসা হ্রাস পাওয়াকেই 'উজব' বা আত্মগৌরব বলা হয়। অহংকারের মত এটাও মানুষের আমল বরবাদ করে দেয় এবং আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত রাখে। হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানরা প্রথমে নিজেদের সংখ্যাধিক্যে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল। ফলে আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে সাময়িক পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। আল্লাহ বলেন– وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ হোনাইনের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।[১০৯০] নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ তিনটি ব্যাধি মানুষকে ধ্বংস করে দেয়– কৃপণতা, নফসের অনুসরণ

১০৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬
১০৮৯. ইমাম গাজ্জালী (র.), মিনহাযুল আবেদীন, পৃ. ২৪০
১০৯০. সূরা তাওবা, আয়াত–২৬

ও আত্মপ্রশংসা।[১০৯১] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন– الهلاك فى اثنتين القنوط والعجب দু'টি বস্তুতে ধ্বংস অনিবার্য– নৈরাশ ও আত্মগৌরব।[১০৯২]

আত্মম্ভরিতা থেকে বাঁচার উপায়

আগেই বলা হয়েছে আত্মম্ভরিতা এক প্রকারের অহংকার বা অহংকারের প্রাথমিক স্থর। আত্মম্ভরি মনোভাব আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করে। মানুষ যখন আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, তখন অতিশ্রিঘ্রই তার ধ্বংস আসন্ন হয়ে পড়ে। হযরত ঈসা (আ.) তাঁর সহচরগণকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে, বায়ু বহু প্রদীপকে নিভিয়ে দিয়েছে আর আত্মম্ভরিতা বহু আবেদেরই সর্বনাশ করেছে। সুতরাং এই মারাত্মক ব্যাধি থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন। আর তা থেকে বাঁচার উপায় হল– সর্বদা বিনয়ী হওয়া, নিজের সবগুণ, সৌন্দর্য ও মহত্বকে খোদাপ্রদত্ত মনে করে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যা কিছু অর্জন করেছে সবকিছু আল্লাহর তাওফীকের মাধ্যমে হয়েছে নিজের যোগ্যতা বলে নয়– এই ধারণা পোষণ করা। নিজের সৎগুণাবলিকে তুচ্ছ মনে করে আরো বেশী সৎগুণাবলি অর্জনের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানের বিশ্বাস রাখা। সর্বোপরি আল্লাহর অগণিত ও অমূল্য নিয়ামতের কথা স্মরণ করে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মাধ্যমেই আত্মম্ভরিতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

রাগ

রাগের আরবী শব্দ হল الغضب । এর বিপরীত শব্দ হল الحلم। অর্থাৎ ধৈর্য ও শান্ত শিষ্ট। রাগ মানুষের মনুষ্যত্ব বিধ্বংসী একটি কুরিপু। ইমাম বায়জাভী (র.)এর সংজ্ঞায় বলেন– الغضب ثودان النفس عند اراد প্রতিশোধ নেওয়ার দৃঢ় সংকল্পের সময় অন্তরে জিঘাংসার যে উদ্রেক হয় উহাকে রাগ বলা হয়। রাগের সময় মানুষের পশুসুলভ আত্মা সক্রীয় হয়, চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এর প্রভাবে দেহের শিরা-উপশিরা ফুলে উঠে। এসময় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকেনা। প্রতিপক্ষের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উন্মুক্ত হয়ে উঠে। এই রাগের বশবর্তী হয়ে কারো উপর যদি অন্যায়-অবৈধভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হয় তাহলে তা অবশ্যই জঘন্য ও গর্হিত কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে এই রাগ যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য হয় তাহলে তা প্রশংসনীয়। যেমন হযরত ওমর (রা.)'র রাগ।

[১০৯১]. বায়হাকী ও মুকাশিফাতুল কুলুব, বাংলা, খণ্ড-২, পৃ. ১২৮
[১০৯২]. ইমাম গাজ্জালী (র.), তাশকীলে কিরদার, উর্দু, পৃ.২২৯

রাগ শয়তানের পক্ষ হতে আসে

রাগ আসলে মানুষের চেহারা বিকৃতি হয়ে চোখ লাল হয়ে যায়, গলার রগ ফুলে যায়, শরীর গরম হয়ে কপাল দিয়ে ঘাম বের হয়। এসব লক্ষণ আগুনের প্রভাবে হয়ে থাকে। আর শয়তান আগুনের তৈরি বিধায় রাগ শয়তানী চরিত্র এবং শয়তানের পক্ষ হতে আসে। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ রাগ শয়তানের পক্ষ হতে আসে এবং শয়তানকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।[১০৯৩]

রাগ ধ্বংসের কারণ

রাগ এমন ধ্বংসাত্মক বস্তু যা দেরীতে এসে দ্রুত চলে যাওয়া ভাল। রাগ আসলে মানুষের বিবেক বুদ্ধি লোপ পায়। ফলে তার দ্বারা যে কোন অঘটন ঘটতে পারে, শরীয়ত বিরুদ্ধ সর্বপ্রকার নিন্দনীয় কাজ করতে পারে। এজন্যেই নবী করিম ﷺ রাগ করতে নিষেধ করেছেন এবং রাগ সংবরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِي، قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ» এক ব্যক্তি নবী করিম ﷺ এর নিকট আরয করল– আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন– তুমি রাগ করবেনা। লোকটি বারংবার একই প্রশ্ন করলে রাসূল ﷺ প্রত্যেকবারই বললেন– তুমি রাগ করবেনা।[১০৯৪] রাগ সংবরণ ও ক্ষমা আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ। আল্লাহ তায়ালা এগুলোর প্রশংসা করে বলেন– وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ যারা নিজের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।[১০৯৫] উক্ত আয়াতের তাফসীরে মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) তাফসীরে রুহুল মায়ানীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, বায়হাকী শরীফে বর্ণিত আছে, ইমাম জয়নুল আবেদীন (র.)'র দাসী তাঁকে উযূ করানোর জন্য পানিভর্তি পাত্র (বদনা) নিয়ে আসছে। ভুলক্রমে বদনা ইমামের শরীরে পড়লে তিনি আহত হন। তিনি (রাগে) তার দিকে চোখ তুলে তাকালে সে কুরআনের আয়াতাংশ পাঠ করল– وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ মুত্তাকীর আলামত হল রাগ হজম করা। তিনি বললেন– আমি রাগ হজম করেছি। সে বলল– وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ মুত্তাকীর আলামত হল মানুষকে ক্ষমা করা, তিনি বললেন–

[১০৯৩]. মিশকাত, পৃষ্ঠা–৪৩৪
[১০৯৪]. মিশকাত, পৃষ্ঠা–৪৩৩ (বুখারী, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮, মাকতাবায়ে শামেলা)
[১০৯৫]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত–১৩৪

আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। সে আবার বলল– وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ। আল্লাহ এহসানকারীকে ভালবাসেন। তিনি বলেন যাও, তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে আযাদ। এই ধরণের একটি ঘটনা ইমাম হাসান (রা.) সম্পর্কেও বর্ণিত আছে।[১০৯৬] নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন: مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جَرْعَةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ، يَكْظِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالَى আল্লাহর দৃষ্টিতে কোন বান্দাহ রাগের ঢোকের চেয়ে উত্তম ঢোক গিলে না যা সেই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গিলে।[১০৯৭] অর্থাৎ আল্লাহর কাছে রাগ হজম করাই হল উত্তম কাজ। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ عَذَابَهُ» যে নিজের রাগ সংবরণ করে আল্লাহ তার থেকে স্বীয় আযাব প্রতিহত করবেন।[১০৯৮]

ক্রোধ বড় শত্রু

হাদিস শরীফে রাসূল ﷺ ক্রোধকে সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিপদজনক শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ক্রোধ ষড়রিপুর অন্যতম। সুস্থ বিবেক মানুষকে কল্যাণের দিকে চালিত করে। পক্ষান্তরে রিপুগুলি বিবেক কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত না হলে মানব প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে অকল্যাণের দিকে পরিচালিত করে। তম্মধ্যে ক্রোধ সবচেয়ে বড় শত্রু। পৃথিবীর আদি হতেই সকল ধ্বংস ও পতনের মূল কারণ হল ক্রোধ। মূলত ক্রোধ রিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করা বড়ই কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ। যেসব দৈহিক বীর তার প্রতিদ্বন্দ্বী বীরকে শক্তিতে বা রণকৌশলে অতি সহজেই পরাজিত করেছে তাদের চেয়ে শতগুণ শক্তিশালী ঐসব বীরগণ যারা ক্রোধ নামক রিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত করে সুস্থ বিবেককে বিজয়ী করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ একজন দৈহিক বীরের শত্রুতামূলক অনিষ্টকারীতার তুলনায় ক্রোধ শত্রুর অনিষ্টকারিতা শত-সহস্রগুণ বেশী হতে পারে। তাই রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ. إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» ঐব্যক্তি শক্তিশালী নহে যে মানুষকে আছাড় দেয় বরং ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী বীর যে রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে সক্ষম।[১০৯৯] হাদিসে বর্ণিত আছে– اشدكم من غلب نفسه عِنْد الغَضَب واحلمكم من عَفا عند القدرة তোমাদের সবচেয়ে

[১০৯৬]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী, তফসীরে নঈমী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৫
[১০৯৭]. আহমদ ইবনে হাম্বল (র), সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৪৩৪
[১০৯৮]. ইমাম গাজ্জালী (র.), তাশকীলে কিরদার, উর্দু, পৃ. ১১৬
[১০৯৯]. বুখারী, মুসলিম, সূত্র: মিশকাত , পৃষ্ঠা–৪৩৩

সুদৃঢ় ঐ ব্যক্তি যে রাগের সময় নফসের উপর প্রাধান্য লাভ করে অর্থাৎ রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, আর তোমাদের বড় ধৈর্যশীল ব্যক্তি হল যে প্রতিশোধ নেওয়ার শক্তি-সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়।[১১০০]

রাগ ঈমানের পরিপূর্ণতার অন্তরায়

রাগ শয়তানী স্বভাব, পক্ষান্তরে ঈমান খোদায়ী দান। একটি অপরটির বিপরীত। সুতরাং দুই বিপরীত বস্তু একত্রে অবস্থান করতে পারেনা। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– إِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبْرُ الْعَسَلَ রাগ ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয় যেমন সাবির (গাছের তিক্ত রস) মধুকে বিনষ্ট করে দেয়।[১১০১]

রাগ দমনের উপায়

কোন বস্তুর বিপরীত বস্তু হল উহার প্রতিষেধক। রাগ মানুষের শরীরে উত্তাপ সৃষ্টি করে। উত্তপ্ততা আগুনের বহিঃপ্রকাশ। আর আগুন পানি দ্বারা নির্বাপিত হয়। তাই রাগ আসলে পানি দ্বারা উযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন রাসূল ﷺ ।

হাদিসে আছে– فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ যখন তোমাদের মধ্যে কারো যখন রাগ আসে তবে সে যেন উযূ করে।[১১০২] অন্যত্র রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ তোমাদের কারো যখন রাগ আসে সে যদি দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে তবে যেন বসে পড়ে। এতে যদি রাগ চলে যায় তবে উত্তম নতুবা সে যেন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে।[১১০৩] অভিজ্ঞ বুযুর্গানেদ্বীনগণ বলেছেন– রাগের সময় «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» পড়লেও রাগ চলে যায়। অতএব রাসূল ﷺ এর বাণী মোতাবেক আমলের মাধ্যমে ঈমান-আমল বিধ্বংসী রাগ বা ক্রোধ নামক মারাত্মক অন্তরব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব।

জিহ্বার হেফাজত

মানুষের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথা হাত,পা, চোখ, কান, ও জিহ্বা ইত্যাদি দ্বারা পাপ সংঘটিত হয় তম্মধ্যে জিহ্বা হল প্রধান। মানুষের অধিকাংশ নিত্য-নৈমত্তিক গুনাহ যেমন- অভিশাপ, অশ্লীলতা, গালি-গালাজ, মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী ইত্যাদি কবীরাহ গুনাহ সমূহ জিহ্বা দ্বারা সংঘটিত হয়। সুতরাং প্রথমে জিহ্বার হেফাজত তথা রসনা সম্পর্কে

[১১০০]. ইমাম গাজ্জালী (র.), তাশকীলে কিরদার, উর্দু, পৃ. ১১৬
[১১০১]. ইমাম বায়হাকী (র), শুয়াবুল ঈমান, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা–৪৩৪
[১১০২]. ইমাম আবু দাউদ (র), আবু দাউদ শরীফ, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা–৪৩৪
[১১০৩]. ইমাম আহমদ ও তিরমিযী (র.) মুসনাদ ও তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা–৪৩৪

আলোচনা করব। জিহ্বা ছোট একটি মাংসপিণ্ড হলেও এটি হৃদয়ের দরজা। এটি হৃদয়ের সংবাদ সরবরাহ করে। এর ক্ষমতা প্রবল, পরাক্রমশালী নরপতি হতেও বেশী। এটি মানুষকে ধ্বংসের অতলেও ডুবাতে পারে। আবার সাফল্যের শীর্ষেও সমাসীন করতে পারে। এজন্য জিহ্বাকে সংযত রাখা একান্ত প্রয়োজন। জিহ্বা হল অন্তরের মুখপাত্র ও প্রতিনিধি। আর বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ জিহ্বার নিকট দায়বদ্ধ। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا মানুষ যখন সকালে ঘুম হতে উঠে, তার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বার কাছে অনুনয় বিনয়ের সাথে আরয করে বলে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়োনা। কেননা আমরা তোমার সাথে জড়িত। তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকব। অর্থাৎ তুমি সঠিক পথে পরিচালিত হলে আমরাও সঠিক পথে পরিচালিত হবো। আর তুমি বাঁকা পথে চললে আমরাও বাঁকা পথে চলতে বাধ্য হবো। ফলে বিপদগ্রস্থ হবো আর আল্লাহর আযাবের শিকার হবো।

জিহ্বা সংযত করা মুক্তির উপায়

অজ্ঞ ও নির্বোধরা জিহ্বার অধিনস্থ হয়ে জিহ্বার দাসে পরিণত হয়। জিহ্বাকে আয়ত্বে আনতে না পারলে মানুষকে পদে পদে বিপদগ্রস্থ হতে হয়। আল্লাহ ও বান্দার ক্রোধের শিকার হতে হয়। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে হাদিস বর্ণিত আছে- তিনি বলেন– لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقُلْتُ: مَا النَّجَاةُ؟ فَقَالَ: أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، একদিন আমি রাসূল ﷺ এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বক্ষেত্রে মুক্তির উপায় কি? উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, তুমি তোমার জিহ্বাকে আয়ত্বে রাখ।[১১০৪] অর্থাৎ কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোন কথাকে ছোট, তুচ্ছ ও নগন্য মনে করা উচিত নয়। কারণ অনেক সময় মানুষের তুচ্ছ কথাও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে জাহান্নামী হতে হয়। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ বান্দাহ কোন কোন সময় এমন কথা বলে যাতে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন। একথা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে অথচ সে এ বিষয়ে ওয়াকিফহাল নয়।[১১০৫] অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে নবী করিম ﷺ বলেন, «أَتَدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟»

[১১০৪]. ইমাম তিরমিযী, তিরমিযী শরীফ, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৪১৩
[১১০৫]. বুখারী, সূত্র: মিশকাত, পৃ.৪১১

تোমরা কি জান কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে الْأَجْوَفَانِ: الْفَمُ وَالْفَرْجُ প্রবেশ করাবে? তা হল দু'টি গহ্বর– একটি মুখ অপরটি লজ্জাস্থান।[১১০৬] হাদিস শরীফে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, إِنَّهُ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدَّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمَيْهِ বান্দাহর পা পিছলানোর চেয়ে মুখ পিছলানো মারাত্মক ক্ষতিকর।[১১০৭] কারণ পা পিছলিয়ে পড়লে হয়তবা শারীরিক ক্ষতি হবে, কিন্তু মুখ পিছলিয়ে গেলে ঈমান ও আমলের তথা দ্বীনি ক্ষতি হবে, যা শারিরীক ক্ষতির চেয়ে সহস্র গুণ ভয়ানক।

জিহ্বাই সবচেয়ে ভয়ংকর ও সর্বনাশের মূল

পাপ-পূণ্য ও ঈমান-কুফর চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় জিহ্বা দ্বারা। খুব সাবধানতার সহিত জিহ্বাকে ব্যবহার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন– আমি একদিন রাসূল ﷺকে জিজ্ঞাসা করলাম– يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: " هَذَا " হে আল্লাহর রাসূল! যে জিনিসগুলো আপনি আমার জন্য ভয়ের বস্তু বলে মনে করেন; তন্মধ্যে অধিক ভয়ংকর কোন জিনিসটি? সুফিয়ান বলেন, এটা শুনে রাসূল ﷺ নিজের জিহ্বা ধরে বললন– এটা।[১১০৮] একদিন হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র নিকট গিয়ে দেখলেন তিনি তাঁর জিহ্বা ধরে টানছেন। অর্থাৎ জিহ্বার উপর নিজের ক্রোধ প্রকাশ করে শাস্তির উদ্দেশ্যে এরূপ করেছেন। এটা দেখে হযরত ওমর (রা.) বাঁধা প্রদানের উদ্দেশ্যে বললেন– থামুন! আপনার কি হয়েছে? কেন এমন করছেন? আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। তখন আবু বকর (রা.) বলেন, এ জিহ্বাই আমার যতসব সর্বনাশের মূল। এটাই আমাকে ধ্বংসের স্থানসমূহে অবতীর্ণ করেছে।[১১০৯] অতএব সর্বদা প্রত্যেক মানুষকে জিহ্বা সম্পর্কে সর্তক ও সাবধান থাকতে হবে। একে ভাল কাজে ব্যবহার করে মন্দ কাজ থেকে বিরত রেখে এর ধ্বংসাত্মক অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

অভিশাপ ও অশ্লীলতা

অভিশাপ ও অশ্লীলতা মুখ দিয়ে প্রকাশ হয় এগুলো রাগের মন্দ প্রতিফল। এ দু'টি আচরণ মানুষের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে, গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করে দেয়, সমাজকে কলুষিত করে শান্তি বিনষ্ট করে। এগুলো অভদ্রজনিত অসুন্দর আচরণ। পক্ষান্তরে মু'মিন বলতেই ভদ্র, শান্ত ও সুন্দর আচরণকারীকে বুঝায়। সুতরাং কোন মু'মিনের পক্ষে এ ধরণের আচরণ

[১১০৬]. মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৪১২
[১১০৭]. বায়হাকী, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৪১৩
[১১০৮]. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৪১৩
[১১০৯]. ইমাম মালেক (র.) সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৪১৫

মোটেই শোভা পায়না। তাই হাদিস শরীফে নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– «لَا يَنْبَغِي لِصدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا» সিদ্দীক তথা মু'মিনের পক্ষে অধিক অভিসম্পাতকারী হওয়া উচিত নয়।[১১১০] অন্য এক বর্ণনায় আছে لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا একজন মু'মিন অধিক অভিসম্পাতকারী হতে পারে না।[১১১১] উম্মতে মুহাম্মদীর একটি বিশেষ মর্যাদা হল তারা কিয়ামত দিবসে পূর্ববর্তী নবীদের পক্ষে সাক্ষ্য দান করবে যে, নবীগণ স্ব-স্ব কওমের লোকদের কাছে তাবলীগী দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন এবং অনেক সৎকর্মশীলদের সুপারিশে বহু জাহান্নামীকেও জান্নাত দেয়া হবে। কিন্তু যারা দুনিয়াতে লোকদের প্রতি অহেতুক, অবান্তর ও কথায় কথায় অভিশাপ দেয় কিয়ামতের দিন তাদের সাক্ষ্য ও সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করা হবে। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ، وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» নিশ্চয় অধিক অভিসম্পাতকারী কিয়ামতের দিন সাক্ষ্যদাতা ও সুপারিশকারী হবে না।[১১১২]

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন– একদিন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর এক দাসকে ভর্ৎসনা করছিলেন। এ সময় নবী করিম ﷺ তাঁর পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। রাসূল ﷺ (শুনে) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কা'বার প্রভুর শপথ! ভর্ৎসনাকারী ও সিদ্দীক কখনো এক ব্যক্তি হতে পারেনা। অর্থাৎ সিদ্দীকীয়তের মত উৎকৃষ্টগুণ ভর্ৎসনা করার মত নিকৃষ্টতম কাজ একই ব্যক্তির মধ্যে সমাবেশ ঘটতে পারেনা। কেননা এ দু'টি পরস্পর বিরোধী। এটা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) ঐ দিনেই তাঁর কয়েকজন দাসকে মুক্ত করে দিয়ে নবীর কাছে গিয়ে বললেন ভবিষ্যতে কখনো এ কাজের (পাপের) পুনরাবৃত্তি করবোনা।[১১১৩] অর্থাৎ ভুলক্রমেও যদি কোন সময় এ ধরনের পাপ সংঘটিত হয়ে যায় তাহলে সাথে সাথে তার বিপরীত দান সাদকা কিংবা যেকোন নেক কাজ করে ভবিষ্যতে আর কোন দিন করবেনা বলে প্রতিজ্ঞা করলে তা তাওবার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ফলে গুনাহ মাফ হওয়ার আশা করা যায়। সমাজে কিছু অশিক্ষিত অজ্ঞ লোক আছে যারা সামান্য বিষয়ে কথায় কথায় অভিশাপ ও গালিগালাজ করে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও নাজায়েয। মু'মিন হলো আদর্শবান ও চরিত্রবান ব্যক্তি। অভিসম্পাত ও ভর্ৎসনা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারেনা। তাই নবী করিম ﷺ এগুলোর ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত

[১১১০]. মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৪১১
[১১১১]. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৪১৩
[১১১২]. মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৪১১
[১১১৩]. বায়হাকী, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৪১৫

আছে– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ، وَلَا بِغَضَبِ اللَّهِ، وَلَا بِجَهَنَّمَ» তোমরা একে অপরকে এভাবে অভিসম্পাত করবে না যে, তোমার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক, আল্লাহর গজব হোক এবং তুমি জাহান্নামী।[১১১৪] অনেকেই প্রাকৃতিক বস্তুকে নিজের প্রতিকূল হতে দেখলে তাকে অভিসম্পাত ও গাল-মন্দ দিতে আরম্ভ করে। অথচ এটা জঘন্য পাপ। কারণ প্রকৃতির সবই আল্লাহর সৃষ্টি। এদের নিজেদের কোন ক্ষমতা নাই। স্বয়ং আল্লাহই ওদের নিয়ন্ত্রক। সুতরাং ঐগুলোকে গালি দেওয়া মানে আল্লাহকে গালি দেওয়ার সমান। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে অভিসম্পাত নিজের উপর এসে পড়ে। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে– إِنَّ رَجُلًا نَازَعَتْهُ الرِّيحُ رِدَاءَهُ عَلَى فَلَعَنَهَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلْعَنْهَا، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ এক ব্যক্তির গায়ের চাদর বাতাসে উড়ছিল। লোকটি বাতাসকে অভিসম্পাত করতে লাগল। নবী করিম ﷺ শুনে বললেন– বাতাসকে অভিসম্পাত করোনা। কেননা তা তো আদিষ্ট (অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে চলে) তবে মনে রেখো যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে লা'নত করে আর যদি ঐ বস্তুটি লা'নতের যোগ্য না হয় তাহলে লা'নত লা'নতকারীর দিকেই ফিরে আসে।[১১১৫]

লা'নত এর শরয়ী বিধান

লা'নত বা অভিসম্পাত সম্পর্কে শরীয়তের বিধান হল, কোন মুসলমানকে নির্দিষ্ট করে লানত দেওয়া না জায়েয। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, لَا تَقُوْلُو الْمُسْلِم عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللهِ اوْ غَضَبُ اللهِ তোমার উপর আল্লাহর অভিশাপ ও আল্লাহর গযব এরূপ বলোনা। তবে সামগ্রীকভাবে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর লা'নত করা বৈধ। যেমন বলা হয়– لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ এবং لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির মৃত্যু কূফর বা শিরক অবস্থায় হয়েছে বলে নস বা দলীল দ্বারা প্রমাণিত তার উপরও লা'নত করা বৈধ।

অশ্লীলতা হল বেহায়াপনা বা নির্লজ্জতার আলামত। লজ্জা ঈমানের শাখা। লজ্জা না থাকলে মানুষ যে কোন নিকৃষ্ট কাজ করতে পারে। অশ্লীলতা মানুষকে ত্রুটিপূর্ণ করে দেয়, যতসব কুকর্ম ও দোষ–ত্রুটির জন্ম দেয়। হাদিস শরীফে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ কোন কিছুতে অশ্লীলতা

[১১১৪]. তিরমিযী, আবু দাউদ, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৪১৩
[১১১৫]. প্রাগুক্ত

তাকে ত্রুটিপূর্ণ করে দেয় আর লজ্জাশীলতা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দেয়।[১১১৬] ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি ইসলামের কাম্য। আর অশ্লীলতা গাল-মন্দ ও হিংসা-বিদ্বেষ এই ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি-শৃঙ্খলাকে বিনাশ করে ফেলে। ফলে ঐসব খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ করা প্রত্যেক মানুষের জন্য আবশ্যক।

মিথ্যা

মিথ্যা বলা মহাপাপ। একথাটি প্রত্যেক ধর্মেই স্বীকৃত। বিশেষত ইসলামে এটাকে সকল পাপের মূল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মিথ্যাই মানুষকে পাপ ও অপরাধের প্রতি উৎসাহ যোগায়। একটি মিথ্যাকে চাপা দিতে অসংখ্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। মূলত মিথ্যার উপর ভরসা করেই মানুষ অপরাধ করার সাহস পায়। মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না এমনকি অতি আপনজনও। মহান দয়াবান আল্লাহ মিথ্যাবাদীকে অভিশাপ করেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।[১১১৭] মিথ্যা মিথ্যাবাদীকে জাহান্নামী বানিয়ে দেয়। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا তোমরা মিথ্যাচার হতে বেঁচে থাক। মিথ্যা পাপাচারের পথ দেখায় আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলতে সচেষ্ট থাকে, আল্লাহর দরবারে তাকে বড় মিথ্যুক বলে লিখা হয়।[১১১৮] মিথ্যা কত বড় জঘন্য ও নিকৃষ্ট তা রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلاً مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ বান্দাহ যখন মিথ্যা বলে, তখন (তার নিরাপত্তায় নিয়োজিত) ফেরেশ্‌তা মিথ্যার দুর্গন্ধের কারণে এক মাইল দূরে চলে যায়।[১১১৯] অর্থাৎ মিথ্যা এতবেশী দুর্গন্ধময় যে, যার দুর্গন্ধ এক মাইল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মিথ্যা কোন প্রকৃত মু'মিনের স্বভাব হতে পারেনা। যিনি মু'মিন তিনি সত্যবাদী। সত্য আর মিথ্যা দু'টি বিপরীতধর্মী জিনিস। এ দু'টি কক্ষনো এক ব্যক্তির মাঝে সমাবেশ ঘটতে পারেনা। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল– أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟ قَالَ: لا ঈমানদার কি ভীরু হতে পারে? রাসূল

[১১১৬]. তিরমিযী, আবু দাউদ, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৪১৩
[১১১৭]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৬১
[১১১৮]. বুখারী, মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা–৪১২
[১১১৯]. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা–৪১৩

বললেন– হ্যাঁ। তাকে আরো জিজ্ঞাসা করা হল, ঈমানদার কি কৃপণ হতে পারে? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, ঈমানদার কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? তিনি বললেন, না।[১১২০] অর্থাৎ ভীরুতা ও কৃপণতা ঈমান বিরোধী স্বভাব নয়। কোন মু'মিনের মধ্যে তা সংক্রমিত হতে পারে। ফলে তাকে কাপুরুষ বা কৃপণ বলা যায়। কিন্তু কোন মু'মিনের মধ্যে মিথ্যা থাকতে পারেনা। কারণ প্রত্যেক মুসলমান জন্মগতভাবে সত্যবাদীতার উপর জন্মলাভ করে।

সমাজে এমন কিছু লোক দেখা যায় যারা নিজেদেরকে বিজ্ঞ, জ্ঞানী ও পণ্ডিত হিসাবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে মেলা-মজলিসে উপস্থিত শ্রোতাদের থেকে প্রশংসা পাওয়ার জন্য এবং মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে থাকে। এদের জন্য নবী করিম ﷺ তিনবার অনুশোচনা ব্যক্ত করেন। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ؛ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ» অনুশোচনা তাদের জন্য যারা কথা বলে, আর জনতাকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। তাদের জন্য অনুশোচনা, তাদের জন্য অনুশোচনা।[১১২১] মিথ্যা মুনাফেকী স্বভাব। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «إِنَّ الْكَذِبَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النِّفَاقِ» নিঃসন্দেহে মিথ্যা নেফাকের দরজাসমূহের একটি দরজা।[১১২২] রাসূল ﷺ আরো এরশাদ করেন– ثَلَاثَ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ যার মধ্যে তিনটি স্বভাব থাকবে সে মুনাফিক। যদিও রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান মনে করে। তাহল যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখলে খিয়ানত করে।[১১২৩] মিথ্যা দ্বারা মানুষের আদালত, সততা ও গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলে মুহাদ্দিসীনে কেরামগণ তাদের থেকে হাদিস গ্রহণ করতেন না।

ঘটনা

হযরত শিবলী (র.) একজন উচুঁ স্তরের অলী ছিলেন। তিনি একজন উস্তাদের নিকট ইলমে নাহু শিক্ষার জন্য গেলেন। উস্তাদ বললেন– পড়! ضَرَبَ زَيْدٌ عُمَرَ যায়েদ ওমরকে মেরেছে। তখন হযরত শিবলী (র.) জিজ্ঞেস করলেন যে, বাস্তবে কি যায়েদ ওমরকে মেরেছে? উস্তাদ উত্তর দিলেন– মারেনি তবে এটা একটা উদাহরণ। তখন হযরত শিবলী

[১১২০]. মালেক, বায়হাকী, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা–৪১৪
[১১২১]. আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা–৪১৩
[১১২২]. ইমাম গাজ্জালী (র.), তাশকীলে কিরদার, উর্দু, পৃষ্ঠা–৭৬
[১১২৩]. বুখারী ও মুসলিম

(র.) বললেন– আমি এমন ইলম পড়ব না যার ভিত্তিটাই মিথ্যার উপর এ বলে তিনি চলে গেলেন।[১১২৪] আগেই বলা হয়েছে মিথ্যা সকল পাপের মূল ও উৎস। মিথ্যা বলে অস্বীকার করে মুক্তি পাবে– এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়। তাই প্রথমে পাপের উৎসকে বন্ধ করতে হবে। এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ 'র দরবারে এসে বলল– ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি মুসলমান হতে চাই। তবে আমার মধ্যে অনেক মন্দ স্বভাব আছে যা আমি মোটেই ছাড়তে পারবোনা। আমি ব্যভিচার করি, মদ্যপান করি, চুরির অভ্যাসও আছে এবং মিথ্যাও বলি। আমাকে দয়া করে ঐগুলোর অনুমতি দিন। আমি ধীরে ধীরে একটি একটি করে ত্যাগ করব। রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন– ঠিক আছে, তুমি মিথ্যা বলা ত্যাগ করতে পারবে? লোকটি ভাবল এটাতো সহজ। ঠিক আছে আমি ওয়াদা করলাম মিথ্যা ত্যাগ করবো। এই বলে চলে গেল। এখন সে তার অভ্যাস অনুযায়ী যখন যিনা করার ইচ্ছা করল তখন চিন্তা করল আল্লাহর দরবারে যখন হাজির হবো তখন মিথ্যা বলতে পারবোনা আর সত্য বললে লজ্জিত হবো ও শাস্তি পাবো। অতএব যিনা করার ইচ্ছা ত্যাগ করল। এভাবে মদ্যপানের ইচ্ছা করলে এবং রাতে চুরি করার ইচ্ছা করলে ঠিক তার অন্তরে ঐ কথা এসে যায়। ফলে মিথ্যা বলতে পারবো না বলে সেই এক এক করে সব পাপ কাজ পরিত্যাগ করে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।[১১২৫]

সাধারণত মিথ্যা দু'ধরনের হতে পারে। ক. মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, নিজের লাভ অন্যের ক্ষতির উদ্দেশ্যে অথবা পাপাচারের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে। এটা না জায়েযও হারাম। আল্লাহপাক বলেন– وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ তোমরা মিথ্যা পরিহার কর।[১১২৬] খ. বিবাদমান দু'ব্যক্তি বা দু'দলের সমঝোতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা কোন মুসলমানের কল্যাণার্থে কিংবা কোন মুসলমানকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলা শুধু বৈধ নয় বরং ক্ষেত্র বিশেষে এ প্রকারের মিথ্যা ওয়াজিব হয়ে যায়। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ সে ব্যক্তি মিথ্যুক নয় যে লোকদের মধ্যে মীমাংসা করে।[১১২৭] হযরত সওবান (রা.) বলেন– «الْكَذِبُ كُلُّهُ إِثْمٌ إِلَّا مَا نُفِعَ بِهِ مُسْلِمًا، أَوْ دُفِعَ عَنْهُ ضررًا» প্রত্যেক মিথ্যা গুনাহ তবে যে মিথ্যা দ্বারা কোন মুসলমানের কল্যাণ সাধিত হয় কিংবা কোন মুসলমানকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য বলা হয়ে তা বৈধ।[১১২৮] তবে যতক্ষণ সত্য দ্বারা সম্ভব হয় ততক্ষণ মিথ্যার

[১১২৪]. আব্দুর রহমান সফূরী (র.), নুযহাতুল মাজালিস, পৃষ্ঠা–১১৯
[১১২৫]. আব্দুর রহমান সফূরী (র.), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–১১৯
[১১২৬]. সূরা হাজ্ব, আয়াত–৩০
[১১২৭]. বুখারী, মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা–৪১২
[১১২৮]. ইমাম গাজ্জালী (র.), তাশকীলে কিরদার, উর্দু, পৃষ্ঠা–৭৬

আশ্রয় না নেওয়া শ্রেয়। সর্বদা মনে রাখতে হবে রাসূল ﷺএর বাণী الصدق ينجى والكذب يهلك সত্য মুক্তি দান করে আর মিথ্যা ধ্বংস করে।

গীবত

গীবত বা পরনিন্দা মুসলিম সমাজের একটি মারাত্মক ব্যাধি। সমাজে হিংসা বিদ্বেষ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী একটি মহামন্ত্র। পরস্পর বিশ্বাস, সহমর্মিতা ও বন্ধুত্ব গীবতের কারণে বিনষ্ট হয়। দুনিয়া-আখিরাতে ক্ষতিকারক এই মহাব্যাধি থেকে বেঁচে থাকার জন্য পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং হাদিস শরীফে কঠোর সর্তকবাণী এসেছে। সুতরাং গীবত বা দোষচর্চা হতে বাঁচতে হলে প্রথমে এ ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান বা ধারণা থাকা উচিৎ।

গীবতের পরিচয়

আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) বলেন– কারো অনুপস্থিতিতে তার এমন কোন দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা যা সে শুনলে আঘাত পাবে ইসলামী পরিভাষায় তাই গীবত। তা মুখের আলোচনায়, ইশারা-ইঙ্গিতে, কলমে কিংবা অন্য যে কোন উপায়ে হোক। সমালোচিত ব্যক্তি বিধর্মী হলেও গীবত সাব্যস্ত হবে।[১১২৯] মূলত আমরা গীবতের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ। অনেকে মনে করে আমি অন্যের সম্পর্কে যা বলছি তা তো সত্য, মিথ্যা না। অর্থাৎ ঐ দোষ তার মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং এটা গীবত হবে কেন? এই ধারণা ভুল। ব্যক্তির মধ্যে বাস্তবে যে দোষ রয়েছে, তার অনুপস্থিতিতে সে দোষ আলোচনা করার নামই গীবত। পক্ষান্তরে ব্যক্তির মধ্যে আদৌ যে দোষ নেই। কিন্তু তার প্রতি এরূপ মিথ্যা দোষারোপ করাকে মিথ্যা অপরাধ বলা হয়। মোটকথা হল, বাস্তব সত্যও যদি অসাক্ষাতে বলে তাও গীবত। গীবতের পরিচয় দিতে গিয়ে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ» ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ» তোমরা কি জান গীবত কাকে বলে? সাহাবীগণ বললেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল ﷺ বললেন– তোমরা কোন (মুসলমান) ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা (শুনলে) তার খারাপ লাগবে। জিজ্ঞাসা করা হলো,যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সে ত্রুটি বর্তমান থাকে, যে ত্রুটি সম্পর্কে আমি বললাম। তবুও কি গীবত হবে? রাসূল ﷺ বললেন, তুমি যে দোষ-ত্রুটির কথা বললে তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে, আর যদি সে দোষ-ত্রুটি তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি

[১১২৯]. আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.), গীবত, পৃষ্ঠা–৯

তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিলে।[১১৩০] উক্ত হাদিস শরীফ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যা অপবাদ গীবতের চেয়ে মারাত্মক। গীবত হারাম, কবীরা গুনাহ বা মহাপাপ। এটা অত্যন্ত ঘৃণিত, দুর্গন্ধময় ও অতি নিকৃষ্ট কাজ। পবিত্র কুরআনে গীবতকারী ব্যক্তিকে আপন ভাইয়ের মৃতদেহের গোশত ভক্ষণকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর তা হল কুকুর, শুকুর ও ইতর প্রাণীর কাজ। আল্লাহ পাক বলেন– وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ তোমরা কেউ কারো গীবত করোনা। তোমাদের কেউ কি আপন মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তা ঘৃণা কর।[১১৩১] ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা.) একদিন এক গীবতকারীকে উদ্দেশ্য করে বললেন– انك الغيبة فانها ادام كلاب الناس অর্থাৎ তুমি গীবত থেকে বেঁচে থাক। কারণ তা মানবরূপী কুকুরদের তরকারী।[১১৩২] একদিন হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল ﷺকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (র.) সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন যে, حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا، تَعْنِي قَصِيرَةً، فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مزج بِهَا الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ» সাফিয়ার দোষ সম্পর্কে আপনাকে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সে এরূপ অর্থাৎ সে বেঁটে। রাসূল ﷺ বললেন– হে আয়েশা তুমি এমন এক জঘন্য কথা বলেছ, যদি সমুদ্রের পানির সাথে তা মিশ্রণ করা হয় তাহলে তার (আবর্জনাময় দুর্গন্ধে) সমুদ্রকেও পরির্বতন করে দেবে। অর্থাৎ সমুদ্রের পানিকে আবর্জনাময় দুর্গন্ধে পরিণত করে ফেলবে।[১১৩৩] হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ এর যুগে গীবতের দুর্গন্ধ অনুভব করা যেতো। কারণ তখন গীবতের অস্তিত্ব ছিল খুবই কম। কিন্তু এখনকার সময় গীবতের প্রাদুর্ভাবের কারণে লোকজন এত অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে যে, দুর্গন্ধই অনুভব হয়না। যেমন কোন অনভ্যস্থ ব্যক্তি চামড়ার গুদামে গেলে দুর্গন্ধের কারণে বেশীক্ষণ অবস্থান করতে পারবেনা। কিন্তু অভ্যস্থ ব্যক্তিরা চামড়ার উপর বসে পানাহার করছে, অথচ কোন রূপ দুর্গন্ধ অনুভব করছেনা। গীবতের অবস্থাও তাই।[১১৩৪]

হযরত আনাস (রা.) বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– মি'রাজের রাত্রিতে আমি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছিলাম যারা নিজেদের মুখমণ্ডল বিরাটাকার ধারালো নখের দ্বারা আঁচড়াতে ছিল এবং গলিত পঁচা লাশ ভক্ষণ করছিল। জিব্রাইলকে

[১১৩০]. মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা–৪১২
[১১৩১]. সূরা হুজরাত, আয়াত–১২
[১১৩২]. ইমাম গাজ্জালী (র.), কিমিয়ায়ে সা'দাত, সূত্র: গীবত, পৃষ্ঠা–৫০
[১১৩৩]. আহমদ, তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা–৪১৪
[১১৩৪]. ইমাম গাজ্জালী (র.), মুকাশিফাতুল কুলুব, খণ্ড-১ম, পৃষ্ঠা–১৭০

এদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বললেন, এরা দুনিয়াতে (অন্যের গীবত করে) মরা লাশের গোশত ভক্ষণ করতো।[১১৩৫] হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি পার্থিব জগতে তার ভাইয়ের গোশত খেয়েছে গীবতের দ্বারা কিয়ামত দিবসে তার সামনে ঐ ব্যক্তির গোশত হাযির করা হবে এবং বলা হবে যেভাবে তুমি দুনিয়াতে তার গোশত খেয়েছিলে সেভাবে তার মৃত অবস্থায় ভক্ষণ কর।[১১৩৬] গীবত ইবাদতের পূর্ণ সওয়াব থেকে বঞ্চিত করে এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে মূল ইবাদতকেও নষ্ট করে দেয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– দু'জন রোযাদার ব্যক্তি যোহর কিংবা আসর নামায পড়ল। যখন নবী ﷺ নামায শেষ করলেন– বললেন, তোমরা যাও পুনরায় উযূ কর ও নামায পড় এবং তোমাদের রোযা পূর্ণ করে অন্য কোন দিন তা কাযা কর। তারা আরয করল কেন? ইয়া রাসূলাল্লাহ! হুযূর ﷺ বললেন– কারণ তোমরা অমুক ব্যক্তির গীবত করেছ।[১১৩৭] অধিকাংশ ফোকাহাদের মতে গীবতের দ্বারা নামায, রোযা ও উযূ ভঙ্গ না হলেও এগুলোর সওয়াব কমে যায় কিংবা যার গীবত করেছে সওয়াব তার আমলনামায় চলে যায়। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন গীবতকারীর আমল গীবতকৃত ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে। ফলে হযরত হাসান (রা.) একবার জানতে পারলেন যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর গীবত করেছে। সংবাদ পেয়ে তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট কিছু হাদিয়া পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন– তুমি আমার গীবত করে তোমার নেকীগুলো আমাকে দিয়ে দিয়েছ। সুতরাং তোমার এ উপকারের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনস্বরূপ সামান্য এ হাদিয়া পাঠালাম।[১১৩৮] গীবতকারী আমল শূন্য হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

গীবত ব্যাভিচার হতেও মারাত্মক। কারণ গীবত বান্দার হক। বান্দাহ ক্ষমা না করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করেন না। যিনাহকে গুনাহ মনে করে তা গোপনে করে পক্ষান্তরে সাধারণত গীবতকে গুনাহও মনে করেনা। আর গুনাহকে গুনাহ মনে না করা বড় গুনাহ। গীবতকারী যেহেতু গীবতকে গুনাহই মনে করে না। সেহেতু তাওবাও করেনা। ফলে গুনাহগার হয়ে জাহান্নামী হয়। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন: الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ ". وَفِي رِوَايَةِ فَيَغْفِرُ لَهُ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ" " وَفِي رِوَايَةِ انس قال صاحب الزنا يتوب وصاحب الغيبة ليس له توبه গীবত ব্যাভিচার হতেও মারাত্মক।

[১১৩৫]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–১৬৮
[১১৩৬]. মিশকাত, পৃষ্ঠা–৪১৫
[১১৩৭]. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, সূত্র: গীবত, পৃষ্ঠা–৪৯
[১১৩৮]. গীবত, পৃষ্ঠা–৫৭। সূত্র: আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী, নুযহাতুল মাজালিস

সাহাবীগণ আরয করলেন– এটা কিভাবে? রাসূল ﷺ বললেন মানুষ ব্যভিচার করে। অতঃপর তাওবা করে এবং আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করে তাওবা কবুল করেন। কিন্তু পরোক্ষ নিন্দাকারীকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না। যতক্ষণ না যার নিন্দা করা হয়েছে সে ক্ষমা করে। হযরত আনাস (রা.)'র বর্ণনায় আছে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, ব্যভিচারী তাওবা করে কিন্তু পরোক্ষ নিন্দাকারীর জন্যে তাওবা নাই।[১১৩৯] কারো দোষ চর্চা করা যেমন পাপ তেমনি শোনাও পাপ। বসে বসে গীবত শোনা এবং তাতে বাঁধা না দেওয়া গীবত করার নামান্তর। কারণ এতে গীবতকারীকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– কোন মজলিসে কারো গীবত চর্চা হলে যার গীবত করা হচ্ছে তার প্রশংসা করে গীবতকারীকে গীবত থেকে বেঁচে থাকার সহায়তা কর। গীবতকারীকে গীবত হতে বাধা প্রদান কর নতুবা মজলিশ ত্যাগ করে চলে যাও। চুপচাপ বসে থাকলে তুমিও গীবতকারী বলে গণ্য হবে। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে– «مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ» যে ব্যক্তি গীবতের দ্বারা কোন মুসলমানের সম্মানহানী থেকে লোকদেরকে প্রতিহত করবে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া মহান আল্লাহর উপর অপরিহার্য হয়ে যায়।[১১৪০] গীবত শ্রবণ করার পর প্রথম করণীয় হচ্ছে, যার গীবত শোনা হচ্ছে তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা না করা, তার মন্দ বিষয়সমূহকে সত্য মনে না করা। কারণ গীবতকারী মহাপাপী। সে কোন অবস্থাতেই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারেনা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রা.)'র মজলিসে এক ব্যক্তি হযরত আবু হানিফা (র.)এর গীবত করলে ইবনে মুবারক তাকে থামিয়ে বললেন; তুমি ইমাম আবু হানিফার গীবত করছ অথচ তার শান হল– একাধারে চল্লিশ বছর তিনি একই উযূ দিয়ে পাঁচওয়াক্ত নামায পড়েছেন।[১১৪১]

গীবতের পরিণাম

গীবতকারীর দোয়া কবুল হয়না। ফকীহ আবুল লাইছ (র.) বলেছেন, ثَلاثَة لا يستجاب دعوتهم اكل الحرام ومكثار الغيبة ومن كان فى قلبه بخل او حسد للمسلمين তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়না– হারাম খাদ্য ভক্ষণকারী অধিকহারে গীবতকারী, কৃপণ ও হিংসুক ব্যক্তি।[১১৪২] হযরত ইব্রাহিম ইবনে আদহাম (র.)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমাদের দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ কি? তিনি আটটি দোষের কারণে দোয়া কবুল

১১৩৯. মিশকাত, পৃষ্ঠা–৪১৫
১১৪০. মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী, সূত্র: গীবত, পৃষ্ঠা–৮০
১১৪১. দুররুল মোখতার পাদটীকা, সূত্র: গীবত
১১৪২. আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী, গীবত, পৃষ্ঠা–৫৬

হয়না বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আট নম্বারে বলেন– তোমরা ভোরে ঘুম থেকে উঠেই নিজের দোষ–ত্রুটির প্রতি না তাকিয়ে অপরের দোষচর্চা শুরু করে দাও। এ কারণেই তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয়না এবং দোয়া কবুল হয়না।[১১৪৩] গীবতের কারণে তিনটি মহা ক্ষতি সাধিত হয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, اياكم والغيبة فان فيها ثلاث افاتٍ لا يستجاب له الدعاء ولا يقبل له الحسنات ويزداد عليه السيئات গীবত হতে বেঁচে থাক। কেননা এতে তিনটি বালা রয়েছে– এক. গীবতকারীর দোয়া কবুল হয়না। দুই. তার নেক আমলসমূহ কবুল হয়না। তিন. তার পাপসমূহ বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১১৪৪] গীবতকারী সর্বাগ্রে জাহান্নামে যাবে। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত কা'ব ইবনে আহবার (রা.) বলেন– আমি পূর্ববর্তী নবীগণের কিতাবে পড়েছি من مَاتَ تَائبًا من الغيبة كان اخر من يدخل الجنة ومن مَاتَ مصرًا عليه كان اوّل من يدخل النار যে ব্যক্তি গীবত থেকে তাওবা করে মৃত্যুবরণ করেছে সে সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে পক্ষান্তরে যে গীবতের উপর অটল থাকা অবস্থায় (তাওবাবিহীন) মৃত্যুবরণ করবে সে সবার আগে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১১৪৫]

কবরে এক তৃতীয়াংশ শাস্তি গীবতের কারণে হবে। বর্ণিত আছে, عذَاب القبر ثلث من الغيبة وثلث من النميمة وثلث من البول কবরের আযাব এক তৃতীয়াংশ গীবতের কারণে। এক তৃতীয়াংশ চোগলখোরীর কারণে এবং অপর এক তৃতীয়াংশ পেশাব হতে ভালভাবে পরিচ্ছন্নতা অর্জন না করার কারণে হবে।[১১৪৬] হযরত হাতিম আসাম (রা.) বলেছেন– গীবতকারী জাহান্নামে বানররূপে, মিথ্যাবাদী জাহান্নামে কুকুররূপে এবং হিংসুক শূয়াররূপে অবস্থান করবে।[১১৪৭]

গীবতের কাফ্ফারা

পূর্বেই বলা হয়েছে 'গীবত' হল বান্দার হক। সুতরাং কাফ্ফারাও বান্দার সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ যার 'গীবত' করা হয়েছে প্রথমে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে যদি তিনি উপস্থিত থাকেন কিংবা বেঁচে থাকেন। পক্ষান্তরে যদি সে দূরে থাকার কারণে সাক্ষাৎ সম্ভব না হয় বা মৃত্যুবরণ করে তবে সেক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট তাওবা করবে এবং ঐ ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনা করবে। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, গীবতের

১১৪৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–৫৬
১১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–৫৯
১১৪৫. ইমাম গাজ্জালী (র.), কিমিয়ায়ে সা'দত। সূত্র: গীবত, পৃষ্ঠা–৪৮
১১৪৬. গীবত পৃষ্ঠা–৪৮ ও ফকীহ আবুল লাইস, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃষ্ঠা-১০৮।
১১৪৭. আব্দুর রহমান সফূরী (র.), নুযহাতুল মাজালিস, সূত্র: আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী, গীবত, পৃষ্ঠা–৫১

কাফফারা হল– তুমি যার গীবত করেছ তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবে এভাবে– হে আল্লাহ আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা কর।[১১৪৮] এতক্ষণ যাবৎ গীবতের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনায় এর মারাত্মক অনিষ্ট সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের পর কোন বিবেকবান মানুষ গীবতে লিপ্ত হতে পারেনা। তবে কারো সাক্ষাতে তাকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে, জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থ ও দ্বীনের হেফাজতের উদ্দেশ্যে কারো নিন্দা প্রকাশ করা বৈধ। কোন কোন সময় অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করা, খোদাদ্রোহীদের দোষ–ত্রুটি তুলে ধরে দ্বীনের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটন করে দ্বীনের হেফাজত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। অত্যাচারিত ও নিপীড়িত ব্যক্তি অত্যাচারী সম্পর্কে জনগণের নিকট কিংবা বিচারকের নিকট তার অত্যচারের কাহিনী দোষ-ত্রুটি তুলে ধরতে পারবে। শরীয়তের পরিপন্থি-বিদয়াত প্রচারকারীর দোষ বর্ণনা করা জায়েয। হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র.) বলেন– ثَلَاثَةٌ لَيْسَتْ لَهُمْ غِيبَةٌ: الْإِمَامُ الْجَائِرُ، وَالْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِفِسْقِه، وَالْمُبْتَدِعُ الَّذِي يَدْعُو النَّاسَ إِلَى بِدْعَتِه তিন প্রকারের মানুষের সমালোচনা করা গীবত হয়না। এক. অত্যাচারী শাসক। দুই. অভিশপ্ত ফাসেক ও তিন. ঐ বিদয়াতী লোক যে মানুষকে বিদআত কাজের দিকে আহবান করে।[১১৪৯] সারকথা হল গীবত মানুষের দুনিয়া আখিরাত বিধ্বংসী এক মহাপাপ। সুতরাং পাপকে ঘৃণা করা উচিত, পাপীকে নয়। কারো কোন পাপ দেখা মাত্র তাকে হেয় করার উদ্দেশ্যে সমালোচনা করা কোন জ্ঞানী লোকের কাজ নয়। কারণ দৃশ্যমান ইবাদত পরকালে নাজাত পাওয়ার একমাত্র অবলম্বন নয়। হাতে তসবীহ, মাথায় পাগড়ি, গায়ে জোড়া-তালির কাপড় জান্নাত লাভের মাধ্যম নয়। অন্তরে ঈমান ও তাকওয়া থাকলে অনেক সময় আমল ছাড়াও নাজাত পাওয়া যায়। বড় বড় অলী আল্লাহও মুহূর্তের মধ্যে পাপী হয়ে যায় আবার জঘন্য পাপী ও আল্লাহর অলী হতে সময় লাগেনা। গীবতের আলোচনা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)'র একটি মূল্যবান বাণী দিয়ে সমাপ্ত করছি। তিনি বলেন– اذا اردت ان تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك যখন তুমি তোমার কোন সঙ্গীর দোষ সম্পর্কে গীবত করতে চাইবে তখন নিজের দোষসমূহের কথা স্মরণ কর।[১১৫০] এই সহজ পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমেই আল্লাহ আমাদেরকে গীবত ও এর অনিষ্ট হতে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

চোগলখোরী

একজনের কথা কিংবা দোষ অপরজনকে বলে বেড়ানোকে চোগলী বলা হয়। চোগলখোরী অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ। এটা হারাম। এর ফলে ইসলামের সাম্য, ঐক্য,

১১৪৮. মিশকাত, পৃষ্ঠা-৪১৫
১১৪৯. বায়হাক্বী, সূত্রঃ গীবত, পৃষ্ঠা–৩৮
১১৫০. আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী, গীবত, পৃষ্ঠা–৪৯

ভ্রাতৃত্ব, শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। সমাজে, পরিবারে, ভাইয়ে ভাইয়ে, পিতা-পুত্রে কলহ-বিবাদ লেগে থাকে। বেহেশ্‌তী পরিবেশ দোযখে পরিণত হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ।[১১৫১] অপর আয়াতে বলা হয়েছে– هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ যে পশ্চাতে নিন্দা করে, একের কথা অপরকে লাগায় (সে পাপিষ্ট)।[১১৫২] চোগলখোর সমাজে সর্বদা ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার কুমন্ত্রনায় লিপ্ত থাকে। একজনের বিরুদ্ধে আর একজনকে কিভাবে ক্ষেপাবে সে চিন্তায় রাত দিন মগ্ন থাকে। ফলে নিজেও শান্তি পায় না অপরকেও শান্তিতে থাকতে দেয়না। এরা সমাজ বিধ্বংসী কীট। এদেরকে কেউ পছন্দ করেনা। আল্লাহ বলেন, وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।[১১৫৩] পৃথিবীতে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা মুনাফিকের চরিত্র। পবিত্র কুরআনে আছে– وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ যখন মুনাফিকদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ করোনা। তখন তারা বলে আমরাতো সংশোধনকারী। জেনে রেখো তারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী। কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করেনা।[১১৫৪] চোগলখোর জান্নাতে যাবে না। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১১৫৫] অর্থাৎ তারা অন্যান্য নেক্‌কারদের সাথে প্রথম পর্যায়ে বেহেশতে যাবেনা বরং তার কৃতকর্মের প্রতিফল তথা শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে।

চোগলখোরের কবর আযাব

চোগলখোর দুনিয়াতে যেমন লাঞ্ছিত হয় তেমন কবরেও কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে একাধিক স্থানে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদিসে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত আছে যে, রাসূল ﷺ একদিন দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ যাত্রাবিরতি করে বললেন– এ দু'টি কবরবাসীর উপর আযাব হচ্ছে। কারণ ওদের একজন চোগলখোরী করত আর অপরজন পেশাব হতে ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন করত না।[১১৫৬] আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) 'তাম্বীহুল গাফেলীন' এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন– জনৈক আনসারী সাহাবীর বোনের ইন্তেকাল হল। কাফন-দাফন শেষে বাড়ী ফিরে তার স্মরণ হল, তার টাকার থলে কবরের ভিতর রয়ে গেছে। অতঃপর কবর খনন

১১৫১. সূরা হুমাযাহ, আয়াত–১
১১৫২. সূরা ক্বলম, আয়াত–১১
১১৫৩. সূরা মায়েদা, আয়াত-৬৪
১১৫৪. সূরা বাকারা, আয়াত- ১১
১১৫৫. মিশকাত, পৃষ্ঠা–৪১১
১১৫৬. মিশকাত, পৃষ্ঠা–৪২

করে তা নিতে গিয়ে দেখল যে, কবরে আগুন। বোনের মর্মান্তিক পরিণতি প্রত্যক্ষ করে তাড়াতাড়ি মাটি দ্বারা ঢেকে দিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে ঘটনার বিবরণ দিল। তার আমল সম্পর্কে মাকে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে মা বললেন, তার তেমন কোন দোষ ছিলনা, তবে তার চোগলখোরীর অভ্যাস ছিল। নামায বিলম্বে পড়ত এবং পাক পবিত্রতায় উদাসীন থাকত। এ কারণেই হয়ত তার এই আযাব হচ্ছে।[১১৫৭] চোগলখোর আল্লাহর নিকট অতি নিকৃষ্ট ও ইতর। মানুষের ঘৃণার পাত্র হয় চোগলখোর। এদের দেখলে মানুষ মুখ ফিরিয়ে ফেলে, কথা বলা বন্ধ করে দেয় এবং তাদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। চোগলখোর ওলিদ ইবনে মুগীরাকে কুরআনে হারামজাদা তথা জারজ সন্তান বলে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– خيار عباد الله الذين اذا رُواو اُذكر الله وشرار عباد الله المشاؤن بالنميمة المفرقون بين الاحبة الباغون আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ তারা যাদেরকে দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হয়। আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট বান্দাহ তারা যারা মানুষের পরোক্ষ নিন্দা করে বেড়ায়। বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পুত-পবিত্র লোকদের পদস্কলন প্রত্যাশা করে।[১১৫৮] অর্থাৎ চোগলখোরীর মাধ্যমে ভাল মানুষদেরকে বিপর্যয়ে,পাপাচারে ধ্বংসে, পতনে ও ব্যভিচারে ফেলার সুযোগের সন্ধান করে। চোগলখোরের দোয়া কবুল তো দূরের কথা তার কারণে অন্যদের দোয়াও কবুল হয়না। ফলে সে শুধু নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হয়না অপরকেও ক্ষতিগ্রস্থ করে। তাদের কারণে আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত হতে সবাইকে বঞ্চিত হতে হয়।

ঘটনা

হযরত মুসা (আ.)এর সম্প্রদায় বনী ইসরাইলে একদিন অনাবৃষ্টির কারণে দূর্ভিক্ষে পতিত হয়েছে। মুসা (আ.) সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে লাগাতার তিনদিন বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। কিন্তু দোয়া কবুল হয়নি বৃষ্টিও হয়নি। মুসা (আ.) আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন– এর কারণ কি? তখন ওহী নাযিল হল– হে মুসা! তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন চোগলখোর আছে যার কারণে দোয়া কবুল হচ্ছেনা এবং হবেও না। মুসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ! কে সে বদবখত? আপনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিন, আমি তাকে বের করে দেবো। আল্লাহ বললেন– আমি চোগলখোরী থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করি আর আমি কিভাবে চোগলখোরী করবো? হুকুম হল তোমরা সবাই একত্রে তাওবা কর, তাহলে দোয়া কবুল হতে পারে। অতএব সবাই খালেস দিলে তাওবা করেছে তাৎক্ষণিক বৃষ্টি অবতীর্ণ হয়েছে।[১১৫৯] ইমাম ইয়াহিয়া আকসাম (র.) বলেন, চোগলখোর

[১১৫৭]. আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী, গীবত, পৃ. ৪২ ও ইমাম গাজ্জালী (র.), মুকাশিফাতুল কুলুব, খণ্ড–১ম, পৃ. ১৬৮
[১১৫৮]. মিশকাত, পৃষ্ঠা-৪১
[১১৫৯]. ইমাম গাজ্জালী (র.), কিমিয়ায়ে সা'দত, পৃষ্ঠা–২১৩ ও আবুল লাইস (র.), তাম্বীহুল গাফেলীন, আরবী, পৃষ্ঠা–১০৯

যাদুকরের চেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকারক। একজন চোগলখোর এক ঘন্টায় যা (ক্ষতি) করতে পারে যাদুকর তা একমাসেও পারেনা।[১১৬০] কথিত আছে যে, চোগলখোরের কাজ শয়তানের কাজের চেয়েও ক্ষতিকর। কেননা শয়তানের কাজ হল ভিতরে, খেয়ালে ও প্ররোচনার মাধ্যমে পক্ষান্তরে চোগলখোরের কাজ প্রত্যক্ষ ও সামনাসামনি।[১১৬১] আরবী প্রবাদে চোগলখোরকে حمالة তথা লাকড়ি বাহক বলা হত। অধিকাংশ মুফাসসিরগণ কুরআনের আয়াত حَمَّالَةَ الحطب থেকেও চোগলখোর অর্থ লিখেছেন। শুকনো লাকড়ি যেমন আগুনের ইন্ধন হয়, চোগলখোরও ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।[১১৬২] হযরত মাসআব ইবনে জুবাইর (র.) বলেন, আমার মতে চোগলখোরের কথা শোনা চোগলী করার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ। চোগলখোরের উদ্দেশ্য হল উত্তেজিত করা আর শ্রবণকারী তা কবুল করে তাকে উৎসাহিত করে।[১১৬৩] হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন– যে ব্যক্তি তোমার সামনে অন্যের কথা বলে সে অবশ্যই তোমার কথা অন্যের কাছে বলে বেড়াবে। সুতরাং সর্বাবস্থায় চোগলখোরের খপ্পর থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

মদ ও জুয়া

'ইসলাম' বিজ্ঞান সম্মত ধর্ম। এর প্রতিটি আদেশ নিষেধ হেকমতে পূর্ণ। ইসলামে বস্তুত শুধু বাহ্যিক দিকটা বিচার্য নয় বরং ভিতরে বাইরে সবকিছুকে বিচার করে ভালমন্দের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। প্রাক ইসলামী যুগে সমগ্র আরব সমাজে মদ ও জুয়ার ব্যাপক প্রচলন ছিল। শুধু তা নয় মদ আভিজাত্যের প্রতীক ছিল। আল্লাহ তায়ালা মদ্যপানকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে নিষেধ করেছেন। কারণ দীর্ঘদিনের অভ্যাস মানুষ সহজে ত্যাগ করতে পারেনা। তাই আল্লাহপাক প্রথমে মদ্যপানের অপকারিতা সম্পর্কে সর্তক করে দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন– يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এতদুভয়ের মধ্যে মহাপাপ আছে এবং মানুষের জন্য উপকারিতাও আছে। তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়।[১১৬৪] এ দু'টির মধ্যে মানুষের ধারণা মোতাবেক সামান্য উপকারিতা থাকলেও অপকারিতা কিন্তু অনেক বেশী। কারণ মানুষের সবচেয়ে বড় নেয়ামত ও দামী বস্তু হচ্ছে আকল বা বিবেক যা দ্বারা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, তা মদ্যপান দ্বারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে যে কোন পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে সে। তাফসীরে আযিযী গ্রন্থে ইবনে জরির, ইবনে আবি হাতেম, হাকেমের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আলী ও হযরত আব্দুল্লাহ

[১১৬০]. ফকীহ আবুল লাইস (র.), তাম্বীহুল গাফেলীন, আরবী, পৃষ্ঠা–১০৮
[১১৬১]. তাম্বীহুল গাফেলীন, আরবী, পৃষ্ঠা–১০৮
[১১৬২]. প্রাগুক্ত
[১১৬৩]. ইমাম গাজ্জালী (র.), কিমিয়ায়ে সা'দত, পৃষ্ঠা-৩৯৪
[১১৬৪]. সূরা বাকারা, আয়াত–২১৯

ইবনে মুজাহিদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালামের যামানায় মানুষ বিভিন্ন পাপাচারের লিপ্ত হয়ে পড়লে ফেরেশ্তারা আল্লাহর দরবারে আরয করল ইনসান বড় গুনাহগার। আমরা প্রথমেই বলেছিলাম এরা দুনিয়ায় গিয়ে খুন খারাবীতে লিপ্ত হবে। এখন আমাদের কথা সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। আল্লাহ পাক বললেন– মানুষকে ক্রোধ, ক্ষুধা ও শাহওয়াত দেয়া হয়েছে যা দ্বারা তারা গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে। তারা বলল, আমাদের এগুলি দিলেও আমরা গুনাহে লিপ্ত হবো না। তাদের বলা হল– ঠিক আছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পরহেজগার ফেরেশ্তা নির্বাচিত কর। তাদেরকে ঐগুলি দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। তারা বাছাই করে হারুত ও মারুত দু'জন ফেরেশ্তা নির্বাচিত করল। আল্লাহ তাদের শাহওয়াত ও রাগ দিয়ে পৃথিবীতে বাবেল শহরে পাঠালেন। তারা দিনের বেলায় কাজী হয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতেন আর সন্ধ্যা বেলায় ইসমে আ'যমের মাধ্যমে আসমানে উঠে যেতেন। ন্যায়পরায়ণতায় তারা প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। বহু মোকাদ্দামা তাদের কাছে আসতে লাগল। একদিন যুহরা নামক একজন সুন্দরী মহিলা স্বামীর বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা নিয়ে আসে। তাকে দেখা মাত্রই ঐ দু'জন ফেরেশ্তা আশেক হয়ে পড়েছে এবং অন্যায় কাজের প্রস্তাব দিয়েছে। মহিলাটি বলল– তোমাদের এবং আমাদের দ্বীন-ধর্ম ভিন্ন, তাছাড়া আমার স্বামী অত্যন্ত রাগী শুনলে আমাকে হত্যা করবে। তাদের আসক্তি আরো বৃদ্ধি পেলে মহিলা প্রস্তাব দিল তোমরা আমার দেবতাকে সেজদা কর অথবা আমাকে ইসমে আ'যম শিক্ষা দাও অথবা আমার স্বামীকে হত্যা কর অথবা মদ্যপান কর। তারা বলেছে সিজদা শিরক এটা সম্ভব নয়। ইসমে আ'যম এটা আসরারে এলাহী। এটা প্রকাশ করা খেয়ানত ও যুলুম। হত্যা বান্দার হক এগুলো আমাদের দ্বারা অসম্ভব। তবে মদ্যপান করতে পারি। অতএব মদ্যপানে সম্মত হয়ে মদ্যপান করে মাতাল হয়ে পড়েছে। ফলে মাতাল অবস্থায় তারা মূর্তিপূজা করেছে, ইসমে আ'যম শিখায়েছে এবং মহিলার স্বামীকে হত্যাও করেছে। পরে হুঁশ আসলে তারা লজ্জিত হল, আল্লাহর দরবারে তাওবা করল। কিয়ামত পর্যন্ত, দুনিয়াতে তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।[১১৬৫] অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় যেসব গুনাহ করতে সাহস পায়নি মদ্যপান করে মাতাল হয়ে সেসব কাজ অনায়াসেই করে ফেলেছে। অতএব বলা হয় যে, বিবেক বিলুপ্ত হয়ে গেলেই প্রতিটি মন্দ কাজের পথ সুগম হয়ে যায়। মদ্যপান সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হয় হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (র.)এর ঘরে কয়েকজন সাহাবী উপস্থিত আহারাদি করার পর যথারীতি সবাই মদ্যপান করলেন। মাগরীবের নামাযে হযরত আলী (রা.) ইমামতি করতে গেলে মদ্যপানের কারণে তিনি قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ সূরা পড়তে ভুল করেছেন। তখন আয়াত নাযিল হয় يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ

[১১৬৫]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), তাফসীরে নঈমী, খণ্ড-১ম পৃষ্ঠা–৫৬৬

وَأَنْتُمْ سُكَارَى হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাবস্থায় নামাযের কাছে যেওনা।[১১৬৬] পরবর্তীতে আর এক ঘটনায় মদ্যপান করে সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে হতাহতের ঘটনা ঘটলে মদ্যপান হারাম সম্পর্কে চূড়ান্ত আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি এবং তীর নিক্ষেপ এই সবগুলো অপবিত্র শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাক।[১১৬৭] হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– সর্বপ্রকার অপকর্ম এবং অশ্লীলতার জন্মদাতা হচ্ছে মদ। এটি পান করে মানুষ নিকৃষ্টতর পাপে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে– إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবেনা?[১১৬৮] উপরোক্ত আয়াত থেকে মদ্যপান ও জুয়ার ক্ষতিসমূহ চিহ্নিত হয়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে যে, এ দু'টি কাজ শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। শয়তান কাউকে মদ্যপান ও জুয়া খেলায় লিপ্ত রাখতে পারলে অনেক কল্যাণজনক কাজ থেকে বিরত এবং বহু ধ্বংসাত্মক কাজে পতিত করাতে পারে আর এটাই শয়তানের কাজ। হযরত সাঈদ (রা.) হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, চার ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না অথচ তা পাঁচশত বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ চার প্রকারের মানুষ জান্নাত থেকে পাঁচশত বছরের দূরে থাকবে। আর তারা হল কৃপণ, খোটা প্রদানকারী, মদ্যপানে অভ্যস্থ ব্যক্তি ও পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি।[১১৬৯] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) বলেন, মদের সাথে সম্পর্কযুক্ত দশ শ্রেণীর লোকের উপর রাসূল ﷺ লা'নত করেছেন। (১) যে মদের নির্যাস বের করে (২) প্রস্তুতকারক (৩) পানকারী (৪) যে পান করায় (৫) আমদানীকারক (৬) যার জন্য আমদানী করা হয় (৭) বিক্রেতা (৮) ক্রেতা (৯) সরবরাহকারী ও (১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী।[১১৭০] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, কিয়ামতের দিন মদ্যপায়ীকে উপস্থিত করা হবে, তার চেহারা থাকবে কুৎসিত, চোখ দু'টি নীলবর্ণের, জিহ্বা বুক পর্যন্ত ঝুলন্ত এবং তা থেকে লালা

[১১৬৬]. সূরা নিসা, আয়াত–৪৩
[১১৬৭]. সূরা মায়েদা, আয়াত–৯০
[১১৬৮]. সূরা মায়েদাহ, আয়াত–৯১
[১১৬৯]. ফকীহ আবুল লাইস (র.), তাম্বীহুল গাফেলীন, আরবী, পৃষ্ঠা-১১
[১১৭০]. প্রাগুক্ত

ঝরতে থাকবে। তার এরূপ অবস্থা যারা দেখবে, সে তার দূর্গন্ধের কারণে তাকে ঘৃনা করবে। তোমরা মদ্যপায়ীদের সালাম দেবেনা, অসুস্থ হলে দেখতে যাবেনা এবং তারা মারা গেলে তাদের জানাযা পড়বে না।[১১৭১] হযরত ওসমান (রা.) বলেন– তোমরা মদ্যপান থেকে বিরত থাক। কেননা এ হচ্ছে সকল গুনাহের মূল। কোন ব্যক্তির অন্তরে ঈমান ও মদ একত্রিত হতে পারেনা। এ দু'টির একটি অপরটিকে ধ্বংস করে দেয়। অর্থাৎ নেশাগ্রস্থ অবস্থায় মদ্যপায়ীর মুখ দিয়ে কুফরী শব্দ বের হয়ে যেতে পারে। মৃত্যুকালে তার মুখ দিয়ে কুফরী প্রকাশ হওয়ার সম্ভবনা আছে। ফলে দুনিয়া থেকে কুফরী অবস্থায় যাবে এবং চিরকাল জাহান্নামী হবে।[১১৭২] হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– কিয়ামতের দিন মদ্যপায়ী যখন কবর থেকে উঠবে তখন সে পঁচা লাশের চেয়েও দূর্গন্ধযুক্ত হবে। তার গলায় থাকবে মদের ভাণ্ড ঝুলানো, হাতে পেয়ালা তার চামড়া ও গোশতের মাঝখানটা সাপ-বিচ্ছুতে ভরা থাকবে। তাকে আগুনের এক জোড়া জুতা পরতে দেয়া হবে তাতে তার মাথার মগজ টগবগ করতে থাকবে। সে দেখবে যে তার কবরটি জাহান্নামের একটি গর্ত এবং জাহান্নামে সে হবে ফেরআউন ও হামানের সাথী।[১১৭৩] হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা.) বর্ণনা করেন– আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি মদ্যপান করে সাত দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবেনা। যদি তাতে তার জ্ঞান লোপ পায় তাহলে চল্লিশ দিন যাবৎ নামায কবুল হবেনা। যদি মারা যায় তাহলে সে কাফেররূপে মারা যাবে। অন্য এক হাদিসে আছে কেউ যখন একবার মদ্যপান করে তখন চল্লিশ দিন যাবৎ তার কোন নামায, রোযা বা কোন আমল কবুল হবেনা। দ্বিতীয় বার পান করলে আশি দিন যাবৎ তার কোন আমল আল্লাহ কবুল করবেন না। তৃতীয়বার পান করলে একশ বিশ দিন পর্যন্ত, চতুর্থ দিন পান করলে তোমরা তাকে হত্যা করবে। কেননা সে কাফের এবং তাকে জাহান্নামীদের পুঁজ পান করানো আল্লাহর জন্য অপরিহার্য।[১১৭৪]

এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষিগণ

- ইমাম আ'যম আবু হানিফা (র.) ১৫ শাবান ১৫০ হিজরি
- ইমাম যয়নুল আবেদীন (র.) ৪ শাবান
- হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) ১৪ শাবান ১৬১ হিজরি
- ইমাম ইবনে কাসীর (র.) ২৬ শাবান ৭৭০ হিজরি
- হযরত সুফিয়ান সওরী (র.) শাবান ১৬১ হিজরি।

[১১৭১]. প্রাগুক্ত, আয়াত–৯০
[১১৭২]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯১
[১১৭৩]. প্রাগুক্ত
[১১৭৪]. প্রাগুক্ত

মাহে রমযান

মাহে রমযানের ফযিলত

মাহে রমযান আরবী চান্দ্র মাসসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম মর্যাদাসম্পন্ন ও বরকতময় মাস। এ মাসের ফযিলত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৫নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- "রমযান মাসই হল সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন যা মানুষের জন্য হেদায়েত ও পথনির্দেশ এবং মীমাংসার সুস্পষ্ট বাণীসমূহ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই সে মাসে রোযা পালন করে।" যেহেতু পবিত্র কুরআন আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ আম্বিয়ায়ে কেরামগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মাহে রমযান অন্যান্য মাসসমূহের উপর শ্রেষ্ঠ সেহেতু শ্রেষ্ঠ কিতাবকে শ্রেষ্ঠ নবীর উপর শ্রেষ্ঠ মাসে অবতীর্ণ করা হয়েছে যাতে শ্রেষ্ঠত্বের ধারাবাহিকতা অটুট থাকে।

পবিত্র হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فتحت ابواب السماء وفي رواية فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ وَفِيْ رَوَايَةٌ فتحت ابواب الرحمة (متفق عليه) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এরশাদ করেন- যখন রমযান আসে তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। অপর এক বর্ণনায় আছে- জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শিকল দিয়ে বন্দী করা হয়। অপর এক বর্ণনায় আছে রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।[১১৭৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ (رواه الترمذى وابن ماجه)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন- যখন মাহে রমযানে প্রথম রাত আসে তখন শয়তান এবং অবাধ্য জ্বিনকে বন্দী করা হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর এর কোন দরজা খোলা

[১১৭৫]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৭৩

হয়না। আর জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। অতঃপর ইহার কোন দরজা বন্ধ করা হয়না। আর আল্লাহ একজন আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে- হে কল্যাণ অন্বেষণকারী (কল্যাণের দিকে) অগ্রসর হও। হে অকল্যাণ অন্বেষণকারী (অকল্যাণ থেকে) বিরত হও। আর অসংখ্য জাহান্নামীকে জাহান্নাম থেকে আযাদ (মুক্ত) করবেন। ইহা (রমযান মাসের) প্রত্যেক রাতে হতে থাকবে।[১১৭৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فرض اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ تُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مردة الشَّيَاطِينُ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ (رواه احمد والنسائى)

হযরত আবু হুরাইয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- তোমাদের নিকট বরকতপূর্ণ মাস রমযান এসেছে আল্লাহ তায়ালা এ মাসে তোমাদের উপর রোযা ফরয করেছেন। এ মাসে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। অবাধ্য শয়তানদেরকে গলায় বেড়ী দেয়া হয়। আর এ মাসে এমন এক রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের ফযিলত থেকে বঞ্চিত থাকবে সে অবশ্যই (সমস্ত নেয়ামত থেকে) বঞ্চিত হবে।[১১৭৭]

ইমাম বায়হাকী (র.) শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন; নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন- " إِنَّ الْجَنَّةَ لَتُزَخْرَفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى حَوْلٍ قَابِلٍ "، قَالَ: " فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَنَشَرَتْ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى الْحُورِ الْعِينِ، فَيَقُلْنَ: يَا رَبِّ، اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا تَقَرُّ بِهِمْ أَعْيُنُنَا وَتُقَرُّ أَعْيُنُهُمْ " بِنَا বছরের প্রথম থেকে রমযানের পূর্ব পর্যন্ত জান্নাতকে মাহে রমযান শরীফের সম্মানার্থে সুসজ্জিত করা হয়। তিনি বলেন যখন রমযানের প্রথম দিন আসে তখন আরশের নীচে জান্নাতের বৃক্ষের পাতায় বেহেশতের হুরদের উপর দিয়ে (জান্নাতী রহমতের) বাতাস প্রবাহিত হয়। তখন তারা প্রার্থনা করে বলে হে প্রভূ! আপনি আপনার (রোযাদার) বান্দাদেরকে আমাদের স্বামী বানিয়ে দিন যাতে তাদের দ্বারা আমাদের চক্ষু শীতল হয় এবং তাদের চক্ষু আমাদের দ্বারা শীতল হয়।[১১৭৮]

[১১৭৬]. তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ সূত্র: মিশকাত শরীফ পৃ. ১৭৩
[১১৭৭]. আহমদ ও নাসাঈ, সূত্র: মিশকাত শরীফ পৃ. ১৭৩
[১১৭৮]. বায়হাকী, শোআবুল ঈমান, সূত্র: মিশকাত শরীফ পৃ. ১৭৪

উপরোক্ত কুরআন ও হাদিস শরীফ থেকে প্রমাণিত হয় রমযান মাসে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে আসমানে রহমত ও জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ইবলিছ শয়তানকে লোহার শিকল দিয়ে বন্দী করে রাখা হয়। রমযানের রাতে আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশ্তাগণ আসমানে এসে সৎ কাজের প্রতি আহ্বান করে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে থাকে। তাছাড়া এ মাসের শেষের দশ রাতের যে কোন বেজোড় রাতে শবে কদর নিহিত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। রমযানের সম্মার্থে আল্লাহ তায়ালা দীর্ঘ একবছর যাবৎ জান্নাতকে সুসজ্জিত করে তুলেন। এ সম্মান দেখে জান্নাতের হুর পর্যন্ত রোযাদারের পত্নী হওয়ার বাসনা করে।

রমযান শব্দের বিশ্লেষণ

কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলেন رَمْضَان আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। অতএব شهر رمضان অর্থ আল্লাহর মাস। হযরত জা'ফর সাদেক (র.) তাঁর পূর্বপুরুষের সূত্রে বলেন, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন 'রমযান' আল্লাহর মাস। হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন তোমরা শুধু রমযান বলো না বরং সম্মানের সাথে বলো। কেননা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, شهر رمضان (অর্থাৎ মাহে রমযান)।[১১৭৯] কারো মতে رمض অর্থ প্রচণ্ড গরম। যেহেতু আরবী মাসসমূহের নাম রাখার সময় অর্থের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হত। সম্ভবত যখন এ মাসের নাম রাখা হয় তখন হয়ত প্রচণ্ড গরমের মৌসুম ছিল বিধায় رمضان করে নাম রাখা হয়েছে। অথবা এ মাসে মানুষের গুনাহ জ্বালিয়ে দেয়া হয় বলে رمضان করে নাম রাখা হয়েছে।

আবার এরূপও বর্ণিত আছে যে, رمض অর্থ বর্ষাকালের বৃষ্টি। বর্ষাকালের বৃষ্টি যেমনি সমস্ত ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার করে পবিত্র করে ফেলে তেমনি মাহে রমযান মানুষের শরীরের সমস্ত পাপ ধুয়ে পরিস্কার করে অন্তরসমূহকে পবিত্র করে দেয়।[১১৮০]

রহমত, মাগফিরাত ও নাযাতের মাস

এ মাস রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের মাস। যেমন হযরত সালমান ফারসী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের অংশে আছে- وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ , وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ এ মাসের প্রথম দশ দিন রহমত,

[১১৭৯]. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.), গুনিয়াতুত তালেবীন পৃ. ৩৫১
[১১৮০]. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.), গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃ. ৩৫২

মধ্যের দশ দিন মাগফেরাত এবং শেষ দশদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার মাস আর যে ব্যক্তি তার অধিনস্থ কর্মচারীর উপর রমযান মাসে কাজ-কর্ম সহজ বা হ্রাস করে দেবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।[১১৮১]

এ মাস এত বেশী বরকতময় যে, এ মাসে নফল এবাদত করলে অন্য মাসের ফরয এবাদতের সমান এবং এ মাসে একটি ফরয আদায় করলে অন্য মাসের সত্তরটি ফরয আদায়ের সমান সওয়াব প্রদান করা হয়।

এ মাস ধৈর্য্যের মাস, সহনশীলতার মাস এবং জীবিকা বৃদ্ধির মাস। নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন- مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ، كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ "যে ব্যক্তি এ মাসে নফল এবাদত করবে সে যেন অন্য মাসে ফরয এবাদত করল আর যে এ মাসে একটি ফরয আদায় করবে সে যেন অন্য মাসে ৭০টি ফরয আদায় করল। এ মাস ধৈর্যের মাস আর ধৈর্যের পরিণাম হল জান্নাত। আর সহনশীলতার মাস এবং এ মাসের মধ্যে মু'মিনের জীবিকা বৃদ্ধি করা হয়।"[১১৮২]

হযরত আবু বকর ইবনে আবি মরযাম তার শায়খগণ থেকে বলেন- তারা বলতেন- রমযান মাস যখন উপস্থিত হয় তখন তোমরা বেশী করে ব্যয় কর কেননা এ মাসের ব্যয়কে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের ন্যায় বৃদ্ধি করা হয়। এ মাসের একটি তাসবীহ অন্য মাসের হাজার তাসবীর চেয়ে উত্তম।

ইমাম নখঈ (র.) বলেন- এ মাসের একদিনের রোযা হাজার দিনের রোযার চেয়ে উত্তম, এ মাসের এক তাসবীহ হাজার তাসবীহর চেয়ে উত্তম এবং এ মাসের এক রাকাত নামায হাজার রাকাত নামায থেকে উত্তম।[১১৮৩]

গাউছে পাক (র.) বলেন- আবু নছর তার পিতার সূত্রে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে আমার নিকট হাদিস বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন- রমযানের প্রথম রাত যখন আসে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন আর যখন কোন বান্দার প্রতি আল্লাহ রহমতের নজর করেন তবে তাকে কোন আযাব দেননা। আল্লাহর নির্দেশে সহস্র ব্যক্তি দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করে।[১১৮৪]

১১৮১. বায়হাকী, শোআবুল ঈমান, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ. পৃ. ১৭৪
১১৮২. প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৩
১১৮৩. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫ হি.) লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ. ২৪৮
১১৮৪. আব্দুল কাদের জিলানী (রা.) (৫৬১ হি.), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দু, পৃ. ৩৫৪

আল্লাহ তায়ালা রমযান মাসে সূর্য উদিত হওয়া থেকে ইফ্তার পর্যন্ত তাঁর কিছু বান্দাকে নারী হোক বা পুরুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। প্রত্যেক আসমানে একজন আহ্বানকারী ফেরেশ্তা আছে যার মাথা আরশের নীচে এবং পা পৃথিবীর সাত স্তর জমিনের নীচে। তার এক পাখা পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে অপরটি পশ্চিমপ্রান্তে তার মাথায় লুলু, মারজান ও জাওয়াহের পাথরের তাজ হবে। এই আহ্বানকারী ফেরেশ্তা এই বলে আহ্বান করে যে, কোন তাওবাকারী আছে? তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। কোন প্রার্থনাকারী আছে? তার প্রার্থনা কবুল করা হবে। কোন মযলুম আছে? তার যুলুম দূরীভূত করা হবে। কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে? তাকে ক্ষমা করা হবে। কারো কোন চাহিদা আছে? তার চাহিদা পূর্ণ করা হবে।[১১৮৫]

মাহে রমযান গুনাহের কাফ্ফারা

হযরত আ'মশ (র.) আবু খায়সমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এর সাহাবায়ে কেরামগণ বলতেন এক রমযান অপর রমযান পর্যন্ত, একটি হজ্ব অপর হজ্ব পর্যন্ত, এক জুমা অপর জুমা পর্যন্ত, এক নামায অপর নামায পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়ে 'যা গুনাহ্ হয়েছে সবগুলির কাফ্ফারা হয়ে যায়।[১১৮৬]

রমযান শ্রেষ্ঠমাস

সব মাসের মধ্যে রমযান মাসেই হল সর্বশ্রেষ্ঠ মাস। যেমন বলা হয় মাসের মধ্যে রমযান মাসের শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ হল- বক্ষের মধ্যে যেমন অন্তর শ্রেষ্ঠ, অথবা মানুষের মধ্যে যেমন আম্বীয়ায়ে কেরাম শ্রেষ্ঠ কিংবা শহরসমূহের মধ্যে যেমন হারাম শরীফ শ্রেষ্ঠ। হেরম শরীফ এমন মর্যাদাপূর্ণ স্থান যে, সেখানে অভিশপ্ত দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারে না ঠিক তেমনি মাহে রমযানে রোযাদারের অন্তরে অভিশপ্ত শয়তান প্রবেশ করতে পারে না। কারণ তাকে রমযানে বন্দী করে রাখা হয়। আম্বিয়ায়ে কেরাম গুনাহগারের জন্য সুপারিশ করবে, অনুরূপ মাহে রমযানও গুনাহগারের জন্য সুপারিশ করবে। অন্তরের পরিচ্ছন্নতা মা'রফত, ঈমান ও নূরের দ্বারা হয়ে থাকে পক্ষান্তরে রমযানের সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা তেলাওয়াতে কুরআনের দ্বারা হয়। যাকে মাহে রমযানে ক্ষমা করা হয়নি তাকে আর কোন মাসে ক্ষমা করা হবেনা?[১১৮৭]

বলা হয় যে, সাইয়্যেদুল বশর তথা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হযরত আদম (আ.), ছায়্যেদুল আরব তথা আরববাসীর মধ্যে হযরত মুহাম্মদ ﷺ শ্রেষ্ঠ, রোমবাসীর মধ্যে হযরত সুহাইব (রা.) শ্রেষ্ঠ। হাবশা তথা আবাসিনিয়াবাসীর মধ্যে হযরত বেলাল (রা.)

১১৮৫. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.), গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃ. ৩৫৭
১১৮৬. গুনিয়াতুত তালেবীন
১১৮৭. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.), গুনিয়াতুত তালেবীন পৃ. ৩৫৮

শ্রেষ্ঠ। এভাবে সমস্ত নগরীর মধ্যে মক্কা নগরী শ্রেষ্ঠ, উপত্যাকার মধ্যে বায়তুল মোকাদ্দাস শ্রেষ্ঠ, দিনসমূহের মধ্যে জুমা'র দিন শ্রেষ্ঠ, রাতসমূহের মধ্যে শবে ক্বদর শ্রেষ্ঠ, আসমানী কিতাব সমূহের মধ্যে পবিত্র কুরআন মজীদ শ্রেষ্ঠ, সূরাসমূহের মধ্যে "সূরা বাকারা" শ্রেষ্ঠ, আয়াতসমূহের মধ্যে "আয়াতুল কুরসী" শ্রেষ্ঠ, পাথরের মধ্যে "হাজরে আসওয়াদ' শ্রেষ্ঠ, কূপসমূহের মধ্যে "জমজম কূপ" শ্রেষ্ঠ, লাঠির মধ্যে হযরত মূসা (আ.)এর লাঠি শ্রেষ্ঠ, মাছের মধ্যে যে মাছ হযরত ইউনুছ (আ.)কে পেটে রেখেছে সে মাছ শ্রেষ্ঠ, হযরত ছালেহ (আ.)এর উটনী সমস্ত উটের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বোরাক সমস্ত ঘোড়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, হযরত সোলায়মান (আ.)এর আংটি সমস্ত আংটির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মাহে রমযান মাস সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম।[১১৮৮]

আল্লামা ইবনে জওযী (র.) বলেন- আল্লাহ তায়ালা হযরত ইয়াকুব (আ.)কে বারটি সন্তান দান করেছেন কিন্ত হযরত ইয়াকুব (আ.)এর কাছে তাদের (সন্তানদের) মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ.)ই বেশী প্রিয় ছিলেন। তেমনি বারটি মাসের মধ্যে রমযান মাসই আল্লাহ তায়ালার কাছে বেশী প্রিয়। যেভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)এর উসিলায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর এগার ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা করেছেন সেভাবে অন্যান্য এগার মাসের কৃত গুনাহ রমযান মাসে ক্ষমা করে দেন।[১১৮৯]

একথা সবর্জনস্বীকৃত যে আসমানী কিতাবের মধ্যে কুরআন সর্বোত্তম, আম্বীয়ায়ে কেরামের মধ্যে মুহাম্মদ ﷺ সর্বশ্রেষ্ঠ আর মাসের মধ্যে রমযান মাস শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সর্বোত্তম কিতাব সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উপর অবতীর্ণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা সবোর্ত্তম মাস রমযান মাসকেই নির্বাচিত করেছেন।

মাহে রমযানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

মাহে রমযানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর কর্তব্য। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, যেই পর্যন্ত আমার উম্মত মাহে রমযানের ইজ্জত অক্ষুণ্ন রাখবে সেই পর্যন্ত তারা অপদস্থ হবে না। জনৈক ব্যক্তি আরয করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! অপদস্থ কিভাবে হবে? উত্তরে হুযুর ﷺ এরশাদ করেন– যে ব্যক্তি রমযানে হারাম কাজ করে কিংবা কোন গুনাহের কাজ করে বা যেনা করে তার রমযান (কোন রোযা) গ্রহণ করা হবেনা এবং আগামী বৎসর পর্যন্ত আল্লাহ, তাঁর ফেরেশ্তা এবং আসমানের অধিবাসী ফেরেশ্তাদের অভিশাপ তার উপর পতিত হবে। যদি ঐ সময় (আগামী রমযান পর্যন্ত সময়ে) সে মারা যায় তাহলে আল্লাহর কাছে তার কোন নেক আমল গ্রহণযোগ্য হবে না।[১১৯০]

১১৮৮. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.), গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃ. ৩৫৯
১১৮৯. মাওলানা নুর মুহাম্মদ কাদেরী, মাওয়ায়েজে রেজভীয়্যাহ, পৃ. ১৭০
১১৯০. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.), গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃষ্ঠা–৩৫৮

এ ব্যাপারে আবু হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং এ জাতীয় গর্হিত কাজ ত্যাগ করবেনা তার পানাহার ত্যাগ করার উপর আল্লাহর কোন উদ্দেশ্য নেই। অর্থাৎ এসব রোযা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নহে।[১১৯১]

রমযান মাসে সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার, পরনিন্দা, মিথ্যা অপবাদ, চোগলী, অহেতুক কথা-বার্তা যাবতীয় গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমেই মাহে রমযানের সম্মান প্রদর্শন সাধিত হবে। উপরোল্লিখিত শরীয়ত বিবর্জিত কাজ মাহে রমযানে রোযাদারের নিকট পাওয়া গেলে সেটা উপোস থাকা হবে মাত্র। যেমন হাদিস শরীফে আছে– كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَأُ অর্থাৎ অনেক রোযাদারের রোযা উপোস বৈ কিছুই নয়।[১১৯২]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা তীবী বলেন– فان الصائم اذا لم يكن مُحْتَبِسًا او لم يكن مُجْتَنِبًا عن الفواحش من الزور والبهتان والغيبة ونحوها من المناهى فلا حاصل له الا الجوع والعطش وان سقط القضا ولا يترتب عليه الثواب অর্থাৎ রোযাদার অশ্লীল, মিথ্যা অপবাদ, পরনিন্দা এ জাতীয় গর্হিত কাজ থেকে যদি বিরত না থাকে তাহলে সে অনাহার ও পিপাসা ছাড়া আর কিছুই অর্জন করলনা। যদিও রোযা ক্বাযা করতে হয় না কিন্তু এতে সে কোন সাওয়াব পাবেনা।

এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লামা ইবনে নাবাতা (র.) রমযানের প্রথম খুতবায় বলেন– হে মুসলমান ভাইয়েরা! ঐ রোযাদার ব্যক্তি যারা (মাহে রমযান) হারাম কাজ থেকে বিরত রয়েছে, হালাল বস্তু দিয়ে ইফতার করেছে, আর যারা নিজের জিহ্বাকে মিথ্যা, অপবাদ, গীবত, চোগলখোরী থেকে বিরত রেখেছে এবং যারা অনর্থক কথাবার্তা থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে, নিজের চক্ষুকে হারাম বস্তু দেখা থেকে বিরত রেখেছে এবং নিজের অন্তরকে মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ থেকে হেফাজত করেছে উপরে বর্ণিত রমযানের ফযিলত কেবল তাদের জন্য।

মাহে রমযানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতিদান

যারা ইহকালে মাহে রমযানকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে কাল কিয়ামত দিবসে এই রমযান তাদের হাত ধরে আল্লাহর সামনে নিয়ে সম্মানের তাজ পরিধান করাবেন– যেমন হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে– رُوى انَّ رمضان يأتى يوم القيامة فى صورة حسنة فيسجد بين يدى الله فيقال له خذ بيد من عرف حقك فيأخذ من عرف حقّه ويقف بين يدى الله تعالى

১১৯১. বুখারী, সূত্র: মেশকাত পৃষ্ঠা–১৭৬
১১৯২. দারেমী, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা–১৭৭

فيقال له ما تريد فيقول يا رب تتوجّه بتاج الوقَارِ فَيَتَوَجُّ বর্ণিত আছে– নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে রমযান একটা সুন্দর আকৃতি নিয়ে এসে আল্লাহর দরবারে সিজদা করবে। অতঃপর তাকে বলা হবে যে, তোমাকে (দুনিয়াতে) সম্মান করেছে, তোমার হক্ব আদায় করেছে তার হাত ধর। তারপর রমযান তার হাত ধরবে যে তার সম্মান করেছে এবং আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে তাকে বলা হবে কি চাও তুমি? সে বলবে হে প্রভু! তাকে সম্মানের তাজ পরিধান করান। অতঃপর তাকে সম্মানের তাজ পরিধান করানো হবে।[১১৯৩]

ঘটনা

মাহে রমযানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণে একজন অগ্নিপূজারীর ঈমান নসীব হয়ে জান্নাতের যাওয়ার ঘটনা নুযহাতুল মাজালিস গ্রন্থের ১৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ঘটনার বিবরণ

'বুখারা' শহরে একজন অগ্নিপূজারী বসবাস করত। একদিন অগ্নিপূজারী ব্যক্তি তার ছেলেকে নিয়ে রমযান মাসে মুসলমানদের বাজার দিয়ে যাচ্ছিল। এসময় তার ছেলে কোন খাবার বস্তু খাচ্ছিল। অগ্নিপূজারী এটি দেখে তার ছেলের গালে এক চড় দিয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে বলল– মাহে রমযানে মুসলমানদের বাজারে খাবার খেতে লজ্জাবোধ করা উচিত। ছেলে উত্তর দিল– আব্বাজান! আপনিও তো রমযান মাসে খাবার গ্রহণ করেন। উত্তরে পিতা বলল– আমি খাই ঠিক কিন্তু ঘরে, মানুষের সামনে খাইনা এবং এ মাসের সম্মান ও পবিত্রতা নষ্ট করিনা। পরবর্তীতে ঐ ব্যক্তি যখন মারা গেল কোন এক বুযুর্গ ব্যক্তি স্বপ্নে ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতে দেখতে পেলেন। তিনি আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন– তুমি তো অগ্নিপূজারী ছিলে জান্নাতে কিভাবে এসেছ? উত্তরে সে বলল– বাস্তবিকই আমি অগ্নিপূজারী ছিলাম। কিন্তু যখন আমার মৃত্যু সন্নিকট হল তখন রমযান শরীফকে সম্মান করার কারণে আল্লাহ আমাকে ঈমানের দৌলত নসীব করেন এবং আজকে এই জান্নাত রমযান শরীফের সম্মানের ফলশ্রুতিতে পেয়েছি। অতএব বুঝা যায় একজন অগ্নিপূজারী যদি মাহে রমযানের ইজ্জত ও সম্মান করার কারণে জান্নাত পায় তবে আমরা মুসলমান হয়ে মাহে রমযানকে সম্মান করলে নিশ্চয় আমরাও জান্নাতের অধিকারী হতে পারবো ইনশাল্লাহ্।

মাহে রমযান নাজাতের মাস

আল্লামা ইস্পাহানী (র.) আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– রমযানের প্রথম রাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। যার উপর আল্লাহর দৃষ্টি দেন তাকে আল্লাহ তায়ালা আযাব দেননা এবং রমযানের

[১১৯৩]. আব্দুর রহমান সফুরী (র.) (৮৯৪ হি), নুযহাতুল মাজালিস, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা–১৩৭

প্রতিরাত্রে দশ লক্ষ জাহান্নামীকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। সারা মাসে যা মুক্তি দিয়েছেন রমযানের উনত্রিশতম তথা শেষ রাতে ততটুকু পরিমাণ জাহান্নামীকে মুক্তি দেন।[১১৯৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন– রমযান মাস আসলে নবী করিম ﷺ সকল কয়েদীকে মুক্ত করে দিতেন এবং প্রত্যেক ভিক্ষুককে প্রদান করতেন।[১১৯৫]

উপরোক্ত হাদিস শরীফ দ্বারা বুঝা যায় যে, পুরো রমযান মাসে আল্লাহ তায়ালা তিন কোটি জাহান্নামীকে নাজাত প্রদান করেন এবং রমযানের সর্বশেষ রাতে আরো তিন কোটি নাজাত প্রাপ্ত হয়।

তারাবীহ'র বর্ণনা

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় কিয়ামে রমযান তথা তারাবীহর সালাত আদায় করবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।[১১৯৬]

তারাবীহ প্রত্যেক নর-নারীর উপর এজমায়ে উম্মতের দ্বারা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ। বিনা কারণে এটি ত্যাগ করা জায়েয নেই। শাহ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) বলেন– নারী পুরুষ সকলের উপর তারাবীহর নামায সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ। এটাই বিশুদ্ধ ও মসনূন পদ্ধতি যা পূর্ববর্তী বুর্যুগানে দীন থেকে আজ পর্যন্ত চালু আছে। ইমাম আ'যম (র.) হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন– তারাবীহ পড়া সুন্নত এবং কোন অবস্থাতেই এটি ত্যাগ করা জায়েয নেই। কেননা নবী করিম ﷺ রমযানের সময় প্রায়ই তারাবীহ পড়তেন। শুধু ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে মাঝে মধ্যে ত্যাগ করতেন। হাদিস শরীফে আছে হযরত ওমর (রা.) ও অন্যান্য খোলাফায়ে রাশেদীনগণ তারাবীহ পড়তেন। আর রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, হে লোকেরা তোমরা আমার পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে দৃঢ়তার সাথে আমল কর। কোন কোন ফিকাহর কিতাবে আছে যে, যদি শহরবাসী তারাবীহ পড়া ছেড়ে দেয় তাহলে তারাবীহ

[১১৯৪]. মুফতি আমজাদ আলী (র.) বাহারে শরীয়ত, খণ্ড-৫ পৃষ্ঠা-৯৬
[১১৯৫]. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-১০
[১১৯৬]. বুখারী শরীফ, হাদিস নং-১৮৮২

ত্যাগকারীদেরকে হত্যা করা সেকালের দায়িত্ববান হাকীমের (বিচারকের) উপর কর্তব্য।[১১৯৭]

জামাতে তারবীহ পড়া সুন্নাত

শাহ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) "মা ছাবাতা বিছসুন্নাহ ফি আইয়্যামিছ ছেনাহ" গ্রন্থে বলেন– কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলেন– যে ব্যক্তি তারাবীহ নামায জামাতে পড়া ত্যাগ করেছে সে সুন্নতে নববী তথা নবীর সুন্নতকে ত্যাগ করেছে এবং সে অন্যায় করেছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তারাবীহ সর্বদা জামাতে আদায় করতেন। আর সাহাবায়ে কেরামের আমলও এভাবে প্রচলিত আছে এবং সমস্ত ওলামা ও ফোকাহায়ে কেরামও এর উপর একমত। আবার কেউ কেউ বলেন– সিদ্দীকে আকবর এর যুগে এবং ফারূকে আ'যমের যুগের প্রথম দিকে লোকেরা নিজ নিজ ঘরে একাকী তারাবীহর নামায পড়তেন। অতঃপর হযরত ওমর (রা.)'র যুগে তারাবীহ জামাতে আদায় করার বন্দোবস্ত করা হয়েছে এবং সকলেই এর উপর এত্তেফাক হয়েছেন। আর বাস্তবিকই তারাবীহ নামায জামাতে পড়াই উত্তম।

একদিন হযরত ওমর (রা.) রমযানের একরাতে মসজিদে তাশরীফ নেন এবং সেখানে লোকদেরকে পৃথক পৃথকভাবে তারাবীহর নামায পড়তে দেখেন। তখন তিনি বলেন– সবাই এক ইমামের পিছনে নামায পড়া উচিত এবং উত্তম মনে করি। তারপর সবাইকে হযরত ইমাম উবাই ইবনে কা'ব (রা.)এর সাথে একত্রিত করে দেন। পরদিন তিনি মসজিদে গিয়ে সবাইকে ইমামের পিছনে নামায পড়তে দেখে বলেন– نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ এটি উত্তম বেদআত।[১১৯৮]

শায়খ কাসেম হানাফী বলেন– বিশুদ্ধ মত হল জামাত সহকারে তারাবীহ পড়া সুন্নাতে কেফায়া। অর্থাৎ মসজিদে জামাত সহকারে তারাবীহ পড়া ছেড়ে দিলে সুন্নাত ত্যাগ করার কারণে এলাকাবাসী সবাই গুনাহগার হবে।[১১৯৯]

হযরত আলী (রা.) বলেন– হযরত ওমর (রা.) আমার থেকে তারাবীহর নামাযের হাদিস যখন শ্রবণ করেন তখন আমল করা আরম্ভ করলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল হে আমীরুল মু'মেনীন ঐ হাদিস কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন– আমি রাসূল ﷺ থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন– আরশের পাশে حضرة القدس নামক একটি নূরে পরিপূর্ণ জায়গা আছে। সেখানে এত ফেরেশ্‌তা আছে যে, যার সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন

১১৯৭. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.), মাছাবাতা বিস সুন্নাহ, উর্দু, পৃ-২৯০
১১৯৮. বুখারী (র.) (২৫৬ হি) বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৯, হাদিস নং-১৮৮৩
১১৯৯. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি), মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ, উর্দু, পৃ-২২০

না। তারা সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে রত আছেন। মূহূর্তের জন্যও তারা অবহেলা করেন না। যখন রমযান মাস আসে তখন তারা পৃথিবীতে আসার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। পৃথিবীতে এসে বনী আদমের সাথে (তারাবীহর) নামাযে শরীক হয়। উম্মতে মোহাম্মদী থেকে কেউ ওদের কাউকে স্পর্শ করলে কিংবা ওরা কাউকে স্পর্শ করলে সে এমন ভাগ্যবান হয়ে যায় যে, কখনো সে হতভাগা কিংবা কাফের হবে না। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) বলেন– এই নামাযের যদি এতই গুরুত্ব হয় তাহলে এই নামাযের হকদার আমরাই বেশী। এরপর তিনি তারাবীহ'র জামাত কায়েম করে এটিকে সুন্নাত সাব্যস্ত করেন।[১২০০]

তারাবীহর ফযিলত

রোযাদার মুসলমানেরা মাহে রমযানে এশার ফরয ও সুন্নাতের পরে প্রতি রাতে জামাত সহকারে বিশ রাকাত তারাবীহ'র নামায পড়ে। এভাবে ত্রিশ রাতে ২০×৩০=৬০০ (ছয়শত) রাকাত নামায পড়ার সুযোগ হয় যা সাধারণ মুসলমানের জন্য সহজ ব্যাপার নয়। তাছাড়া হাদিস শরীফে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِئَةِ আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের সাওয়াব বাড়িয়ে দেয়া হয়। একটি নেকীর সওয়াব দশ থেকে সাতশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।[১২০১] অতএব এ হিসাবে হিসাব করলে ত্রিশ দিনে ছয়শত রাকাত তারাবীহকে সাতশ দিয়ে গুণ করলে ৬০০×৭০০ = ৪,২০,০০০ (চার লক্ষ বিশ হাজার) রাকাত তারাবীহর সওয়াব পাওয়া যাবে। তারাবীহ'র নামায বিশ রাকাত। এটি সুন্নতে রাসূল, সুন্নতে সাহাবা ও সর্ব সাধারণ মুসলমানের ধারাবাহিক নিয়ম। ইবনে আবি শায়বা, তিবরানী কবীর গ্রন্থে, ইমাম বায়হাকী (র.), আবদে ইবনে হামিদ এবং ইমাম বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন– أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً سوي الْوِتْرَ وزاد البيهقى فى غير جماعة "রাসূল ﷺ রমযান মাসে বিশ রাকাত তারাবীহ পড়তেন বিতর ব্যতীত। বায়হাকী অতিরিক্ত বলেন যে, তিনি জামাত ছাড়া পড়তেন।" যে সব হাদিসে রাসূল ﷺ তিনদিন তারাবীহ পড়ার কথা আছে তা দ্বারা জামাতে তিনদিন পড়ার কথা বলা হয়েছে। তবে তিনি জামাত ছাড়া সর্বদা তারাবীহ আদায় করতেন।[১২০২]

১২০০. আব্দুল কাদের জিলানী (র.), গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃষ্ঠা-৩৬৭
১২০১. মিশকাত, ১৭৩ পৃষ্ঠা
১২০২. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), জাআল হক, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৫

ইমাম মালেক (র.) হযরত ইয়াযিদ ইবনে রুমান থেকে বর্ণনা করেন– كان الناس يقومون فى زمن عمر الخطاب فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة হযরত ওমর (রা.)'র যামানায় লোকেরা রমযানে তেইশ রাকাত নামায পড়তেন। এর মধ্যে বিশ রাকাত ছিল তারাবীহ আর তিন রাকাত ছিল বিতর।[১২০৩]

ইমাম বায়হাকী (র.) স্বীয় সুনান গ্রন্থে হযরত আবু আব্দুর রহমান সালমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন– اَن عَلِيٌّ بن ابى طالب قَالَ: " دَعَا الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ خمس ترويحات عِشْرِينَ رَكْعَةً " وَكَانَ عَلِيٌّ يُوتِرُبِهِمْ " হযরত আলী (রা.) রমযানে কারীগণকে ডেকে একজনকে আদেশ দিলেন যে, লোকদেরকে বিশ রাকাত পড়াও আর হযরত আলী (রা.) বিতর পড়াতেন।[১২০৪]

তিরমিযী শরীফে 'বাবু কিয়ামে শাহরে রমযান' এ বর্ণিত আছে– واكثر اهل العلم على ما روى عن على وعمر وغيرهما من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سفيان ثورى وابن المبارك والشافعى وقال الشافعى هكذا ادركت بلد مكة يصلون عشرين ركعة আর অধিকাংশ জ্ঞানীদের আমল হল– হযরত আলী, হযরত ওমর ও নবী ﷺ'র অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে যা বর্ণিত আছে তার উপর। অর্থাৎ বিশ রাকাত তারাবীহ। এটি সুফিয়ান সওরী, ইবনে মোবারক ও ইমাম শাফেঈ'র অভিমত। ইমাম শাফেঈ (র.) আরো বলেন– আমি মক্কাবাসীদেরকেও বিশ রাকাত তারাবীহ পড়তে পেয়েছি।[১২০৫]

উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী গ্রন্থে বলা হয়েছে– قال ابن عبد البر وهو قول جمهور العلماء وبه قال الكوفيون والشافعى واكثر الفقهاء وهو الصحيح عن ابى بن كعب من غير خلاف من الصحابة ইবনে আব্দুল বার বলেন– অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মত হল বিশ রাকাত তারাবীহ। এটিই কু'ফী হযরাতের মত এবং ইমাম শাফেঈ ও অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরামেরও অভিমত। আর এটাই অধিক বিশুদ্ধ বলে উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই।[১২০৬]

মোল্লা আলী ক্বারী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থে বলেন– فصارا جماعًا لما روى البيهقى باسنادٍ صحيح كانوا يقيمون على عهد عمر ركعة وعلى عهد عثمان وعلى عشرين বিশ রাকাত

১২০৩. জাআল হক, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৫
১২০৪. প্রাগুক্ত, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৬
১২০৫. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), জাআল হক, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৭
১২০৬. আল্লামা আইনী (র.), উমদাতুল কারী, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৫৫

তারাবীহ'র ব্যাপারে মুসলমানগণের ঐকমত্য সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা ইমাম বায়হাকী (র.) বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম এবং সকল মুসলমান হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলী (রা.)'র যামানায় বিশ রাকাত তারাবীহ পড়তেন।[১২০৭]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ আমি রাসূল ﷺকে রমযান সম্পর্কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় তারাবীহ'র নামায আদায় করবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।[১২০৮]

তারাবীহর মাধ্যমে খত্‌মে কুরআন করা সুন্নত

মাহে রমযানে তারাবীহর মাধ্যমে একবার কুরআন খতম করা তথা খত্‌মে তারাবীহ পড়া সুন্নাত। দুইবার খতম করা উত্তম আর তিনবার খতম করা অতি উত্তম। কোন কোন ফোকাহা ও ওলামায়ে কেরামের মতে ২৬ শে রমযান তথা ২৭ তারিখ রাতে কুরআন খতম করা উত্তম। যাতে শবে কদরের বরকত অর্জিত হয়। কেননা অধিকাংশ মুহাদ্দেসীনে কেরাম হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, ২৭ তারিখের রাতেই শবে কদর নিহিত রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, ইমাম আ'যম আবু হানিফা (র.) রমযান মাসে ৬১টি বার কুরআন খতম করতেন। ৩০ খতম দিনে, ৩০ খতম রাতে এবং ১ খতম তারাবীহ'র মাধ্যমে করতেন।[১২০৯]

এমনিতো তেলাওয়াতে কুরআনে অনেক সওয়াব রয়েছে। তাছাড়া মাহে রমযানে তারাবীহ নামাযের মাধ্যমে তেলাওয়াতের ফযিলত অনেক বেশী যা বর্ণনাতীত। কুরআন তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী উভয় সমান সওয়াবের অধিকারী। সুতরাং তারাবীহ নামাযে হাফিয সাহেবান তেলাওয়াত করে যা সাওয়াব পাবেন মুক্তাদীরা শুনে ততটুকু সওয়াবের অধিকারী হবেন। হাদিস শরীফে আছে– عَنْ ابن مَسْعُود قال قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ» আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন– যে ব্যক্তি কিতাবুল্লাহর একটি হরফ পড়বে তার জন্য উহার বিনিময়ে একটি নেকী দেয়া হবে। আর প্রতিটি নেকীর সওয়াব দশগুণ দেয়া হবে। নবী করীম ﷺ বলেন– الم কে আমি একটি হরফ বলছি না বরং তন্মধ্যে। একটি হরফ ل একটি হরফ م একটি হরফ।[১২১০]

১২০৭. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), জাআল হক, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৮
১২০৮. বুখারী (র.) (২৫৬ হি), বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৯, হাদিস নং-১৮৮২
১২০৯. আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), মা ছাবাতা বিসসুন্নাহ, পৃ. ২১৫
১২১০. তিরমিযী ও দারেমী, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা-১৮৬

এতে বুঝা যায় শুধু الم পড়লে ত্রিশটি নেকী বা সওয়াব পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী। কুরআন তেলাওয়াত করা মানে স্বয়ং আল্লাহর সাথে কথা বলা। সুতরাং কুরআন তেলাওয়াতের অনেক সওয়াব ও উপকারিতা রয়েছে যা রাসূলে পাক ﷺ এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তম্মধ্যে নামাযের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াতের বিশেষ ফযিলত রয়েছে। যেমন: হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ، وَالتَّسْبِيحُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ " হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, নামাযের মধ্যে ব্যতীত কুরআন তেলাওয়াতের চেয়ে নামাযের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত উত্তম। তাসবীহ এবং তাকবীরের চেয়ে নামাযের মধ্যে ব্যতীত কুরআন তেলাওয়াত করা উত্তম। আর সদকার চেয়ে তাসবীহ উত্তম, (নফল) রোযার চেয়ে সাদকা উত্তম। রোযা দোযখের আগুন থেকে বাঁচার ঢালস্বরূপ।[১২১১]

তারাবীহতে কুরআন তেলাওয়াত নামাযের মধ্যেই হয়ে থাকে যেটাকে হাদিস শরীফে উত্তম বলা হয়েছে। সুতরাং এমন উত্তম এবাদত যেন অবহেলার দরুন আমাদের হাত ছাড়া না হয়। যারা নিয়মিত তারাবীহ'র মাধ্যমে খতমে কুরআন আদায় করবে তাদের জন্য রয়েছে অগণিত সওয়াব। উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফের আলোকে বলা হয়েছে যে, কুরআনের একটি হরফ পাঠ করলে দশটি নেকী দেয়া হবে। পবিত্র কুরআনে মোট হরফের সংখ্যা = ৩,৬৬,৩৯২টি। প্রতিটি হরফের পরিবর্তে দশটি নেকীর ভিত্তিতে এ সংখ্যাকে দশ দিয়ে গুণ দিলে নেকীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬,৬৩,৯২০। উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নেকীর সওয়াব সাতশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। এ হিসাবে উপরের সংখ্যাকে সাতশ গুণ দিয়ে গুণ দিলে নেকীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫৬,৪৭,৪৪০০০ দুইশ ছাপ্পান্ন কোটি সাত চল্লিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার। সুতরাং তারাবীহর মাধ্যমে কুরআন খতম করলে উপরে বর্ণিত বিপুল পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে।

তারাবীহ'র জন্য হাফিয সাহেব নির্বাচন

রমযানের পূর্বে শা'বান মাস থেকে খতমে তারাবীহ'র জন্য হাফিয নির্বাচন করা শুরু হয়ে যায়। এক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক, দাড়ি, চুল, পোশাক-পরিচ্ছদ সর্বোপরি সুন্নাতের অনুসারী সুন্নী হাফিয নির্বাচন করা উচিত। বিশেষ করে বিশুদ্ধ ও ধীরস্থিরভাবে সুন্দর কণ্ঠে তারতীলের সাথে পাঠকারী হাফিযকে প্রাধান্য দিতে হবে।

১২১১. বায়হাকী ও শোয়াবুল ঈমান, সূত্র: মিশকাত,পৃষ্ঠা-১৮৮

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে– নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» তোমরা সুন্দর কর কুরআন মজীদকে (সুন্দর) আওয়ায (কণ্ঠ) দ্বারা।[১২১২]

অপর হাদিসে আছে– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا» সুন্দর আওয়ায (কণ্ঠ) দিয়ে তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর। কেননা সুন্দর কণ্ঠ কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।[১২১৩]

হাফিয নির্বাচনের সময় যে দিকটা সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে সেটা হল হাফিয সাহেব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা পোষণকারী তথা সুন্নী কিনা দেখতে হবে। কেননা দেখা যায় যে অনেক বদ আক্বীদা পোষণকারী হাফিয রমযান আসলে সাময়িকভাবে সুন্নী সেজে পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়ে যায়। এসব বদ আক্বীদা পোষণকারী ইমামের পেছনে জেনে শুনে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না।

সাহ্রী ও ইফতার

ইহুদি-নাসারাগণের রোযা ছিল সাহরীবিহীন। যেমন আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে– وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يُصْبِحَ কোন ব্যক্তি ইফতার করে খাবার গ্রহণের পূর্বে নিন্দ্রা গেলে সকাল পর্যন্ত কিছুই খেতে পারত না।

বুখারী শরীফে আছে– إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ কোন রোযাদার ব্যক্তির সামনে ইফতার উপস্থিত আছে (কিন্তু গ্রহণ না করে) ঘুমিয়ে পড়লে ঐ রাতে এবং ঐ দিনে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই খেতে পারবে না।[১২১৪]

ইসলামের প্রাথমিক যুগেও সাহরীর ব্যবস্থা ছিল না। শুধু ইফতারের পরে নিন্দ্রার পূর্বে খানা-পিনার অনুমতি ছিল। একবার শয্যাগ্রহণ করে ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথেই এসব কিছু হারাম হয়ে যেতো। কায়েস ইবনে সারমাহ আনসারী নামক জনৈক সাহাবী একদিন সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে ইফতারের পরে ঘরে এসে দেখে খাবার মতো কিছুই নেই। স্ত্রী বললেন, একটু অপেক্ষা করুন। আমি কিছু খাবার সংগ্রহ করে আনার চেষ্টা করি। স্ত্রী যখন খাদ্য সংগ্রহ করে ফিরে এলেন সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। স্ত্রী যখন তাঁকে খাবার গ্রহণের জন্য ডাকলেন তিনি তা খেতে অস্বীকার করেন এবং কিছু না খেয়েই তিনি পরদিন রোযা রাখেন। কিন্তু দুপুর বেলায় একেবারে দুর্বল হয়ে

১২১২. মিশকাত, পৃষ্ঠা-১৯১

১২১৩. প্রাগুক্ত

১২১৪. বুখারী, পৃষ্ঠা-২৫৬

বেহুঁশ হয়ে তিনি পড়ে যান। তখন আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন- وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ তোমরা রাতে পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়।[১২১৫]

উম্মতে মোহাম্মদীর উপর সহজ করার জন্য এবং ইহুদি নাসারাদের রোযার সাথে মুসলমানের রোযার সাদৃশ্য দূরীভূত ও পার্থক্য সৃষ্টি করার লক্ষ্যে পূর্বের নিয়ম রহিত করে মুসলমানদেরকে সাহরী খাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নবী করিম ﷺ সাহরীকে সুন্নত বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ আমাদের রোযা আর আহলে কিতাবীদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হল সাহরী খাওয়া।[১২১৬]

সাহরীর জন্য উঠা সাহরী গ্রহণ করা ইসলামী শেয়ার বা লক্ষণ যা অন্য কাউকে প্রদান করা হয়নি। রমযান মাসে সাহরী খাওয়া অত্যন্ত বরকতময় যদিও সামান্য হয়। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ السَّحُورَ بَرَكَةٌ» তোমরা সাহরী খাও কেননা সাহরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে।[১২১৭]

'নুযহাতুল মাজালিস' গ্রন্থের ১৩৮ পৃষ্ঠায় আছে, ان الله وملئكته يصلون على المتسحرين নিশ্চয় আল্লাহ সাহরী গ্রহণকারীদের উপর সালাত তথা রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশ্তারা তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন।

ইফতার করা সুন্নত। খেজুর বা কোন মিষ্টি জাতীয় বস্তু দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব। যেমন নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فانه بركة فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» তোমাদের মধ্যে যখন কেউ ইফতার করবে– খেজুর দিয়ে ইফতার করা উচিত, কেননা এটি বরকতময় আর যদি খেজুর না পায় তাহলে পানি দিয়ে ইফতার করা উচিত, কেননা তা পবিত্র।[১২১৮]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ নবী করিম ﷺ মাগরীবের নামাযের পূর্বে পাকা তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার

১২১৫. সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৭
১২১৬. মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা-১৭৫
১২১৭. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৭৫
১২১৮. আহমদ, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, তিরমিযী, দারেমী, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা-১৭৫

করতেন। আর যদি পাকা তাজা খেজুর না পেতেন তাহলে শুকনো খেজুর দিয়ে করতেন। তাও না পেলে কয়েক ঢোক পানি দিয়ে ইফতার করতেন।[১২১৯] সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে বিলম্ব না করে ইফতার করা উত্তম।[১২২০]

হাদিস শরীফে আছে– عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ، مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» হযরত সাহ্ল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– মানুষের সর্বদা কল্যাণ হবে যেই পর্যন্ত তারা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে।[১২২১]

তাড়াতাড়ি ইফতার করা দ্বারা তাহলে কিতাবীদের বিরোধিতা করা হয়। কেননা তারা বিলম্বে ইফতার করত, নক্ষত্র দেখার জন্য অপেক্ষা করত। যেমন মিশকাত শরীফের ১৭৫ পৃষ্ঠায় আছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الفطْرَ، لان الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ» হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– সর্বদা দ্বীনি ইসলাম প্রাধান্য বিস্তার করবে যতক্ষণ লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহুদি ও নাসারাগণ ইফতার বিলম্বে করতো।[১২২২] তাছাড়া তাড়াতাড়ি ইফতার করাকে আল্লাহও ভালবাসেন। হাদিস শরীফে আছে– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ، أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا " হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন– আমার নিকট ঐসব বান্দারা প্রিয় যারা তাড়াতাড়ি ইফতার করে।[১২২৩]

রোযাদারকে ইফতার করানোর ফযিলত

মাহে রমযানে ধনী-গরীব, উঁচু-নিচু, মালিক-কর্মচারী, বড়-ছোট সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম বাদ দিয়ে হরেক রকমের ইফতারী নিয়ে বসে একত্রে ইফতার করার সৌন্দর্য সত্যিই বর্ণনাতীত। তাছাড়া রোযাদারকে ইফতার করানোর ফযিলত তো আছেই। যেমন সালমান ফারসী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস শরীফে নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ

১২১৯. মিশকাত, পৃষ্ঠা-১৭৫
১২২০. তিরমিযী ও আবু দাউদ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৭৫
১২২১. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: প্রাগুক্ত
১২২২. আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা-১৭৫
১২২৩. তিরমিযী,সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা-১৭৫

أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ " قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُعْطِي اللهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى مَذْقَةِ لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ

যে ব্যক্তি রমযান মাসে কোন রোযাদারকে ইফতার করালে তার সমস্ত গুনাহের মাগফেরাত হয় এবং সে জাহান্নামের আগুন থেকে আযাদ হবে। আর সেই রোযাদারের সমতুল্য সওয়াব পাবে, রোযাদারের সওয়াবের মধ্যে সামান্য পরিমাণও ঘাটতি হওয়া ব্যতীত। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামগণ বলেন– হে আল্লাহর রাসূল! রোযাদারকে (পরিতৃপ্তভাবে) ইফতার করানোর সামর্থ তো আমাদের সবার নেই। রাসূলুলাহ ﷺ এরশাদ করেন– আল্লাহ তায়ালা এই সওয়াব দান করবেন ঐ ব্যক্তিকে যে কোন রোযাদারকে ইফতার করাবেন এক ঢোঁক দুধ বা একটি খেজুর কিংবা এক গ্লাস পানির শবরত দিয়ে। আর যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে পরিতৃপ্ত করে পানাহার করাবে আল্লাহ তাকে আমার হাউজ (কাউসার) থেকে এমন শরবত পান করাবেন জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত তার পিপাসা লাগবে না।[১২২৪]

'তিবরানী কবীর' গ্রন্থে হযরত সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি হালাল খাবার বা পানি দিয়ে কোন রোযাদারকে ইফতার করালো মাহে রমযানের সময় ফেরেশ্‌তা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং হযরত জিব্রাইল (আ.) শবে কদরে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে হালাল রোজগার থেকে রমযান মাসে রোযাদারকে ইফতার করালে রমযানের সমস্ত রাতে ফেরেশ্‌তা তার উপর দুরূদ প্রেরণ করেন এবং শবে কদরে জিব্রাইল (আ.) তার সাথে মোসাফাহা (করমর্দন) করেন।[১২২৫]

রোযা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যেন তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পার।[১২২৬]

রোযা শব্দটি ফার্সী। এর আরবী প্রতিশব্দ হল صوم বা صيام। শাব্দিক অর্থ সাধারণভাবে বিরত থাকা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় দিনের বেলায় তথা সূর্য উদয়

১২২৪. ইমাম বায়হাকী (র.), শুআবুল ঈমান, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা-১৭৪
১২২৫. মুফতি আমজাদ আলী (র.) বাহারে শরীয়ত, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১২৯
১২২৬. সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৩

থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত নিয়ত সহকারে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকে صيام বা রোযা বলা হয়। রোযা কোন নতুন ইবাদত নয় বরং ইহা হযরত আদম (আ.) থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে– كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ "যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূববর্তী লোকদের উপর"। হযরত আদম (আ.)এর উপর 'আইয়্যামে বীয' তথা প্রতি চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা ফরয ছিল। হযরত আনতারাহ (রা.) হযরত আলী (রা.)এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন– ঐ দিনসমূহকে "আইয়্যামে বীজ" কেন বলা হয়। উত্তরে হযরত আলী (রা.) বলেন– হযরত আদম (আ.)কে যখন জান্নাত থেকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হল তখন সূর্যের তাপে তাঁর সমস্ত শরীর জ্বলে পুড়ে কাল হয়ে গিয়েছিল। ঐসময় হযরত জিব্রাইল (আ.) এসে আদম (আ.)এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি পুনরায় ফর্সা বা সাদা হতে চান? হযরত আদম (আ.) বললেন– জ্বী হ্যাঁ। তখন তাকে বলা হয়েছে তাহলে আপনি ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখুন। হযরত আদম (আ.) যখন প্রথম রোযা রাখলেন তখন তার শরীরের তিন ভাগের এক ভাগ ফর্সা হয়ে গেল। এভাবে দ্বিতীয় রোযায় তিন ভাগের দুই ভাগ এবং তৃতীয় রোযায় পুরো শরীরের ত্বক সাদা হয়ে গেল। এ কারণে ঐ দিনগুলোকে "আইয়্যামে বীজ" বলা হয়।[১২২৭]

এভাবে হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর উম্মতের উপর আশুরার রোযা এবং শনিবারে রোযা ফরয ছিল। হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর উম্মতের উপর মাহে রমযানের রোযা ফরয ছিল। কিন্তু তারা বিভিন্ন কারণে রোযার সংখ্যা বাড়াতে বাড়াতে দুই মাস তথা ৬০ দিনে রূপান্তরিত করেছিল।[১২২৮]

নবী করিম ﷺ মদীনায় হিজরতের পর আশুরার রোযা এবং আইয়্যামে বীজের রোযা রাখতেন। অনেকের মতে তখন এগুলো ফরয ছিল। কিন্তু হিজরতের দ্বিতীয় বৎসর বদর যুদ্ধের পূর্বে যখন মাহে রমযানের রোযা ফরয হল তখন ঐগুলোর ফরয রহিত হয়ে গেল তবে নফল হিসাবে বৈধতা বহাল রয়েছে।[১২২৯]

রোযা ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের মধ্যে চতুর্থ বুনিয়াদ। যেমন হাদিস শরীফে আছে– «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ البَيْتِ» من استطاع اليه سبيلا ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি ১. সাক্ষ্য

১২২৭. আব্দুল কাদের জিলানী (র.), গুনিয়াতুত তালেবীন
১২২৮. আব্দুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), তাফসীরে আজীজী
১২২৯. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি), গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃষ্ঠা-৩৫১

দেওয়া আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল ২. সালাত কায়েম করা ৩. যাকাত প্রদান করা ৪. রমযান মাসে রোযা রাখা এবং ৫. পাথয়ের সামর্থ থাকলে হজ্জ করা।[১২৩০] রোযা ইবাদতে বদনী তথা শারিরীক এবাদত। সুতরাং ধনী-গরিব, বাদশা, ফকীর প্রত্যেক সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক মুকীম (নারীদের ক্ষেত্রে হায়েজ নেফাস থেকে মুক্ত) মু'মিন নর-নারীর উপর রোযা ফরয।

রোযার ফযিলত

আল্লাহ তায়ালা বলেন– إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ধৈর্য্যশীলদেরকেই তাদের পরিপূর্ণ অগণিত প্রতিদান দেয়া হয়।[১২৩১] কুরআনে করিমে আরো এরশাদ হয়েছে– وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।[১২৩২]

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (র.) الصبر অর্থ রোযা এবং الصابرين রোযাদার নিয়েছেন। অর্থাৎ ইমাম গাজ্জালী (র.)'র বর্ণনামতে আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা হবে– অন্যান্য ইবাদতের সওয়াব সীমিত তথা দশ গুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় কিন্তু রোযার সওয়াব অসীম ও অগণিত। যেমন হাদিস শরীফে আছে– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمائَة قَالَ اللهُ تَعَالى إِلَّا الصَّوْمَ হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, প্রত্যেক আদম সন্তানের নেক আমলের সাওয়াব দশ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন– রোযা ব্যতীত।[১২৩৩]

পবিত্র কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে– كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ বিগত দিনে (দুনিয়াতে) তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে।[১২৩৪]

ইমাম গাজ্জালী (র.) এবং আল্লামা আব্দুর রহমান সফুরী (র.) হযরত ওয়াকী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন–أَيَّامِ الْخَالِيَةِ দ্বারা صِيَام أَيَّام উদ্দেশ্য।[১২৩৫]

১২৩০. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা–১২
১২৩১. সূরা যুমার, আয়াত-১০
১২৩২. সূরা বাকারা, আয়াত-১৫৩
১২৩৩. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৭৩
১২৩৪. সূরা আল-হাক্কাক্বাহ, আয়াত–২৪
১২৩৫. ইমাম গাজ্জালী (র.) (৫০৫ হি), এয়াহইয়াউল উলুমুদ দিন, পৃ-২৩৮ ও আব্দুর রহমান (র.) নুযহাতুল মাজালিস, পৃ-১৩৪

এদের মতানুযায়ী এ আয়াতের ব্যাখ্যা أَيَّامِ الْخَالِيَةِ তথা রোযার দিনে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত বন্দেগী বা ভাল কাজ করবে এবং দিনের বেলায় পানাহার থেকে বিরত থাকার কষ্ট সহ্য করবে কিয়ামত দিবসে বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বেহেস্তের সুগন্ধিযুক্ত খাবার ও পানীয় দান করবেন। মাহে রমযানের অপর নাম شهر الصبر ধৈর্যের মাস। যেমন হাদিস শরীফে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে– انه سُمِّيَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرَ الصَّبْرِ নিশ্চয় মাহে রমযানের নাম রাখা হয়েছে ধৈর্যের মাস করে।[১২৩৬]

অন্য হাদিসে আছে– নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– الصوم نصف الصبر রোযা ধৈর্যের অর্ধেক।[১২৩৭]

হযরত সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة মাহে রমযান ধৈর্যের মাস আর ধৈর্যের প্রতিদান হল জান্নাত।[১২৩৮]

অতএব উপরে বর্ণিত তিনটি হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, انما يوفى الصابرون اجرهم الخ আয়াতে صابرون থেকে রোযাদার উদ্দেশ্য হওয়া যুক্তিযুক্ত।

হাদিস শরীফের আলোকে

রোযা রোযাদারকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেয়। যেমন হাদিস শরীফে আছে– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه » হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় রোযা রাখে তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[১২৩৯]

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– مَنْ صام رمضان ايمانا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امُّه وفى رواية من صام رمضان اوّله الى اخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امُّه যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রমযান মাসে রোজা রাখবে সে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট নিষ্পাপ শিশুর মত গুনাহ থেকে নিষ্পাপ হয়ে

১২৩৬. আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ
১২৩৭. তিরমিযী
১২৩৮. শেখ ওয়ালী উদ্দীন ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) (৭৪০ হি), মিশকাত, পৃষ্ঠা-১৭৩
১২৩৯. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৭৩

যাবে। অন্য রেওয়ায়েতে আছে– যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পালন করবে সে মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ট নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যাবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: " كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضعْفٍ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، يَقُولُ اللَّهُ: إِلَّا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي به، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِه، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّه. وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّه مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَالصِيَامُ جنه"

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– প্রত্যেক আদম সন্তানের আমল দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন রোযা ব্যতীত, কেননা রোযা আমার জন্য এবং এর বদলা আমিই দেবো। রোযাদার নিজের নফসের প্রবৃত্তি এবং খাবার পরিত্যাগ করে আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। রোযাদারের জন্য দু'টি খুশি। একটা ইফতারের সময় আর একটি (পরকালে) তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের চেয়েও বেশী সুগন্ধি। আর রোযা (জাহান্নাম থেকে বাঁচার) ঢালস্বরূপ।[১২৪০]

অন্যান্য ইবাদতের সওয়াব দশ থেকে সাতশ গুণ হওয়ার কারণ হল যার এখলাস, মহব্বত, আন্তরিকতা, আদব ও তাক্ওয়া যতটুকু তার সওয়াবের পরিমাণও ততটুকু হবে। কিন্তু আল্লাহ বলেন বান্দা রোযা শুধু আমার জন্য রাখে তাই রোযার বদলা আমি নিজেই দেবো।

হাদিস শরীফে আছে– كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল নিজের জন্য কিন্তু রোযা ব্যতীত। কেননা উহা আমার জন্য।[১২৪১]

উপরোক্ত হাদিস শরীফে সমস্ত ইবাদত বা আমলকে বান্দার প্রতি সম্পর্ক করা হয়েছে কিন্তু রোযাকে আল্লাহ স্বয়ং নিজেই নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। কারণ প্রত্যেক ইবাদতের মধ্যে 'রিয়া' বা লোকদেখানোর সম্ভাবনা আছে কিন্তু রোযা এমন এক এবাদত যাতে লোকদেখানোর কোন অবকাশ নেই। কারণ বান্দা সত্যি সত্যি রোযা রাখছে কিনা সেটা বান্দা ও আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে না। রোযাকে আল্লাহ নিজের দিকে সম্পর্কিত করার কারণ হল পানাহার এবং অন্যান্য নফসের প্রবৃত্তি থেকে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। বান্দা যখন রোযার মাধ্যমে ঐগুলি থেকে বিরত থাকে তখন আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হয় বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সক্ষম হয়। তখন এ

[১২৪০]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৭৩
[১২৪১]. বুখারী শরীফ

বাক্যের অর্থ হবে– الصوم سبب التقرب الى রোযা আমার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। অথবা পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে মুক্ত থাকা ফেরেশ্তার অভ্যাস। বান্দা এগুলি থেকে বিরত থেকে ফেরেশ্তার গুণে গুণান্বিত হয়ে ফেরেশ্তাদের ন্যায় আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়।

হাদিস শরীফে আছে– كل عمل ابن آدم له كفّارة الاّ الصوم রোযা ব্যতীত বনী আদমের প্রত্যেক আমলের কাফ্ফারা আছে। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (রা.) বলেন– কিয়ামতের ময়দানে অনেক নেককার তাদের নেকীর পাহাড় নিয়ে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে। কিন্তু একজন হকদার এসে বলবে হে আল্লাহ! সে দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আমার হক খেয়েছে, আমার উপর যুলুম করেছে, আমি তার প্রতিদান চাই, তখন আল্লাহ তায়ালা ঐ নেককার বান্দার রোযা ব্যতীত অন্যান্য আমল থেকে ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দিবেন। এভাবে হকদার এসে এসে তার সমস্ত নেক আমল নিয়ে যাবে। রোযার আমল ব্যতীত তার কাছে আর কোন আমল থাকবেনা কিন্তু হকদার অবশিষ্ট থেকে যাবে। হকদার যখন আল্লাহর কাছে রোযার আমল চাইবে তখন আল্লাহ বলবেন বান্দা রোযা শুধু আমার জন্য রেখেছে বিধায় এর সওয়াব কাউকে দেয়া যাবে না। তবে হকদারকে আমার পক্ষ হতে হক আদায় করবো। এই বলে আল্লাহ রোযাদারকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (সুবাহান্নাল্লাহ) বান্দার সমস্ত আমলের সওয়াব যখন পাওনাদারেরা নিয়ে যাবে তখন একমাত্র সম্বল হিসাবে শুধু রোযার আমলের সওয়াবই অবশিষ্ট থাকবে যার উছিলায় বান্দা নাজাত পাবে। অথবা অন্যান্য আমলের সওয়াব আল্লাহ নিজের হাতে দিবেন না বরং দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশ্তাদের মাধ্যমে প্রদান করবেন কিন্তু রোযার সওয়াব আল্লাহ নিজের কুদরতের হাতে দান করবেন। এটাই হচ্ছে الصوم لى وانا اجزى এর মর্মার্থ। আর যদি اُجزى انا পড়া হয় তখন মর্মার্থ হবে রোযার প্রতিদান স্বয়ং আমি নিজেই। অর্থাৎ অন্যান্য আমল দ্বারা জান্নাত লাভ করা যায় কিন্তু রোযা দ্বারা জান্নাতের মালিককে পাওয়া যায়। আর জান্নাতের মালিককে পেলে সহস্র জান্নাত উপেক্ষিত হয়ে যায়।

ঘটনা

একদিন হযরত সুলতান মাহমুদ গজনবী (র.) তাঁর আমলাদের সামনে মূল্যবান মণি-মুক্তা নিক্ষেপ করে বললেন– যার যা প্রয়োজন নিয়ে নাও। তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। উপস্থিত লোকেরা মণি-মুক্তা কুড়িয়ে নিতে ব্যস্ত। এদিকে সুলতান মাহমুদ কিছু দূরে গিয়ে পেছনে ফিরে দেখেন তখন তাঁর ভৃত্য আয়াযকে তার পেছনে দেখতে পান। তিনি আয়াযকে জিজ্ঞাসা করলেন, আয়ায! তোমার কি মূল্যবান মণি-মুক্তা প্রয়োজন নেই তুমি আমার পেছনে আসছ কেন? উত্তরে আয়ায বললেন– যারা মণি-

মুক্তার আকাঙ্ক্ষিত তারা তা কুড়িয়ে নিচ্ছে, আমার মণি-মুক্তার প্রয়োজন নেই বরং মণি-মুক্তার মালিকের প্রয়োজন। সুতরাং আমার যার প্রয়োজন আমি তার সাথেই আছি।

রোযাদারের জন্য দু'টি খুশি একটি সারাদিন রোযা রাখার পরে ইফতারের সময় সেটা প্রত্যেক রোযাদার মাত্রই অনুভব করতে পারেন। আর একটি খুশী হল পরকালে আল্লাহর দিদারের সময়। পরকালের সমস্ত নেয়ামতের চেয়ে বড় নেয়ামত হল আল্লাহর দিদার। আল্লাহর দিদার লাভের আনন্দে জান্নাতের সমস্ত আনন্দ-উৎফুল্ল ভুলে যাবে। আর এ সৌভাগ্য শুধু রোযাদারেরই হবে।

الصيام جنة: সৈনিকের ডান হাতে থাকে তরবারী বা অস্ত্র আর বাম হাতে থাকে লৌহার তৈরি ঢাল। ডানহাতের অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে আর বাম হাতের ঢাল দিয়ে প্রতিপক্ষের আক্রমণ ঠেকায়। যেভাবে সৈনিক বাম হাতের ঢাল দিয়ে শত্রু পক্ষের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে তেমনি রোযা দুনিয়াতে জ্বিন ও ইনসান শয়তানের আক্রমণ তথা শরীয়ত বিরোধী সমস্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে রোযাদারকে রক্ষা করে তেমনি পরকালে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে। হাদিস শরীফে আছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ فَيَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ " হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে হে প্রভু! আমি তাকে (রোযাদারকে) দিনের বেলায় পানাহার এবং নফসের কুপ্রবৃত্তি থেকে নিষেধ করেছি। সুতরাং আপনি তার হকে আমার সুপারিশ কবুল করুন। আর কুরআন বলবে আমি তাকে (তেলাওয়াতকারী) রাতের বেলায় ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং আপনি তার হকে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতঃপর উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।[১২৪২]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ، أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ "

হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– জান্নাতে একটি দরজা আছে যাকে "রাইয়্যান" বলা হয়। কিয়ামত দিবসে ঐ

[১২৪২]. বায়হাকী, শোআবুল ঈমান, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা-১৭৩

দরজা দিয়ে রোযাদার (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। রোযাদার ব্যতীত অন্য কেউ ঐ দরজা দিয়ে তাদের সাথে প্রবেশ করতে পারবে না। বলা হবে, রোযাদার ব্যক্তিরা কোথায়? অতঃপর ঐ দরজা দিয়ে তারা প্রবেশ করবে। যখন সর্বশেষ রোযাদার ব্যক্তি প্রবেশ করবে তখন দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং কেউ আর ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।[১২৪৩]

রোযাদার আল্লাহর কাছে এত প্রিয় ও মকবুল হয় যে, ইফতারের সময় তার দোয়া আল্লাহর দরবার থেকে ফেরত হয়না। যেমন মরফু হাদিসে বর্ণিত আছে– **«إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ»** ইফতারের সময় রোযাদারদের দোয়া প্রত্যাখ্যান হয় না। (ইবনে মাজাহ) দিনে রোযা রাতে নামায পড়ার জন্য শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে পানাহার করা ইবাদতের শামিল এবং সওয়াবের অধিকারী হবে। যেমনিভাবে ইবাদতের শক্তি অর্জনের জন্য দিনে ও রাতে নিদ্রা যাওয়া ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন মরফু হাদিসে বর্ণিত আছে– **نوم الصَائم عبادَة** রোযাদারের ঘুম ইবাদত।[১২৪৪]

হযরত আবুল আলীয়া (রা.) বলেন– **الصائم فى عبادةٍ مَالَمْ يغتب احدًا وان كان نائمًا على فراشه** রোযাদার যতক্ষণ কারো গীবত করবে না ততক্ষণ ইবাদতে থাকে যদিও বিছানায় ঘুমায়।[১২৪৫]

কিয়ামত দিবসে অন্যান্য লোকেরা যখন হিসাব নিকাশে ব্যস্ত থাকবে তখন রোযাদার আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত সুস্বাদু খাবার গ্রহণে রত থাকবেন যেমন– হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত মরফু হাদিসে বর্ণিত আছে– **الصائمون ينفخ من افواههم ريح المسك ويوضع لهم مائدة تحت العرش يأكلون منها والناس فى الحساب** রোযাদারের মুখ থেকে মেশকের সুগন্ধী বের হবে এবং তাদের জন্য আরশের নিচে দস্তরখানা রাখা হবে। তারা তা থেকে খাবে আর লোকেরা হিসাব নিকাশে ব্যস্ত থাকবে।[১২৪৬]

হযরত আনাস (রা.) থেকে মওকুফ হাদিসে বর্ণিত আছে– **ان لله مائدة لم ترمثلها عين ، ولم تسمع اذن ، ولا خطر على قلب بشر لا يقعد عليها الا الصائمون** আল্লাহর নিকট এমন এক দস্তরখানা আছে যার সাদৃশ্য না কোন চোখে অবলোকন করেছে, না কোন কান

[১২৪৩]. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি), মুসলিম শরীফ, পৃষ্ঠা-৩৬৪
[১২৪৪]. বায়হাকী, শোআবুল ঈমান, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা-৪১০
[১২৪৫]. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫ হি), লাতায়েফুল মাআরিফ,আরবী, পৃ-২৫৭
[১২৪৬]. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫ হি), লাতায়েফুল মাআরিফ,আরবী, পৃ-২৬০

শুনেছে, না কোন মানুষের হৃদয়ে অনুভূত হয়েছে। উহাতে রোযাদার ছাড়া আর কেউ (খেতে) বসতে পারবেনা।[১২৪৭]

হযরত আনাস (রা.) থেকে মরফু হাদিসে বর্ণিত আছে যে, **يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح افواههم ، افواههم اطيب من ريح المسك** রোযাদার কবর থেকে বের হলে তাদের মুখের সুগন্ধী দ্বারা তাদেরকে চেনা যাবে। তাদের মুখের সুগন্ধ মেশকের চেয়েও উত্তম। ইমাম মকহুল (র.) বলেন– জান্নাতবাসীরা একটা সুগন্ধি পাবে। তারা বলবে– হে আমাদের প্রভু! আমরা জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে এই সুগন্ধির মত উত্তম সুগন্ধি আর পাইনি। তখন বলা হবে– এই সুগন্ধি রোযাদারের মুখের। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ মেশকের চেয়ে সুগন্ধি হওয়া এটা অসম্ভব কিছুই নয়। কারণ নেক কাজের প্রতিদান আল্লাহ এভাবেই দেন। যেমন সর্বজন স্বীকৃত যে, হযরত ইমাম বুখারী (র.)এর কবর মোবারক থেকে সুগন্ধি বের হত। তাছাড়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে গালেব (র.) যিনি অত্যধিক নামায পড়তেন এবং রোযা রাখতেন, তার ইন্তেকালের পর যখন তাকে দাফন করা হয় তখন তার কবরের মাটি থেকে মেশকের সুগন্ধি বের হয়। কোন বুযুর্গ ব্যক্তি স্বপ্নে তাকে দেখলে তিনি তার কবরের সুগন্ধির কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বলেন, ঐ সুগন্ধি রোযা এবং তেলাওয়াতে কুরআনের।[১২৪৮]

বান্দা আল্লাহর ইবাদত ও তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে গিয়ে যদি বান্দা থেকে অপছন্দনীয় কিংবা অপবিত্র কিছু অনিশ্চা সত্ত্বেও প্রকাশিত হয় তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় কিংবা অপবিত্র থাকে না বরং তা পছন্দনীয় ও পবিত্র হয়ে যায়। যেমন হযরত মূসা (আ.)'র উপর তাওরাত কিতাবের জন্য তূর পর্বতে ত্রিশ রাত ইবাদতে মশগুল থাকার নির্দেশ ছিল এবং এই ত্রিশ দিন তিনি রোযা ছিলেন। এতে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। তিনি মুখের এই দুর্গন্ধ নিয়ে আল্লাহর সাথে কথা বলা অপছন্দ করেছেন। তাই একটি মিসওয়াক নিয়ে মিসওয়াক করেন। যখন দুর্গন্ধ মুক্ত হয়ে ওয়াদা মোতাবেক তাওরাত নিতে গেলেন– আল্লাহ বললেন– হে মূসা! তুমি ঐ সুগন্ধি দূর করে দিয়েছ যা আমার কাছে মেশকের চেয়েও বেশী প্রিয়। সুতরাং যাও আরো দশটি রোযা রাখ যাতে পুনরায় ঐ সুগন্ধি হয়। অতঃপর আরো দশদিন বেড়ে মোট চল্লিশ দিন হয়েছিল। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً الخ। একইভাবে হাদিস শরীফে বলা হয়েছে কিয়ামত দিবসে শহীদের রক্তের গন্ধ মেশকের গন্ধের ন্যায় হবে। অতএব উপরোল্লেখিত দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রোযাদারের

[১২৪৭]. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫ হি), লাতায়েফুল মাআরিফ,আরবী, পৃ-২৬০

[১২৪৮]. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫ হি), লাতায়েফুল মাআরিফ,আরবী, পৃ-২৬৪

মুখের দুর্গন্ধ মেশকের চেয়ে সুগন্ধি হওয়া আশ্চার্য কিংবা অসম্ভব কিছুই নয়। রোযাদারদের রোযাকে যথাযথ ইবাদতের মাধ্যমে পালন করলে জান্নাত ছাড়াও রোযাদারের জন্য পুরষ্কার রয়েছে। যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও হাদিস শরীফে আছে– «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا»، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هِيَ لِمَنْ قَالَ طَيِّبَ الْكَلَامِ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْشَى السَّلَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ» জান্নাতে এমন একটি কক্ষ আছে যার ভিতর থেকে বাহির অংশ এবং বাহির থেকে ভিতর অংশ দেখা যায়। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি কাদের জন্য? উত্তরে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, ঐ সব লোকদের জন্য যারা (অপরকে) খাবার খাওয়ায়, যারা সর্বদা রোযাদার এবং যারা রাত্রিবেলায় নামায পড়ে যখন মানুষ ঘুমায়।[১২৪৯] উপরোক্ত গুণাবলি মাহে রমযানে একজন মু'মিন রোযাদারের মধ্যেই পাওয়া যায়। সুতরাং হাদিসে বর্ণিত নেয়ামত রোযাদারের জন্যই অবধারিত। রোযাদার সমস্ত পাপ কাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকে। কেননা হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে–

وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ তোমাদের কেউ রোযা অবস্থায় গর্হিত কথা-বার্তা এবং ঝগড়া-বিবাদ করবেনা। যদি কেউ কোন রোযাদারকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায় তাহলে সেই বলবে যে, ভাই আমি রোযাদার।[১২৫০]

আমি রোযাদার বলে রোযাদারকে গালি গালাজ কিংবা ঝগড়া ফাসাদ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা চলি তার বিপরীত। রমযান আসলে রোযাদারের মাথা পূর্বের তুলনায় আরো বেশী গরম হয়ে যায়, কথায় কথায় ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হয়ে যায়। ফলে রমযানের ফুয়ুজাত, বরকাত থেকে আমরা বঞ্চিত হই। রোযাদারকে বিশেষ করে গীবত থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ হাদিস শরীফে আছে– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَكَانَا صَائِمَيْنِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ، قَالَ: " أَعِيدَا وُضُوءَكُمَا وَصَلَاتَكُمَا وَامْضِيَا فِي صَوْمِكُمَا وَاقْضِيَاهُ يَوْمًا آخَرَ "، قَالَا: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " اغْتَبْتُمْ فُلَانًا " হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, দুই ব্যক্তি জোহর কিংবা আসরের নামায পড়েছে। তারা দু'জন রোযাদার ছিল। রাসূল ﷺ নামায শেষ করার পরে তাদেরকে বললেন, তোমরা পুনরায় উযূ কর এবং নামায পড়।

[১২৪৯]. মুসনাদে আহমদ

[১২৫০]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা–১৭৩

আর রোযা রেখে দাও তবে পরে একদিন ক্বাযা করে দিও। তারা বলল কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন– তোমরা অমুক ব্যক্তির গীবত করেছ।[১২৫১]

গীবতের দ্বারা রোযা নষ্ট না হলেও রোযার পুণ্য ও পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায় এবং রোযার পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যায়না। তাই রাসূল ﷺ পরে কোন এক দিন রোযা ক্বাযা করার নির্দেশ দেন।[১২৫২]

ইমাম সুফিয়ান সওরী (র.)এর মতে– **انّ الغيبة مفسدة للصوم** গীবত রোযা ভঙ্গকারী। (এহয়াউল উলুম) উক্ত কিতাবের প্রথম খণ্ড ২৪১ পৃষ্ঠায় হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে– **خصلتان يفسدان الصيام الغيبة والكذب** দু'টি বস্তু তথা গীবত ও মিথ্যা রোযাকে ভঙ্গ করে দেয়। যদিও বিশুদ্ধ মতানুযায়ী গীবত, মিথ্যা, ঝগড়া-ফাসাদ ইত্যাদি দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না তবে রোযার ফযিলত নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এগুলো থেকে বেঁচে থাকা রোযাদারের একান্ত প্রয়োজন।

রোযা ভঙ্গের পরিণাম

অতিশয় বৃদ্ধ, রোগী, মুসাফির, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা, সন্তানকে দুধপানকারী মহিলা শর্তসাপেক্ষে মাহে রমযানের রোযা না রাখার অনুমতি শরীয়তের পক্ষে দেওয়া আছে। তবে বিনা কারণে রোযা ভঙ্গ করলে সে অবশ্যই ফাসেক। আর রোযাকে **انكار** বা অস্বীকার করলে নিশ্চিত কাফের হয়ে যাবে। কাযা'র দ্বারা রোযার জিম্মাদারী আদায় হয় বটে কিন্তু রমযানের রোযার যে ফযিলত সেটা পাওয়া যায় না। যেমন হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে– **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلاَ مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّه وَإِنْ صَامَهُ.** আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– শরীয়ত সমর্থিত কোন কারণ কিংবা রোগ ব্যাধি ছাড়া যে ব্যক্তি মাহে রমযানের রোযা ভঙ্গ করবে সেই সারা জিন্দেগী রোযা রাখলেও তার ক্বাযা হবে না। অর্থাৎ মাহে রমযানের রোযার যেই সওয়াব তা পাবে না।[১২৫৩]

বদর যুদ্ধ

বদর যুদ্ধ ও ই'তিকাফ: সর্বপ্রথম ইসলামে বড় যুদ্ধ হিজরি দ্বিতীয় সনে ১৭ রমযান জুমার দিন বদর প্রান্তরে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। ঘোড়া ছিল মাত্র তিনটি আর উট ছিল সত্তরটি। পক্ষান্তরে কুরাইশ বাহিনীর সংখ্যা ছিল এক হাজার, ঘোড়া ছিল দু'শ। ছয়শ বর্মধারী জোয়ান ছিল এবং একদল গায়িকা ছিল যারা বাদ্যযন্ত্রাদি সহ বদর প্রান্তে উপস্থিত হয়। রাসূল ﷺএর দোয়া ও আল্লাহর

১২৫১. মিশকাত, পৃষ্ঠা–৪১৫
১২৫২. বায়হাকী, শোআবুল ঈমান, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৪১৫
১২৫৩. আবু ঈসা তিরমিযী (র.) (২৭৯হি), তিরমিযী শরীফ, পৃষ্ঠা-৯০

সাহায্যেই এত অল্প সংখ্যক মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়। এই যুদ্ধে ৭০ জন কাফির হত্যা হয়েছে এবং ৭০ জন বন্দি হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে ২২ জন শহীদ হয়েছিলেন। তম্মধ্যে ১৪ জন ছিল মুহাজির ৬ জন ছিল খাজরাজ গোত্রের আর ২ জন ছিল আউস গোত্রের। হযরত ওসমান (রা.) রাসূল কন্যা হযরত রোকেয়ার সেবা করার জন্য এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি বটে তবে গনীমতের অংশীদার হয়ে যুদ্ধের ফযিলতের অংশীদার হয়েছিলেন। এই যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে আল্-কুরআনের সূরা আনফালসহ বিভিন্ন মাগাযীর কিতাব অধ্যায়ন করুন।

ই'তিকাফ

ই'তিকাফের শাব্দিক অর্থ অবস্থান করা। শরীয়তের পরিভাষায় ইতিকাফ বলা হয়, পুরুষের জন্য নিয়্যতসহ এমন মসজিদে অবস্থান করা যেখানে পাঁচওয়াক্ত নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। আর মহিলাদের জন্য ই'তিকাফ হল নিয়্যত সহকারে ঘরের ভিতরে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা। ই'তিকাফ তিন প্রকার। যথা– ১. ওয়াজিব ২. সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ও ৩. মুস্তাহাব। ই'তিকাফের মান্নত করলে তা ওয়াজিব। রমযানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ থাকা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আলাল কিফায়া। অর্থাৎ মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে একজন ই'তিকাফ থাকলে সকলেই দায়মুক্ত হয়ে যাবে অন্যথায় সবাই গুনাহগার হবে। আর কিছুক্ষণের জন্য ইতিকাফের নিয়্যত করে মসজিদে অবস্থান করা মুস্তাহাব।

ই'তিকাফের শর্তাবলী

(১) নিয়্যত করা। নিয়্যত ব্যতীত সারাজীবন মসজিদে অবস্থান করলেও ই'তিকাফ হবে না। (২) এমন মসজিদে ই'তিকাফ করা যেখানে পাঁচওয়াক্ত নামাযের নিয়মিত জামাত হয়। জাওয়াহেরুল ফিক্হ গ্রন্থে বলা হয়েছে, **وَلاَ يَصِحُّ الاعتكاف الا فى مسجدٍ جماعةٍ فيه الصلواتُ الخميس كلها بامامٍ ومُؤذّنٍ معلوم** নির্দিষ্ট ইমাম ও মুয়াযযিন দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাত সহকারে হয় এমন মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে না। ই'তিকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান হল মসজিদে হারাম, অতঃপর মসজিদে নববী এরপর বায়তুল মোকাদ্দাস, তারপর জামে মসজিদ এবং এরপর যে মসজিদে মুসল্লী সংখ্যা বেশী। মহিলারা তাদের নিজগৃহে নামাযের স্থানে ই'তিকাফ করবে। মান্নতের ই'তিকাফের জন্য রোযা শর্ত। নফল ই'তিকাফের জন্য রোজা শর্ত নয় এবং কোন নির্দিষ্ট সময় সীমাও নেই। ই'তিকাফ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হল (১) মুসলমান হওয়া। (২) জ্ঞানবান হওয়া। (৩) জানাবত এবং হায়িয ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া। বালিগ হওয়া

শর্ত নয় তাই না বালিগের ই'তিকাফও সহীহ হবে। মহিলাদের জন্য স্বামীর অনুমতি নেয়া প্রয়োজন।

ই'তিকাফ ভঙ্গের কারণ

পুরুষেরা বিনা ওযরে মসজিদ থেকে মহিলারা নির্দিষ্ট নামাযের স্থান হতে বের হওয়া। তবে পেশাব, পায়খানা ও জুমার জন্য বের হওয়া জায়েয। অনুরূপভাবে মসজিদ ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে অথবা জোরপূর্বক মসজিদ থেকে বের করে দিলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য মসজিদে প্রবেশ করলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হবে না। জানমালের আশঙ্কা হলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। সহবাসের দিকে আকৃষ্টকারী কাজ দ্বারা দিনে হোক কিংবা রাতে হোক ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে স্বপ্ন দোষের দ্বারা ই'তিকাফ ভঙ্গ হয় না। ই'তিকাফ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত, দুরূদ শরীফ পাঠ, যিকর-আযকার, দ্বীনি বই-পুস্তক পাঠ এবং ধর্মীয় গ্রন্থাদি লেখা বৈধ। অনর্থক কথা-বার্তা, দুনিয়াবী কিংবা পারিবারিক কাজ ইতিকাফ অবস্থায় করা মাকরূহ।

ই'তিকাফের ফযিলত

রাসূল ﷺ সর্বদা রমযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ থাকতেন। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ আজীবন রাসূল ﷺ শেষ দশদিন ই'তিকাফ থাকতেন।[১২৫৪] সুতরাং ই'তিকাফের দ্বারা রাসূল ﷺএর সুন্নতের অনুসরণ হয়। ই'তিকাফকারী আল্লাহর মেহমান হয়ে যায়। তখন তারা যা দোয়া করে আল্লাহ তা কবুল করেন। তাছাড়া হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ «هُوَ يَعْكُفُ الذُّنُوبَ، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا» ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, ই'তিকাফকারী সম্পর্কে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন ই'তিকাফকারী ইতিকাফের কারণে গুনাহ থেকে বিরত থাকে আর নেকীর এমন সওয়াব অর্জন করে থাকেন যেন সমস্ত নেকীর সওয়াব অর্জন করেন।[১২৫৫]

ইমাম বায়হাকী (র.) বর্ণনা করেন– قَالَ الحسين بن على رضى الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتكف عشر رمضان كان كحجتين وعمرتين হযরত হোসাইন ইবনে আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রমযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ থাকবে সে যেন দু'টি হজ্ব ও দু'টি ওমরা করেছে।[১২৫৬]

[১২৫৪]. তিরমিযী শরীফ
[১২৫৫]. ইবনে মাজাহ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৮৩
[১২৫৬]. আল্লামা শা'রানী (র.), কাশফুল গুম্মাহ, খণ্ড-১, পৃ-২১২

যারা দুনিয়ার আরাম আয়েশের বাড়ী-ঘর ত্যাগ করে অল্প সময়ের জন্য মসজিদে ই'তিকাফ নেন বেহেশ্‌তে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য মনোরম মহল তৈরি করবেন। যেমন হাদিস শরীফে আছে– كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتكف ما بين المغرب والعشاء فى مسجد جماعة لم يتكلم الابصلوة وقران كان حقا على الله ان يبنى له قصرًا فى الجنة রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– যে ব্যক্তি মাগরীব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় এমন মসজিদে ই'তিকাফ থাকবে নামায এবং কুরআন তেলাওয়াত ব্যতীত কোন কথা বলবেনা তাদের জন্য বেহেশ্‌তে মহল তৈরি করা আল্লাহর উপর দায়িত্ব হয়ে যাবে।[১২৫৭]

হাদিস শরীফে আরো বর্ণিত আছে– كان صلى الله عليه وسلم يقول من اعتكف يومًا ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق ابعد مما بين الخافقين রাসূল ﷺ এরশাদ করতেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে মাত্র একদিন ই'তিকাফ থাকবে আল্লাহ তায়ালা তার এবং জাহান্নামের মধ্যখানে তিনটি পরিখা দিয়ে আড়াল করবেন যেগুলোর দূরত্ব আসমান ও জমিনের দূরত্বের চেয়েও বেশী।[১২৫৮]

লায়লাতুল ক্বদর

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ .

আমি এটি (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি শবে ক্বদরে। শবে ক্বদরের মর্যাদা সম্পর্কে আপনি কি জানেন? শবে ক্বদর এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশ্‌তাগণ বিশেষতঃ জিব্রাইল (আ.) দুনিয়াতে আসেন তাদের প্রভুর নির্দেশক্রমে। এ শান্তি বা নিরাপত্তা ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

শানে নুযুল

একদিন রাসূল ﷺ বনী ঈস্রাঈলের জনৈক আবেদ মুজাহিদ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের সামনে আলোচনা করলেন। কারো মতে ঐ ব্যক্তির নাম ছিল শামউন। সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম দিনে জিহাদ এবং রাতে ইবাদতে মশগুল ছিলেন। মুসলমানগণ একথা শুনে বিস্মিত হলো এবং নিজেদের অল্প বয়সের কারণে এত বেশী ইবাদতের অক্ষমতার জন্য চিন্তিত হলো। তখন আল্লাহ তাদের সান্ত্বনার জন্য এ সূরা নাযিল করে ঘোষণা করেন যে, উম্মতে মুহাম্মদীর এ একটি রাতের এবাদত বনী ইসরাইলের ঐ আবেদের হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। তাফসীরে আযিযীতে আল্লামা আব্দুল আযিয মুহাদ্দেস দেহলভী (র.) বলেন, একদিন নবী করিম ﷺ নিজের

[১২৫৭]. আল্লামা শা'রানী (র.), কাশফুল গুম্মাহ, খণ্ড-১, পৃ-২১২
[১২৫৮]. কাশফুল গুম্মাহ, খণ্ড-১, পৃ-২১২

উম্মত এবং অন্যান্য নবীগণের উম্মতের বয়সের তুলনা করেন। অন্য নবীর উম্মতগণ দীর্ঘ জীবনের ফলে তারা অনেক আমল করতে সক্ষম হন। পক্ষান্তরে আমার উম্মতের বয়স কম হওয়ার দরুন অন্যদের মত বেশী আমল করতে পারেনা। এ ভাবনায় রাসূল ﷺ এর চেহারা মোবারক মলিন হয়ে উঠে। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হাবিবের সন্তুষ্টির জন্য এ সূরা নাযিল করে ঘোষণা করলেন যে, আমি আপনার উম্মতের জন্য হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রাত শবে ক্বদর উপহার দিয়েছি।[১২৫৯]

লায়লাতুল ক্বদরের অর্থ

রাত আর ক্বদর অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। অন্যান্য রাতের চেয়ে যেহেতু এ রাত সম্মানীয় ও মর্যাদাপূর্ণ সেহেতু এ রাতকে মহিমান্বিত রজনী বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ইতিপূর্বে যারা নেক কাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সম্মানিত বা মহিমান্বিত হতে পারে নি তারা এই একটি মাত্র রজনীতে ইবাদত ও এস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সম্মানিত হতে পারে। ক্বদরের আরেক অর্থ তকদীর। এ রাত্রিতে পরবর্তী একবছরে অবধারিত বিধিলিপি দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশ্তাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তাই এটাকে লায়লাতুল ক্বদর বলা হয়। এটা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য বিশেষ নেয়ামত যা অন্য কোন উম্মতকে দেয়া হয়নি।

লায়লাতুল ক্বদরের ফযিলত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কদর রাতে ঈমান ও ইখলাসের সাথে কিয়াম করবে তার পূর্ববর্তী যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[১২৬০]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ»

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযান মাস আসলে রাসূল ﷺ বলতেন, নিশ্চয় রমযান মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে। এতে এমন বরকত মণ্ডিত রাত নিহিত আছে যা হাজার মাস থেকে উত্তম। যে একে সম্মান করবে সে যেন পুরো কল্যাণকেই সম্মান করল আর যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল সে পুরো কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হল।[১২৬১]

[১২৫৯]. শাহ্ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), তাফসীরে আযিযী, পৃ. ২৪৭
[১২৬০]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৭৩
[১২৬১]. ইবনে মাজাহ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৭৩

লায়লাতুল কদর রমযানের শেষ দশ রাতে নিহিত

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– তোমরা লায়লাতুল কদরকে রমযানের দশ রাতে তালাশ কর।[১২৬২]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِ، فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى»

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেছেন, তোমরা (লায়লাতুল কদর) রমযানের শেষ দশকে তালাশ কর। লায়লাতুল কদর (শেষ দিক থেকে গণনায়) নবম, সপ্তম বা পঞ্চম রাত অবশিষ্ট থাকে।[১২৬৩]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ، مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লায়লাতুল কদর সন্ধান কর।[১২৬৪]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ»

ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺএর কতিপয় সাহাবীকে স্বপ্নযোগে রমযানের শেষের রাতে লায়লাতুল কদর দেখানো হয়। (একথা শুনে) রাসূল ﷺ বললেন, আমাকেও তোমাদের স্বপ্নের অনুরূপ দেখানো হয়েছে। (তোমাদের দেখা ও আমার দেখা) শেষ সাত রাতের ক্ষেত্রে মিলে গেছে। অতএব যে ব্যক্তি এর সন্ধানে প্রত্যাশী সে যেন শেষ সাত রাতে সন্ধান করে।[১২৬৫]

লায়লাতুল কদর ২৭ তারিখ রাতে নিহিত

যদিও লায়লাতুল কদর রমযানের শেষ দশ দিনের যে কোন বেজোড় রাতে নিহিত রয়েছে তবুও ওলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানেদ্বীনগণ বলেছেন, রমযানের ২৬ তারিখ

[১২৬২]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা-১৮১
[১২৬৩]. বুখারী শরীফ, হাদিস নং-১৮৯৪
[১২৬৪]. বুখারী শরীফ, হাদিস নং-১৮৯০
[১২৬৫]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৮১

দিবাগত ২৭ তারিখের রাতে নিহিত আছে। তারা প্রমাণস্বরূপ বলেন, সূরা কদরে لَيْلَةَ الْقَدْرِ শব্দটিতে নয়টি হরফ আছে। আর এই শব্দটি মোট তিনবার ব্যবহার হয়েছে। নয়কে তিন দিয়ে গুণ করলে (৯×৩=২৭) সাতাশ হয়। অথবা উক্ত সূরায় ত্রিশটি শব্দ আছে। তম্মধ্যে هِيَ শব্দটি হল সাতাশ নম্বর শব্দ। আর هِيَ দ্বারা লায়লাতুল কদর উদ্দেশ্য। সুতরাং লায়লাতুল কদর সাতাশ তারিখ রাতে নিহিত রয়েছে। আর এটাকে গোপন রাখার উদ্দেশ্য হল লোকেরা শুধুমাত্র ঐ রাতের উপর ভরসা করে অন্যান্য দিবা-রাতের ইবাদত পরিত্যাগ করবে এবং ঐ রাতে মাগফিরাতের আশায় পাপ কাজে লিপ্ত হতে দ্বিধাবোধ করবেনা।[১২৬৬]

বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওসমান ইবনে আস (রা.)এর গোলাম একদিন তার কাছে আরয করল যে, হে মুনিব! আমি দীর্ঘদিন যাবৎ নৌকা চালিয়েছি। মাঝে মধ্যে নদীর পানিতে এক বিস্ময়কর ঘটনা আমি অনুভব করেছি যা আমার জ্ঞানে মেনে নিতে পারছেনা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তা কি? উত্তরে সে বলল, প্রতি বছর এমন এক রাত আসে যে রাতে নদীর পানি মিষ্টি হয়ে যায়। তিনি গোলামকে বললেন,এবার তুমি খেয়াল রাখবে যদি এরূপ হয় তবে তারিখ সহ আমাকে বলবে। যখন রমযানের সাতাশ তারিখ আসল তখন খাদেম তাঁকে বলল, হে মুনিব! আজ রাতে নদীর পানি মিষ্টি হয়ে গিয়েছিল।[১২৬৭]

ফেরেশ্‌তাদের ঈদ

এই রাতে হযরত জিব্রাইল (আ.) অন্যান্য অসংখ্য ফেরেশ্‌তাদের নিয়ে পৃথিবীতে আল্লাহর রহমত নিয়ে অবতরণ করেন। আল্লাহ বলেন– تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশ্‌তারা বিশেষত হযরত জিব্রাইল (আ.) (পৃথিবীতে) আসেন তাদের প্রভুর নির্দেশে। এ শান্তি বা নিরাপত্তা ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। মানবজাতি বৎসরে দুই দিন তথা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদ তথা খুশী উদযাপন করে পক্ষান্তরে ফেরেশ্‌তারা ঈদ উদযাপন করে দুই রাতে তথা বরাতের ও কদরের রাতে। সুতরাং এই রাত ফেরেশ্‌তাদের ঈদের রাত। সারা রাত আল্লাহর রহমত ও সালামত নিয়ে সূর্যাস্ত হতে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত রহমত বিতরণ করতে থাকেন তারা।

[১২৬৬]. শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), তাফসীরে আযিযী, পৃষ্ঠা-২৫৯
[১২৬৭]. শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), তাফসীরে আযিযী, পৃষ্ঠা-২৫৭

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (র.) লিখেছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.)'র সৃষ্টি সম্পন্ন করেছেন তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহর দরবারে আরয করল, হে আল্লাহ! আপনি আদম (আ.) কেন সৃষ্টি করলেন? পৃথিবীতে গিয়ে তাঁর সন্তানরা ঝগড়া-ফ্যাসাদ, যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত করবে এবং নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্যের রক্ত দ্বারা নিজের হাত রক্তে রঞ্জিত করবে। আপনার ইবাদতের জন্য আমরা কি যথেষ্ট নই? তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, انى اعلم ما لا تعلمون আমি যা জানি তোমরা তা জান না। শবে কদরে ফেরেশতাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করে বান্দার আমল ও ইবাদত দেখায়ে চাক্ষুষ জবাব দেবেন। আল্লাহ বলবেন, হে ফেরেশতা! তোমরা বলেছিলে তারা পৃথিবীতে গিয়ে রক্তপাত ঘটাবে কিন্তু আজকে দেখ তারা আমার ইবাদতে মশগুল। স্বীয় গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছে। এটা দেখে ফেরেশতারা তাদের কৃত মন্তব্য ফিরিয়ে নেবে এবং আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইবে। আর আল্লাহর ইবাদতে রত বান্দার জন্য নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য দোয়া করবে সকাল পর্যন্ত। এ রাতে সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি যাবতীয় পোকা-মাকড়ের ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে সবাই সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে। পুরো রাত নিরাপদ থাকবে।

এ রাতে জিব্রাইল (আ.) অসংখ্য ফেরেশতাসহ পতাকা নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। একটি পতাকা রাসূল ﷺ'র রওযা শরীফের উপর, দ্বিতীয়টি কা'বা শরীফের উপর, তৃতীয়টি বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর এবং চতুর্থটি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যখানে স্থাপন করেন। তারপর জিব্রাইল (আ.) সকল ফেরেশতাদের পৃথিবীতে ইবাদত রত মানুষের নিকট চলে যেতে আদেশ করেন। তারা প্রত্যেক মানুষের ঘরে প্রবেশ করেন এবং ঘরে যাকে আল্লাহর ইবাদতে মশগুলে পাবেন তাকে সালাম বলেন, তার সাথে মুসাফাহা করেন। ফেরেশতার সাথে মুসাফাহা করার সময় মানুষের মধ্যে একটি স্বর্গীয় অনুভূতি সৃষ্টি হয়। তবে এ অনুভূতি কেবল ঐ ব্যক্তিই অনুভব করে যে একাগ্রচিত্তে ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকে।[১২৬৮]

যাকাত

যাকাত ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি ও অবশ্য পালনীয় ফরয। এটি ইবাদতে মালী বিধায় কেবল ধনী নিসাবের মালিক মুসলমানের উপর ফরয। 'যাকাত' আরবী শব্দ এর অর্থ হল– পবিত্রতা ক্রমবৃদ্ধি। যাকাত আদায় দ্বারা অবশিষ্ট সম্পদ পবিত্র এবং বরকত মণ্ডিত ও বৃদ্ধি হয় আর আখিরাতে সাওয়াব বৃদ্ধি হয়।

[১২৬৮]. মাওলানা নূর মুহাম্মদ, মাওয়ায়েযে রেজভীয়্যাহ, খণ্ড. ১, পৃ. ২১৪

পরিভাষায়– শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সম্পদের অংশকে হাশেমী বংশ এবং তাঁদের মাওলা ব্যতীত গরীব মুসলিমকে মালিক বানিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত গরীব ব্যক্তি থেকে উপকৃত হওয়া ব্যতীত।[১২৬৯]

পবিত্র কুরআন মজীদে ও হাদিস শরীফে অসংখ্যবার যাকাতের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে বত্রিশ স্থানে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। তম্মধ্যে আটাশ স্থানে যাকাতকে নামাযের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিস শরীফেও যাকাতকে নামাযের সাথে বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ ইবাদতে বদনী তথা শারিরীক ইবাদতের মধ্যে যেমন নামায শ্রেষ্ঠ তেমনি ইবাদতে মালী তথা আর্থিক ইবাদতের মধ্যে যাকাত শ্রেষ্ঠ। যেমন আল্লাহর বাণী– وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর।[১২৭০]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ আর তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত প্রদান কর এবং নামাযীদের সাথে নামায আদায় কর।[১২৭১]

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ " পাঁচটি বস্তুর উপর ইসলামের ভিত্তি। ১. সাক্ষ্য দেওয়া আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বান্দা। ২. নামায প্রতিষ্ঠা করা। ৩. যাকাত প্রদান করা। ৪. হজ্ব করা এবং ৫. রমযান মাসে রোযা রাখা।[১২৭২]

খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফত কালে আরবের কিছু গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকৃত জানিয়েছিল, যদিও তারা নামায পড়ত। কিন্তু আবু বকর (রা.) যাকাত না দেওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন– আমি অবশ্যই সে সব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। আল্লাহর শপথ! ওরা যদি একটা উটের রশিও দিতে অস্বীকার করে, যা রাসূল ﷺ এর যামানায় তারা দিত, তাহলে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব। সকল সাহাবায়ে কিরাম তাঁর সাথে সর্বসম্মতভাবে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

১২৬৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমুদ, কানযুক দাকায়েক, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫৫
১২৭০. সূরা বাকারা, আয়াত-১১০
১২৭১. সূরা বাকারা, আয়াত-৪৩
১২৭২. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১২, হাদিস নং-৩

যাকাত দ্বারা যাকাত দাতা পবিত্র ও পরিশোধিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন– خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا হে নবী! আপনি তাদের (ধনীদের) সম্পদ থেকে সাদকা (যাকাত) গ্রহণ করুন। এর দ্বারা আপনি তাদের পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন।[১২৭৩]

যাকাত প্রদান করলে আল্লাহর দয়া প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী একে অপরের সহায়ক। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরই উপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[১২৭৪]

আল্লাহ আরো বলেন– وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ আমার রহমত সব কিছুকে পরিব্যপ্তি করে আছে। সুতরাং আমি তা তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।[১২৭৫]

যাকাতের গুরুত্ব বর্ণনায় নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» আমি আদিষ্ট হয়েছি মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল আর নামায প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত প্রদান করবে। যখন তারা এরূপ করবে, তখন আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কেউ দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করে তবে জান ও মালের দণ্ডও হবে এবং তাদের বিচারের ভার আখিরাতে আল্লাহর উপরই ন্যস্ত রইল।[১২৭৬]

১২৭৩. সূরা তাওবা, আয়াত-১০৩
১২৭৪. সূরা তাওবা, আয়াত-৭১
১২৭৫. সূরা আরাফ, আয়াত-১৫৬
১২৭৬. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১২, হাদিস নং-১৩

যাদের উপর যাকাত ফরয

যাকাত কেবল মাত্র স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক ও সম্পদশালী মুসলমানের উপর ফরয। সম্পদের উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য প্রথমত সম্পদের মালিকানা সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া জরুরী। দ্বিতীয়ত সম্পদ অবশ্যই বর্ধনশীল বা প্রবৃদ্ধমান হতে হবে। এক্ষেত্রে সম্পদের বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট, বৃদ্ধি পাওয়া জরুরী নয়। তৃতীয়ত নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা আবশ্যক। নিসাব হল প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদ দিয়ে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সম-মূল্যের সম্পদের মালিক হওয়া। অথবা উভয়টি মিলে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমান কিংবা সব সম্পদ মিলে উভয়টি থেকে যে কোন একটির নিসাবের সমান হলে যাকাত দিতে হবে। মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে গরীবের জন্য যা অধিকতর লাভজনক তার মূল্য ধরতে হবে। চতুর্থত নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকতে হবে।

যাকাতের হকদার

পবিত্র কুরআনে মোট আট প্রকারের লোক যাকাতের হকদার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ সাদকা কেবল ফকীর ও মিছকিনদের জন্য এবং সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত লোকদের জন্য, যাদের চিত্তাকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্থদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১২৭৭]

১. ফকীরঃ যাদের কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই তাদেরকে ফকীর বলা হয়।

২. মিছকীনঃ যারা নিঃস্ব, অসহায়, যাদের কাছে কোন সম্পদ নেই তারাই মিসকীন।

৩. আমিলুনঃ যাকাতের কাজে নিযুক্ত লোকদের আমিলুন বলা হয়।

৪. মুয়াল্লিফাতুল কুলুবঃ কাফির ও নওমুসলিমদের ইসলামের প্রতি চিত্তাকর্ষণের উদ্দেশ্যে ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় যাকাত দেওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে ইসলাম শক্তিশালী হলে তা রহিত করা হয়।

৫. দাস মুক্তিঃ মুক্তিপণ ধার্যকৃত দাস মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৬. ঋণগ্রস্থদের ঋণ পরিশোধঃ ঋণগ্রস্থদের ঋণ পরিশোধের জন্য কিংবা ঋণ মুক্ত করার জন্য তাদেরকে যাকাত প্রদান করা যাবে।

[১২৭৭]. সূরা তাওবা, আয়াত-৬০

৭. আল্লাহর পথেঃ যেসব গাজী ও মুজাহিদ জিহাদের উপকরণ ক্রয়ের ক্ষমতা নেই তাদেরকেও যাকাত প্রদান করা যাবে। গরীব দ্বীনি ইলম শিক্ষার্থীসহ যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিয়েছে তাদেরকে যাকাত প্রদান করা যাবে।

৮. মুসাফিরঃ মুসাফিরকে যাকাত প্রদান করা যাবে, যদিও সে নিজ দেশে ধনী হয়।

যাকাত আদায়ের নির্ধারিত কোন মাস নেই। নিসাবের মালিক সম্পদের মালিকানার এক বছর পূর্ণ হলে যাকাত আদায় করবে। তবে রমযান মাসে আদায় করলে সওয়াব বেশী হয় বিধায় উত্তম।

যাকাত আদায় না করার পরিণাম

যাকাত আদায় না করা জঘন্য অপরাধ। যাকাত না দেওয়ার ইহকালীন পরিণতি সম্পর্কে নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– «مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ» যাকাত যে মালের সাথে মিশ্রিত হয় সে মালকে যাকাত অবশ্যই ধ্বংস করে দেয়।[১২৭৮]

পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে কুরআন-হাদিসে অনেক স্থানে বর্ণিত হয়েছে– আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা অর্থাৎ যাকাত দেয়না। তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ এবং পিঠে দাগ দেওয়া হবে। সেদিন বলা হবে, এটাই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর।[১২৭৯]

তিনি আরো বলেন– وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তাদের দিয়েছেন তাতে তারা কৃপণতা করে। তারা যেন কৃপণতা করে সম্পদ জমা করাকে তাদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে। বরং তা তাদের জন্য ক্ষতিকর। যাতে তারা কৃপণতা করে তা অচিরেই কিয়ামত দিবসে তাদের গলায় বেড়ি হবে।[১২৮০]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– مَا مِنْ رَجُلٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ شُجَاعًا، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} الآيَةَ যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত আদায় করবে না, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সে সম্পদ

[১২৭৮]. ইমাম শাফেঈ (র.) ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় তারীখ গ্রন্থে, সূত্রঃ মিশকাত, পৃষ্ঠা-১৫৭
[১২৭৯]. সূরা তাওবা, আয়াত– ৩৪-৩৫
[১২৮০]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৮০

তার ঘাড়ে সাপস্বরূপ করবেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর কিতাব হতে একথার সমর্থন পেশ করেন– "আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তাদেরকে দিয়েছেন তাতে তারা কৃপণতা করে। শেষ পর্যন্ত।"[১২৮১]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– " مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ – يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ – ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ: (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) الآيَةَ " আল্লাহ যাকে ধনসম্পদ দিয়েছেন সে যদি তার যাকাত আদায় না করে তাহলে কিয়ামতের দিন তা একটি বিষধর অজগর সাপের রূপ ধারণ করবে যার দু'চোখের উপর দু'টি কালো চিহ্ন থাকবে। কিয়ামতের দিন সাপটিকে তার গলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার মুখের দুপাশে কামড়াতে থাকবে আর বলবে আমিই তোমার সম্পদ। আমি তোমার পুঞ্জীভূত ধন।[১২৮২]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)এর সময়কালে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ইন্তেকাল করল। লোকেরা তাকে দাফন করার জন্য কবর খনন করলে দেখা গেল কবরে একটি বিষাক্তসাপ ফানা তুলে আছে। ইবনে আব্বাস (রা.)কে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি অন্যত্র কবর খননের নির্দেশ দেন। অন্যত্র কবর খনন করা হল এবং প্রত্যেকটিতে বিষাক্ত সাপ বিদ্যমান। অবশেষে ইবনে আব্বাস (রা.) মৃতের ওয়ারিশদেরকে ডেকে মৃত ব্যক্তির আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তারা বলল, লোকটি নেককার ছিল, কিন্তু তার একটি দোষ ছিল সে যাকাত আদায় করত না। একথা শুনে ইবনে আব্বাস (রা.) নির্দেশ দিলেন যে, তাকে দাফনের জন্য অন্য কোথাও আর কবর খননের প্রয়োজন নেই বরং ঐ সাপযুক্ত কবরেই তাকে দাফন কর। কেননা সে যাকাত অনাদায়কারী ছিল। যাকাত অনাদায়কারীর কবর যেখানেই খনন কর না কেন সাপ সেখানেই বিদ্যমান থাকবে।[১২৮৩]

ইবনে হাজর মক্কী (র.) বর্ণনা করেন– হযরত আবু সিনান (রা.)'র নিকট একদল তাবেয়ী সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। তিনি বললেন, আমার এক প্রতিবেশী ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং মৃতের ওয়ারিশদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে আমি সেখানে যাচ্ছি। আগন্তুক তাবেয়ীর দল বললেন, আমরাও আপনার সাথে যাব। তারা প্রতিবেশীর ঘরে গিয়ে দেখেন যে, সে খুবই কান্নাকাটি করতেছে। আবু সিনান (র.) তাকে শান্তনা দিলেন কিন্তু সে মোটেই শান্ত হচ্ছিলনা। তিনি বললেন, ভাই মৃত্যু আল্লাহর

১২৮১. তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা-১৫৭, হাদিস নং-১৬৯৫
১২৮২. বুখারী, সূত্র: মিশকাত, পৃষ্ঠা-১৫৫, হাদিস নং-১৬৭৭
১২৮৩. আব্দুর রহমান সফূরী (র.) (৮৯৪ হি), নুযহাতুল মাজালীস, পৃষ্ঠা-১৫৫

হুকুমে হয়। এটাকে কেউ রোধ করতে পারেনা। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। প্রতিবেশী বলল, আমি তো আমার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য কাঁদছিনা বরং সকাল-সন্ধ্যা তার উপর যে আযাব হচ্ছে আমি সে জন্য কাঁদছি। সে বলল, আমি কোন গায়েব জানিনা। তবে বাস্তব কথা হল- যখন আমার ভাইয়ের কবরে মাটি দিয়ে লোকেরা চলে আসল তখন আমি ভাইয়ের মহব্বতের কারণে কিছুক্ষণ কবরের পাশে বসে রইলাম। একটু পরে আমার ভাইয়ের কবর থেকে প্রচণ্ড কান্নাকাটির শব্দ শুনলাম। কবর থেকে চিৎকার স্বরে আওয়ায আসল, হ্যায়, আফসোস, আমি পাঁচওয়াক্ত নামায পড়তাম, রোযা রাখতাম, কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমার উপর আযাব হচ্ছে। এই শব্দ শুনে আমি অস্থির হয়ে উঠলাম, আমার ভাইয়ের উপর কী আযাব হচ্ছে তা দেখার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। অবশেষে আমি কবর থেকে মাটি সরাতে আরম্ভ করলাম, দেখলাম আমার মৃত ভাইয়ের গলায় আগুনের শিকল যার কারণে তার পুরো শরীরে আযাব অনুভূত হচ্ছে। তার এ অবস্থা দেখে আমার চোখে পানি এসে গেল। তাকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে আগুনের শিকলে হাত দিলে আগুনে আমার হাত জ্বলে গেল। আমি হাত সরিয়ে নিলাম এবং তার উপর মাটি ঢেলে দিলাম আমার ভাইয়ের সেই আযাবের স্মরণে আমাকে কাদাচ্ছে। তাবেয়ীদল ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার ভাইয়ের জীবন কীরূপ ছিল? তার আমল কেমন ছিল? উত্তরে সে বলল, আমার ভাই নেককার ছিল। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করত এবং রমযান মাসে রোযা পালন করত কিন্তু তার একটি দোষ ছিল সে নিজের সম্পদের যাকাত দিত না। তখন তারা বললেন– তোমার ভাইয়ের আযাব এরূপই হবে।[১২৮৪]

জুমুআর দিনের ফযিলত

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ হে মু'মিনগণ! জুমুআর দিনে যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের (নামাযের) দিকে দ্রুত আগমন কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ।[১২৮৫]

নামকরণ

জুমআ অর্থ একত্রিত হওয়া, জমায়েত হওয়া। হযরত সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ আমাকে বলেছেন– তোমরা কি জান জুমআর নাম জুমআ কেন হল? আমি আরয করলাম, না, জানিনা। তিনি বললেন, এই দিনে তোমাদের পিতা

১২৮৪. ইবনে হাজর মক্কী (র.) (৯৭৪ হি), যাওয়াজের, পৃষ্ঠা-১৪০
১২৮৫. সূরা জুমুআ, আয়াত–৯

আদম (আ.)'র খামীর একত্রিত করা হয়েছিল। এ কারণে এই দিনের নাম জুমআ রাখা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, হযরত আদম (আ.) চল্লিশ বছর খামীর অবস্থায় থাকার পর এই দিন তাতে রূহ প্রদান করা হয়েছে। অনেকেই বলেন, হযরত হাওয়া (আ.)কে হযরত আদম (আ.)এর পাঁজর থেকে সৃষ্টি করার পর এই দিন উভয়ই একত্রিত হয়েছিলেন। কেউ বলেছেন দীর্ঘ সময় উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হওয়ার পর এ দিন একত্রিত হয়েছিলেন। একটি মত এটাও আছে যে, এদিন শহর ও গ্রামবাসী জুমআর নামাযের জন্য একত্রিত হয় তাই জুমআ নাম রাখা হয়েছে। এটাও বলা হয় যে, কিয়ামত দিবসের একটি নাম হল ইয়াউমুল জুমআ। আল্লাহ তায়ালার বাণী– يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ একত্রিতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।[১২৮৬]

মোটকথা হল– এই দিনটি মুসলমানদের সমাবেশের দিন। এই দিনে হযরত আদম (আ.) সৃষ্টি হয়েছেন। এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করা হয় এবং এই দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামানো হয়। কিয়ামত এই দিনেই সংঘটিত হবে। এই দিনকে 'সাইয়্যেদুল আইয়্যাম' তথা দিনসমূহের সর্দার বলা হয়। ইহুদিরা শনিবারকে এবং খৃষ্টানরা রবিবারকে নিজেদের সমাবেশের জন্য পবিত্র দিন হিসাবে নির্ধারিত করে নেয়। আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মদীকে জুমআর দিন দান করেছেন যা শনি ও রবিবারের চেয়ে উত্তম। তাই এই দিন গরীবের জন্য হজ্বের দিন হিসেবে বিবেচিত হয়। এই দিনের ফযিলত সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস বিদ্যমান। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– আমরা দুনিয়াতে আগমনের দিক দিয়ে পরবর্তী কিন্তু আখিরাতের দিক দিয়ে অগ্রবর্তী। তারা আমাদের পূর্বে কিতাব লাভ করেছে আমরা তাদের পরে লাভ করেছি।

ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، يَعْنِى يَوْمَ الْجُمُعَة فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ اليَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ» অতপর এটাই ইহুদি-নাসারাদের দিন যা তাদের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ জুমআর দিন। কিন্তু তারা সে দিন সম্পর্কে মতবিরোধে লিপ্ত হল। ফলে আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক সন্ধান দিলেন। অতএব এ ব্যাপারে লোক আমাদের পশ্চাতে পড়ে গেল। ইহুদিরা পরের দিন শনিবারকে আর নাসারারা তার পরের দিন রবিবারকেই গ্রহণ করল।[১২৮৭]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন,

১২৮৬. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দু, পৃষ্ঠা-৪৪৪
১২৮৭. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১১৯, হাদিস নং-১২৭২

«خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ» পৃথিবীতে সর্বোত্তম দিন হল জুমআর দিন। এদিনে হযরত আদম (আ.)কে সৃজন করা হয়েছে, এদিনেই তাঁকে জান্নাতে দাখিল করা হয়েছে আর এ দিনেই তাঁকে সেখান থেকে বের করা হয়েছে এবং এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।[১২৮৮]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূল ﷺকে জিজ্ঞাসা করা হল, জুমআর দিনকে জুমার দিন কেন বলা হয়? তিনি বললেন– কেননা সে দিন তোমার পিতা আদম (আ.)'র কাদামাটি একত্র করা হয়েছে। এদিন বিশ্ব ধ্বংস হবে এবং জীবকুলকে পুনরায় উঠানো হবে। এ দিনেই কাফিরদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে এবং এ দিনের শেষ তিন মূহূর্তের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যদি কেউ তখন আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন।[১২৮৯]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– যখন রজব মাস আসতো তখন রাসূল ﷺ বলতেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য রজব ও শাবান মাসে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে রমযান পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখুন। রাবী বলেন– তিনি আরো বলতেন– জুমআর রাত একটি উজ্জ্বল রাত এবং জুমআর দিন একটি উজ্জ্বল দিন।[১২৯০]

ওবাই ইবনে সাব্বাক (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ এক জুমুআর দিনে বলেছেন- হে মুসলমানগণ!

«إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا فَاغْتَسِلُوا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ» এটা এমন একটি দিন যাকে আল্লাহ তায়ালা ঈদস্বরূপ করেছেন। সুতরাং তোমরা এদিন গোসল করবে এবং যার কাছে সুগন্ধি আছে সে তা ব্যবহার করবে। আর তোমরা অবশ্যই মিসওয়াক করবে।[১২৯১]

হযরত আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনযের (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ জুমুআর দিন সকল দিনের উপর শ্রেষ্ঠ এবং সকল দিন অপেক্ষা আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত দিন। এদিন কুরবানী ও ঈদের দিন অপেক্ষা

১২৮৮. মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১১৯, হাদিস নং-১২৭৩
১২৮৯. আহমদ,সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১২১, হাদিস নং–১২৮১
১২৯০. বায়হাকী, দাওয়াতুল কবীর,সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১২১, হাদিস নং-১২৮৫
১২৯১. মালিক ও ইবনে মাজাহ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১২৩, হাদিস নং-১৩১১

আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাবান। এদিনে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। এদিন আল্লাহ আদম (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে মৃত্যু দান করেছেন। এ দিনে এমন একটি মূহূর্ত রয়েছে যদি কোন বান্দা সে মূহূর্তে আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে তিনি তাঁকে তা দান করেন, যে পর্যন্ত সে হারাম কিছু প্রার্থনা করবেনা আর এ দিনেই কিয়ামত কায়েম হবে। সকল সম্মানিত ফেরেশ্‌তা, আসমান, জমিন, বাতাস, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্র সকলেই জুমআর দিনকে ভয় করে।[১২৯২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। তখন তাঁর কাছে এক ইহুদি ছিল। সে বলল, যদি এই আয়াতটি আমাদের উপর অবতীর্ণ হতো আমরা এ আয়াত অবতীর্ণের দিনকে ঈদ উৎসব করতাম। এটা শুনে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– এটা আমাদের উপর সেই দিন অবতীর্ণ হয়েছে যেদিন এক সঙ্গে দুই ঈদ হয়েছিল। এক জুমআর দিন দ্বিতীয় আরফার দিন।[১২৯৩]

জুমআর দিন দোয়া কবুল হয়

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» জুমআর দিনে এমন একটি সময় রয়েছে, যদি কোন মু'মিন বান্দা তা পায় এবং তখন আল্লাহর কাছে কোন কল্যাণ প্রার্থনা করে, আল্লাহ নিশ্চয় তাকে তা দান করেন।[১২৯৪]

জুমআর দিনে দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ সময় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হযরত আবু বুরদা ইবনে আবু মুসা (রা.) বলেন, আমি আমার পিতা আবু মুসাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল ﷺ জুমআর দিনের সেই সময়টি সম্পর্কে বলেছেন– ইমাম (মিম্বরে) বসা হতে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়।[১২৯৫]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, التَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ। তোমরা জুমআর দিনে দোয়া কবুল হওয়ার সময়টাকে আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তালাশ কর।[১২৯৬]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন– আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, জুমআর দিনে দোয়া কবুল হওয়ার সময়টি কখন। আবু হোরায়রা (রা.) বলেন– তাহলে তা

১২৯২. ইবনে মাজাহ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১২০, হাদিস নং-১২৮০
১২৯৩. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা–১২১, হাদিস নং-১২৮৪
১২৯৪. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১১৯, হাদিস নং-১২৭৪
১২৯৫. মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১১৯, হাদিস নং-১২৭৫
১২৯৬. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা–১২০, হাদিস নং-১২৭৭

আমাদেরকে অবহিত করুন। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন– তাহল জুমাবারের সর্বশেষ সময়। আবু হোরায়রা বললেন, এটি জুমাবারের শেষ সময় কিভাবে হতে পারে? কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি কোন মু'মিন বান্দা তা নামায অবস্থায় পায়, অথচ আসরের পর নামায পড়া মাকরূহ। তখন ইবনে সালাম (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ কি একথাও বলেন নি যে, যে ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকে সে মূলত নামাযেই থাকে যে পর্যন্ত না সে ওই নামায পড়ে?

ইবনে সালাম (রা.) বললেন, এখানে নামায অবস্থায় থাকা অর্থ নামাযের অপেক্ষায় থাকা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আসর পড়ে মাগরীবের অপেক্ষায় থাকা।[১২৯৭]

হযরত মারজানা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত ফাতিমা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, জুমআর দিন এমন একটি সময় আছে, ঠিক ঐ সময় যদি বান্দা আল্লাহর কাছে কোন কল্যাণ প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে তা অবশ্যই দান করেন। ফাতিমা (রা.) বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ সময়টি কখন? উত্তরে রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন, যখন সূর্যের অর্ধেক অস্তমিত হয়। মারজানা বলেন, যখন জুমআর দিন আসত, তখন হযরত ফাতিমা (রা.) স্বীয় গোলাম যায়েদকে আদেশ দিতেন যেন সে একটি উঁচু জায়গায় গিয়ে সূর্যাস্ত দেখে তাঁকে অবহিত করেন। সুতরাং যায়েদ এরূপই করতেন। যখন যায়েদ তাঁকে সূর্যাস্ত সম্পর্কে অবহিত করতেন তখন তৎক্ষণাৎ উঠে মসজিদে চলে যেতেন এবং সূর্য অস্ত গেলে নামায আদায় করতেন।[১২৯৮]

অন্য এক বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেছেন, এই সময়টা হলো জুমআর নামাযের একামত দেয়া থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত।[১২৯৯]

জুমার দিন বেশী করে দুরূদ পড়ার নির্দেশ

হযরত আওস ইবনে আওস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– তোমাদের সকল দিন অপেক্ষা জুমআর দিন শ্রেষ্ঠ। এদিন হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এদিনই পুনর্জীবিত করার জন্য দ্বিতীয়বার শিঙায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। সুতরাং ওই দিন তোমরা আমার উপর বেশী করে দুরূদ পাঠ কর। কেননা তোমাদের দুরূদ নিশ্চয় আমার কাছে উপস্থিত করা হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের দুরূদ আপনার কাছে কীভাবে উপস্থিত করা হবে অথচ আপনি তখন মাটি হয়ে যাবেন? রাসূল ﷺ বললেন– «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ

১২৯৭. মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১২০,হাদিস নং-১২৭৬
১২৯৮. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দু, পৃষ্ঠা-৪৪১
১২৯৯. প্রাগুক্ত

«أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ» নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা জমির উপর হারাম করে দিয়েছেন আম্বীয়াগণের শরীরকে। অর্থাৎ মাটি এঁদের কোন ক্ষতি করতে পারেনা।[১৩০০]

হযরত আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– তোমরা জুমআর দিন আমার উপর বেশী করে দুরূদ পাঠ কর। কেননা, জুমআর দিন হাজিরার দিন। এদিন ফেরেশ্তা আল্লাহর বিশেষ রহমত নিয়ে হাজির হয়ে থাকেন। তোমাদের যে কেউ যে কোন দিন আমার প্রতি দুরূদ প্রেরণ করবে, নিশ্চয় সে দুরূদ আমার কাছে পেশ করা হবে যে পর্যন্ত না সে অবসর গ্রহণ করবে। বর্ণনাকারী বললেন, আমি বললাম, মৃত্যুর পরেও কী? রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– মৃত্যুর পরেও।

«إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ» নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা নবীগণের শরীর মোবারক খাওয়াকে মাটির প্রতি হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নবী জীবিত, তাকে রিযিক দেওয়া হয়।[১৩০১]

জুমআর দিনে মৃত্যুর ফযিলত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন–"مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ "কোন মুসলমান যদি জুমআর দিনে বা জুমআর রাতে মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তায়ালা তাকে কবরের ফিতনা (আযাব) থেকে রক্ষা করবেন।[১৩০২]

জুমআর দিনে করণীয়

হযরত সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করবে এবং সাধ্যানুযায়ী উত্তমরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন করবে, তারপর নিজের সঞ্চিত তেল হতে নিজের শরীরে কিছু তেল লাগাবে অথবা ঘরে সুগন্ধি থাকলে ব্যবহার করবে, তারপর মসজিদে রওয়ানা হবে এবং দুই ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক করবেনা, তারপর যা তার পক্ষে সম্ভব নফল, সুন্নাত নামায পড়বে। তারপর ইমাম যখন খুৎবা দিতে থাকেন চুপ করে শুনবে, তাহলে নিশ্চয় তার এই জুমআ ও পূর্ববর্তী জুমআর মধ্যকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে।[১৩০৩]

জুমআর দিনে পিতা-মাতা ও মুরুব্বীদের কবর যিয়ারত করতে হয়। আল্লামা ইয়াফেঈ (র.) বলেন, বাহিয়া নাম্মী একজন নেককার মহিলা মৃত্যুবরণ করলে তার ছেলে

১৩০০. আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমী এবং বায়হাকী দাওয়াতে কবীর, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-১২০, হাদিস নং-১২৭৮

১৩০১. ইবনে মাজাহ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১২১, হাদিস নং-১২৮২

১৩০২. আহমদ ও তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-১২১, হাদিস নং-১২৮৩

১৩০৩. বুখারী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১২২, হাদিস নং-১২৯৫

প্রতি জুমাবার মায়ের কবরে গিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করত এবং এর সাওয়াব কবরবাসীকে হাদিয়া দিয়ে মায়ের জন্য ও সকল কবরবাসীর জন্য দোয়া করত। এক রাতে ছেলে তার মাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল– আপনি কেমন আছেন? উত্তরে মা বললেন, বড়ই কঠিন। আল্লাহর রহমতে কবরে আমি শান্তিতে আছি। আমার নীচে রায়হান বিছানো আছে আর রেশমের বালিশ দেওয়া আছে। কিয়ামত পর্যন্ত আমার সাথে এরূপ আচরণ করতে থাকবে। ছেলে বলল, আমি আপনার কী খেদমত করতে পারি? বলুন। মা বললেন, তুমি প্রতি জুমাবারে আমার নিকট এসে যে কুরআন পাঠ কর তা পড়তে থাক, বন্ধ করে দিওনা। কারণ যখন তুমি আস তখন কবরবাসীরা খুশী হয়ে আমাকে সুসংবাদ দিয়ে বলে– তোমার ছেলে এসেছে। ফলে তোমার আসাটা আমার কাছে খুবই ভাল লাগে এবং কবরবাসীরাও আনন্দিত হয়। এরপর ছেলে বলল, আমি প্রতি জুমাবারে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে কবরস্থানে যেতাম।

একরাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, নারী-পুরুষের একটি বিরাট দল আমার নিকট সমবেত হল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা কারা? তারা বললেন, আমরা অমুক কবরস্থানের অধিবাসী। আমরা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এসেছি। তুমি প্রতি জুমাবারে আমাদের নিকট আস এবং আমাদের জন্য দোয়া কর। এতে আমরা খুবই খুশী হই। এটাকে চালু রাখবে। ছেলে বলল, এরপর আমি আরো বেশী গুরুত্ব সহকারে এ কাজ করতে থাকি।[১৩০৪]

জুমআর দিন সর্বাগ্রে মসজিদে যাওয়ার ফযিলত

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» যখন জুমআর দিন আসে তখন ফেরেশ্তাগণ মসজিদের দরজায় এসে দাঁড়ায় এবং যার পূর্বে যে আসে তা লিখতে থাকেন। যে ব্যক্তি আগে আসে তার উদাহরণ হচ্ছে- যে মক্কায় কুরবানী করার জন্য একটি উট পাঠায়। তারপর যে আসে তার উদাহরণ হচ্ছে- যে একটি গরু পাঠায়। তারপর আগমনকারী একটি দুম্বা, তারপর আগমনকারী একটি মুরগী, তারপর আগমনকারী একটি ডিম পাঠানোর ন্যায় সাওয়াব প্রাপ্ত হবে। যখন ইমাম খুৎবা পাঠের জন্য বের হন তখন ফেরেশ্তাগণ তাদের কাগজ ভাঁজ করে নেন এবং খুৎবা শুনতে থাকেন।[১৩০৫]

১৩০৪. আল্লামা ইয়াফেঈ (র.) (৭৬৮ হি) রওযুর রাইয়্যাহীন, হেকায়ত নং-১৫৬, পৃষ্ঠা-১৬১

১৩০৫. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১২২, হাদিস নং–১২৯৮

অপর বর্ণনায় আছে ফেরেশ্তাগণ সর্বাগ্রে মসজিদে আগমনকারী সত্তর জনের নাম লিপিবদ্ধ করেন। এরপর তারা তালিকা বন্ধ করে ভাঁজ করে রাখেন। আর এই সত্তর জনের মর্যাদা হলো বনী ইসরাইলের যে সত্তরজনকে হযরত মুসা (আ.) নির্বাচন করেছিলেন তাদের সমতুল্য। এরা সকলই নবী ছিলেন।[১৩০৬]

জুমআর নামাযের গুরুত্ব

জুমআর দিন প্রত্যেক স্বাধীন প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মুসলমানের উপর যোহরের নামাযের সময় যোহরের পরিবর্তে দু'রাকাত জুমআর নামায জামাতে আদায় করা ফরয। অন্যান্যরা যথানিয়মে যোহরের নামায আদায় করবে।

হযরত তারিক ইবনে শিহাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ জুমআর নামায জামাত সহকারে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। তবে চার ব্যক্তি ছাড়া। ১. ক্রীতদাস ২. স্ত্রীলোক ৩. নাবালেগ ছেলে এবং ৪. রোগী।[১৩০৭]

অন্য রিওয়াতে বর্ণিত আছে মুসাফিরের উপরও জুমআ ফরয নয়। সূরা জুমআর ৯নং আয়াতে জুমআর আযান দেওয়ার সাথে সাথে যাবতীয় দুনিয়াবী কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে নামাযে দ্রুত আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– **الْجُمُعَةَ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ** যে আযান শুনবে তার উপর জুমআ ফরয।[১৩০৮]

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– **مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ**- যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার উপর জুমআর দিনে জুমআর নামায ফরয।[১৩০৯]

পূর্বকালে সমরকন্দ শহরে একজন ফাসিক, ফাজির লোক ছিল। সে সর্বদা গুনাহে লিপ্ত থাকত। এক সময় সে তাওবা করে সৎলোকে পরিণত হয়ে গেল। তার তাওবার ঘটনা বলতে গিয়ে বলল– একদিন জুমআর পবিত্র দিন ছিল। আমার উপর কয়েকটি কাজের দায়িত্ব ছিল। প্রথম কাজ হল– আমার গাধা জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছে। সেটাকে খোঁজার জন্য জঙ্গলে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত আমার বাগান শুকিয়ে গিয়েছিল।

১৩০৬. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দু, পৃষ্ঠা-৪৪০
১৩০৭. আবু দাউদ , সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১২১, হাদিস নং-১২৯১
১৩০৮. আবু দাউদ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১২১
১৩০৯. দারেকুতনী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১২১, হাদিস নং–১২৯৪

বাগানে পানি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। আর বাগানে পানি দেওয়ার পালা ছিল জুমআর দিন। আমার বাগানের প্রতিবেশী আমাকে এসে বলল, ভাই, পানি দিলে আজকে দিয়ে দিন নতুবা পানি দেওয়ার এই সুযোগ আর হাতে আসবেনা। আর তৃতীয় কাজটি হলো গম পিসার জন্য মেশিনে দিয়ে এসেছি। সেগুলো আটা বানিয়ে আনতে হবে। এসব কাজের সময় ছিল জুমআর দিন। জুমআর দিন নামাযের সময়। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম যে কোন কাজটি আগে করবো। অবশেষে সব কাজ বাদ দিয়ে জুমআর নামাযে চলে গেলাম। নামায শেষে ঘরে এসে জানতে পারলাম যে, আমার সব কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। আমার প্রতিবেশীর জমির পানি উপচে পড়ে আমার বাগানে পানি এসে গেল। আটাও আমার ঘরে পৌঁছে গেল। কেননা এক ব্যক্তি তার গম মনে করে আমার গম পিসিয়ে আমার বাড়ীর পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় আমার স্ত্রী গমের টুকরী চিনে ফেলে এবং আটার টুকরী রেখে দিল। অতএব যখন আমি দেখলাম যে, জুমআর নামায আদায় করার ফলে আমার সব কাজ এমনিই কুদরতীভাবে হয়ে গেল তখন আমি তৎক্ষনাৎ তাওবা করে নিলাম।[১৩১০]

জুমআর নামায না পড়ার পরিণাম

হযরত ইবনে ওমর ও আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, আমরা রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি মিম্বরে কাঠের উপর দাঁড়িয়ে বললেন, লোকেরা নিশ্চয় জুমআর নামায তরক করা থেকে বিরত থাকবে। নতুবা আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরসমূহে মোহরাংকিত করে দেবেন। তারপর তারা অবশ্যই গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।[১৩১১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– «**مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لَا يُمْحَى وَلَا يُبَدَّلُ**» **وَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ:** «**ثَلَاثًا**» যে ব্যক্তি কোন ওযর ব্যতীত জুমআর নামায তরক করেছে তাকে এমন তালিকায় মুনাফিক লিখা হয় যার লিখা মুছে ফেলা যায় না এবং পরিবর্তন করাও যায়না। অপর বর্ণনায় আছে তিনবার তরক করেছে।[১৩১২]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত– «**لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ**» **لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ:** নবী করিম ﷺ জুমআর নামায পরিত্যাগকারীদের সম্পর্কে বলেন, আমি ইচ্ছা করেছি যে,

১৩১০. আব্দুর রহমান সফূরী (র.) (৮৯৪ হি), নুযহাতুল মাজালীস, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা–৯
১৩১১. মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১২১, হাদিস নং-১২৬৬
১৩১২. শাফেঈ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১২১, হাদিস নং–১২৯৩

এক ব্যক্তিকে নামায পড়ানোর আদেশ দিয়ে, আমি গিয়ে জুমআ পরিত্যাগকারীদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবো।[১৩১৩]

আল্-কুরআন

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির হিদায়তের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন সাথে সাথে আল্লাহর বাণী সম্বলিত আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। আসমানি কিতাব মোট ১০৪ খানা। তম্মধ্যে স্পষ্টভাবে মোট চারটির কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়েছে। যেমন– তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন। এ সবের মধ্যে আল্-কুরআন হল শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। কারণ এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ﷺএর উপর সর্বকালের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। অতীতের সব আসমানী কিতাবের সারাংশ হল আল কুরআন। এতে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সব কিছুর বর্ণনা বিদ্যমান। কুরআনের সংজ্ঞায় আল্লামা আবুল বারাকাত নসফী (র.) (৭১০ হিজরি) বলেন– فَالْقُرانُ الْمُنَزَّلُ عَلى الرَّسُوْلِ عَلَيه السَّلام اَلْمَكْتُوْبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَواتِرًا بِلاَ شُبْهَةٍ وَ هُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنى جَمِيْعًا আল কুরআন হল– যা অবতীর্ণ হয়েছে রাসূল ﷺএর উপর যা পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যা সন্দেহাতীত পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা হয়ে আসছে। কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম।[১৩১৪]

আল্লাহ তায়ালা বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ আমি এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় যাতে তোমরা বুঝতে পার।[১৩১৫]

তিনি আরো বলেন– وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে। আর এ কুরআন তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে (অবতীর্ণ) সত্য। তিনি তাদের মন্দ কাজগুলো বিদুরিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন।[১৩১৬]

আল্লাহ তায়ালা বলেন– نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ আমি আপনার উপর কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি যাতে সবকিছুর বর্ণনা রয়েছে।[১৩১৭]

১৩১৩. মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১২১, হাদিস নং–১২৯২
১৩১৪. মোল্লা জিউন (র.), নুরুল আনোয়ার, শরহে মানার, পৃ.৮-৯, ইউপি ইন্ডিয়া ও মুফতি আমীমূল ইহসান (র.) কাওয়ায়েদুল ফিকহ, পৃ-৪২৬
১৩১৫. সূরা ইউসূফ, আয়াত-২
১৩১৬. সূরা মুহাম্মদ, আয়াত-২
১৩১৭. সূরা নাহল, আয়াত-৮৯

আল্-কুরআন স্থায়ী মু'জিযা

কুরআন রাসূল ﷺএর স্থায়ী মু'জিযা। ইমাম বুখারী (র.) হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أَتَيْتُه وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا আম্বিয়ায়ে কিরামগণ প্রত্যেককে এর ন্যায় বস্তু (মু'জিযা) দেওয়া হয়েছে। যার উপর মানুষ ঈমান এনেছিল। আর আমাকে যা দেওয়া হয়েছে তা হল ওহী যা আল্লাহ আমার প্রতি প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি সকল আম্বিয়া থেকে আমার অনুসারী অধিক হবে।[১৩১৮]

ইমাম সুয়ূতী বলেন, ওলামায়ে কিরামগণ বলেন, উক্ত হাদিসের উদ্দেশ্য হল– অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের মুজিয়া তাঁদের সময়কাল শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর তাঁদের মু'জিযাসমূহ শুধু তারাই অবলোকন করেছিল যারা সেকালে উপস্থিত ছিল। পক্ষান্তরে রাসূল ﷺ'র স্থায়ী মু'জিযা আল কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। আল কুরআন তার বাচনভঙ্গি, অলংকারপূর্ণ এবং অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানে সম্পূর্ণ অলৌকিক। প্রতি যুগে সংঘটিত কোন না কোন প্রকাশিত ঘটনা সম্পর্কে আল কুরআনে প্রকাশ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কি হবে না হবে এ বিষয়েও সংবাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এগুলো আল কুরআনের বিশুদ্ধতার প্রমাণ বহন করে।[১৩১৯]

আল্-কুরআন সংরক্ষণ করেন স্বয়ং আল্লাহ

আল্-কুরআন মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই এর সংরক্ষণ করেন। তাই এতে কোন প্রকার পরিবর্ধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন– إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ আমি স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।[১৩২০]

ইমাম কুরতুবী (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুত্তাসিল সনদ দ্বারা এবং ইমাম সুয়ূতী (র.) খলিফা মামুনুর রশিদের দরবারের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। খলিফা মামুনুর রশিদের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হত। এতে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিত ব্যক্তিগণের অংশগ্রহণের অনুমতি ছিল। এমনকি এক আলোচনা সভায় জনৈক ইহুদি পণ্ডিতের আগমন ঘটল। আকার-আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির দিক দিয়েও তাকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছিল, তদুপরি তার আলোচনাও ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অলংকারপূর্ণ এবং

১৩১৮. ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), আল খাসায়েসুল কুবরা, বৈরুত, খণ্ড-১ পৃষ্ঠা-১৮৮
১৩১৯. প্রাগুক্ত
১৩২০. সূরা হিজর, আয়াত–৯

বিজ্ঞানসম্মত। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ইহুদি? সে স্বীকার করল। মামুন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাকে বললেন, তুমি যদি মুসলমান হয়ে যাও তবে তোমার সাথে চমৎকার ব্যবহার করা হবে। সে উত্তরে বলল, আমি পৈতৃক ধর্ম বির্সজন দিতে পারিনা। কথা-বার্তা এখানেই সমাপ্ত হল। লোকটি চলে গেল। কিন্তু এক বছর পর সে মুসলমান হয়ে আবার দরবারে আগমন করল এবং আলোচনা সভায় ইসলামী ফিকহ সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থাপন করল। সভা শেষে মামুন তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি ঐ ব্যক্তি যে বিগত বছর এসেছিল? সে বলল, হ্যাঁ। আমি ঐ ব্যক্তিই বটে। মামুন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তো তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অসম্মত ছিলে। এরপর এখন মুসলমান হওয়ার কারণটা কি? সে বলল আপনার দরবার থেকে চলে যাওয়ার পর আমি বর্তমান কালের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা করি। আমি একজন হস্তলেখাবিশারদ। স্বহস্তে গ্রন্থাদি লিখে উঁচু মূল্যে বিক্রয় করি। আমি পরীক্ষামূলকভাবে তাওরাতের তিন কপি লিপিবদ্ধ করলাম। এগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে বেশ-কম করে লিখে কপিগুলো নিয়ে ইহুদিদের উপসনালয়ে উপস্থিত হলাম। ইহুদিরা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কপিগুলো কিনে নিল। অতঃপর এমনিভাবে ইঞ্জিলের তিনটি কপি কম-বেশী করে লিখে খ্রিষ্টানদের উপসনালয়ে নিয়ে গেলাম। তারাও খুব খাতির যত্ন করে কপিগুলো আমার কাছ থেকে কিনে নিল। এরপর কুরআনের বেলায়ও আমি তাই করলাম। এরও তিনটি কপি সুন্দর করে লিপিবদ্ধ করলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে কম-বেশী করে দিলাম। এগুলো নিয়ে যখন বিক্রয়ার্থে বের হলাম, তখন যেই দেখল, সেই প্রথমে আমার লিখা কপিটি নির্ভুল কিনা যাচাই করে দেখল। অতঃপর বেশ-কম দেখে কপিগুলো ফেরত দিয়ে দিল। এটা দেখে আমি শিক্ষা গ্রহণ করলাম যে, আল কুরআন হুবহু অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহ তায়ালা নিজেই এর সংরক্ষণ করছেন। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।[১৩২১]

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক কুরআন সংরক্ষণ করার আর একটি পদ্ধতি হল তিনি কুরআন হেফজ বা মুখস্থ করাকে সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন– وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ আর আমি কুরআনকে স্মরণ রাখার জন্য সহজ করে দিয়েছি।[১৩২২]

এর ফলে উম্মতে মুহাম্মদীর সাত আট বছরের শিশুরা পর্যন্ত ত্রিশ পারা কুরআন হেফজ করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া একমাত্র কুরআনই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী পঠিত হয়। সুতরাং এই কুরআন বিকৃত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। কুরআন অবিকৃত থাকার

১৩২১. ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি) আল খাসায়েসুল কুবরা, বৈরুত, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-৩১৬
১৩২২. সূরা কমর, আয়াত-১৭

ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন– لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ কুরআনে কোন মিথ্যা সামনের দিক থেকে এবং পিছনের দিক থেকে আসতে পারবে না।[১৩২৩]

অর্থাৎ কুরআনের বর্হিভূত কিছু প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে প্রবেশ করাতে কেউ পারবে না। কেউ এ কাজ করতে চাইলে সে ধরা পড়বে এবং লাঞ্ছিত হবে। পবিত্র কুরআনে সর্ব সম্মতিক্রমে ১১৪টি সূরা। ইবনে আব্বাস (রা.)'র মতে ৬৬১৬টি আয়াত এবং ৩২৩৯৭১টি হরফ আর ৭০৯৩৪টি কালিমা রয়েছে।[১৩২৪] আল্লামা নাঈম (র.) কামালাইন গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, আল্-কুরআনে রুকুর সংখ্যা ৫৫৪, সিজদার আয়াত ১৪টি, শব্দ সংখ্যা ৮৬৪৩০, হরফ সংখ্যা ৩২২৬৭১, যবর ৫৩২৪৩, যের ৩৯৫৮২, পেশ ৮৮০৪, তাশদীদ চিহ্ন ১২৫৩, মদ ব্যবহার হয়েছে ১৭৭১ বার এবং নুকতা রয়েছে ১০৫৬৮২ টি।[১৩২৫]

কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত

সমস্ত আসমানী কিতাব লিখিত অবতীর্ণ হয়েছে কেবল কুরআনই পঠিত অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ হে নবী! আপনি পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।[১৩২৬]

এ কারণেই কুরআনের এক অর্থ পঠিত। নবী করিম ﷺ নিজেই কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ যেমন আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল, যিনি তোমাদেরকে আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করবেন, আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না।[১৩২৭]

কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যে কুরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়।[১৩২৮]

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ هَذَا الْكِتَابَ، فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا،

১৩২৩. সূরা হা-মীম সিজদা, আয়াত-৪২
১৩২৪. ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি) আল ইতকান, খণ্ড-১ পৃষ্ঠা. ৮৬-৯০ লাহোর
১৩২৫. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইফাবা
১৩২৬. সূরা আলাক, আয়াত-১
১৩২৭. সূরা বাকারা, আয়াত-১৫১
১৩২৮. বুখারী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৮৩, হাদিস নং–২০০১

" فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ দু'ব্যক্তি ছাড়া কেউ ঈর্ষার পাত্র নয়। এক. সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন আর সে তা দিন রাত তিলাওয়াত করে। দুই. সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধনসম্পদ দান করেছেন আর সে তা হতে দিন-রাত দান করে।[১৩২৯]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُولُ الْم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ যে আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর পাঠ করবে সে এর বিনিময়ে একটি নেকী পাবে আর একটি নেকী দশটি নেকীর সমান হবে। আমি বলছি না যে, 'আলিফ লাম মীম' একটি অক্ষর। বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর এবং 'মীম' একটি অক্ষর। সুতরাং الْم পড়লে ত্রিশটি নেকী পাবে।[১৩৩০]

হযরত ওবাইদা মুলাইকী (রা.) বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَا تَوَسَّدُوا الْقُرْآنَ، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِن آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَافشوه وَتَغَنُّوهُ وَتُدَبِّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَلَا تَعْجِلُوا ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا হে কুরআনধারীগণ! তোমরা কুরআনকে বালিশ বানিও না বরং তিলাওয়াত করার মত তিলাওয়াত কর রাত ও দিনে আর প্রকাশ করবে ও সূর করে পড়বে। কুরআনে যা আছে তা নিয়ে গবেষণা করবে যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার এবং শীঘ্রই এটার প্রতিফল পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হবে না। কেননা কুরআনের প্রতিফল রয়েছে।[১৩৩১]

হযরত মুয়ায জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ، فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا؟» যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং তাতে যা আছে তা মোতাবেক আমল করবে তাহলে তার পিতামাতাকে কিয়ামতের দিন এমন একটি তাজ পরানো হবে যার কিরণ সূর্যের কিরণ অপেক্ষা উজ্জ্বল হবে, যদি সূর্য তোমাদের পৃথিবীর ঘরে তোমাদের মধ্যে থাকত। এখন তার সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা যে কুরআন মোতাবেক আমল করেছে?[১৩৩২]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন

১৩২৯. বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা–১৮৪, হাদিস নং–২০০৫
১৩৩০. তিরমিযী ও দারেমী, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা–১৮৬, হাদিস নং-২০২৭
১৩৩১. বায়হাকী, শোআবুল ঈমান, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৯২, হাদিস নং–২০৯৯
১৩৩২. আবু দাউদ ও আহমদ,সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৮৬, হাদিস নং-২০২৯

" يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ، وَارْتَقِ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا " (হাশরের ময়দানে) কুরআন পাঠকারীকে তথা হাফেজে কুরআনকে বলা হবে, তুমি পাঠ করতে থাক এবং (জান্নাতের স্তরসমূহে) উঠতে থাক। আর ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে পাঠ কর যেভাবে দুনিয়াতে পাঠ করতে। কেননা তোমার অবস্থানস্থল হল তোমার পাঠকৃত শেষ আয়াত পর্যন্ত। অর্থাৎ যত আয়াত পাঠ করবে তত মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি পাবে এভাবে শেষ আয়াত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে।[১৩৩৩]

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ، فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ যে ব্যক্তি কুরআন পড়েছে এবং মুখস্থ রেখেছে তারপর তার হালালকে হালাল আর হারামকে হারাম জেনেছে। তাকে আল্লাহ জান্নাতে দাখিল করবেন এবং তার পরিবারের এমন দশজন ব্যক্তির পক্ষে তার সুপারিশ কবুল করবেন, যাদের জন্য জাহান্নাম আবশ্যক হয়েছিল।[১৩৩৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন– مَن قَرَاءَ القُرانَ فَكَانَّمَا اَدْرَجَتِ النبوة بَيْنَ جَنْبَيْهِ اِلاَّ اَنَّهُ لا يُوحى اِلَيْهِ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে, সে যেন নিজের দু'পাঁজরের মাঝখানে নবুয়তকে প্রবিষ্ট করেছে। তবে পার্থক্য হল–তার নিকট ওহী নাযিল হয় না।[১৩৩৫]

কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা আল্লাহর রহমত নাযিল হয়

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ কোন একটি দল আল্লাহর কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করলে এবং নিজেদের মধ্যে তার অধ্যয়নের ব্যবস্থা করলে অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়। রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, ফেরেশ্‌তারা নিজেদের ডানা মেলে তাদের উপর ছায়া বিস্তার করে এবং আল্লাহর নিকট যারা থাকেন তাদের সামনে তিনি তাদের আলোচনা করেন।[১৩৩৬]

১৩৩৩. আবু দাউদ, আহমদ ও নাসাঈ, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৮৬, হাদিস নং-২০২৪
১৩৩৪. আবু দাউদ,ইবনে মাজাহ, আহমদ ও নাসাঈ, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৮৭, হাদিস নং-২০৩১
১৩৩৫. ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (র.) (৩৭৩ হি), তাম্বীহুল গাফেলীন, বৈরুত, পৃষ্ঠা–২৬৩
১৩৩৬. মুসলিম, সূত্রঃ রিয়াদুস সালেহীন, পৃষ্ঠা-৪১৮, বৈরুত, হাদিস নং–১০২৩

হযরত বারা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফ পড়ছিল, আর তার পার্শ্বে তার ঘোড়া বাঁধা ছিল দু'টি রশি দিয়ে। এসময় এক খণ্ড মেঘ তাকে ঢেকে নিল এবং ক্রমান্বয়ে তা তার নিকটবর্তী হতে লাগল আর তার ঘোড়া লাফাতে লাগল। সে যখন ভোরে উঠল তখন রাসূল ﷺএর নিকট তা বর্ণনা করল। তিনি বললেন– «تِلْكَ السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ أَوْ تَنَزَّلَتْ عَلَى الْقُرْآنِ» তা ছিল প্রশান্তি যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল।[১৩৩৭]

হযরত আবু উমামা (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি– «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ» তোমরা কুরআন পড়, কেননা, কুরআন কিয়ামতের দিন পাঠকদের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আসবে।[১৩৩৮]

হাফেজে কুরআনের পিতা-মাতার আযাবহ্রাস

নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– مَنْ اسْتَظْهَرَ بِالقُرآنِ خَفَّفَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى عَنْ اَبَوَيْهِ الْعَذَابَ وَاِنْ كَانَا كَافِرِينِ যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদ হেফজ করবে, তার পিতা-মাতা কাফির হলেও আল্লাহ তায়ালা তাদের কবর আযাব শিথিল করবেন।[১৩৩৯]

কুরআন মু'মিনের জন্য শেফা ও রহমত

কুরআন আত্মিক রোগসমূহ যেমন শিরক, কুফর, কুচরিত্র ইত্যাদির ঔষধ তেমনি বাহ্যিক তথা দৈহিক রোগসমূহের অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। তাই আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের শেফা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত।[১৩৪০]

হযরত আব্দুল মালিক ইবনে ওমাইর (রা.) মুরসাল রূপে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ» সূরা ফাতিহায় সকল রোগের আরোগ্য রয়েছে।[১৩৪১]

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ হল আল কুরআন।[১৩৪২]

[১৩৩৭]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা–১৮৪, হাদিস নং–২০০৯
[১৩৩৮] মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা–১৮৪ হাদিস নং–২০১২
[১৩৩৯]. ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (র.) (৩৭৩ হি), তাম্বীহুল গাফেলীন, বৈরুত, পৃষ্ঠা–২৬৩
[১৩৪০]. সূরা বণী ইসরাঈল, আয়াত-৮২
[১৩৪১]. দারেমী, বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৮৯, হাদিস নং–২০৫৯

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন–عَلَيْكُمْ بِالشِفَائَيْنِ اَلْعَسَلُ الْقُرانُ তোমরা রোগ নিরাময়কারী দু'টি বস্তুকে আঁকড়িয়ে ধর, একটি হল মধু অপরটি হল আল কুরআন।[১৩৪৩]

হযরত আবু উবাদাহ ইবনে তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– اِذَا قُرِئَ الْقُرْانَ عِنْدَ الْمَرِيْضِ وَجَدَ ذَالِكَ خِفَّةً রোগীর নিকটে কুরআন তিলাওয়াত করা হলে তাতে রোগী শান্তি পায়।[১৩৪৪]

এ ব্যাপারে হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.)'র একটি হাদিস প্রায় সব হাদিস গ্রন্থে বিদ্যমান। যার সারমর্ম হল– একদল সাহাবী সফররত ছিলেন। কোন এক গ্রামের জনৈক সরদারকে বিচ্ছু দংশন করলে লোকেরা সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করল তারা এ রোগের চিকিৎসা করতে পারবে কিনা? তারা বকরীর বিনিময়ে সূরা ফাতিহা পড়ে রোগীর গায়ে ফুঁ দিলে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। পরে রাসূল ﷺকে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি এ কাজে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।[১৩৪৫]

ইবনে মারদুইয়্যা আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন এক ব্যক্তি রাসূল ﷺএর নিকট এসে বলল, আমার বুকে ব্যাথ্যা করছে। রাসূল ﷺ বললেন اِقْرأ الْقُرانَ يَقُوْلُ اللهُ تعَالى وَشِفَاء لِمَا فِى الصُّدُوْرِ তুমি কুরআন তিলাওয়াত কর। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন কুরআন বুক ব্যাথার জন্য শেফা।[১৩৪৬]

আল্-কুরআনের চ্যালেঞ্জ

আল্-কুরআন আল্লাহর কালাম তথা বাণী। এটা কোন মানব রচিত গ্রন্থ নয়। চৌদ্দ শত বছর পূর্বে দেওয়া আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ এখনো পর্যন্ত কেউ ভাঙতে পারে নি এবং কিয়ামত পর্যন্তও পারবেনা। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে অনেকবার চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমরা এই কুরআনকে মানব রচিত বলে মনে কর তবে এর মত একটি সূরা বা আয়াত রচনা করে দেখাও। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন– أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ অথবা তারা কি বলে তিনি এ কুরআন নিজেই রচনা করেছেন? বরং তারা অবিশ্বাসী। সুতরাং তারা যেন এরূপ একটা বাণী নিয়ে আসে, যদি তারা সত্যবাদী হয়।[১৩৪৭]

[১৩৪২]. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি)ন আল ইতকান, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৮
[১৩৪৩]. ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৩৯১, হাদিস নং-৪২৫১
[১৩৪৪]. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), আল ইতকান, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৮
[১৩৪৫]. বুখারী, সূত্র: আল ইতকান, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-২০৮
[১৩৪৬]. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), আল ইতকান, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৮ লাহোর
[১৩৪৭]. সূরা তূর, আয়াত; ৩৩-৩৪

অন্যত্র আল্লাহ বলেন– وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ আর যদি তোমাদের কোন সন্দেহ হয় তাতে যা আমি আমার বান্দার প্রতি নাযিল করেছি, তবে সেটার ন্যায় একটি সূরা নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীদের আহবান কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অতঃপর যদি তোমরা তা না পার অবশ্য তা তোমরা কখনো পারবে না। সুতরাং তোমরা ভয় কর জাহান্নামের আগুনকে যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর, যা তৈরি করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।[১৩৪৮] অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন, أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ তারা কি একথা বলে? তিনি তা নিজে রচনা করেছেন? আপনি বলুন, তোমরা এর অনুরূপ দশটা সূরা নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ব্যতীত যাকে পার ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[১৩৪৯] দশটা সূরা আনতে যখন অক্ষম হল তখন আল্লাহ ঘোষণা করলেন– أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ তারা কি একথা বলে, তিনি ওটা রচনা করেছেন? আপনি বলুন, তোমরা সেটার মত মাত্র একটি সূরা নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকা সক্ষম সবাইকে ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[১৩৫০]

সর্বশেষ বলেছেন– قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا হে নবী! আপনি বলুন, যদি মানব ও জীন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে একত্রিত হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারীও হয় তবুও তারা কখনো অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।[১৩৫১]

কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা এতবার চ্যালেঞ্জ করার পরও তৎকালীন বড় বড় বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস পায়নি। আর বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগেও কেউ পারে নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না। সুতরাং আল্লাহর ঘোষণা মুতাবেক জাহান্নামের আগুনকে ভয় করে কুরআন যে আল্লাহর বাণী তা মেনে নিয়ে কুরআনের হিদায়েত গ্রহণ করা প্রত্যেকের উচিত।

কুরআনের ফযিলত

ইমাম দারেমী (র.) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে মারফু হাদিস বর্ণনা করেছেন, اَلْقُرْآنُ اَحَبُّ الى اللهِ مَن فِى السَّمواتِ وَالاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ আল্লাহর নিকট

১৩৪৮. সূরা বাকারা, আয়াত; ২৩-২৪
১৩৪৯. সূরা হুদ, আয়াত–১৩
১৩৫০. সূরা ইউসূফ, আয়াত–৩৮
১৩৫১. সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত–৮৮

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এ উভয়ের মধ্যখানে যা আছে সবচেয়ে অধিক প্রিয় হল আল কুরআন।[১৩৫২]

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি– «لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، مَا احْتَرَقَ» যদি কুরআনকে চামড়ায় রেখে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে তা পুড়ে যাবে না।[১৩৫৩]

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ، مَا مَسَّتْهُ النَّارُ কুরআনকে যদি চামড়ায় রাখা হয় তাহলে আগুনে স্পর্শ করতে পারে না।[১৩৫৪]

ইমাম বায়হাকী আল আসমা গ্রন্থে বর্ণনা করেন– فَضْلُ القُران عَلى سَائِرِ الكَلاَمِ كَفَضْلِ اللهِ عَلى سَائِرِ خَلْقِه সমস্ত কালামের উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব সেরূপ যেরূপ সমগ্র সৃষ্টির উপর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব।[১৩৫৫]

এ কথায় বলা যায় যে, আল্লাহ যেমন শ্রেষ্ঠ আল্লাহর কালাম তথা কুরআনও শ্রেষ্ঠ। পবিত্রতা অর্জন করা ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন– إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ، فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ، لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ নিশ্চয় এটা সম্মানিত কুরআন যা আছে এক গোপন কিতাবে, যারা পাক-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবেনা।[১৩৫৬]

হযরত ওমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত আছে, তিনি যখন তাঁর বোনের কাছে কুরআন চাইলেন, বোন বলেছিলেন– এটি পবিত্র গ্রন্থ, পবিত্র হওয়া ব্যতীত এটাকে স্পর্শ করা যাবে না। অতঃপর হযরত ওমর পবিত্রতা অর্জন করে কুরআন নিলেন এবং হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

কুরআন সুপারিশকারী

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– اَلْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، فَمَنْ جَعَلَهُ اَمَامَه قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ কুরআন মাজীদ সুপারিশকারী, সুপারিশ কবুলকৃত, অভিযোগকারী, সত্যায়নকৃত। যে ব্যক্তি তাকে সামনে রাখবে (অনুসরণ করবে) তা তাকে জান্নাতে টেনে নিয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি পিছনে রাখবে (আমল করবেনা) তাকে তা জাহান্নামে ঠেলে নিয়ে যাবে।[১৩৫৭]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন– কুরআন আল্লাহর সাহিত্য। তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর সাহিত্য শিক্ষা কর। নিশ্চয় এ কুরআন আল্লাহর মজবুত রশি.

১৩৫২. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি), আল-ইতকান, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ১৯৩
১৩৫৩. দারেমী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৮৬, হাদিস নং-২০৩০
১৩৫৪. তাবরানী, সূত্র: আল ইতকান, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯৩
১৩৫৫. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.), (৯১১ হি), আল ইতকান, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯৪
১৩৫৬. সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত; ৭৭-৭৯
১৩৫৭. ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (র.) (৩৭৩ হি), তাম্বীহুল গাফেলীন, বৈরুত, পৃষ্ঠা–২৬২

উজ্জ্বল আলো, উপকারী প্রতিকার, যে তা ধারণ করবে তার জন্য তা রক্ষাকবচ, যে তা অনুসরণ করে তার জন্য মুক্তির উপায়। তা বাঁকা হয় না যে, পুনরায় সোজা করতে হবে। বিচ্যুত হয় না যে, অনুশোচনা করতে হবে এর রহস্য শেষ হবে না। অধিক পুনারাবৃত্তির ফলে তা পুরাতন হবেনা। তোমরা তা তিলাওয়াত কর, কেননা প্রতিটি হরফ পাঠের বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদেরকে দশটি নেকী দান করবেন। জেনে রেখো, আমি বলছি না যে, "আলিফ-লাম-মীম" এর জন্য দশটি নেকী বরং 'আলিফ' এর জন্য দশটি, 'লাম' এর জন্য দশটি এবং 'মীম' এর জন্য দশটি নেকী দেয়া হবে।[১৩৫৮]

হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে কুরআন শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং এর ফযিলত সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন– তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এরপর তিনি আমাদেরকে এর ফযিলত বর্ণনা করে বলেন– إِنَّ الْقُرْآنَ يَأْتِي أَهْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْوَجَ مَا يَكُوْنُ إِلَيْهِ নিশ্চয় কুরআন কিয়ামতের দিন পাঠকারীর নিকট এসে উপস্থিত হবে যখন সে তার প্রতি সবচেয়ে বেশী মুখাপেক্ষী থাকবে। সে সুন্দরতম আকৃতিতে আসবে এবং বলবে اَتَعْرِفُنِي তুমি কি আমাকে চিনেছ? সে বলবে– তুমি কে? কুরআন বলবে– আমি সেই যাকে তুমি ভালবাসতে, সম্মান করতে, আমাকে নিয়ে রাত জাগতে আর দিনের সময় আমাকে নিয়ে অতিবাহিত করতে। লোকটি বলবে– তুমি হয়ত কুরআন। অতঃপর সে আল্লাহর নিকট যাবে। তখন তার ডানহাতে রাজত্ব আর বাম হাতে স্থায়িত্বের নির্দেশনামা দেয়া হবে। তার মাথায় রাজমুকুট স্থাপন করা হবে। আর তার পিতা-মাতাকে এমন এমন দু'জোড়া পোশাক পরানো হবে যার মূল্য হবে গোটা দুনিয়া ও তার দ্বিগুণ। তারা বলবে আমাদের জন্য এটি কোথা থেকে এলো? আমাদের আমল তো এ পর্যায়ে পৌঁছেনি। তাদেরকে বলা হবে– তোমাদের সন্তানের কুরআন পাঠের ফযিলত হিসাবে তোমাদেরকে এ পোশাক দান করা হয়েছে।[১৩৫৯]

এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ

▪ হযরত ফাতেমা (রা.)	৩ রমযান	১১ হিজরি
▪ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)	৮ রমযান	৩২/৩৩ হিজরি
▪ হযরত খাদীজা (রা.)	১০ রমযান	
▪ হযরত আলী (রা.)	১৭/২১ রমযান	৪০ হিজরি
▪ নাছির উদ্দিন চেরাগ দেহলভী (র.)	১৭ রমযান	
▪ ইমাম ইবনে মাজাহ (র.)	২২ রমযান	২৭৩ হিজরি

১৩৫৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৩
১৩৫৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৬

শাওয়াল

'শাওয়াল' আরবী মাসসমূহের মধ্যে ১০ম মাস। রমযানের পরে ও যিলকদের পূর্বে এর অবস্থান। মাহে রমযানের সাথে মিলিত হওয়ার কারণে এর ফযিলত বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমনিভাবে সুন্নাতে রাবেতা তথা ফরয নামাযের আগে-পরের সুন্নাত অন্যান্য সুন্নাতের চেয়ে দামী। তাছাড়া এ মাসটি থেকে হজ্বের মাস আরম্ভ হয় বিধায় ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এমাসের প্রথম দিন হলো ঈদের দিন। বান্দা দীর্ঘ একমাস যাবৎ সিয়াম সাধনার পর রোযা ভঙ্গের মাধ্যমে উৎসব বা খুশী উদযাপন করার কারণে এটিকে ঈদুল ফিতর বলা হয়। ঈদের দিন বিশ্ব মুসলিম পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদগাহ গিয়ে ছোট-বড়, ধনী-গরীব, আমীর-ফকির, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ও জাত-বংশের যাবতীয় ভেদাভেদ ভুলে একই কাতারে দাঁড়িয়ে ঈদের নামায পড়ে, একে অন্যের সাথে বুক মিলিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। এতে পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালবাসা, প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক অনুপম দৃষ্টান্ত প্রকাশ পায়।

ঈদের দিনের ফযিলত

মাওয়াজির গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে মাওয়ায়েযে রেজভীয়্যা গ্রন্থে বলা হয়েছে– وَلِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ فِطْرٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ سِتُّونَ أَلْفًا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَعْتَقَ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ مَرَّةً سِتِّينَ أَلْفًا "আল্লাহ তায়ালা পবিত্র মাহে রমযানের প্রতি রাতে ইফতারের সময় ষাট হাজার জাহান্নামীকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। যখন ঈদুল ফিতরের দিন আসে তখন সারা মাসে যে পরিমাণ লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে সে পরিমাণ লোককে ঐ একদিনেই মুক্তিদান করেন। সুতরাং এ হিসাবে কেবল ঈদুল ফিতরের দিন আল্লাহ তায়ালা আঠার লক্ষ্য জাহান্নামীকে মুক্তিদান করেন।[১৩৬০] অনুরূপ হাদিস ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫ হি) লাতায়েফুল মা'আরিফ গ্রন্থের ৩৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে– فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ، يَعْنِي يَوْمُ فِطْرِهِمْ، بَاهَى بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ، فَقَالَ: يَا مَلَائِكَتِي مَا جَزَاءُ أَجِيرٍ وَفَّى عَمَلَهُ؟، قَالُوا: رَبَّنَا جَزَاؤُهُ أَنْ يُوفَى أَجْرَهُ، قَالَ: يَامَلَائِكَتِي عَبِيدِي وَإِمَائِي قَضَوْا فَرِيضَتِي عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَرَجُوا يعُجُّونَ إِلَي بالدُّعَاءِ، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفاعِ مَكَانِي لَأُجِيبَنَّهُمْ، فَيَقُولُ: ارْجِعُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، قَالَ:

১৩৬০. মাওলানা নুর মুহাম্মদ কাদেরী, মাওয়ায়েযে রেজভীয়্যা, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ-২৬৫

فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ ঈদুল ফিতরের দিন যখন আগমন করে তখন আল্লাহ তায়ালা স্বীয় ফেরেশ্‌তাদের সম্মুখে তাঁর বান্দাদের ইবাদতের উপর খুশী হয়ে বলেন, হে ফেরেশ্‌তাগণ! যারা স্বেচ্ছায় দায়িত্ব পালন করে আজ এখানে সমাবেত হয়েছে তাদের কি প্রতিদান হওয়া উচিত? উত্তরে ফেরেশ্‌তাগণ বলবেন, হে আমাদের প্রভু! তাদের পুণ্যময় কাজের সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক দেয়া উচিত। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে ফেরেশ্‌তাগণ! আমার বান্দা বন্দিনীরা আমার বিধান পরিপূর্ণভাবে পালন করেছে। অতঃপর উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করে করে দোয়ার জন্য বের হয়েছে ঈদগাহের দিকে। আমার ইয্যতের শপথ! আমার জালালিয়তের শপথ! আমার উচ্চ মর্যাদার শপথ! আমি অবশ্যই তাদের দোয়া কবুল করব। তারপর তিনি বলবেন, হে লোকসকল! তোমরা ফিরে যাও, আমি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমাদের পাপকে নেকীতে পরিবর্তন করে দিয়েছি। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, লোকেরা ঈদগাহ থেকে নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসবে।[১৩৬১]

ঈদ উদ্‌যাপন

ঈদের দিন সুন্দর ও উত্তম পোশাক পরিধান করা, সুস্বাদু খাবার খাওয়া এবং অনৈসলামিক কার্যকলাপ ও আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠার দ্বারা প্রকৃত ঈদ উদ্‌যাপিত হয়না। বরং ইসলামী ঈদ উদযাপিত হয়- আল্লাহর আনুগত্য, গুনাহ থেকে দূরে থাকা, গুনাহের পরিবর্তে সওয়াব অর্জনের চেষ্টা করা ইত্যাদি কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে। ঈদের দিন হযরত আলী (রা.)'র খেদমতে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। এসময় তিনি আটার ভুসির তৈরী রুটি আহার করছিলেন । আগন্তুক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, আজকে ঈদের দিন, অথচ আপনি ভুসির তৈরী রুটি খাচ্ছেন? উত্তরে তিনি বলেন, আজকে ঈদ তাদের জন্য যাদের রোযা কবুল হয়েছে, যার পরিশ্রম সফল হয়েছে আর যার গুনাহ মাফ হয়েছে। আজকের দিন, আগামী দিন এবং প্রত্যেক দিন আমাদের জন্য ঈদের দিন হবে যেদিন আমরা আল্লাহর নাফরমানী করবোনা।[১৩৬২]

আল্লামা ইবনে নাবাতা (রা.) বলেন, হে মুসলিম ভাইগণ! তোমরা শাওয়াল মাসে রমযান মাসের ন্যায় আমল কর এবং রমযানে কৃত আমলসমূহ আল্লাহর দরবারে প্রত্যাখ্যান হয় কিনা ভয় কর। যেমন হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ঈদের দিন হযরত ওমর (রা.)'র ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে কান্নাকাটি করছেন। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! মানুষ

[১৩৬১]. শেখ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (৭৪০ হি) মিশকাত শরীফ, পৃ-১৮২
[১৩৬২]. আব্দুল কাদের জিলানী (রা.)(৫৬১হি.), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দু, পৃ.৩৭৭

ঈদের খুশী উদযাপন করছে আর আপনি কাঁদছেন? উত্তরে তিনি বলেন, আনন্দিত লোকেরা যদি বুঝত তবে তারা আনন্দিত হতোনা। অতঃপর তিনি আবার কান্না আরম্ভ করলেন এবং বললেন, যদি তারা মকবুল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে খুশী হওয়া উচিত। আর যদি প্রত্যাক্ষীতদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে ক্রন্দন করা উচিত। আমিতো জানিনা যে আমি কি মকবুলদের অন্তর্ভুক্ত না প্রত্যাখ্যিতদের অন্তর্ভুক্ত।[১৩৬৩]

সাদকায়ে ফিতর

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করছে সে, যে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেছে এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে নামায আদায় করে।[১৩৬৪]

হযরত কাতাদাহ ও আতা (র.) বলেন উক্ত আয়াতে تَزَكَّى দ্বারা সাদকায়ে ফিতর উদ্দেশ্য। আর وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى এর ব্যাখ্যায় হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) বলেন, পালনকর্তার নাম স্মরণ অর্থ হলো তাকবীর পাঠ করা আর صَلَّى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামায পড়া।[১৩৬৫] ঈদুল ফিতরের দিন সাদকায়ে ফিতর আদায় করা মুস্তাহাব। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে–

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكوة الفطر طهر للصائم من للغو والرفث وطعمة للمساكين রাসূল ﷺ সাদকায়ে ফিতরকে ওয়াজিব করেছেন। রোযাদারের রোযার ভুল-ত্রুটি মার্জনার জন্য এবং গরীব মিসকীনদের আহারের জন্য।[১৩৬৬] ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (র.) বলেন, রমযানের জন্য সাদকায়ে ফিতর হলো নামাযে সাহু সিজদার ন্যায়। নামাযের ত্রুটি যেমনি সাহু সিজদা দ্বারা পূর্ণ হয় তেমনি রমযানের রোযার মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী ইত্যাদি গুনাহের কারণে যে ত্রুটি হয় তা সাদকায়ে ফিতর দ্বারা পূর্ণ হয়।[১৩৬৭]

দাইলামী খতীব ও ইবনে আসাকের (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, সাদকায়ে ফিতর আদায় না করা পর্যন্ত রোযাদারের রোযা আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী লটকিয়ে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে পৌঁছেনা।

[১৩৬৩]. ইবনে নাবাতা (রা.), খোতবায়ে দোয়াযদাহ মাহী, শাওয়ালের প্রথম খোতবা, পৃ.১৬৮
[১৩৬৪]. সূরা আল আ'লা, আয়াত ১৪-১৫
[১৩৬৫]. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দু, পৃ. ৩৭০-৩৭১
[১৩৬৬]. শেখ ওয়ালীউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ(৭৪০হি), মিশকাত শরীফ, পৃ.১৬০
[১৩৬৭]. আব্দুল কাদের জিলানী (রা.)(৫৬১হি.) গুনিযাতুত তালেবীন, উর্দু, পৃ.৩৭১

মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক প্রত্যেক মুসলিম নারী পুরুষের উপর সাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব।

সাদকায়ে ফিতরের পরিমাণ

গম ও গমের আটা, যব ও যবের আটা এবং খেজুর ও কিসমিস দ্বারা ফিতরা আদায় করা যায়। গম হলে অর্ধ সা (১ কেজি ৭৫০ গ্রাম) এবং যব কিংবা খেজুর হলে এগুলোর মূল্য হিসাব করে দিতে হবে। কিসমিস হলে এক সা' দিতে হবে। দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য দ্রব্য দ্বারা ফিতরা আদায় করা উত্তম। সাধারণ অবস্থায় মূল্য আদায় করা উত্তম।

সাদ্কাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময়

ঈদুল ফিতরের দিন সুবহি সাদিকের পর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় এবং ঐদিন ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করা মুস্তাহাব। তবে এর পূর্বে ও পরে আদায় করলেও আদায় হয়ে যাবে। সুবহে সাদিকের পূর্বে কেউ মারা গেলে তার উপর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবেনা। পক্ষান্তরে সুবহে সাদিকের পর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে কিংবা কেউ মুসলমান হলে তার উপর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। নিজের এবং নিজের নাবালেগ সন্তানদের পক্ষ হতে সাদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। স্ত্রী এবং বালেগ সন্তানগণ নিজেরাই ফিতরা আদায় করবে। তবে স্বামী এবং পিতা তাদের পক্ষ থেকে আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে। এক ব্যক্তির ফিতরা এক মিসকীনকে দেওয়া উত্তম। তবে একাধিক ব্যক্তিকেও দেওয়া যায়। আবার একাধিক ব্যক্তির ফিতরা একজন মিসকীনকে দেওয়া জায়েয।

ঈদুল ফিতরের দিন করণীয় কাজ

ঈদুল ফিতরের দিন নিম্নোক্ত কাজসমূহ সুন্নাত: ১. প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠা, ২. মিসওয়াক করা, ৩. ঈদের নামাযের পূর্বে গোসল করা, ৪. সুগন্ধি ব্যবহার করা, ৫. চোখে সুরমা লাগানো, ৬. পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা, ৭. ফজর নামাযের পর যথাশীঘ্রই ঈদগাহে গমন করা, ৮. সামর্থানুযায়ী উত্তম খাবারের ব্যবস্থা করা ও প্রতিবেশী ইয়াতীম-মিসকীন, গরীব-দুঃখীকে পানাহার করানো, ৯. ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে মিষ্টান্ন গ্রহণ করা, ১০. ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সাদকায়ে ফিতর আদায় করা, ১১. ঈদগাহে একপথে যাওয়া অন্য পথে আসা, ১২. যথাসম্ভব পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া, ১৩.ঈদের নামায মসজিদে আদায় না করে ময়দানে বা ঈদগাহে আদায় করা, ১৪. ঈদগাহে যাবার পথে নিম্নস্বরে তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা।[১৩৬৮] ১৫. চুল, দাড়ি, গোঁফ

[১৩৬৮]. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ.২৫৭

ঠিক করা, ১৬. নখ কাটা, ১৭. আংটি পরিধান করা, ১৮. নামাযে যাবার পূর্বে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খাওয়া।

ঈদের নামাযের নিয়ম

শাওয়াল মাসের ১ তারিখ সূর্য ভালভাবে উদিত হওয়ার পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত ছয় তকবীরের সাথে জামাত সহকারে দুই রাকাত ওয়াজিব নামায আদায় করতে হয়। এ নামাযে আজান ও ইকামতের বিধান নেই। এই নামায ঈদগাহে আদায় করা উত্তম। যাদের উপর জুমা ফরয কেবল তাদের উপরে ঈদের নামায ওয়াজিব। জুমার নামাযে যে সব শর্ত রয়েছে ঈদের নামাযেও সেসব শর্ত রয়েছে তবে পার্থক্য হল জুমার খুৎবা শর্ত কিন্তু ঈদের খুৎবা সুন্নত। জুমার খুৎবা নামাযের পূর্বে আর ঈদের খুৎবা নামাযের পরে।

পূর্ব ঘোষিত নির্ধারিত সময়ে দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে নিয়্যত করে তাকবীরে তাহরিমা আল্লাহু আকবর বলার সাথে সাথে কান পর্যন্ত হাত তুলে নাভির নীচে হাত বাঁধবে। তারপর 'সানা' তথা سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك পাঠ করবে। এরপর ইমাম উচ্চস্বরে পর পর তিনবার আল্লাহু আকবর বলে তাকবীর বলবেন। মুক্তাদীগণও ইমামের অনুসরণ করবে তবে তাকবীর মনে মনে বলবে। প্রথম দুই তাকবীরে হাত ছেড়ে দিবে আর তৃতীয় তাকবীরের পর হাত নাভির নীচে বাঁধবে। এরপর ইমাম উচ্চস্বরে সূরা ফাতিহা ও কিরাত পড়বেন আর মুক্তাদী চুপ থাকবে। অতঃপর রুকু সিজদা যথানিয়মে করে দাঁড়িয়ে ইমাম প্রথমে সূরা ফাতিহা ও কিরাত উচ্চস্বরে পড়ে আল্লাহু আকবর বলে তিনবার তাকবীর বলবেন রুকুতে যাওয়ার পূর্বে। প্রতিবার হাত ছেড়ে দেবে আর চতুর্থ তাকবীরে রুকুতে চলে যাবেন। অন্যান্য নামাযের ন্যায় বাকী কাজ সমাপ্ত করে সালাম ফিরায়ে নামায শেষ করবেন। এরপর মিম্বরে না বসে দাঁড়িয়ে প্রথম খুৎবা শেষে একটু বসে দ্বিতীয় খুৎবা আরম্ভ করবেন।

নিয়ত: نويت ان اصلى لله تعالى ركعتي صلوة العيد الفطر مع ستة تكبيرات واجب الله تعالى اقتديت بهذا الامام متوجها الى جِهَةِ الكعبة الشريفة الله اكبر আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে কিবলামুখী দাঁড়িয়ে ঈদুল ফিতরের দুই রাকাত ওয়াজিব নামায ছয় তাকবীরের সাথে এই ইমামের পেছনে ইকতিদা করে আদায় করার নিয়্যত করছি- আল্লাহু আকবর।

ইমাম সাহেব انا امام لمن حضر ومن يحضر اقتديت بهذا الامام এর স্থলে বলবে। অর্থাৎ বর্তমান যারা উপস্থিত এবং পরে যারা উপস্থিত হয়ে নামাযে শরীক হবে তাদের সকলের ইমামতির নিয়্যত করছি। ঈদুল আযহার নামাযও অনুরূপ। শুধু عيد الفطر এর স্থলে عيد الاضحي বলবে। নিয়ত আরবীতে শুদ্ধ করে উচ্চারণ অক্ষম হলে বাংলায়ও করা যায়।

ছয় রোযা

শাওয়াল মাসে ঈদের দিন ব্যতীত ছয়টি রোযা রাখা সুন্নাত। পরিভাষায় এগুলোকে ছয় রোযা বলা হয়। এগুলি ধারাবাহিকভাবেও রাখা যায় কিংবা বিরতির সাথেও রাখা যায়। এ প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম, ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমী, ইবনে আবি শায়বা ও বায়হাকী (র.) নিজ নিজ গ্রন্থে সিয়াম অধ্যায়ে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা পালনের পর শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখবে সে যেন এক যুগ রোযা রাখল। অর্থাৎ এক যুগ রোযা রাখার সওয়াব পাবে।[১৩৬৯]

শাওয়াল মাসে ছয় রোযা রাখলে পুরো এক বছরের রোযার সওয়াব দেওয়া হয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করবে, তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে। এই সূত্র মতে রমযানে একমাস রোযার সমান হয় তিনশত দিন আর শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযার সমান হয় ষাট দিন। আর তিনশত ষাট দিনে হয় এক বছর। সুতরাং রমযানের রোযার পর শাওয়ালের ছয় রোযা রাখলে মোট এক বছরের রোযার সওয়াব প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত সওবান (রা.) নবী করিম ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, «صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ السِّتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ» রমযানের রোযা দশ মাসের সমান আর ছয় রোযা হলো দু'মাসের সমান। এভাবে এক বছরের রোযা হয়ে যায়।[১৩৭০]

শাওয়াল মাসে রোযা রাখা ফরয নামাযের পর সুন্নাতে রাবেতার ন্যায়। কেননা রমযানের ফরয রোযার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকলে শাওয়াল মাসের নফল ছয় রোযার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করা হবে। কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশ্তাদেরকে বলবেন, আমার বান্দার ফরযের ত্রুটি-বিচ্যুতি নফল দ্বারা পূর্ণ করে দাও। তাছাড়া, রমযান মাসের রোযার পর শাওয়াল মাসে রোযা রাখা রমযান মাসের রোযা কবুল হওয়ার আলামত। কেননা আল্লাহ তায়ালা যখন বান্দার কোন আমল কবুল করেন তখন পরবর্তীতে তাকে আরো নেক আমল করার তাওফীক দান করেন। সুতরাং কোন নেক

১৩৬৯. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫হি.), লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ:৩৫৮

১৩৭০. ইমাম আহমদ (র.) স্বীয় মসনদ, ৫/২৮০, ইমাম নাসাঈ (র.) নাসাঈ শরীফে, ২/১৬২, ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) ইবনে মাজাহ শরীফ ১/৫৪৭, ইমাম দারেমী (র.) দারেমী শরীফ ২/২১, ইমাম ইবনে হিব্বান(র.) সহীহ গ্রন্থে ৫/২৪৮, ইমাম বায়হাকী (র.) বায়হাকী শরীফ ৪/৪৮৩ সুত্র : ইবনে রজব হাম্বলী (র.)(৭৯৫হি.) লাতাফেফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ.৩৬১

আমলের পর অন্য কোন নেকআমল করা প্রথম আমল কবুল হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে কোন নেকআমলের পর যদি সে খারাপ আমল করে তবে পূর্বের আমল প্রত্যাখ্যান হওয়ার আলামত।[১৩৭১] ইমাম শা'বী (র.) বলেন, لَانْ اَصُومَ يَوْمًا بَعْدَ رَمْضَانَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِن اَنْ اَصُوْمَ الدَّهْرِ كُلُّه রমযানের পরে শাওয়াল মাসে একদিন রোযা রাখা আমার নিকট পূর্ণ একযুগ রোযা রাখার চেয়ে বেশী প্রিয়। ইবনে ওমর (রা.) থেকে দুর্বল সূত্রে মারফু হাদিসে বর্ণিত আছে যে– مَنْ صَامَ بَعْدَ الفِطْرِ يَوْمًا فَكَانَّمَا صَامَ السَّنَةِ ঈদুল ফিতরের পর একদিন রোযা রাখা পূর্ণ একবছর রোযার সমান। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে দুর্বল সূত্রে মারফু হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, الصَّائِمِ بَعْدَ رَمْضَانَ كَالكارِّ بَعْدَ الفَارِّ রমযানের পরে রোযাদারের উদাহরণ হলো যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসা ব্যক্তির ন্যায়।[১৩৭২]

পিতা-মাতার হক

পবিত্র ইসলামে সম্মান ও আনুগত্যের দিক দিয়ে পিতা-মাতাকে আল্লাহর পরে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহর হক আদায়ের পর পিতা-মাতার হক আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا আপনার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাঁদের একজন বা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বাধক্যে উপনীত হলে তাঁদেরকে 'উফ' বলোনা এবং তাঁদেরকে ধমক দিবে না, তাঁদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে।[১৩৭৩]

উক্ত আয়াতে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদতের পাশাপাশি পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন– وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো

১৩৭১. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫ হি), লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ-৩৬৩

১৩৭২. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫ হি), লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ-৩৬৩

১৩৭৩. সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-২৩

দু'বছর হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। আর দুনিয়াতে তাঁদের সাথে সদ্ভাবে সহ অবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে।[১৩৭৪]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ নিজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে পিতা-মাতার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সন্তানকে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তারা যদি সন্তানদেরকে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করার নির্দেশ দেন তা কোন অবস্থাতেই মানা যাবেনা বরং তা প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তাঁদের প্রতি বেআদবী ও অশালীনতা প্রদর্শন করা যাবে না। তাঁদের পক্ষ থেকে অন্যায়-যুলুম হলেও তা বরদাশত করে পাশ কাটিয়ে চলতে হবে। মোটকথা হলো দ্বীনের বিরুদ্ধে তাঁদের কথা মানা যাবে না, তবে পার্থিব কাজ-কর্ম যথা শারিরীক সেবা-যত্ন বা ধনসম্পদ ব্যয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কার্পণ্য করা যাবে না। وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন– وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا তোমরা আল্লাহর উপসনা কর আর তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করোনা এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।[১৩৭৫] পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারকে নবী করিম ﷺ আল্লাহর প্রিয় আমলের দ্বিতীয় স্থানে বর্ণনা করেছেন। যেমন হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে– عَنْ ابنِ مَسْعُود قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ: " الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا "، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: " بِرُّ الْوَالِدَيْنِ "، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ " হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি নবী করিম ﷺকে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহর কাছে কোন আমলটি উত্তম? তিনি বলেন, সময় মতো নামায আদায় করা। আমি বললাম এর পর কোনটি? তিনি বলেন, অতঃপর পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা। আমি বললাম, এরপর কোনটি? তিনি বলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।[১৩৭৬]

পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি

[১৩৭৪]. সূরা লোকমান, আয়াত. ১৪-১৫
[১৩৭৫]. সূরা নিসা, আয়াত-৩৬
[১৩৭৬]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৫৮ ও ইমাম নববী (র.) (৬৭৬ হি) রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-১৫৮, লেবনান

বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে।[১৩৭৭]

পিতা-মাতার সেবা ও সন্তুষ্টিতে জান্নাত লাভে ধন্য হয়। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَغِمَ أَنْفُهُ، رَغِمَ أَنْفُهُ، رَغِمَ أَنْفُهُ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبْرِ، أَوْ أَحَدَهُمَا، اَو كلاهما ثم لم يدخل الجنة » হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, ধুলায় অবলুণ্ঠিত হোক তার নাক, ধুলায় অবলুণ্ঠিত হোক তার নাক, ধুলায় অবলুণ্ঠিত হোক তার নাক। জিজ্ঞাসা করা হলো হে আল্লাহর রাসূল! কার নাক? তিনি বললেন, সেই ব্যক্তির যে তার পিতা-মাতার কোন একজনকে অথবা উভয়কে বাধক্য উপনীত অবস্থায় পেয়েছে। অতঃপর তাদের সেবা-যত্ন করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[১৩৭৮]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ: «هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ» হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺকে জিজ্ঞাসা করল যে, সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক কি? উত্তরে তিনি বললেন, তাঁরা তোমার জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম।[১৩৭৯] অর্থাৎ পিতা-মাতার খেদমত করে তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারলে সন্তানের জন্য জান্নাত নিশ্চিত যদি সন্তান মু'মিন হয়। পক্ষান্তরে তাঁদের মনে কষ্ট দিলে কিংবা তাঁরা অসন্তুষ্ট হলে সন্তানের জন্য জাহান্নাম নিশ্চিত। মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত। হাদিস শরীফে আছে–

أَنَّ جَاهِمَةَ، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا» জাহিমা নামক এক ব্যক্তি নবী করিম ﷺএর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেছি এবং আপনার পরামর্শের জন্য আপনার নিকট এসেছি। নবী করিম ﷺ বললেন, তোমার মাতা কি জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ, জীবিত আছেন। তখন তিনি বললেন, তাহলে তুমি তার সেবা কর, কেননা মায়ের পায়ের নিকট হলো জান্নাত।[১৩৮০] হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– «الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ» জান্নাত জননীর পদতলে।[১৩৮১]

[১৩৭৭]. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি), তিরমিযী শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪১৯
[১৩৭৮]. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি), সহীহ মুসলিম শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪১৮
[১৩৭৯]. ইমাম ইবনু মাজাহ (র.) (২৭৩ হি), ইবনে মাজাহ শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪২১
[১৩৮০]. ইমাম আহমদ (র.) (২৪১ হি) ইমাম নাসাঈ (র.) (৩০৩ হি), ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪২১
[১৩৮১]. হাশিয়ায়ে মিশকাত, পৃ-৪২১, হাশিয়া নং-৪

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَصْبَحَ مُطِيعًا فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، وَمَنْ أَمْسَى عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا " قَالَ الرَّجُلُ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ قَالَ: " وَإِنْ ظَلَمَاهُ، وَإِنْ ظَلَمَاهُ، وَإِنْ ظَلَمَاهُ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতার ব্যাপারে আল্লাহর অনুগত হয়, তার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা উম্মুক্ত হবে, আর একজন হলে একটি দরজা উন্মুক্ত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পিতা-মাতার ব্যাপারে আল্লাহর অবাধ্য হয়, তার জন্য জাহান্নামের দু'টি দরজা উম্মুক্ত হবে আর একজন হলে একটি দরজা উম্মুক্ত হবে। একজন সাহাবী আরয করল, পিতা-মাতা যদি সন্তানের উপর যুলুম করে? উত্তরে তিনি বললেন, তাঁরা তার উপর যুলুম করলেও তাদের বাধ্য থাকতে হবে এবং অবাধ্য হলে জাহান্নামে যেতে হবে। কথাটি তিনি তাকীদের উদ্দেশ্যে তিনবার বলেছিলেন।[১৩৮২]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ " فَقَالُوا: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ كَذَلِكُمُ الْبِرُّ، كَذَلِكُمُ الْبِرُّ وَكَان ابرّ الناس بأمّه হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমি বেহেশতে প্রবেশ করলাম এবং তথায় কুরআন পাঠ শুনতে পেলাম। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? ফেরেশ্তাগণ বললেন, হারিসা ইবনে নুমান (রা.) পূণ্যের প্রতিফল এরূপই, পূণ্যের প্রতিফল এরূপই। সে ছিল সকল মানুষের তুলনায় নিজের মায়ের সাথে সর্বাদিক সদাচরণকারী।[১৩৮৩]

পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও তাদের সাথে জাগতিক ব্যাপারে সৌজন্যমূলক আচরণ করা ওয়াজিব। হাদিস শরীফে হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِيهَا» কুরাইশদের সাথে চুক্তিকালীন অর্থাৎ হোদাইবিয়ার সন্ধির সময় আমার মা আমার কাছে মুশরিকা অবস্থায় (মদীনায়) আগমন করলেন। তখন আমি রাসূল ﷺ এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম– হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা আমার কাছে এসেছেন অথচ তিনি ইসলামের প্রতি অনাগ্রহী।

১৩৮২. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি) বায়হাকী শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪২১

১৩৮৩. শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪১৯

এমতাবস্থায় আমি কি তাঁর সাথে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তাঁর সাথে সদাচরণ কর।[১৩৮৪]

পিতা-মাতার আদেশে অবাধ্য স্ত্রীকে তালাক প্রদান বৈধ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ كُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي بِطَلَاقِهَا، فَأَبَيْتُ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ، طَلِّقْهَا» আমার বিবাহ বন্ধনে একজন মহিলা ছিল, যাকে আমি ভালবাসতাম। অথচ (আমার পিতা) হযরত ওমর (রা.) তাকে অপছন্দ করতেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি তাকে তালাক দাও। কিন্তু তা আমি অস্বীকার করলাম। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) রাসূল ﷺ এর নিকট গেলেন এবং ব্যাপারটি তাঁর নিকট বর্ণনা করলেন। রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও।[১৩৮৫]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِيَ امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فحافظ او ضَيِّعْ হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলল, আমার একজন স্ত্রী আছে। আমার মা তাকে তালাক দিতে আদেশ করেন। (এখন আমি কি করব?) তখন হযরত আবু দারদা (রা.) তাকে বললেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, পিতা হলেন বেহেস্তের দরজাসমূহের মধ্যবর্তী (উত্তম) দরজা। যদি চাও তবে দরজাটিকে সংরক্ষণ কর (সন্তুষ্ট কর) অথবা ভেঙ্গে ফেল।[১৩৮৬]

শরয়ী বিধান

পিতা-মাতা যদি পুত্রবধুর মধ্যে দ্বীনের কোন মৌলিক ঘাটতি কিংবা কোন ফরয-ওয়াজিব বিধানের লঙ্ঘন দেখতে পান এবং তাকে বার বার বুঝানোর পরও সে শরয়ী বিধানে ফিরে না আসে, তখন পিতা-মাতার নির্দেশে পুত্র কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক দেওয়া বৈধ। তবে পিতামাতা ব্যক্তিগত কারণে তালাক দিতে বললে তা মানা যাবে না। কারণ পিতা-মাতার আদেশ শরীয়ত সম্মত ব্যাপারে পালনীয় গুনাহের ব্যাপারে পালনীয় নয় বরং বর্জনীয়। যেমন হাদিস শরীফে আছে– لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ সৃষ্টিকর্তার

১৩৮৪. ইমাম বুখারী ও মুসলিম, বুখারী ও মুসলিম শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪১৮

১৩৮৫. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি) ও আবু দাউদ (র.) (২৭৫ হি), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪২১

১৩৮৬. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি) তিরমিযী শরীফ ও ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) (২৭৩ হি) ইবনে মাজাহ শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪১৯

অবাধ্যে কোন সৃষ্টির অনুগত করা যাবে না। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, তাদেরকে গালি দেওয়া কিংবা গালির উপলক্ষ হওয়া এবং তাদের মনে কষ্ট দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম ও কবীরা গুনাহ। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন– فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا তাঁদের মনে ব্যাথা পেয়ে 'উফ' বলার মত আচরণ করিও না এবং তাদেরকে ধমক দিওনা।[১৩৮৭] রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» ثَلَاثًا «الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ – أَوْ قَوْلُ الزُّورِ» আমি কি তোমাদেরকে সর্বোচ্চ গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব, তা হলো আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা মিথ্যা কথা বলা।[১৩৮৮] হযরত মুগীরা (রা.) থেকে বর্ণিত, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقوق الامُهات রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর মায়ের অবাধ্যতাকে হারাম করেছেন।[১৩৮৯]হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ» রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, সন্তান কর্তৃক নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেউ কি নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে কোন ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়, ফলে ঐ লোকও তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে কোন ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, ফলে সেও পাল্টা তার মাকে গালি দেয়।[১৩৯০]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ،وَلا عَاقٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ উপকার করে খোঁটাদানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ও সর্বদা মদ্যপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১৩৯১] হযরত আবু বুকরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «كُلُّ الذُّنُوبِ يَغْفِرُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا شَاءَ، إِلَّا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، يَجْعَلُهُ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ» পিতা-মাতার অবাধ্যতার গুনাহ ব্যতীত পাপ আল্লাহ তায়ালা যতটুকু ইচ্ছা ক্ষমা করেন।

[১৩৮৭]. সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-২৩
[১৩৮৮]. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি) সহীহ মুসলিম, খণ্ড-১, হাদিস নং-১৬৭
[১৩৮৯]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪১৯
[১৩৯০]. ইমাম বুখারী ও মুসলিম, বুখারী ও মুসলিম শরীফ, সূত্র; মিশকাত শরীফ, পৃ-৪১৯
[১৩৯১]. ইমাম নাসাই ও দারেমী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪২০

অধিকন্তু তিনি অবাধ্য ব্যক্তিকে তার জীবদ্দশায় মৃত্যুর পূর্বেই দ্রুত শাস্তি প্রদান করেন।[১৩৯২]

পিতা-মাতার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের দৃষ্টিতে থাকালেও মকবুল হজ্বের সওয়াব প্রাপ্ত হয়। হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً "، قَالُوا: وَإِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؟ قَالَ: " نَعَمْ، اللهُ أَكْبَرُ وَأَطْيَبُ কোন সদাচারী নেক্কার সন্তান অনুগ্রহের দৃষ্টিতে নিজের পিতা-মাতার দিকে তাকালে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি কবুল হজ্বের সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন। সাহাবীগণ আরয করলেন, যদি দৈনিক একশত বার দৃষ্টিপাত করে? (তখনও কি একশত কবুল হজ্বের সওয়াব দিবেন?) তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ অতি মহান ও অতি পবিত্র।[১৩৯৩] হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– النَّظَرُ إِلَى الْوَالِدِ عِبَادَةٌ، وَالنَّظَرُ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ، وَالنَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ، وَالنَّظَرُ إِلَى أَخِيكَ حُبًّا لَهُ فِي اللهِ عِبَادَةٌ পিতার দিকে দেখা ইবাদত, কাবার দিকে দৃষ্টিপাত করা ইবাদত, কুরআনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া ইবাদত এবং নিজের ভাইয়ের দিকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসার নজরে দেখা ইবাদত।[১৩৯৪] পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আরো একটি উত্তমপন্থা হচ্ছে– তাঁদের জীবদ্দশায় ও ইন্তেকালের পর তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদাচরণ করা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা। হযরত আবু উসাইদ সায়েদী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূল ﷺ'র সামনে বসা ছিলাম। এমন সময় বনু সালমা গোত্রের একজন লোক তাঁর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন উপায় আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে, তা হলো– الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا তাদের জন্য দোয়া করা, তাদের মাগফিরাত কামনা করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা, পিতা-মাতার মাধ্যমে স্থাপিত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।[১৩৯৫]

[১৩৯২]. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), শোয়াবুল ঈমান, সূত্র; মিশকাত শরীফ, পৃ-৪২১
[১৩৯৩]. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), শোয়াবুল ঈমান, সূত্র; মিশকাত শরীফ,পৃ-৪২১
[১৩৯৪]. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), শোয়াবুল ঈমান, খণ্ড-১০, পৃ-২৬৭
[১৩৯৫]. ইমাম আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ (র.), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪২০

عَنْ ابن عمر أَنَّ رَجُلا اتى النبى ﷺ فقال يَا رَسُولَ اللَّه، إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَبِرَّهَا "

হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করিম ﷺএর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি জঘন্য পাপ করেছি, আমার জন্য তাওবার কোন সুযোগ আছে কিনা? তিনি বললেন, তোমার কি মা আছে, লোকটি বলল না। তিনি বললেন তোমার কি কোন খালা আছে? সে বলল হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন তবে তুমি তার সাথে সদাচরণ কর।[১৩৯৬] আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা একটি উত্তম নেক আমল। নেক আমলের দ্বারা সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ বলেন– إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ 'নিশ্চয়ই ভাল কাজ পাপকে দূরীভূত করে।' কিন্তু লোকটির বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় পাপটি বড় তথা কবীরা গুনাহ ছিল। কবীরা গুনাহ তাওবা ব্যতীত মাফ হয় না। এক্ষেত্রে বলা হবে, লোকটি সবার সামনে পাপ স্বীকার করা এক প্রকারের তাওবা। এতে তার অনুতপ্ত প্রকাশ পেয়েছে। التوبة هو الندم অনুতপ্ত হওয়াই তাওবা। সুতরাং এর দ্বারা কবীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। অথবা গুনাহটি কবীরা বা বড় গুনাহ ছিলনা কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম ছোট গুনাহকেও বড় গুনাহ মনে করতেন। এটি তাঁদের অধিক তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ। তাই লোকটি এটাকে বড় গুনাহ ভেবেছেন।

পিতা-মাতার খেদমতের উসিলায় বিপদ মুক্ত হয়

হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমাদের পূববর্তী যুগের লোকদের মধ্যে তিনজন লোক একদিন পথ চলছিল। হঠাৎ তাদেরকে বৃষ্টি পেল। যার কারণে তারা এক পর্বত গুহায় আশ্রয় নিল। এসময় হঠাৎ পর্বত হতে একটি বিশাল পাথর তাদের গুহার মুখে পতিত হল এবং পাথরটি তাদের বের হবার পথ বন্ধ করে দিল। তখন তাদের একজন অপরজনকে বলল, তোমরা চিন্তা করে তোমাদের কোন নেক আমল বের কর, যা তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করেছ। সে নেক আমলকে উসীলা করে আল্লাহর কাছে দোয়া কর। হতে পারে তিনি পাথরটি দূর করে দেবেন। তখন তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার অতিবৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন এবং আমার কয়েকজন ছোট বাচ্চা ছিল। আমি তাদের জন্য মেষ চরাতাম। সন্ধ্যায় ফিরে আসার সময় তাদের জন্য দুধ দোহন করে আনতাম। আমার সন্তানদের আগে আমার পিতা-মাতাকে দুধপান করাতাম। ঘটনাক্রমে একদিন চারণবৃক্ষ আমাকে দূরে নিয়ে গেল। (মেষ চরাতে চরাতে অনেক দূরে চলে গেলাম) যার

[১৩৯৬]. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি), জামে তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪২০

কারণে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘরে ফিরতে পারলাম না। বাড়িতে এসে পিতা-মাতাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম। তারপর যেভাবে প্রতিদিন দুধ দোহন করতাম, সেভাবে আজো দুধ দোহন করলাম। দুধের পাত্র নিয়ে তাঁদের মাথার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগানো অপছন্দ করলাম। আর বাচ্চাদেরকেও তাদের আগে দুধপান করানো ভাল মনে করলাম না। অথচ বাচ্চাগুলো ক্ষুধায় আমার দু'পায়ের কাছে কাঁদছিল। এটিই ছিল সারারাত আমার ও তাদের কাজ। অর্থাৎ বাচ্চারা সারা রাত কেঁদেছিল কিন্তু তাদেরকে দুধ দেইনি। এভাবে সকাল হলো। হে আল্লাহ আপনি জানেন যে, একাজটি কেবল আপনার সন্তুষ্টির আশায় করেছি। সুতরাং আমাদের জন্য এতটুকু পাথর সরিয়ে দিন যেন আমরা আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তায়ালা পাথরটি সামান্য সরিয়ে দিলেন, যাতে তারা আকাশ দেখতে পায়।[১৩৯৭] পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করলে সন্তানের আয়ু ও রিযিক বৃদ্ধি পায়। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ اللهُ فِي عُمْرِهِ، فِي رِزْقِهِ، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ যে ব্যক্তি নিজের আয়ু ও রিযিক বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করে।[১৩৯৮]

সদাচরণের জন্য পিতার চেয়ে মাতা অগ্রগণ্য

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: «أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ» আমার সাহচর্যের সর্বাপেক্ষা অধিকারী কে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল এরপর কে? তিনি বললেন তোমার মা। লোকটি বলল তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন তোমার পিতা। অন্য বর্ণনায় আছে– তিনি বললেন, তোমার মা। অতঃপর তোমার মা। অতঃপর তোমার মা। অতঃপর তোমার মা। অতঃপর তোমার পিতা। এরপর তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজন, নিকটতম আত্মীয়-স্বজন।[১৩৯৯]

হাদিসে রাসূল ﷺ গর্ভধারিনী স্নেহময়ী মায়ের কতগুলো বিশেষত্বের কারণে পিতার উপর তাঁর হককে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন– ১. মা কষ্ট করে ১০ মাস যাবৎ গর্ভধারণ করেন। যেমন আল্লাহ বলেন, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا ২. অনেক ঝুঁকি নিয়ে অতীব কষ্ট স্বীকার

[১৩৯৭]. ইমাম বুখারী ও মুসলিম, সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪২০
[১৩৯৮]. ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি), শোয়াবুল ঈমান, খণ্ড-১০, পৃ-২৬৪
[১৩৯৯]. ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.), সূত্র:মিশকাত শরীফ, পৃ: ৪১৮

করে সন্তান প্রসব করেন। আল্লাহ বলেন, وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ৩. দীর্ঘ দু'বছর যাবৎ সন্তানকে দুধপান করান। যেমন আল্লাহ বলেন– وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ৪. লালন-পালনকালে বিভিন্ন অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করেন ও আরাম বর্জন করেন।

পিতা-মাতার জীবদ্দশায় ও ইন্তেকালের পরে তাঁদের জন্য দোয়া করা সন্তানের কর্তব্য এবং এটিও খেদমতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং দোয়া কর -হে পালনকর্তা! তাদের প্রতি দয়া করুন। যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবকালে (দয়ার সাথে) লালন-পালন করেছেন।[১৪০০]

হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فقرا يس غُفِرَلَهُ » যে ব্যক্তি প্রতি জুমার দিন নিজের পিতা-মাতার অথবা যে কোন একজনের কবর যিয়ারত করে এবং সেখানে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[১৪০১] হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত من زار قبر والديه او احدهما احتسابًا كان كان كعدل حجة مبرورة ومن كان زوارًا لهما زارت الملائكة قبره যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা-মাতার কিংবা কোন একজনের কবর যিয়ারত করে সাওয়াবের নিয়্যতে, তাহলে সে একটি মকবূল হজ্জের সাওয়াব প্রাপ্ত হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করে ফেরেশ্তারা তার কবর যিয়ারত করবে।[১৪০২] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)'র সাথে পথে একজন গ্রাম্য ব্যক্তির সাক্ষাত হলো। তিনি তাকে সালাম করলেন এবং যে গাধার উপর তিনি আরোহণ করেছিলেন, তিনি তাকে সেটির উপর আরোহণ করালেন আর নিজের মাথার পাগড়ী খুলে তাকে দিয়ে দিলেন। ইবনে দীনার বলেন- আমি তাকে বললাম, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। ইনি একজন সাধারণ গ্রাম্য লোক। সামান্য কিছুতেই সন্তুষ্ট হয়ে যেতো। তখন হযরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন- ইনি হলেন আমার পিতা ওমর (রা.)'র বন্ধু। আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– «إِنَّ الْبِرَّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ» সর্বোত্তম নেকী হলো কোন সন্তান নিজের পিতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদাচরণ করা।[১৪০৩]

১৪০০. সূরা বনী ইস্রাঈল, আয়াত: ২৪
১৪০১. আল্লামা আলাউদ্দীন আলী মুত্তাকী (রা.)(৯৭৫হি.), কানযুল উম্মাল, খণ্ড. ১৬, পৃ:৪৬৮
১৪০২. আল্লামা আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী (রা.),(৯৭৫হি.), কানযুল উম্মাল, খণ্ড:১৬, পৃ:৪৭৯
১৪০৩. ইমাম মুসলিম (রা.), (২৬১হি.), সহীহ মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ৬৩৯০

মায়ের অসন্তোষের পরিণাম

মায়ের অসন্তুষ্টির কারণে সন্তানের মৃত্যুকালে কালিমা নসীব হয়না। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ'র সময়ে আলকামা নামের এক যুবক ছিল। সে খুবই পরিশ্রমী ও দানশীল ছিল। এক সময় সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং রোগ বেড়ে যায়। তার স্ত্রী নবী করিম ﷺএর নিকট সংবাদ পাঠায় যে আমার স্বামী মুমূর্ষু অবস্থায় আছে। আমি আপনাকে তার সম্পর্কে অবহিত করতে চাইছি। নবী করিম ﷺ হযরত বেলাল, আলী, সালমান ও আম্মার (রা.)কে বললেন যে, তোমরা গিয়ে আলকামার অবস্থা দেখে এসো। তাঁরা গিয়ে তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়তে বললেন। কিন্তু তার বাকশক্তি চললনা। তাঁরা তার নিশ্চিত মৃত্যু হবে জেনে হযরত বেলাল (রা.)কে নবী করিম ﷺ এর নিকট পাঠালেন যুবকের অবস্থা জানাতে। নবী করিম ﷺ জিজ্ঞেসা করলেন যে, তার পিতা–মাতা জীবিত আছে কিনা? লোকেরা বলল, তার পিতা মারা গিয়েছেন তবে তার বৃদ্ধা মা জীবিত আছে। তিনি বললেন, হে বেলাল! যুবকের মায়ের কাছে গিয়ে আমার সালাম বলবে আর তাকে বলবে, আপনি যদি চলতে পারেন তাহলে নবী করিম ﷺএর নিকট চলুন। নইলে এখানে থাকুন। তিনি আপনার এখানে আসবেন। হযরত বেলাল (রা.) গিয়ে এ সংবাদ দিলেন। বৃদ্ধা বললেন, তাঁর জন্য আমার জীবন উৎর্সগ হোক, তাঁর নিকট আমার যাওয়া অধিক সঙ্গত। এই বলে বৃদ্ধা লাঠি নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নবী করিম ﷺ'র নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং সালাম দিলেন। তিনি সালামের উত্তর দিলেন। অতঃপর বৃদ্ধা তাঁর সামনে বসলেন। তিনি বললেন, আপনি আমার সাথে সত্য কথা বলবেন। যদি মিথ্যা বলেন, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার নিকট ওহী আসবে। বলুন, আলকামার অবস্থা কেমন ছিল? বৃদ্ধা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে বেশী নামায পড়ত, রোযা রাখত এবং এত দিরহাম সদকা করত যে, তার ওযন বা সংখ্যা বলা মুশকিল। মহানবী ﷺ বললেন, তার সাথে আপনার সম্পর্ক কিরূপ ছিল? বৃদ্ধা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট ও মনঃক্ষুন্ন ছিলাম। তিনি জানতে চাইলেন, কেন? বৃদ্ধা বললেন, সে আমার উপর তার স্ত্রীকে প্রাধান্য দিত এবং বিভিন্ন বিষয়ে আমার কথা না মেনে স্ত্রীর কথা মানত। নবী করিম ﷺ তখন বললেন, তার মায়ের অসন্তুষ্টিই তার জিহ্বাকে কালিমা পাঠে বাধা দিচ্ছে। তারপর তিনি হযরত বেলাল (রা.)কে বললেন- তুমি গিয়ে বেশ কিছু কাঠ যোগাড় কর। আমি তাকে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলবো। বৃদ্ধা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সন্তান আমার কলিজার টুকরোকে আমার সামনেই আগুনে জ্বালাবেন? আমার মন কিভাবে তা সহ্য করবে? উত্তরে নবী করিম ﷺ বললেন, হে আলকামার মাতা! আল্লাহ তায়ালার আযাব আরো কঠিন ও চিরস্থায়ী। আপনি যদি ভাল মনে করেন যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিন, তাহলে

আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। খোদার শপথ! আপনি যতক্ষণ তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায এবং সদকা তার কোন উপকারে আসবেনা। বৃদ্ধা হাত তুলে দোয়া করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি আসমানে আল্লাহকে এবং আপনাকে ও উপস্থিত সবাইকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি আলকামার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। তখন নবী করিম ﷺ হযরত বেলাল (রা.)কে বললেন, হে বেলাল! তুমি গিয়ে দেখ, আলকামা লাইলাহা ইল্লাল্লাহু বলতে পারছে কিনা? কেননা আলকামার মা নবী ﷺ 'র লজ্জার কারণে হয়তো মনের বিপরীত কথা বলতেছেন। হযরত বেলাল (রা.) গিয়ে দরজার পৌঁছে শুনতে পেলেন আলকামা বলছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। ঘরে প্রবেশ করে তিনি বললেন, হে লোক সকল! আলকামার মায়ের অসন্তুষ্টিই তার জিহ্বাকে কালিমা পাঠে বাধা সৃষ্টি করেছিল। তার সন্তুষ্টিই এখন তার জিহ্বাকে সচল করেছে। ঐ দিনই তার মৃত্যু হয়। নবী করিম ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং তাকে গোসল দিতে ও কাফন পরাতে বললেন। তারপর জানাযার নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন– يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ من فضل زوجته على امه فعليه لعنة الله لا يقبل منه صرف ولاعدل يعنى الفرائض والنوافل হে মুহাজির ও আনসার দল! যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে মায়ের উপর প্রাধান্য দেয়, তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ আর তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত কবুল হবে না।[১৪০৪]

মায়ের বদদোয়া অন্যায়ভাবে হলেও কবুল হয়ে যায়

হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, বনী ইস্রাঈলে জুরাইজ নামক একজন (সাধক) লোক ছিলেন। একদিন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তার মা তাকে ডাকলেন। কিন্তু তিনি তার ডাকে সাড়া দিলেন না। তিনি (মনে মনে) বললেন, আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব নাকি সালাত আদায় করব। তারপর মা তার কাছে এসে বললেন (বদদোয়া হিসাবে) হে আল্লাহ! তুমি তাকে মৃত্যু দিও না যে পর্যন্ত তুমি তাকে কোন বেশ্যার মুখ না দেখাও। (তার দোয়া কবুল হয়েছে) একদিন জুরাইজ তার ইবাদতখানায় ছিলেন। এক মহিলা বলল, আমি জুরাইজকে অবশ্যই ফিতনায় লিপ্ত করব। তখন সে তার নিকট গেল এবং তার সাথে যিনার প্রস্তাব দিল। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর সে মহিলা এক রাখালের নিকট গিয়ে স্বেচ্ছায় নিজেকে তার হাতে সঁপে দিল। এর কিছুদিন পর সে একটি ছেলে প্রসব করল। তখন সে বলে বেড়াত লাগল যে, এ ছেলে জুরাইজের! একথা শুনে লোকেরা জুরাইজের নিকট এলো এবং তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে তাকে বের করে দিল আর তাকে গালি গালাজ

[১৪০৪]. ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দি (র.)(৩৭৩/৭৫হি.), তানবীহুল গাফেলীন, লেবানন, পৃ:৭৭

করল। এরপর তিনি উযূ করলেন এবং সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি নবজাতক শিশুটির কাছে এসে বললেন, হে ছেলে! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল। অমুক রাখাল। তখন লোকেরা বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানাটি স্বর্ণ দিয়ে নির্মাণ করে দিব। জুরাইজ বললেন, না, মাটি দিয়েই নির্মাণ করে দাও। (যেমনটা পূর্বে ছিল)।[১৪০৫]

উপরোক্ত বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত ঘটনায় জুরাইজ নামাযরত থাকার কারণে মায়ের ডাকে সাড়া দেননি। আর মা জানেন না যে, জুরাইজ নামাযরত আছেন। মায়ের ডাকে সাড়া না দেওয়াতে মা ছেলেকে বদ দোয়া দিয়েছেন। নামাযরত অবস্থায় মায়ের ডাকে সাড়া না দেওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। তাছাড়া স্রষ্টার ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে মায়ের ডাকে সাড়া না দেওয়াটা কোন অপরাধ নয়। এতদসত্ত্বেও যখন বদদোয়া মায়ের জবান থেকে বের হয়েছে আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করেছেন। বেশ্যা নারীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে প্রাথমিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন। কিন্তু পরক্ষণে তার বিশেষ কারামত দ্বারা তিনি পূর্বের চেয়েও অধিক পরিমাণ সম্মানিত হয়েছেন। তার ইশারায় সদ্য নবজাতক শিশু স্পষ্ট ভাষায় কথা বলে তাকে মস্ত বড় অপবাদ থেকে মুক্তি দিল।

সুতরাং সব সন্তানকে সর্বদা পিতা-মাতার নাফরমানি, অসন্তুষ্টি ও বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কারণ পিতা-মাতার বদদোয়া ন্যায়-অন্যায়, হক-নাহক ও সত্য-মিথ্যা যাচাই করে না। তাই এইক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

তাফসীরে কাশশাফের প্রণেতা আল্লামা জারুল্লাহ যমখশরী মায়ের বদদোয়ায় লেংড়া হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন- একদিন আমি ছোটবেলায় একটি পাখি নিয়ে খেলা করতে গিয়ে পাখিটির পা ভেঙ্গে গেল। আমার মা যখন পাখিটির পা ভাঙ্গা দেখলেন তখন বললেন, যে এই পাখিটির পা ভাঙল আল্লাহ তায়ালা যেন তার পা ভেঙে দেন। এরপর এক দুর্ঘটনায় তার পা ভেঙে গিয়েছিল।

প্রতিবেশীর হক

নিজের বাসস্থানের নিকটে অবস্থানকৃত লোকদেরকে প্রতিবেশী বলে। বাড়ীর চতুর্দিকের ৪০ বাড়ি হলো প্রতিবেশী। ইমাম যুহরী (র.) বলেন- কারো চারপাশে ৪০ গজের মধ্যে যারা আছে তারা হলো প্রতিবেশী। প্রতিবেশীরা আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে অধিক কাজে আসে। প্রতিবেশীরাই বিপদে-আপদে, দুঃখ-দুর্দশায় প্রথমে এগিয়ে আসে। বিয়ে-শাদীসহ বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে প্রতিবেশীর ভূমিকা থাকে উল্লেখযোগ্য। পবিত্র কুরআনে পিতা-মাতার সাথে প্রতিবেশীর হকের কথাও বলা হয়েছে। আল্লাহ

[১৪০৫]. ইমাম বুখারী (র) সহীহ বুখারী শরীফ, পারা ৯, পৃ. ৩৩৭, হাদিস নং ২৩২০।

তায়ালা বলেন– وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্রতিবেশীর সাথে সদয় ব্যবহার কর।[১৪০৬]

ইমাম বায্যার (র.) হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ বলেছেন, প্রতিবেশী তিন প্রকার। যথা- ১.অনাত্মীয় অমুসলিম প্রতিবেশী। এদের হক মাত্র একটি প্রতিবেশী হিসাবে। ২. অনাত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী। এদের হক দু'টি। একটি প্রতিবেশী হিসেবে অপরটি মুসলিম হিসেবে। ৩.আত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী। এদের হক হল তিনটি। একটি আত্মীয়তার, দ্বিতীয়টি মুসলিম হিসেবে, তৃতীয়টি প্রতিবেশী হওয়ার জন্য। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবেশী অমুসলিম হলেও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া ঈমানের পরিপন্থী কাজ। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يوذ جاره যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। (মিশকাত)

হযরত আয়েশা ও ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন– «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ জিব্রাইল (আ.) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এত বেশী তাকীদ দিতেন, মনে হয়েছিল তিনি তাদেরকে আমার ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন।[১৪০৭]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– «وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قيل من يا رسول الله قَالَ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে সে ব্যক্তি? উত্তরে তিনি বলেন- যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারেনা। [১৪০৮] প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদের মঙ্গল কামনা করা, তাদের কোন প্রকার কষ্ট-যন্ত্রণা না দেওয়া , তাদের উপকার করা, গরীব প্রতিবেশীকে দান করা এবং ক্ষুধার্ত প্রতিবেশীকে খাবার দেওয়া প্রত্যেক ঈমানদারের ঈমানী দায়িত্ব। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– لَيْسَ الْمُؤمن بالذى يشبع وجاره جائع الى جنبه ঐ ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার নয়, যে তৃপ্তিসহকারে খাবার খায় অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশে অভুক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে।[১৪০৯]

[১৪০৬]. সূরা নিসা, আয়াত, ৩৬
[১৪০৭]. বুখারী ও মুসলিম), সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪২২
[১৪০৮]. বূখারী ও মুসলিম, সুত্র: মিশাকাত শরীফ, পৃ:৪২২
[১৪০৯]. ইমাম বায়হাকী (র.), (৪৫৮হি.), শোয়াইব ঈমান, সূত্র :মিশকাত শরীফ, পৃ:৪২৫

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» সে ব্যক্তি প্রথম দফায় বেহেস্তে প্রবেশ করবেনা, যার প্রতিবেশী তার ক্ষতিসমূহ থেকে নিরাপদ নয়। [১৪১০]

যে ব্যক্তি মানুষের নিকট উত্তম প্রতিবেশী, সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটও উত্তম প্রতিবেশী। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– «خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ» আল্লাহর নিকট সেই প্রতিবেশীই উত্তম, যে নিজের প্রতিবেশীর কাছে উত্তম।[১৪১১]

প্রতিবেশীই হলো মানুষের ভাল-মন্দের বিচারক। হাদিস শরীফে আছে- এক ব্যক্তি নবী করিম ﷺকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ أَوْ إِذَا أَسَأْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ: قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ» আমি কিভাবে জানবো যে, আমি ভাল কাজ করলাম না মন্দ করলাম? উত্তরে তিনি বললেন, যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীগণকে বলতে শুনবে যে, তুমি ভাল কাজ করেছ, তাহলে তুমি বুঝবে নিশ্চয় তুমি ভালকাজ করেছ। আর যখন তুমি তাদেরকে বলতে শুনবে যে, তুমি মন্দ কাজ করেছ, তাহলে বুঝবে যে, নিশ্চয় তুমি মন্দ কাজ করেছ।[১৪১২]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে যে, সে খুব বেশী বেশী নামায পড়ে, খুব বেশী বেশী রোযা রাখে এবং প্রচুর পরিমাণ সাদকা করে কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। নবী করিম ﷺ বললেন, هِيَ فِى النَّار সে জাহান্নামে যাবে। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলা সর্ম্পকে জনশ্রুতি আছে যে, সে রোযা কম রাখে, সাদকা কম দেয় এবং নামায কম পড়ে। অবশ্য দু'এক টুকরো পনির সাদকা করে। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়না। নবী করিম ﷺ বললেন, هِيَ فِى الجَنة সে বেহেশতে যাবে।[১৪১৩]

[১৪১০]. ইমাম মুসলিম (র.), (২৬১হি.), সহীহ মুসলিম শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ: ৪২২
[১৪১১]. তিরমিযী ও দারেমী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ:৪২৪
[১৪১২]. ইমাম ইবনে মাজাহ (র.), (২৭৩হি.), ইবনে মাজাহ শরীফ, সুত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ:৪২৪
[১৪১৩]. ইমাম আহমদ (র.), (২৪১হি.),স্বীয় মসনদে ও ইমাম বায়হাকী (র.), (৪৫৮ হি.), শোয়াবুল ঈমান, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ:৪২৪

হাদিয়া আদান-প্রদান করলে মানুষের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়। তাই প্রতিবেশীর সাথে আন্তরিকতা ও ভালোবাসা সৃষ্টি কিংবা বৃদ্ধির জন্যে নবী করিম ﷺ প্রতিবেশীকে হাদিয়া প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন– «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ» যখন তুমি তরকারী রান্না করবে তাতে কিছু ঝোল বেশী দেবে, আর তোমার প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিবে।[১৪১৪] নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ، وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ، وَلَا يُؤْذِ جَارَهُ» কেউ যদি পছন্দ করে যে , আল্লাহ এবং রাসূল তাকে ভাল বাসবে, তাহলে সে যেন সত্য কথা বলে, আমানত আদায় করে এবং নিজের প্রতিবেশীকে যেন কষ্ট না দেয়।[১৪১৫]

প্রতিবেশীকে সম্মান করা নৈতিক কর্তব্য। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে এবং মেহমানকে সম্মান করে।[১৪১৬]

কোন প্রতিবেশীকে এবং প্রতিবেশীর কোন উপঢৌকনকে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয় বরং প্রতিবেশীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সাদরে গ্রহণ করা উচিত। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ বলতেন, «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» হে মুসলিম রমণীগণ! কোন প্রতিবেশী নারী যেন তার অপর প্রতিবেশী নারীকে (তার হাদিয়া ফেরত দিয়ে) হেয় প্রতিপন্ন না করে। যদিও তা বকরীর পায়ের ক্ষুর হোক না কেন।[১৪১৭]

আত্মীয়ের হক

পৃথিবীর মানুষ জন্মসূত্রে ও বৈবাহিক সূত্রে পরস্পর আত্মীয়। আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতার পরে আত্মীয়ের সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন- وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى আর তোমরা উপসনা কর আল্লাহর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করোনা। পিতা-মাতার সাথে এবং নিকট আত্মীয়ের সাথে সদাচরণ কর।[১৪১৮]

[১৪১৪]. ইমাম মুসলিম (র.), (২৬১হি.), সহীহ মুসলিম, সুত্র: শোয়াবুল ঈমান, খণ্ড: ১২, পৃ: ৯০
[১৪১৫]. ইমাম বায়হাকী (র.), (৪৫৮হি.), শোয়াবুল ঈমান, খণ্ড: ১২, পৃ: ৯৯
[১৪১৬]. ইমাম বুখারী (র.), (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড: ২, পৃ: ৮৮৯ , হাদিস নং: ৫৫৯৪
[১৪১৭]. ইমাম বুখারী (র.), (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড: ২, পৃ: ৮৮৯, হাদিস নং:৫৫৯২
[১৪১৮]. সূরা নিসা, আয়াত; ৩৬

অন্যত্র বলেছেন– وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ আত্মীয়দের হক আদায় কর।[১৪১৯]

আল্লাহ আরো বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى আল্লাহ তায়ালা ন্যায়, ইহসান এবং আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন।[১৪২০]

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আত্মীয়ের হক আদায় করা, সামর্থনুযায়ী তাদের কায়িক ও আর্থিকভাবে সেবা-যত্ন করা এবং তাদের খোঁজ-খবর নেয়া আবশ্যক করে দেয়া হয়েছে।

বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত আছে, আত্মীয় স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহারের দ্বারা হায়াত ও রিযিক বৃদ্ধি পায়। যেমন- হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি তার রিযিক প্রশস্ত ও আয়ু বৃদ্ধি হওয়াকে ভালবাসে, সে যেন নিজের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে।[১৪২১]

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، مَنْسَأَةٌ فِي الأَثَرِ তোমরা কমপক্ষে এতটুকু পর্যন্ত তোমাদের বংশ পরিচয় জেনে নাও, যা দ্বারা তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে পার। কেননা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন দ্বারা আপনজনদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হয়, সম্পদ বৃদ্ধি হয় এবং আয়ু বৃদ্ধি হয়।[১৪২২] ইসলাম হচ্ছে মানবতা ও সম্প্রীতির ধর্ম। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার জন্যে আত্মীয়তা রক্ষা করার জোর তাগীদ দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি বলেন, أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ হে আত্মীয়তা! যে তোমার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবো আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো।[১৪২৩] আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী নিজেও আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয় আর তার কারণে অন্যরাও বঞ্চিত হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা.) থেকে বণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি– «لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ

[১৪১৯]. সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ২৬
[১৪২০]. সূরা নাহল, আয়াত, ৯০
[১৪২১]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪১৯
[১৪২২]. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪২০
[১৪২৩]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪১৯

«قَاطِعُ رَحِمٍ» আল্লাহর রহমত সে সম্প্রদায়ের উপর অবতীর্ণ হয়না, যাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী রয়েছে।[১৪২৪]

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি পরকালের জন্য জমা থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতেও অতি দ্রুত এর শাস্তি ভোগ করতে হয়। আবু বুকরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ، وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ» বিদ্রোহ করা এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা এতবড় পাপ যে, আল্লাহ পাপীকে পৃথিবীতে দ্রুত শাস্তি দেবেন এবং পরকালের জন্যও শাস্তি বরাদ্দ করে রাখবেন।[১৪২৫]

আত্মীয়তা ছিন্নকারীর উপর আল্লাহর অভিশাপ। আল্লাহ তায়ালা বলেন- فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে ও আত্মীয়তা ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ অভিশাপ করেন। অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করে দেন। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা কবীরা গুনাহ। যার কারণে মু'মিন প্রথমেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। বরং এই গুনাহের কারণে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাত লাভ করবে। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– لَا تَدْخل الجَنَّة قَاطع আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী প্রথম দফায় জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা।[১৪২৬] মসনদে আহমদ গ্রন্থে নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ» صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» মিসকীনদের দান করলে কেবল সাদকার সাওয়াব পাওয়া যায় কিন্তু রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়কে দান করলে দু'টি সাওয়াব পাওয়া যায়। একটি হলো সাদকার সাওয়াব অপরটি হলো সেলাহ রেহমী তথা সম্পর্ক বজায় রাখার সাওয়াব।[১৪২৭]

স্বামী -স্ত্রীর অধিকার

স্বামী- স্ত্রী হলো একে অপরের পরিপূরক। স্বামীর যেমন স্ত্রীর প্রয়োজন হয় অনুরূপ স্ত্রীরও স্বামীর প্রয়োজন হয়। সুখের সংসার করতে হলে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালবাসা

[১৪২৪]. ইমাম বায়হাকী (রা.), শোয়াবুল ঈমান, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ:৪২০
[১৪২৫]. তিরমিযী ও আবু দাউদ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ:৪২০
[১৪২৬]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ:৪১৯
[১৪২৭]. আল্লামা ইবনে কাসীর (রা.), (৭৭৪হি.), তাফসীরে ইবনে কাসীর

প্রয়োজন। উভয়ের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে এবং পরস্পরের উপর যে কর্তব্য ও অধিকার তা যথাযথভাবে পালন করতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে– وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ নারীদের তেমনি ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন রয়েছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষের মর্যাদা (একটু বেশী) রয়েছে।[১৪২৮] এ আয়াতে নারীর অধিকারের কথা পুরুষের পূর্বে বলা হয়েছে। কারণ সভাবত: নারীরা দূর্বল ও কোমল প্রকৃতির হয়ে থাকে। পুরুষ থেকে জোর করে অধিকার আদায়ে তারা অক্ষম । তাই তাদের অধিকার আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করার উদ্দেশ্যে তাদের অধিকারের বিষয়টির পূর্বে আনা হয়েছে। কিন্তু পরের অংশ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ দ্বারা পুরুষের অধিকার ও ক্ষমতা নারীর চেয়ে বেশী হওয়ার প্রতি দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যেহেতু নারীদের যাবতীয় ভরণ–পোষণের দায়িত্ব পুরুষের উপর এবং পুরুষেই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করে থাকে আর নবুয়ত, ইমামত ও খেলাফতের দায়িত্ব তাদের উপরই অর্পণ করা হয়েছে তাই তাদেরকে নারীদের উপর কতৃত্বও প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন– الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।[১৪২৯]

আল্লাহ আরো বলেন, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ জনকের কর্তব্য হলো যথাবিধি তাদের (স্ত্রীদের) ভরণ–পোষণ করা,[১৪৩০] অন্যত্র বলেছেন, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ বিত্তবান নিজ সামর্থানুযায়ী ব্যয় করবে আর যার রিযিক সীমিত, সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে।[১৪৩১]

এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যাপারে স্ত্রীর অবস্থা ধর্তব্য হবেনা বরং স্বামীর আর্থিক সংগতি অনুযায়ী ভরণ–পোষণ দেয়া ওয়াজিব। স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার এত বেশী যে, নবী করিম ﷺ বলেছেন, لَوْ كُنْتُ آمِرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا আমি যদি কাউকে সিজদা করার হুকুম করতাম, তাহলে স্ত্রীদের তাদের স্বামীকে সিজদা করতে আদেশ দিতাম।[১৪৩২] হযরত উম্মে সালমা

[১৪২৮]. সূরা বাকারা, আয়াত:২২৮
[১৪২৯]. সূরা নিসা, আয়াত, ৩৪
[১৪৩০]. সূরা বাকারা, আয়াত, ২৩৩
[১৪৩১]. সূরা তালাক, আয়াত, ৭
[১৪৩২]. ইমাম তিরমিযী(রা.), (২৭৯হি.), তিরমিযী শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ: ২৮১

(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ» কোন মহিলা মৃত্যুবরণ করার সময় তার উপর যদি তার স্বামী সন্তুষ্ট থাকে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৪৩৩]

হযরত তালাক ইবনে আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ যখন স্বামী তার স্ত্রীকে ডাকবে, তখন তার ডাকে সারা দেওয়া আবশ্যক। যদিও সে চুলায় কাজ করতে থাকে।[১৪৩৪]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» স্বামী যখন স্ত্রীকে শয্যা গ্রহণের আহবান করে তখন সে যদি কোন শরয়ী ওযর ব্যতীত সাড়া না দেয়, তবে সকাল হওয়া পযর্ন্ত ফেরেশ্তারা তার উপর অভিশাপ করে।[১৪৩৫]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করিম ﷺ'র কাছে জিজ্ঞেস করেছে- কোন মহিলা উত্তম? তিনি বললেল– «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ» সেই নারী যার প্রতি স্বামী দৃষ্টিপাত করলে, সে খুশী করে দেয়, আদেশ করলে পালন করে, নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করেনা এবং স্বামীর মতের বিরুদ্ধে তার সম্পদ খরচ করেনা।[১৪৩৬] হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ» কোন মহিলা যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযানের রোযা পালন করে এবং নিজের সতীত্ব রক্ষা করে ও স্বামীর কথা মান্য করে, তবে সে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে যেটা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে। অর্থ্যাৎ তার জন্য জান্নাতের সব দরজা উন্মুক্ত থাকবে।[১৪৩৭]

হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, বনী ইস্রাঈলের এক যুবক সন্তান অসুস্থ হলে তার মা মানত করল যে, যদি আল্লাহ তায়ালা আমার সন্তানকে সুস্থ করে দেন তাহলে আমি সাত দিনের জন্যে পৃথিবী থেকে চলে যাবো। ফলে আল্লাহ তায়ালা যুবককে

[১৪৩৩]. ইমাম তিরমিযী (রা.), (২৭৯ হি.), তিরমিযী শরীফ, সূত্র:মিশকাত শরীফ, পৃ:২৮১
[১৪৩৪]. ইমাম তিরমিযী (রা.), (২৭৯ হি.), তিরমিযী শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ: ২৮১
[১৪৩৫]. বুখারী ও মুসলিম শরীফ, সূত্র:মিশকাত শরীফ, পৃ:২৮০
[১৪৩৬]. ইমাম নাসারী ও বায়হাকী (রা.), নাসাঈ শরীফ ও শোয়াবুল ঈমান, সূত্র:মিশকাত শরীফ, পৃ:২৮৩
[১৪৩৭]. আবু নঈম ইস্পাহানী (রা.), (৪৩০ হি.) হুলিয়া শরীফ, সূত্র:মিশকাত শরীফ, পৃ:২৮১

সুস্থ করে দেন। তখন মা একটি কবর খনন করে সাতদিনের জন্য কবরে চলে যায়। মহিলা যখন কবরে প্রবেশ করল সে সেখানে একটি দরজা দেখতে পেল যা দিয়ে একটি বাগানে প্রবেশ করা যায়। মহিলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করে বাগানে গিয়ে দু'জন মহিলাকে দেখতে পেল। তাদের একজনকে পাখি স্বীয় ডানা দিয়ে পাখা করছে আরেকজনের মাথায় একটি পাখি বসে মাথায় আঘাত করে করে মগজ চুষে খাচ্ছে। ঐ মহিলা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে প্রথমজন বলল, আমি যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম তখন আমার স্বামী আমার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। এর বরকতে এই পাখিটি আমাকে ডানা দিয়ে বাতাস করছে। আর দ্বিতীয়জন বলল, মৃত্যুর সময় আমার স্বামী আমার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। ফলে আমার উপর এই আযাব হচ্ছে। সে বলল, আপনি আমার স্বামীকে গিয়ে আমাকে ক্ষমা করে দিতে বলবেন। অতঃপর সাতদিন পর যখন মহিলার ছেলে তাকে কবর থেকে বের করল, তখন ঐ মহিলার স্বামীর নিকট গিয়ে তার স্ত্রীর উপর আযাবের ঘটনা বলল এবং ক্ষমা চাওয়ার কথাও বলল। তখন স্বামী স্ত্রীকে ক্ষমা করে দিলেন। তারপর এই মহিলা কবরস্থ আযাবে লিপ্ত মহিলাকে স্বপ্নে দেখল যে, স্বামী ক্ষমা করে দেওয়ায় তার আযার রহিত হয়ে গেল। আর এজন্য মহিলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।[১৪৩৮]

স্বামীর অনুমতি ছাড়া কিংবা তার অসম্মতিতে স্ত্রী ঘরের বাইরে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। হাদিস শরীফে আছে– اذا خرجت المراة من بيتها وزَوجها كاره لعنها كل ملك فى السماء وكل شئ مرّت عليه غير الجن والانس حتى ترجع যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীর অসম্মতি সত্ত্বেও ঘর থেকে বের হয়ে যায় তখন আসমানে ফেরেশ্তারা তাকে অভিশাপ দেয় এবং ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত সে যে সব বস্তুর উপর দিয়ে গমন করবে জ্বিন ও ইনসান ব্যতীত সকলেই তাকে লানত করে।[১৪৩৯]

স্বামীর খেদমত করা, তাকে সন্তুষ্ট রাখা, স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য। স্বামীর খিদমত স্ত্রীর জন্য নফল নামায ও নফল রোযার চেয়ে উত্তম। নবী করিম ﷺ বলেছেন– لا تصوم امراة الا باذن زوجها কোন স্ত্রী যেন তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা না রাখে।[১৪৪০]

হযরত জারিব (রা.) বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয়না এবং তাদের নেকী আকাশের দিকে উঠেনা। ১. পলাতক ক্রীতদাস যতক্ষণ না সে

[১৪৩৮]. আব্দুর রহমান সফূরী (রা.), (৮৯৪ হি.), নুযহাতুল মাজালীস, পৃ:৫, সূত্র:মাওয়ায়েযে রেজজীয়্যাহ, খণ্ড:২য়, পৃ:১৫০
[১৪৩৯]. আল্লামা শা'রানী (রা.), কাশফুল গুম্মাহ, পৃ:৮১, সূত্র: মাওয়াযে রেজভীয়্যাহ, খণ্ড:২য়, পৃ;১৪৭
[১৪৪০]. আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ, সূত্র:মিশকাত শরীফ, পৃ:২৮২

তার মালিকের কাছে ফিরে আসে ও তার হাতে ধরা দেয় ২. সে স্ত্রী যার উপর তার স্বামী অসন্তুষ্ট, যতক্ষণ না সে তাকে সন্তুষ্ট করে। ৩.মাতাল যতক্ষণ না তার হুঁশ আসে[১৪৪১]

স্ত্রীর উপর ফরয হলো স্বীয় স্বামীর অনুগত হওয়া, স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার ধনসম্পদ রক্ষনাবেক্ষণ করা এবং স্বামীর মান-মর্যাদা রক্ষা করা। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ সৎ স্ত্রীরা স্বামীর অনুগত হয় এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে (তার সম্পদ ও সম্মান) সংরক্ষণ করে যেভাবে আল্লাহ সংরক্ষণের আদেশ দিয়েছেন।[১৪৪২] ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। তার অধিবাসীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক। কারণ তারা কুফরী করে। জিজ্ঞাসা করা হলো, তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে? তিনি বললেন, তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং ইহসান অস্বীকার করে। তুমি যদি দীর্ঘকাল তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে থাক, এরপর তোমার সামান্য অবহেলা দেখলেই বলে, আমি তোমার কাছ থেকে কল্যাণময় কিছুই পাইনি।[১৪৪৩] হযরত তামীমদারী (রা.) নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، أَنْ لا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ ، وَأَنْ تَبَرَّ قَسَمَهُ ، وَأَنْ تُطِيعَ أَمْرَهُ ، وَأَنْ لا تَخْرُجَ إِلا بِإِذْنِه ، وَأَنْ لا تُدْخِلَ عَلَيْهِ مَنْ يَكْرَهُ স্ত্রীর উপর স্বামীর হক হলো স্ত্রী স্বামীর বিছানা ছাড়বেনা , স্বামীর শপথ পূর্ণ করবে, তার আদেশ পালন করবে, তার অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে বের হবেনা এবং স্বামীর অপছন্দের কাউকে ঘরে প্রবেশ করতে দিবেনা।[১৪৪৪]

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার হলো স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করা, ভরণ-পোষণ দেয়া, তাদের ছোট খাট দোষ–ত্রুটির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।[১৪৪৫]

[১৪৪১]. বায়হাকী, শুআবুল ঈমান সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ:২৮৩, হাদিস নং ৩১১৮
[১৪৪২]. সূরা নিসা, আয়াত: ৩৪
[১৪৪৩]. ইমাম বুখারী (রা.), (২৫৬ হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড:১ম, পৃ:৯, হাদিস নং:২৮
[১৪৪৪]. তাবরানী, সূত্র: হাফিয নুরুদ্দিন আলী ইবনে আবু বকর (রা.), (৮০৭ হি.), মাজমাউস যাওয়ায়েদ, খণ্ড: ৫, পৃ:৩০৭
[১৪৪৫]. সূরা নিসা, আয়াত, ১৯

হযরত হাকিম ইবনে মুয়াবিয়া স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন– أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحْ وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ এক ব্যক্তি নবী করিম ﷺকে জিজ্ঞাসা করল স্বামীর উপর স্ত্রীর হক কি? তিনি বললেন, যখন স্বামী খাবে স্ত্রীকেও খাওয়াবে, যখন সে নিজে কাপড় পরিধান করবে, তখন স্ত্রীকেও পরিধান করাবে। স্ত্রীর চেহারায় প্রহার করবেনা, তার দোষ বর্ণনা কববেনা এবং একান্ত প্রয়োজন হলে ঘরের ভিতরেই পৃথক রাখবে।[১৪৪৬] হযরত জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– أَلا عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الأَمَةِ ، أَلا خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِه তোমাদেরর মধ্যে কোন এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে দাসীর ন্যায় প্রহার করবে। শোন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে নিজের স্ত্রীর কাছে উত্তম।[১৪৪৭] হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ মু'মিনদের মধ্যে ঐসব লোকের ঈমান পরিপূর্ণ হবে, যাদের চরিত্র উত্তম হবে এবং যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করে।[১৪৪৮]

সতী সাধ্বী স্ত্রীর গুণাবলি

একজন স্ত্রী যদি নেককার, পরহেজগার ও আমানতদার হয় বিশেষত; সচ্চরিত্রবান হয়, তাহলে পুরো পরিবার শান্তির নীড়ে পরিণত হয়। কোমলতা, নম্রতা, অনুগত, শান্ত-শিষ্ট ও হাসি মুখের অধিকারী হওয়া নারী জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এসব গুণাবলির মধ্যেই নারী সৃষ্টির রহস্য নিহিত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন– الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের মর্যাদা দান করেন। পুরুষের কর্তৃত্ব এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। আর নেককার স্ত্রীগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা সংরক্ষণ যোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তা সংরক্ষণ করে।[১৪৪৯] হাদিস শরীফে রাসূল ﷺ

[১৪৪৬]. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে মাজাহ (র.) (২৭৩ হি) সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ-১৩৩
[১৪৪৭]. বায্যার, সূত্র: হাফিয নুরুদ্দীন হায়সামী (র.) (৮০৭ হি), মাজমাউস যাওয়ায়েদ, খণ্ড-৪, পৃ-২০৩
[১৪৪৮]. ইমাম আহমদ (র.) মসনদে আহমদ, সূত্র: হাফিয নুরুদ্দীন হায়সামী (র.) (৮০৭ হি), মাজমাউস যাওয়ায়েদ, খণ্ড-৪, পৃ-৩০৩
[১৪৪৯]. সূরা নিসা, আয়াত-৩৪

এরশাদ করেন– لَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ পার্থিব নেয়ামত সমূহের মধ্যে নেককার স্ত্রীর চেয়ে উত্তম কিছুই নেই। [১৪৫০]

অন্য বর্ণনায় আছে– خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ দুনিয়ার সর্বোত্তম নিয়ামত তথা উপকৃত বস্তু হল সতী সাধ্বী স্ত্রী। [১৪৫১]

আল্লাহর হকের পরে স্বামীর হকই স্ত্রীদের উপর অধিক গুরুত্বপূর্ণ। স্বামীর সন্তুষ্টিতেই স্ত্রীর কল্যাণ নিহিত। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, বনী আসহাল গোত্রের হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি নবী করিম ﷺএর দরবারে আগমন করেন। তখন রাসূল ﷺ সাহাবীগণের মাঝে অবস্থান করছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক, আমি সমগ্র নারী জাতির প্রতিনিধি হয়ে এসেছি। আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল মহিলারা শুনবে যে, আমি আপনার কাছ থেকে বের হয়ে এসেছি অথবা শুনবে না। নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। আমরা আপনার ও আপনার ইলাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা নারী সম্প্রদায় আবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ, আপনাদের ঘরে অবস্থানকারী। আপনাদের চাহিদা পূরণকারিনী ও আপনাদের সন্তানের গর্ভধারিনী। আর আপনাদের পুরুষ দলকে জুমা, জামাত, রোগীর সেবা, জানাযায় উপস্থিত ও হজ্জের ক্ষেত্রে আমাদের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আর সর্বোত্তম হজ্জ্ব হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আপনাদের কেউ হজ্ব, ওমরা ও জিহাদে বের হলে আমরা আপনাদের সম্পদ সংরক্ষণ করি। আপনাদের কাপড় তৈরি করি ও আপনাদের সন্তানদের লালন-পালন করি। আমরা কি এসব আমলের সাওয়াব ও উত্তম কাজে আপনাদের সাথে শরীক হবো? নবী করিম ﷺ সাহাবীদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বলেন, কোন নারী কি তার দ্বীন সম্পর্কে এ নারীর চেয়ে উত্তম প্রশ্ন করেছে? উত্তরে তাঁরা বললেন, আমরা ভাবিনি কোন নারী এরূপ হেদায়ত গ্রহণ করেন। নবী করিম ﷺ তাঁর প্রতি মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে নারী! তুমি বুঝ এবং তোমার পশ্চাতে থাকা নারীদের জানিয়ে দাও, স্বামীর জন্য স্ত্রীর অনুরোক্তি, তার সন্তুষ্টি কামনা করা এবং তার সিদ্ধান্তের অনুসরণ করা ঐ সব নেক আমলের সাওয়াবের সমান। তারপর মহিলাটি খুশীতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও তাকবীর বলতে বলতে চলে গেল।

[১৪৫০]. ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) (২৭৩ হি) ইবনে মাজাহ শরীফ, সূত্র: সফীনায়ে নূহ, পৃ-২৩৪
[১৪৫১]. ইমাম নাসাঈ (র) (৩০৩ হি.), নাসাঈ শরীফ, সূত্র: সফীনায়ে নূহ, পৃ. ২৩৪

এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ

▪ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.)	১ শাওয়াল	২৫৬ হিজরি
▪ হযরত ওসমান হারুনী (র.)	৬ শাওয়াল	৬১৭ হিজরি
▪ মুফতি আমীমুল ইহসান (র.)	১০ শাওয়াল	১৯৭৬ ঈসায়ি
▪ বাদশাহ আলমগীর আওরঙ্গজেব (র.)	১২ শাওয়াল	
▪ ইমাম আবু দাউদ (র.)	১৬ শাওয়াল	২৭৫ হিজরি
▪ মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.)	শাওয়াল	১১০ হিজরি

যিলকদ

'যিলকদ' মাস হলো আশহুরুল হুরুম তথা সম্মানিত চার মাসের অন্যতম মাস। সম্মানিত মাস হলো চারটি, তন্মধ্যে একটি রজব যা পৃথক। বাকী তিনটি হলো ধারাবাহিক। আর তা হলো যিলকদ, যিলহজ ও মহররম। আবার যিলকদ মাস হলো হজ্বের মাস। হজ্বের মাস হলো তিনটি। যথা: শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্ব। যিলকদ মাসকে জাহেলী যুগেও সম্মান করা হতো। কেননা এ মাসে হাজীগণ হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হতেন। এ সময় সম্মানিত মাস হওয়ার কারণে শত্রুর আক্রমণের ভয় থেকে নিরাপদে যাতায়াত করতে পারতো। আর যিলকদ শব্দের অর্থ হলো উপবেষ্টনকারী। এ মাসকে এ নামে নামকরণের কারণ হলো এ মাসে জাহেলী যুগেও লোকেরা যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বসে (বিরত) থাকত। যিলহজ্ব মাসকে হজ্বের কারণে, মহররম মাসকে হজ্ব থেকে ফেরার কারণে আর রজব মাসকে উমরার কারণে সম্মানিত মাসের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।[১৪৫২]

যিলকদ মাসের বৈশিষ্ট্য

নবী করিম ﷺ সমস্ত উমরা যিলকদ মাসে সম্পাদন করেছিলেন। শুধু বিদায় হজ্বের সময় হজ্বের সাথে যে উমরা করেছিলেন তা ব্যতীত। তবে এর ইহরামও বেঁধেছিলেন যিলকদ মাসে। ইবনে ওমর ও আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যিলকদ ও শাওয়াল মাসের উমরা রমযান মাসের উমরার চেয়ে উত্তম। কেননা, নবী করিম ﷺ যিলকদ মাসে উমরা করেছিলেন।[১৪৫৩] এই মাসের ফযিলত সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ.) থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন ত্রিশ রাতের এবং তা পূর্ণ করেছেন আরো দশ দিনের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন– وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ আমি মুসা থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম ত্রিশ রাতের আর তা পূর্ণ করেছি আরো দশ দিনের মাধ্যমে।[১৪৫৪] এখানে ত্রিশ রাত বা দিন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যিলকদ মাসের ত্রিশ দিন আর দশ দিন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশদিন।[১৪৫৫]এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ.)কে তাওরাত কিতাব প্রদানের জন্য শর্তারোপ করলেন যে, ত্রিশ রাত্রি তুর পর্বতে এ'তেকাফ থেকে আল্লাহর আরাধনায় অতিবাহিত করতে হবে। তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে যে, মুসা

[১৪৫২]. ইবনে রজব হাম্বলী (র.), (৭৯৫ হি.), লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ-৪২৪
[১৪৫৩]. ইবনে রজব হাম্বলী (র.), (৭৯৫ হি.),লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ-৪২৫
[১৪৫৪]. সূরা আ'রাফ, আয়াত-১৪২
[১৪৫৫]. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৭ হি.), লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ-৪২৫

(আ.) এই ত্রিশ দিন এ'তেকাফের সাথে রোযা রেখেছিলেন। মাঝে তিনি কোন ইফতার করেননি। ত্রিশ রোযার পর মিসওয়াক করে তিনি তূর পর্বতের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে হাযির হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হলো– রোযাদারের মুখ থেকে যে সুগন্ধি বের হয় তা আল্লাহর কাছে অতি পছন্দনীয়, কিন্তু তুমি তা মিসওয়াক করে দূর করে দিয়েছ। কাজেই আরো দশদিন রোযা রেখে মুখের সে বিশেষ সুগন্ধি সৃষ্টি করে এসো। অতএব তিনি আরো দশদিন রোযা রেখে মোট চল্লিশ দিন পূর্ণ করে তূর পর্বতের নিদ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে তাওরাত কিতাব লাভ করেন।

চল্লিশ এর গুরুত্ব

চল্লিশ সংখ্যাটির গুরুত্ব অনেক। আল্লাহর কাছে চল্লিশ সংখ্যাটি খুবই পছন্দনীয়। চল্লিশ দিনে হযরত আদম (আ.)'র খামীর তৈরী হয়েছিল। চল্লিশ দিনে হযরত মুসা (আ.) তাওরাত লাভ করেছিলেন, চল্লিশ বছরে অধিকাংশ নবীগণের নবুয়াত প্রকাশিত হয়েছিল। চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাতৃগর্ভে বীর্য অবস্থান করে, অতঃপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত রক্তবিন্দু থাকে, আরো চল্লিশ দিন পর মাংসের টুকরাতে পরিণত হয়। সন্তান প্রসবের চল্লিশ দিন পর মহিলাদের ঋতুস্রাব হয় এবং চল্লিশ বছর বয়সে মানুষের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়। যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন যাবৎ আন্তরিকতার সহিত ইবাদতে মশগুল থাকবে আল্লাহ তায়ালা তার যবানের মাধ্যমে হেকমতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, চল্লিশ সংখ্যায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তাই সুফিয়ায়ে কিরামগণ চল্লিশ দিনের চিল্লা করেন। যে ব্যক্তি লাগাতার চল্লিশ দিন নামায পড়ে ইনশাল্লাহ সে স্থায়ী নামাযী হয়ে যাবে।[১৪৫৬]

তাক্ওয়ার সংজ্ঞা

'তাক্ওয়া' শব্দটি আরবী ভাষায় বেঁচে থাকা ও বিরত থাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া ভয় করা অর্থেও ব্যবহার হয়। কারণ যেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা বা বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভয় করারই বিষয় এবং তাতে খোদায়ী শাস্তিরও ভয় থাকে। আল মু'জামুল ওয়াসীত অভিধানে تقوى শব্দের আভিধানিক অর্থ বলা হয়েছে خشيته وامتثال او الخوف والخشية অর্থাৎ ভয়-ভীতি। আল্লাহর প্রতি তাকওয়া মানে হলো امره واجتناب نواهيه আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর নির্দেশ পালন করা এবং তাঁর নিষেধকৃত বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে বা বিরত থাকা।[১৪৫৭] ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (র.) তাকওয়ার

[১৪৫৬]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.)(১৩৯১ হি.),তাফসীরে নঈমী, খণ্ড-১ম, পৃ-৩৬৪
[১৪৫৭]. আল মু'জামুল ওয়াসীত, আরবী অভিধান, পৃ-১০৫২

পারিভাষিক অর্থ বর্ণনায় বলেন– **وصار التقوى فى تعارف حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور ويتم ذالك بترك بعض المباحات** শরীয়তের পরিভাষায় নিজকে গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখা বা বেঁচে থাকাকে তাকওয়া বলা হয়। আর তা অর্জিত হয় নিষিদ্ধ বস্তু পরিত্যাগের মাধ্যমে এবং তা পূর্ণতা লাভ করে কিছু বৈধ কাজ পরিহারের মাধ্যমে। [১৪৫৮]

মুফতি আমীমুল ইহসান (র.) বলেন– **التقوى هو الاحتراز بطاعة الله عن عُقُوبَتِه** আল্লাহর আনুগত্যের দ্বারা তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা।[১৪৫৯]

আল্লামা সৈয়্যদ শরীফ জুরজানী (র.) বলেন– **هو الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته وهو صيانة النفس عما يستحق به العقوبة من فعل أو ترك** আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া। আর তা অর্জিত হয় কোন কাজ করা বা পরিহারের দ্বারা শাস্তির উপযোগী হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।[১৪৬০]

আল্লামা নাছির উদ্দিন বায়যাভী (র.) বলেন– **وهو فى عرف الشرع اسم لمن يقى نفسه عما يضره فى الاخرة** শরীয়তের পরিভাষায় মুত্তাকী বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি পরকালের যাবতীয় ক্ষতিকারক বস্তু থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখেন।[১৪৬১] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যারা ঈমানের সহিত শিরক ও কবীরা গুনাহ হতে বিরত থাকেন এবং আল্লাহর বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করেন তারাই মুত্তাকী। হযরত হাসান বসরী (র.)'র মতে যারা হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকেন এবং ফরয কাজসমূহ পালন করেন তারাই মুত্তাকী।

অতএব উপরোক্ত সংজ্ঞা ও বিজ্ঞজনদের ভাষ্যানুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, যাবতীয় অন্যায়, নিষিদ্ধ, গর্হিত এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থেকে খোদাভীতি অন্তরে ধারণ করে আল্লাহর আনুগত্য করাকে তাকওয়া বলে।

তাক্ওয়ার স্তর

সুফীয়ায়ে কিরামগণ তাক্ওয়াকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। প্রথম স্তর হলো কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। এ অর্থে প্রত্যেক মুসলমানকেই মুত্তাকী বলা যায় যদিও মাঝে মধ্যে গুনাহে লিপ্ত হয়। আর ইহা তাকওয়ার সর্বনিম্ন স্তর। দ্বিতীয় স্তর হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ'র অপছন্দনীয় যাবতীয় বিষয় থেকে বেঁচে থাকা। ইহা বিশেষ

[১৪৫৮]. ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (র.), মুফরাদুল লুগাত, আরবী , পৃ-৫৩০
[১৪৫৯]. মুফতি আমীমূল ইহসান (র.)(১৯৭৮ খ্রি.), কাওয়ায়েদুল ফিকহ, পৃ-২৩৪
[১৪৬০]. আল্লামা সৈয়দ শরীফ জুরজানী (র.), কিতাবুত তা'রীফাত, পৃ-৬৫
[১৪৬১]. আল্লামা নাছির উদ্দিন বায়যাভী (র.), তাফসীরে বায়াযাভী

মু'মিনদের তাক্ওয়া। কুরআন ও হাদিসে যে সব তাকওয়ার ফযিলত ও কল্যাণ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা এ পর্যায়ের তাকওয়ার উপর ভিত্তি করেই হয়েছে। তৃতীয় স্তরের তাক্ওয়া হলো অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা দ্বারা পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধি রাখা। একমাত্র আম্বীয়া ও আউলিয়ায়ে কিরামগণই এ ধরণের তাকওয়া অর্জন করতে সক্ষম হন। আর ইহাই তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। পবিত্র কুরআনের আয়াত يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ "হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে যেভাবে ভয় করা উচিত সেভাবে ভয় করতে থাকে।"[১৪৬২] দ্বারা এ পর্যায়ের তাকওয়া বলা হয়েছে। তাকওয়ার স্তর সম্পর্কে তাফসীরে জালালাইন শরীফের প্রান্ত টীকায় বলা হয়েছে **التقوي على ثلاثة اقسام احدها تقوى العوام وهى اتقاء الكفر بالايمان وثانيها الخواص وهى امتثال الاوامر واجتناب النواهى وثالثها تقوى اخص الخواص وهى اتقاء ما يشغل عن الله** তাক্ওয়া হলো তিন প্রকার। প্রথম প্রকারের তাকওয়া হলো সাধারণত মুসলমানদের জন্য। আর তা হলো ঈমানের সহিত কুফরী থেকে বেঁচে থাকা। দ্বিতীয় প্রকারের তাক্ওয়া হলো বিশেষ মুসলমানদের জন্য। আর তা হলো সকল আদিষ্ট বিষয় পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা। তৃতীয় প্রকারের তাকওয়া হলো "আখাসসুল খাওয়য়াস" বিশিষ্ট ও বিশেষ তথা সর্বোচ্চ পর্যায়ের মু'মিনগণের জন্য। আর তা হলো-আল্লাহ বিমুখ যাবতীয় কার্যাবলী থেকে বিরত থাকা।[১৪৬৩]

তাক্ওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

তাক্ওয়া অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর প্রতি বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। আর আল্লাহর নির্দেশ পালন করা ফরয। যেমন আল্লাহ বলেন– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। যেভাবে ভয় করা উচিত।[১৪৬৪] অন্যত্র বলেন– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর ওসীলা বা নৈকট্য অন্বেষণ কর।[১৪৬৫]

তিনি আরো বলেন– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। আরো এরশাদ করেন– يَا أَيُّهَا

[১৪৬২]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০২
[১৪৬৩]. তাফসীরে জালালাইন, পৃ-৪, হাশিয়া বা টীকা নং-২৩
[১৪৬৪]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১২০
[১৪৬৫]. সূরা মায়িদা, আয়াত-৩৫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا সঠিক ও সত্য কথা বল।[১৪৬৬] অন্য আয়াতে বলেছেন, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রেখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।[১৪৬৭]

নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- যদি তোমরা নামায পড়তে পড়তে ধনুকের ন্যায় বাঁকা হয়ে যাও এবং রোযা রাখতে রাখতে তারের মত চিকন ও দুর্বল হয়ে যাও তবুও তাকওয়া ব্যতীত এত প্রচুর ইবাদত কোন কাজে আসবেনা।[১৪৬৮]

হযরত হাসান বসরী (র.) একদিন মক্কা শরীফে গেলেন। সেখানে হযরত আলী (রা.)'র আওলাদগণের মধ্যে একজন সাহেবজাদা লোকদেরকে নসীহত করতে দেখে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন- দ্বীনের স্তম্ভ বা দ্বীন রক্ষাকারী বস্তু কী? উত্তরে তিনি বলেন- তাকওয়া। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন দ্বীন ধ্বংসকারী বস্তু কী? উত্তরে বলেন- লোভ।[১৪৬৯]

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন- বিন্দু পরিমাণ তাকওয়া পরহেযগারী সহস্র নফল রোযা ও নফল নামায থেকে উত্তম।[১৪৭০] পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তোমরা যা কর , আল্লাহ তা অবহিত।[১৪৭১]

তাক্ওয়া মানব চরিত্রের অন্যতম সম্পদ। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাক্ওয়া। তাই তাক্ওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

তাক্ওয়া মর্যাদার মাপকাঠি

স্রষ্টার সামনে সৃষ্টির, মালিকের সামনে গোলামের কোন মূল্য নেই বটে, কিন্তু তাকওয়া এমন এক গুণ যা দ্বারা বান্দা আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়। আল্লাহ বলেন– إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে-ই সবচেয়ে সম্মানী যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুত্তাকী।[১৪৭২]

[১৪৬৬]. সূরা আহযাব, আয়াত-৭০
[১৪৬৭]. সূরা বাকারা, আয়াত-১৯৪
[১৪৬৮]. আব্দুল কাদের জিলানী (র.)(৫৬১হি.) গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃ-২৪৯
[১৪৬৯]. প্রাগুক্ত, পৃ-২৪৮
[১৪৭০]. প্রাগুক্ত, পৃ–২৪৮
[১৪৭১]. সূরা হাশর, আয়াত–১৮
[১৪৭২]. সূরা হুজরাত, আয়াত-১৩

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- দুনিয়ার মানুষের কাছে ইজ্জত হচ্ছে ধন-সম্পদের নাম, আর আল্লাহর কাছে ইজ্জত হচ্ছে তাকওয়া-পরহযগারীর নাম। হযরত বেলাল হাবশী (রা.) একজন কৃষ্ণবর্ণ কৃতদাস হওয়া সত্বেও মক্কা বিজয়ের দিন বাইতুল্লাহর ছাদে উঠে আযান দেওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন তাকওয়া ও রাসূল ﷺ'র প্রতি নিখুঁত ভালবাসা পোষণ করার কারণে। শুধু এতটুকু নয় বরং তাঁর পদচারণের জুতার শব্দ শুনেছেন নবী করিম ﷺ মি'রাজের রাতে। যার আযান না শুনলে আরশ আ'যমের ফেরেশ্তাদের সকাল হতনা। আর আল্লাহর নিকট যে মর্যাদাবান হয়ে যায়, সমগ্র সৃষ্টির কাছেও সে মর্যাদাবান হয়ে যায়। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– من سرّه ان يكون اكرم الناس فليتق الله যে ব্যক্তি মানুষের নিকট অধিক সম্মানিত হতে চায়, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে অর্থ্যাৎ খোদাভীতি অর্জন করে। হযরত বিশর হাফী (র.) আল্লাহকে এতবেশী ভয় করতেন যে, আল্লাহ প্রদত্ত বিছানা তথা মাটির উপর জুতা পরে হাঁটতেন না। ফলে জীব-জন্তু পর্যন্ত তাকে এমন সম্মান এবং ভয় করত যে, তাঁর চরণযুগল অপবিত্র হবে বলে তাঁর চলার পথে মল-মূত্র ত্যাগ করতনা। মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) তাফসীরে কবীরের উদ্বৃতি দিয়ে বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মানুষের কাছে সম্মানিত হতে চায়, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং তাকওয়া-পরহেযগারী অর্জন করে।[১৪৭৩] হযরত আলী আত্তার (র.) বলেন, আমি একদিন বসরার একটি গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে কয়েকজন বয়স্ক বুযুর্গলোক বসে আছেন। তাতে পাশে বালকরা খেলা করছে। আমি বালকদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম- এ সব বুযুর্গ ব্যক্তিদের সামনে খেলা করতে তোমাদের লজ্জা হয়না? তাদের মধ্যে একজন বালক বলল, যেহেতু ঐ বুযুর্গদের মধ্যে তাকওয়া কমে গিয়েছে বিধায় তাদের প্রতি ভয়ও কমে গিয়েছে।[১৪৭৪]

তাকওয়া সাফল্যের চাবিকাঠি

তাকওয়া দুনিয়া-আখিরাতের সাফল্যের চাবিকাঠি ও গ্যারান্টি। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ হে বুদ্ধিমানগণ! আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও।[১৪৭৫]

যারা তাকওয়া অর্জন করেছে এবং সংশোধন হয়েছে তাদের কোন ভয় নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন– وَاتَّقُوا اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর জেনে রেখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।[১৪৭৬]

[১৪৭৩]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.)(১৩৯১ হি.), তাফসীরে নঈমী, খণ্ড-১, পৃ-১০৯
[১৪৭৪]. আব্দুল কাদের জিলানী (র.)(৫৬১ হি.), গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃ-২৫০
[১৪৭৫]. সূরা মায়িদা, আয়াত-১০০
[১৪৭৬]. সূরা বাকারা, আয়াত-১৯৪

অপর আয়াতে বলেছেন– إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।[১৪৭৭]

অন্য আয়াতে বলেছেন– إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ যালিমরা একে অপরের বন্ধু, আর আল্লাহ হলেন মুত্তাকীদের বন্ধু।[১৪৭৮] পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তাকে বিপদাপদ থেকে নিস্কৃতি দেবেন এবং তাকে ধারণাতীতভাবে রিযিক দান করবেন। [১৪৭৯]

অতএব মুত্তাকীদের কোন ভয় নেই, তাদের সাথে আল্লাহ আছেন। আল্লাহ তাদের বন্ধু, তিনি তাদের বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করেন এবং তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেন- ইহাই তো সফলতা।

তাক্ওয়া জান্নাত পাওয়ার উপায়

কুরআন মাজীদে আরো বলা হয়েছে إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ، فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ নিশ্চয় মুত্তাকীরা (কিয়ামত দিবসে) নিরাপদ স্থানে থাকবে- উদ্যানরাজি ও নির্ঝরণীসমূহে থাকবে।[১৪৮০]

আরো বলা হয়েছে إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ নিশ্চয় মুত্তাকীরা জান্নাতে ও এর নির্ঝরণীতে থাকবে।[১৪৮১]

আরো বলা হয়েছে إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ، فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও নেয়ামতে, তারা উপভোগ করবে, যা তাদের পালনকর্তা তাদের দেবেন এবং তিনি জাহান্নামের আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন।[১৪৮২] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌছবে তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে-

[১৪৭৭]. সূরা তাওবা, আয়াত -৪
[১৪৭৮]. সূরা জাসিয়া, আয়াত-১৯
[১৪৭৯]. সূরা তালাক, আয়াত-২ও ৩
[১৪৮০]. সূরা দুখান, আয়াত- ৫১ও ৫২
[১৪৮১]. সূরা কামর, আয়াত, ৫৪
[১৪৮২]. সূরা তুর, আয়াত-১৭ ও ১৮

তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক। অতঃপর সর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।[১৪৮৩] আল্লাহ আরো বলেন– وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার প্রশস্ত হচ্ছে আসমান ও জমিন সমান, যা তৈরী করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।[১৪৮৪] তিনি আরো বলেন– قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ বলুন আমি কি তোমাদেরকে এ সবের চেয়ে উত্তম বিষয়ের সন্ধান দেবো? যারা মুত্তাকী তাদের জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গীনীগণ এবং থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি।[১৪৮৫]

আল্লাহর নিয়ামত ও দানের মধ্যে সর্বোত্তম দান হলো তাঁর সন্তুষ্টি। এ কারণে সুফিয়ায়ে কিরামগণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জান্নাত কিংবা জান্নাতের বিভিন্ন প্রকারের নিয়ামত নয় বরং তাদের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি যা সবকিছুর মূল। যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেছে দুনিয়া-আখিরাতের যাবতীয় নিয়ামত ও সফলতা তার পদচুম্বন করবে। আর এ সন্তুষ্টি অর্জিত হয় তাকওয়া দ্বারা। আল্লাহ মুত্তাকীদের সর্ম্পকে আরো বলেন– لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ কিন্তু যারা নিজেদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তাতে আল্লাহর পক্ষ হতে সবর্দা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের জন্য একান্তই উত্তম।

তাক্ওয়া মাগফিরাতের উপায়

পবিত্র কুরআনে কারীমে আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া অর্জনকারী মুত্তাকীদের জন্য মাগফিরাত ও ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।[১৪৮৬]

[১৪৮৩]. সূরা যুমার, আয়াত-৭৩
[১৪৮৪]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৩৩
[১৪৮৫]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৫
[১৪৮৬]. সূরা আনফাল, আয়াত-২৯

অন্য আয়াতে বলেছেন– وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পাপসমূহ মোচন করেন এবং তার পুরস্কার বাড়িয়ে দেন।[১৪৮৭]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাকওয়ার মধ্যে নিম্নোক্ত কল্যাণসমূহ বিদ্যমান। ১. ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় বিপদাপদ থেকে মুক্তিলাভ। ২. কল্পনাতীত রিযিক প্রাপ্ত হওয়া। ৩. সব কাজ সহজ হওয়া ৪.ক্ষমা ও পাপ মোচন ৫.বাড়তি পুরষ্কার লাভ, ৬. সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার যোগ্যতা অর্জন, ৭.নির্ভিক হওয়া, ৮.আল্লাহ সাথে থাকা। ৯. আল্লাহর বন্ধু হওয়া, ১০.আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা, ১১. স্রষ্টা ও সৃষ্টির নিকট মর্যাদাবান হওয়া, ১২. জান্নাত ও জান্নাতের যাবতীয় নিয়ামতের অধিকারী হওয়া ও ১৩. সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

তাক্ওয়া অর্জনের উপায়

পবিত্র কুরআনে যে সব জায়গায় তাকওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা শুধু মু'মিনদেরকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কেননা, তাকওয়ার জন্য ঈমান পূর্বশর্ত। ঈমানবিহীন তাকওয়া বস্তুত তাকওয়াই নয় বরং ভণ্ডামী। ঈমানের সাথে সগীরা ও কবীরাসহ যাবতীয় গুনাহ থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন সম্ভব। কারণ অন্তরের গুনাহই সমস্ত গুনাহের মূল। যেমন- রিয়া, নিফাক, অহংকার, লোভ, অন্যের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ, ক্রোধ ইত্যাদি। নফসের চাহিদার বিরুদ্ধে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর সোর্পদ করার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করে এ সব গুনাহ থেকে বিরত থাকার শক্তি অর্জিত হয়। গাউছে পাক (র.) বলেন- মানুষ নিম্নোক্ত দশটি বস্তুকে যতক্ষণ পর্যন্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত তার পরিপূর্ণ তাকওয়া অর্জিত হবেনা। ১. যবান তথা জিহ্বাকে গীবত থেকে বিরত রাখা, ২. কারো প্রতি মন্দ ধারণা থেকে বিরত থাকা, ৩. ঠাট্টা-বিদ্রোপ পরিত্যাগ করা, ৪. নাজায়েয বস্তু থেকে চক্ষু বন্ধ রাখা, ৫. সত্য কথা বলা, ৬.আল্লাহর ইহসান ও দয়া স্বীকার করা, ৭. আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা, ৮. পার্থিব জীবনে উন্নতি কামনা না করা, ৯. সময়মতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা এবং ১০. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর অটল থাকা।[১৪৮৮]

তাক্ওয়া ও মুত্তাকীর আলামত

তাক্ওয়া ও মুত্তাকীর কতিপয় আলামত ওলামায়ে কিরাম ও সুফিয়ায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত আছে ইমাম মালিক (র.) বলেন, ওহাব ইবনে কায়হান আমাকে বলেছেন যে, মদীনায় জনৈক ফকীহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)'র নিকট লিখেছেন যে,

[১৪৮৭]. সূরা তালাক, আয়াত-৫
[১৪৮৮]. আব্দুল কাদের জিলানী (র.)(৫৬১ হি.), গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃ-২৫৪

তাকওয়ার কতিপয় আলামত আছে, যা দ্বারা তাদেরকে চেনা যায়। যেমন- মুসিবতে ধৈর্য্য ধারণ করা, আল্লাহর হুকুমে সন্তুষ্ট থাকা, নিয়ামত প্রাপ্ত হয়ে শোকর করা, আল্লাহর আহকাম যথাযথভাবে পালন করা এবং তাঁর অনুগত হওয়া।[১৪৮৯]

কেউ কেউ বলেন- মানুষের তাকওয়া তিনটি বস্তু দ্বারা চেনা যায়। ১. যে বস্তু সে পাবেনা এবং ঐ বস্তু পর্যন্ত পৌছতেও পারবেনা এর উপর তাওয়াক্কুল করা, ২. যে বস্তু পেয়ে গেছে তার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং ৩. যে বস্তু চলে গিয়েছে বা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে তার উপর সবর করা।[১৪৯০]

তবে তাক্ওয়ার সব চেয়ে বড় আলামত হলো গুনাহের উপর কায়েম না থাকা। যারা মুত্তাকী তাদের থেকে ভুলক্রমে কোন গুনাহ সংঘটিত হলে তাওবা না করা পর্যন্ত তাদের অন্তর শান্তি হয়না। যেমন সাহাবায়ে কিরাম কোন গুনাহ করলে সাথে সাথে রাসূল ﷺ'র দরবারে গিয়ে অকপটে অপরাধ স্বীকার করে তাওবা করে নিস্পাপ হয়ে যেতো। তাদের কাছে লোকে কি বলবে- এই ভয়ের চেয়ে খোদার ভয় তথা তাকওয়া বেশী ছিল। তাই খোদাভীতিই হলো তাকওয়ার উজ্জ্বল আলামত। মোদ্দাকথা হলো সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়, হাসি-কান্নায়, দিনে-রাতে, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে, জীবনে-মরণে সর্বাবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজেকে আল্লাহর কাছে সোর্পদ করাই হলো তাকওয়ার আলামত।

তাক্ওয়ার উপমা

মুত্তাকী পরহেযগার আলিম ও সুফী-সাধকগণ থেকে তাকওয়ার যে সব বাস্তব চিত্র প্রকাশিত হয়েছে তা সাধারণ মানুষের জন্য দূর্লভ হলেও অন্তত সামান্যতমও নিজের জীবনে বাস্তবায়ন ও প্রতিফলন করার মানসে তাকওয়ার কয়েকটি উপমা পেশ করতে প্রয়াস পাচ্ছি। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে সীরিন (র.) চল্লিশ পাত্র ঘি ক্রয় করেছেন। তাঁর খাদেম একটি পাত্র থেকে মৃত ইঁদুর বের করেছে। কিন্তু কোন পাত্র থেকে বের করেছে তা নিশ্চিত না হওয়ায় সমস্ত ঘি সহ পাত্র ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেন ।[১৪৯১]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি সিরিয়ায় হাদিস লিখতে গিয়ে তার কলম ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি কোন এক ব্যক্তি থেকে একটি কলম ধার নিলেন। কিন্তু কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর কলম ফেরত দিতে ভুলে যান এবং সিরিয়া থেকে মরু পৌঁছে দেখেন কলম তার কাছে রয়ে গেছে। তিনি শুধু একটি কলম ফেরত দেওয়ার জন্য পুনরায় মরু থেকে সিরিয়া গিয়ে তা ফেরত দেন।[১৪৯২]

[১৪৮৯]. প্রাগুক্ত, পৃ-২৭০
[১৪৯০]. প্রাগুক্ত
[১৪৯১]. প্রাগুক্ত, পৃ-২৭১
[১৪৯২]. প্রাগুক্ত, পৃ-২৪৮

গাউছে পাক (র.)'র সম্মানিত পিতা হযরত ছালেহ জঙ্গী (র.) নদীতে পাওয়া একটি ফল খেয়ে সেই ফলের মূল্য পরিশোধ করতে গিয়ে জীবনের একটি অংশ ব্যয় করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। হযরত কাহাশ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর এক প্রতিবেশীর দেয়াল থেকে বিনা অনুমতিতে মেহেমানের হাত পরিষ্কার করার জন্য একটু মাটি নিয়েছিলেন। সে গুনাহের লজ্জায় তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত কেঁদেছিলেন।[১৪৯৩]

এভাবে ইমাম আবু হানিফা (র.) তাঁর শরীকদারের নিকট ব্যবসার কাপড় প্রেরণ করেন যাতে একটি কাপড় ত্রুটিযুক্ত ছিল। তিনি শরীকদারকে বলেছিলেন এই কাপড় বিক্রি করলে ত্রুটি উল্লেখ করবে। কিন্তু শরীকদার ত্রুটি উল্লেখ করতে ভুলে যান এবং ঐ কাপড় বিক্রি করে দেন। আর কার কাছে বিক্রি করেছেন অর্থাৎ ক্রেতা কে তাও মনে ছিলনা। ইমাম সাহেব যখন এ ব্যাপারে অবহিত হলেন, তখন ঐ দিনে বিক্রিত যাবতীয় মূল্য তিনি সদ্‌কা করে দিলেন যার তৎকালীন মূল্য ছিল ত্রিশ হাজার দিরহাম।[১৪৯৪]

এতদ্ব্যতীত আরো এমন অনেক মুত্তাকী বুর্যুগানে দ্বীন আছেন যারা জীবনযাপনে এতবেশী তাকওয়া-পরহেযগারী এবং সর্তকতা অবলম্বন করেছেন যে, বহু হালাল ও বৈধ কাজও কেবল সন্দেহের কারণে ত্যাগ করেছেন এবং তাঁদের জীবনে মাকরূহ কাজ তো দূরের কথা খেলাফে আওলা তথা অনুত্তম কাজও খুঁজে পাওয়া দুস্কর ।

উপসংহার

তাক্‌ওয়া মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ। তাকওয়া মানুষের আখলাক বা চরিত্র সংশোধন করে। মু'মিনের ঈমান মজবুত করে। মু'মিনে নাকেচকে কামেলে পরিণত করে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির নিকট মর্যাদাবান করে দেয়। দুনিয়া ও আখিরাতের উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়। অতীব দুঃখের হলেও সত্য যে, বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে সর্ব্বোচ তাকওয়াতো দূরের কথা সর্বনিম্ন তাকওয়াও পরিলক্ষিত হচ্ছেনা বিধায় মুসলমানদের এই করুণ অবস্থা। একমাত্র তাকওয়ার অভাবেই সমাজে অন্যায়, অবিচার, যুলুম, অত্যাচার, খুন–খারাবী, চুরি-ডাকাতি, সুদ, ঘুষ, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আসুন আমরা সবাই ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে তাক্‌ওয়া ভিত্তিক পরিচালিত করে মুসলমানদের হারিয়ে যাওয়া অতীত গৌরব ফিরে এনে বর্তমান অশান্ত পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করি এবং সর্বোপরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ'র সন্তুষ্টি অর্জন করি।

[১৪৯৩]. প্রাগুক্ত, পৃ-২৫৩
[১৪৯৪]. ইবনে হাজর মক্কী (র.)(৯৭৩ হি.), আল খায়রাতুল হিসান, পৃ-৯৮

দোয়া

'দোয়া'র শাব্দিক অর্থ হলো ডাকা, আহবান করা ও প্রার্থনা করা। পরিভাষায় আল্লাহর নিকট বিনয়ের সাথে কিছু প্রার্থনা করাকে দোয়া বলা হয়। কখনো যিকরকেও দোয়া বলা হয়। আল্লাহর কাছে দোয়া খুবই প্রিয়। তাই তিনি বান্দাকে দোয়া করতে আদেশ দেন এবং তা কবুল করারও প্রতিশ্রুতি দেন। ইতিপূর্বে আল্লাহ তায়ালা কেবল নবী-রাসূলগণকেই দোয়া করার আদেশ দিতেন এবং তাঁদের দোয়া কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিতেন। কিন্তু বর্তমান উম্মতি মুহাম্মদীর জন্য এটি ব্যাপক করে দেয়া হয়েছে। এটি উম্মতি মুহাম্মদীর একটি বৈশিষ্ট্য। বান্দার যাবতীয় ইবাদত আল্লাহ তায়ালা কবূল করতেও পারেন কিংবা প্রত্যাখানও করতে পারেন। কারণ কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন বলে ওয়াদা দেননি। কিন্তু দোয়া এমন ইবাদত যা কবুল করবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমার নিকট দোয়া কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।[১৪৯৫] সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহর কাছে দোয়া বা প্রার্থনা করতে হবে এবং তা কবুল হয়েছে বলে দৃঢ়বিশ্বাস রাখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা দোয়া করে তাদের দোয়া কবুল করে নিই, যখন আমার কাছে দোয়া করে। কাজেই আমার আদেশ মান্য করা এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।[১৪৯৬]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন– ادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ তোমরা আল্লাহকে ডাক ভয় এবং আশা নিয়ে। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎলোকদের সন্নিকটে।[১৪৯৭] কেউ কেউ বলেন, জীবন্ত ও সুস্থ অবস্থায় আল্লাহকে ভয়ের মাধ্যমে ডাকলে এবং অসুস্থ ও দুঃসময়ে আল্লাহকে আশা নিয়ে ডাকলে কার্যকরী হয় বেশী।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন– ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ তোমরা তোমাদের প্রভূকে ডাক কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে।[১৪৯৮] অতএব, দোয়ার

[১৪৯৫]. সূরা মু'মিন, আয়াত, ৬০
[১৪৯৬]. সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৬
[১৪৯৭]. সূরা আ'রাফ, আয়াত-৫৬
[১৪৯৮]. সূরা আ'রাফ, আয়াত-৫৫

মধ্যে বিনয়ী ও নম্রতা, ভদ্রতা থাকতে হবে। কারণ দোয়া হলো ইবাদত। হাদিস শরীফে আছে الدعاء هو العبادة। দোয়াই হলো ইবাদত অথবা ইবাদতই হলো দোয়া।[১৪৯৯] অন্যত্র বর্ণিত আছে নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– الدعاء مُخُّ العبادة। দোয়া ইবাদতের মগজ বা মূল। অর্থ্যাৎ দোয়ার মাধ্যমেই ইবাদত কবুল হয়।[১৫০০] সুতারাং যে কোন ইবাদত করার পর আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করে ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য দোয়া করা উচিত। দোয়া আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। তিনি প্রতি রাতের শেষ ভাগে পৃথিবীর সন্নিকট আসমানে তাশরীফ এনে বান্দাকে আহবান করেন– مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ কে আমার নিকট দোয়া করবে, আমি তার দোয়া কবুল করবো, কে আমার নিকট চাইবে, আমি তার প্রয়োজন পুরণ কববো এবং কে আমারা নিকট ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।[১৫০১] রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– لَيْسَ شَيْءٌ اَكْرَمُ عَلى الله مِنَ الدُّعَاءِ আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে অন্য কোন বস্তু মর্যাদাবান নয়।[১৫০২] হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– مَنْ لَمْ يَدْعُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، غَضِبَ عَلَيْهِ যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দোয়া করেনা, আল্লাহ তায়ালা তার উপর রুষ্ট হন।[১৫০৩] হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– قَالَ اللهُ تَعَالى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى وَاَنَا مَعَه اذا دَعَانِى আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণা মোতাবেক হই। যখন সে আমার নিকট দোয়া করে, তখন আমি তার সাথে থাকি।[১৫০৪] নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– تَدْعُوْنَ اللهَ فِى لَيْلَكُمْ وَنَهَارِكُمْ فَاِنَّ الدُّعَاءَ سِلَاحُ الْمُؤمن তোমরা দিবা-রাত্রি আল্লাহর নিকট দোয়া কর, কেননা দোয়া মু'মিনের হাতিয়ার।[১৫০৫] হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে اَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فَاِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ الْمُبْرَمَ বেশী বেশী দোয়া কর। কেননা, দোয়ার দ্বারা চূড়ান্ত তকদীর প্রত্যাখান হয়।[১৫০৬]

[১৪৯৯]. ইমাম তিরমিযী (র.), (২৭৯ হি.), তিরমিযী শরীফ, পৃ-৪৮৬
[১৫০০]. প্রাগুক্ত
[১৫০১]. ইমাম বুখারী (র.), (২৫৬ হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড ২, পৃ-৯৩৬, করাচি
[১৫০২]. প্রাগুক্ত, ইমাম তিরমিযী (র.)(২৭৯ হি.), তিরমিযী শরীফ, পৃ–৪৮৬, করাচি
[১৫০৩]. ইমাম ইবনে মাজাহ (র.)(২৭৩ হি.), ইবনে মাজাহ শরীফ, পৃ-২৭১, করাচি
[১৫০৪]. হাফিয নুরুদ্দীন আলী হায়সামী (র.) (৮০৭ হি.), মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড-১০, পৃ-১৪৮, বৈরুত
[১৫০৫]. হাফিয নুরুদ্দীন আলী হায়সামী (র.), (৮০৭ হি.), মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড-১০, পৃ-১৪৭, বৈরুত
[১৫০৬]. কানযুল উম্মাল, হাদিস নং-৩১২০

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে مَنْ فُتِحَ لَه فِى الدُّعَاءَ مِنْكُمْ فُتِحَتْ لَه اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ তোমাদের মধ্যে যে দোয়ার দরজা উন্মুক্ত করবে, তার জন্য রহমতের দরজা উন্মুক্ত করা হবে।[১৫০৭]

যাদের দোয়া অধিক কবুল হয়

মুত্তাকী, নেককার, পরহেযগার, হালাল ভক্ষণকারী, সুন্নাতের অনুসারী বৃদ্ধ মু'মিন এবং মযলুমের দোয়া আল্লাহর দরবারে বেশী কবুল হয়। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَحْى مِن ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ اِذَا كَانَ مُسدِّدًا لُزُومًا لِلسُّنَّةِ اَنْ يَسْأَلَ اللهَ فَلاَ يُعْطِيْه হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত সুন্নতের অনুসারী কোন বৃদ্ধ মুসলিম আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে তার চাহিদা পূরণ না করতে আল্লাহর লজ্জাবোধ করেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এরূপ বৃদ্ধের দোয়া ফেরত দেন না ।[১৫০৮]

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াককাস (রা.) নবী করিম ﷺকে বললেন - হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি কিন্তু আমার দোয়া কবুল হচ্ছেনা। নবী করিম ﷺ বললেন يَا سَعْدُ اجْتَنِبْ الحَرَامَ فَاِنَّ كُلِّ بَطَنٍ دَخَلَ فِيْه لُقْمَةً مِنَ الحَرَامِ لَا يُسْتَجَابُ دُعَائُه اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا হে সা'দ! তুমি হারাম বর্জন কর। কেননা যে পেটে এক লুকমা হারাম খাদ্য প্রবেশ করবে, চল্লিশ দিন যাবৎ তার দোয়া কবুল হয় না।[১৫০৯]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, دَعْوَةُ الْمَظْلُوم مُسْتَجَابَةٌ وَاِنْ كَانَ فَجِرًا فَفُجُوْرُه عَلى نَفْسِه মযলুমের দোয়া কবুল হয় যদিও সে ফাজির বা গুনাহগার হয়। কেননা তার গুনাহ তার উপর। অর্থাৎ মযলুম গুনাহগার হলেও তার দোয়া গৃহীত হবে।[১৫১০] অনুরূপভাবে রোযাদার ও মুসাফিরের দোয়াও কবুল হয়। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– ثَلَاثُ حَقٌّ عَلي اللهِ اَنْ لَا يَرُدَّلَهُمْ دَعْوَةُ الصَائِمِ حَتّى يَفْطَرُ وَالْمَظْلُوْمُ حَيَّ يَنْصِرُ وَالْمُسَافِرُ حَيَّ يَرْجِعُ তিন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করেন না। ১. রোযাদার ইফতার না করা পর্যন্ত , ২. মযলুম নিজে প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত এবং ৩. মুসাফির (ঘরে) ফিরে না আসা পর্যন্ত।[১৫১১]

[১৫০৭]. ইমাম তিরমিযী (র.)(২৭৯ হি.), জামে তিরমিযী
[১৫০৮]. হাফিয নুরুদ্দীন আলী (র.)(৮০৭ হি.), মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড-১০, পৃ-১৪৯, বৈরুত
[১৫০৯]. ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (র.), (৩৭৩ হি.), তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ-২৫২, বৈরুত
[১৫১০]. প্রাগুক্ত, পৃ-১৫১
[১৫১১]. প্রাগুক্ত, পৃ-১৫১

দোয়ার আদব

দোয়া করার সময় দোয়া কবুল হওয়ার উপর পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে এবং নিশ্চিত বিশ্বাস রাখতে হবে। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلاَ يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ তোমাদের কেউ যখন দোয়া করবে, তখন পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করবে, আর এরূপ বলবেনা- হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও আমাকে দাও। কেননা তার উপর জবরদস্তি করা যায়না।[১৫১২] দোয়ার সময় হাত উঠানো প্রয়োজন। কারণ এতে কথা ও কাজে মিল থাকে এবং চূড়ান্ত বিনয় বিদ্যমান থাকে। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ لَمْ يُحطُّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَه যখন রাসূল ﷺ দোয়ায় হাত উঠাতেন তখন হাতদ্বয় চেহারা মুবারকে মাসেহ করা ব্যতীত নামাতেন না।[১৫১৩] হযরত জাবির (রা.) নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ان الله حي كريم يستحى من عبده ان يرفع يديه فيردهما صفرًا আল্লাহ লজ্জাশীল ও দয়াবান। কোন বান্দাহ তার উভয় হাত তুলে প্রার্থনা করলে, তার উভয় হাত খালি ফেরত দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন।[১৫১৪] ইবনে আব্বাস (রা.), নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন اِذَا سَئَالْتُمْ اللهَ فَاسْئَلُوْه بِبُطُوْنِ اَكْفِكُمْ وَلَا تَسْئَلُوه بِظُهُوْرِهَا وَاَسْحَابِهَا وُجُوْهَكُمْ তোমরা যখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে তখন তোমাদের হাতের ভিতর দিক দিয়ে প্রার্থনা করবে, হাতের বাইরের দিক দিয়ে নয় এবং মুখমণ্ডলে তা মুছে নেবে।[১৫১৫]

কবুল হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হলো দোয়ার আগে আল্লাহ প্রশংসা করা ও নবী করিম ﷺ'র উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَسأَلَ فَلْيَبْدأ بِالْمَدْحَةِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ تعالى بما هُوَا اَهْلُه ثُمَّ لْيُصَلِّى عَلى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَسئَلُ بَعْدَ فَانَه اَجدَرُ اَنْ يَنْجَحَ কোন ব্যক্তি যখন দোয়া করার ইচ্ছে করে, সে যেন প্রথমে আল্লাহর শান মোতাবেক তাঁর প্রশংসা করে। অতঃপর নবী করিম ﷺ'র উপর দুরূদ প্রেরণ করবে তারপর দোয়া করবে। কেননা এর

[১৫১২]. ইমাম বুখারী (র.), (২৫৬ হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পৃ.-৯৩৮, করাচি
[১৫১৩]. ইমাম তিরমিযী (র.)(২৭৯ হি.), জামে তিরমিযী, পৃ-৪৮৮, করাচি
[১৫১৪]. হাফিয নুরুদ্দীন আলী (র.),(৭০৮ হি.), মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড-১০, পৃ-১৪৯, বৈরূত
[১৫১৫]. প্রাগুক্ত, পৃ-২৫৩

দ্বারা দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী ।[১৫১৬] হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وال محمد যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবারের উপর দুরূদ শরীফ পড়বেনা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক দোয়া কবুল হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়।[১৫১৭] হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন فَاِذَا سَئَلْتُمْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اَيُّهَا النَّاسَ فَسْئَلُوْه وَاَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْاِجَابَةِ فَاِنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيْبُ لِعَبْدٍ دَعَاه عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ হে লোকসকল! যখন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর, তখন কবুল হওয়ার দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে কর। কেননা, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন না, যে অলস অন্তর নিয়ে দোয়া করে।[১৫১৮]

দোয়া কবুল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া না করা উচিত। কারণ দোয়া যে কবুল হবে তা নিশ্চিত তবে কখন কবুল হবে এবং কিভাবে কবুল হবে সেটা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন– তিনি বলেন يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي তোমাদের দোয়া কবুল করা হয় যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়া করে। সে বলে আমি দোয়া করেছি কিন্তু আমার দোয়া কবুল হয়নি।[১৫১৯] হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْه لَيْسَ فِيْهَا اِثْمٌ وَلَا قَطِيْعَةُ رِحْمٍ اِلاَّ اَعْطَاه اللهُ بِهَا اَحَدى ثَلَاثٌ اِمَّا يُعَجِّلُ لَه دَعْوَتَهُ وَاِمَّا يَدَّخِرُهَا فِى الاخِرَةِ وَاِمَّا اَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّؤِ مَثْلُهَا قَالُوْا اِذَا نُكَثِّرُ قَالَ اللهُ اَكْثِرُ কোন মুসলমান এমন দোয়া করে যাতে গুনাহ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দোয়া থাকবে না তাকে আল্লাহ তায়ালা তিনটি বস্তু থেকে যে কোন একটি দান করবেন। হয়তো তাৎক্ষণিক তার দোয়া কবুল করবেন অথবা পরকালের জন্য জমা রাখবেন অথবা তার থেকে এ পরিমাণ মুসীবত দূরীভূত করে দেবেন। সাহাবায়ে কিরামগণ বললেন– তাহলে তো আমরা অনেক দোয়া করবো, তিনি বললেন– আল্লাহ অধিক কবুলকারী।[১৫২০]

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, বান্দা যখন কিয়ামতের দিন আশাতীত নেক আমল দেখবে তখন বলবে– হে প্রভু! এতগুলো আমল কোথা হতে এলো? আল্লাহ তায়ালা বলবেন– বান্দা! তুমি দুনিয়াতে যেসব দোয়া করতে তা থেকে কিছু তুমি

[১৫১৬]. হাফিয নুরুদ্দীন আলী (র.), (৮০৭ হি.), মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড-১০, পৃ-১৫৫, বৈরূত
[১৫১৭]. প্রাগুক্ত, পৃ-১৬০
[১৫১৮]. প্রাগুক্ত, পৃ-১৪৮
[১৫১৯]. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি) জামে তিরমিযী, পৃ-৪৮৮
[১৫২০]. হাফিয নুরুদ্দীন আলী (র.) (৮০৭ হি), মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড-১০, পৃ-১৫১, বৈরুত

দুনিয়াতে ভোগ করেছিলে আর কিছু তোমার পরকালের জন্য রেখে দিয়েছি। তখন বান্দা বলবে– যদি দুনিয়াতে আমার কোন দোয়া কবুল না হয়ে বরং সব দোয়া পরকালের জন্য হতো কতই না ভাল হতো। [১৫২১]

দোয়ার দ্বারা বালা-মুসিবত দূরীভূত হয়। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– اِنَّ البَلَاء وَالدُّعَاءَ لَيَلْتَقِيَانِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ فَيَعْتَلِجَانِ اِلى يَوْمِ القِيَامَةِ মুসীবত ও দোয়া নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যখানে মিলিত হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত পরস্পর পরস্পরের সাথে ঝগড়া করতে থাকে।[১৫২২] অর্থাৎ তাকদীর অনুযায়ী যখন বান্দার উপর কোন মুসীবত অবতীর্ণ হতে চায় তখন দোয়া ঐ মুসীবতকে অবতীর্ণ হতে বাধা দেয়। এভাবে এরা উভয় কিয়ামত পর্যন্ত ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে। ফলে মুসীবত বান্দার উপর পতিত হতে পারেনা। ফরয নামাযের পর দোয়া করলে দোয়া দ্রুত কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺকে জিজ্ঞাসা করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! اَيُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَيْلِ الاخِرِ وَدُبُرِ الصَّلواتِ المَكْتُوْبَةِ কখন দোয়া বেশী কবুল হয়? উত্তরে তিনি বললেন– গভীর রাতে এবং ফরয নামাযের পরে।[১৫২৩] দোয়ার দ্বারা তাকদীর পরিবর্তন হয় এবং নেক কাজের দ্বারা হায়াত বৃদ্ধি পায়। হযরত সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– لَا يَرُدُّ القَضَاءَ اِلاَّ الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيْدُ فِى العُمْرِ اِلاَّ البِرُّ একমাত্র দোয়ার দ্বারাই তাকদীর পরিবর্তন করা যায় এবং নেকআমল দ্বারাই হায়াত বৃদ্ধি করা যায়।[১৫২৪] হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ حَتّى يُرِي بَيَاضُ اِبَطَيْهِ রাসূল ﷺ দোয়াতে এমনভাবে হাত উঠাতেন তাঁর বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখা যেত।[১৫২৫] হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– পাঁচ ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়। ১. মজলুমের দোয়া যে পর্যন্ত না সে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, ২. হাজীর দোয়া যে পর্যন্ত না যে বাড়ি ফিরে, ৩. জিহাদকারীর দোয়া যে পর্যন্ত না সে বসে পড়ে, ৪. রোগীর দোয়া যে পর্যন্ত না সে সুস্থ হয় এবং ৫. মুসলমান ভাইয়ের দোয়া মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে। অতঃপর রাসূল

[১৫২১]. ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (র.) (৩৭৩ হি), তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ-২৫১, বৈরুত
[১৫২২]. প্রাগুক্ত, পৃ-১৪৬
[১৫২৩]. ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি) জামে তিরমিযী, পৃ-৫০৪
[১৫২৪]. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-১৯৫, হাদিস নং-১২২২
[১৫২৫]. ইমাম বায়হাকী, দাওয়াতুল কবীর, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ-১৯৬ হাদিস নং-২১৩৯

ﷺ বলেন, এসব দোয়ার মধ্যে দ্রুত কবুল হয় মুসলমান ভাইয়ের দোয়া মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে।[১৫২৬]

আল্লাহ তায়ালা সকলের দোয়া কবুল করেন। এর জন্য কোন শর্ত নেই। এমন কি অভিশপ্ত ইবলীসের দীর্ঘ হায়াতের দোয়াও তিনি কবুল করেছেন। সুতরাং যত বড় গুনাহগার হোক না কেন দোয়া করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। তবে যেসব কারণে দোয়া কবুলের বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা পরিহার করা উচিত। কিছু সময় এমন আছে যাতে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। যেমন– রমযান মাসে, সাহরী ও ইফতারের সময়, ফরয নামাযের পর, কুরআন তিলাওয়াতের পর, জুমার দিন, আরফার দিন, আযানের সময়, দুই খুৎবার মধ্যখানে এবং কোন নেক আমলের পর। যেমন বাইতুল্লাহ নির্মাণের পর হযরত ইব্রাহিম (আ.) দোয়া করেছিলেন। আবার কিছু স্থান আছে যেখানে দোয়া কবুল হয়। যেমন বাইতুল্লাহ, মীযাবে রহমত, মুলতাযিম, সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়, আরফা, মিনা-মুযদালিফা, মসজিদ এবং আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্ত মকবুল বান্দাগণের পাশে। যেমন হযরত যাকারিয়া (আ.) হযরত মরয়ম (আ.)এর পাশে এবং ইমাম শাফেঈ (র.) ইমাম আযম আবু হানিফা (র.)'র মাঝারে দোয়া করেছেন এবং তা কবুল হয়েছিল।

সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ কাজ দু'টি দ্বীনে ইসলামের জন্য দিক নির্দেশিকা সমতুল্য। প্রত্যেক নবী-রাসূল গণের শরীয়তের মধ্যে এ বস্তু দু'টি সর্বকালেই অর্ন্তভূক্ত ছিল। মূলত এ কাজ দু'টি নবী-রাসূলগণের কাজ। যেহেতু শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ এর পর কিয়ামত পর্যন্ত কোন নবী আগমন করবেন না সেহেতু এ কাজ দু'টি অর্পিত হয়েছে উম্মতে মুহাম্মদীর উপর। সক্ষম ও ক্ষমতাবানদের উপর কাজ দু'টি ফরয। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই যাদেরকে প্রকাশ করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে বাধা দেবে আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।[১৫২৭] যারা এ কাজ দু'টি সম্পাদন করে আল্লাহ তাদেরকে সফলকাম বলে উল্লেখ করে বলেন– وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান করবে সৎকাজের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভালো

[১৫২৬]. বায়হাকী, দাওয়াতুল কবীর, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ-১৯৬ হাদিস নং-২১৪৬
[১৫২৭]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১১০

কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।[১৫২৮] সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা মু'মিন উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ মু'মিন নর-নারীরা পরস্পর বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দান করে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করে।[১৫২৯] হযরত আলী (রা.) বলেন– افضل الاعمال الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وشنان الفاسق يعنى بُغْضُهُ فمن امر بالمعروف فقدشد ظهر المؤمن ومن نهى عن المنكر ارغم انف المنافق সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হলো সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ এবং ফাসিকের প্রতি ঘৃণা। যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ করে সে মু'মিনের পৃষ্ঠপোষণ করে আর যে ব্যক্তি অসৎকাজের নিষেধ করে সে মুনাফিকের মুখে ছাই মারে।[১৫৩০] সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজের নিষেধ করা প্রত্যেকের উপর ঈমানী দায়িত্ব। এগুরু দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে কিংবা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও প্রতিরোধ না করলে, আল্লাহর গযব অবতীর্ণ হবে। তখন সৎ লোকের দোয়াও আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না। হাদিস শরীফে হযরত হোযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ، فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ নবী করিম ﷺ বলেছেন– ঐ পবিত্র সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, নিম্নোক্ত দু'টি বিষয়ের মধ্যে একটি অবশ্যই হবে। হয়তো তুমি সৎকাজের আদেশ দান করবে এবং অবশ্যই মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে নতুবা অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর আযাব নাযিল করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর কাছে দোয়া করবে, কিন্তু তিনি তোমাদের দোয়া কবুল করবেন না।[১৫৩১] রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا مُنْكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ، يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ যখন মানুষ কোন মন্দ কাজ দেখে আর সেটাকে প্রতিরোধ না করে, তাহলে অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলের উপর আযাব নাযিল করবেন।[১৫৩২] হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি– مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ،

[১৫২৮]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৪
[১৫২৯]. সূরা তাওবা, আয়াত-৭১
[১৫৩০]. ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (র.) (৩৭৩ হি), তাম্বীহুল গাফেলীন, আরবী, বৈরুত, পৃ-৫৬
[১৫৩১]. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪৩৬
[১৫৩২]. তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪৩৬

فَلَا يُغَيِّرُوا، إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا যে জাতির মধ্যে কোন লোক পাপে লিপ্ত থাকে আর ঐ ব্যক্তিকে পাপ থেকে বিরত রাখতে জাতির লোকদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে পাপ থেকে বিরত না রাখে, তাহলে তাদের মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করবেন।[১৫৩৩]

অন্যায় প্রতিরোধে দায়িত্বের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রত্যেকেই সাধ্য ও ক্ষমতা অনুপাতে এ দায়িত্ব পালন করবে। হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন– তিনি বলেন– مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِه، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِه، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ তোমাদের কেউ কোন অসৎ কাজ হতে দেখলে সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিরোধ করে। যদি সক্ষম না হয় তবে জিহ্বা দ্বারা প্রতিহত করবে। যদি এতটুকুও সক্ষম না থাকে তাহলে অন্তত অন্তরে সেটা খারাপ জানবে।[১৫৩৪] অর্থাৎ ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর হলো হাত দ্বারা অন্যায় প্রতিরোধ করা আর যদি অবস্থা অনুকুলে না থাকে এবং সরাসরি হাত দ্বারা প্রতিরোধ করা সম্ভব না হয় তাহলে ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে প্রতিরোধের চেষ্টা করতে হবে। যদি একটুকুও সামর্থ না থাকে তবে মন্দ কাজটিকে মনে মনে ঘৃণা করতে হবে। কেউ কেউ বলেন হাত দ্বারা অন্যায় প্রতিরোধ করা শাসকের দায়িত্ব। মুখ দ্বারা প্রতিরোধ করা ওলামায়ে কিরামের দায়িত্ব এবং মনে মনে ঘৃণা পোষণ করা নিরীহ সাধারণ মানুষের কর্তব্য। আবার অনেকেই মনে করেন– যার যেরূপ ক্ষমতা রয়েছে, তার সেরূপ প্রতিরোধ করা আবশ্যক।[১৫৩৫]

অন্যায় প্রতিরোধ না করার উপমা

হযরত নুমান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি প্রদানের বিষয়ে অলসতা করাকে ঐ সম্প্রদায়ের সাথে তুলনা করা যায়, যারা নৌকায় স্থান পাওয়ার জন্য লটারী দিয়েছে এবং লটারী অনুসারে কেউ নৌকার নিচে বসেছে আবার কেউ উপরে বসেছে। নৌকার নিচের লোকেরা উপরের লোকদের পাশ দিয়ে পানির জন্য যাতায়াত করতো, ফলে উপরের লোকদের কষ্ট হতো। একদিন নিচের লোকদের থেকে এক ব্যক্তি কুঠার হাতে নিয়ে নৌকার তলায় কাঠ কোপাতে আরম্ভ করে। তখন উপরের লোকেরা তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, সর্বনাশ! তুমি কি করছো? লোকটি বলল, তোমরা আমাদের কারণে কষ্ট পাচ্ছ আর আমাদের পানির একান্ত প্রয়োজন। এমতাবস্থায় যদি তার হাত ধরে ফেলে

[১৫৩৩]. আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪৩৭
[১৫৩৪]. মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪৩৬
[১৫৩৫]. ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (র.) (৩৭৩ হি), তাম্বীহুল গাফেলীন, আরবী, বৈরুত, পৃ-৫৮

তাহলে তাকেও রক্ষা করবে, নিজেরাও রক্ষা পাবে। আর তাকে যদি তার কাজে ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকেও ধ্বংস করবে, নিজেরাও ধ্বংস হবে।[১৫৩৬]

সৎকাজের আদেশ দানের পদ্ধতি

সৎকাজের আদেশ দানকারীর উচিত যথাসম্ভব গোপনীয়ভাবে আদেশ-নিষেধ করবে। প্রকাশ্যভাবে ওয়ায-নসীহতের চেয়ে এ পদ্ধতি অধিক কার্যকরী হবে। হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন- যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে তার ভাইকে নসীহত করলো, সে অসুন্দর কাজ করলো। আর যে ব্যক্তি গোপনীয়ভাবে তাকে নসীহত করলো, সে সুন্দর কাজ করলো। গোপনীয়ভাবে নসীহত করে যদি কোন ফল পাওয়া না যায়, তাহলে প্রকাশ্যভাবে তাকে আদেশ করবে এবং সৎ লোকদের সাহায্য প্রার্থনা করবে, যেন তারা অসৎ কর্ম থেকে বিরত রাখে। তারা যদি তা না করেন, তাহলে অসৎ লোকের প্রাধান্য বিস্তার করবে। ফলে আল্লাহর পক্ষ হতে আযাব নাযিল হবে এবং তাতে সৎ- অসৎ সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।[১৫৩৭]

সৎ কাজের আদেশে পাঁচটি বিষয় প্রয়োজন

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার জন্য পাঁচটি বিষয় আবশ্যক। **এক.** ইলম তথা জ্ঞান। কেননা দ্বীনি ইলম না থাকলে অজ্ঞ ব্যক্তি ভালভাবে সৎকাজের আদেশ দিতে সক্ষম হবেনা। বরং এতে হিতে বিপরীত হবে। **দুই.** উদ্দেশ্য থাকতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দ্বীন রক্ষা। হযরত ইকরামা (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে দেখল যে, একদল মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে একটি গাছের পূজা করছে। সে খুব ক্রুদ্ধ হলো এবং মনে মনে বললো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই গাছটির পূজা করা হচ্ছে? সে একখানা কুড়াল নিয়ে নিজ গাধায় চড়ে ঐ গাছটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। তার ইচ্ছে গাছটি কেটে ফেলা। পথে তার সাথে অভিশপ্ত ইবলীসের সাক্ষাত হলো। ইবলীস ছিল মানুষের আকৃতিতে। সে প্রশ্ন করলো কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, দেখলাম যে, মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে একটি গাছের পূজা করছে। তাই আমি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছি যে, আমি আমার গাধায় চড়ে কুড়াল নিয়ে ঐ গাছের নিকট যাবো এবং ওটাকে কেটে ফেলবো। ইবলীস বলল, ঐ গাছের সাথে তোমার কি সম্পর্ক? তুমি ঐ গাছ এবং যে সব হতভাগারা সেটির পূজা করছে, তাদের ব্যাপারটি ত্যাগ কর। এ বিষয়ে ইবলীস ও লোকটির মধ্যে তর্ক হলো এবং এক পর্যায়ে তারা মল্ল যুদ্ধে লিপ্ত হলো। তিনবার ইবলীস পরাজিত হলো। ইবলীস যখন আর পারছিল না

[১৫৩৬]. বুখারী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-৪৩৬
[১৫৩৭]. ফকীহ আবুল লাইস সমরকান্দী (র.)(৩৭৩ হি.),তাম্বীহুল গাফেলীন, আরবী, বৈরুত, পৃ-৫৭

আবার নিজের বক্তব্য পরিহার করছিল না, তখন বলল, তুমি ফিরে যাও। আমি তোমাকে প্রতিদিন চারটি করে দিরহাম দেবো। তুমি প্রতিদিন তোমার বিছানায় একপ্রান্ত তুলে তা নিয়ে নিও। লোকটি বলল, তুমি কি তা করবে? ইবলীস বলল, হ্যাঁ। লোকটি বাড়ি ফিরে এলো। দু'তিন দিন যাবৎ সে এরূপ পেতে লাগলো। পরে একদিন সে বিছানা তুলে দেখল দিরহাম পাওয়া যাচ্ছেনা। তখন সে কুড়াল নিয়ে গাধায় চড়ে রওয়ানা হলো। পথিমধ্যে মানুষের আকৃতিতে ইবলীসের সাথে তার সাক্ষাত হলো। প্রশ্ন করলো কোথায় যাচ্ছ? বলল, আল্লাহকে বাদ দিয়ে একটি গাছের পূজা করা হচ্ছে, আমি সেটিকে কাটতে চাই। ইবলীস বলল, তুমি তা পারবে না। প্রথমবার তুমি বের হয়েছিলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্রোধ নিয়ে। তাই আসমান-জমিনের সবাই একত্রিত হলেও তোমাকে বাধা দিতে পারত না। কিন্তু এখন তুমি বের হয়েছ নিজের গরযে টাকা না পাওয়ার কারণে। এখন আমি যদি এগিয়ে আসি তোমার ঘাড় মটকে দিতে পারি। এ কথা শুনে লোকটি ঘরে ফিরে গেল।[১৫৩৮]

তিন. যাকে আদেশ-নিষেধ করবে তার প্রতি স্নেহ-মমতা থাকতে হবে। রুক্ষ বা কঠোর ভাষায় আদেশ-নিষেধ করবেনা। আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত মুসা ও হারুন (আ.)'কে ফেরাউনের উদ্দেশ্যে পাঠাচ্ছিলেন, তখন তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন– فَقُوْلَا لَه قَوْلًا لَيِّنًا তোমরা তাকে নরম ভাষায় কথা বলবে। **চার.** ধৈর্য-সহ্য থাকতে হবে। হযরত লোকমান (আ.)'র ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ তুমি সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে এবং তোমার উপর কোন মুসীবত আসলে তাতে ধৈর্য ধারণ করবে।[১৫৩৯]

পাঁচ. অন্যকে যে বিষয়ে আদেশ করা হবে তা নিজে আমল করতে হবে। না হয় অন্যরা তাকে লজ্জা দেবে এবং সে আল্লাহর এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ তোমরা কি লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ করছ অথচ নিজেদের কথা ভুলে যাচ্ছ?[১৫৪০] হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন عَنِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " رَأَيتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيَ رِجَالاً تُقْرَصُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ النَّارِ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟، فَقَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَفِى رَوَايته قَالَ

[১৫৩৮]. ফকীহ আবুল লাইস সমরকান্দী (র.)(৩৭৩ হি.), তাম্বীহুল গাফেলীন, আরবী, বৈরুত, পৃ-৫৮
[১৫৩৯]. সূরা লোকমান, আয়াত-১৭
[১৫৪০]. ফকীহ আবুল লাইস সমরকান্দী (র.), (৩৭৩ হি.), তাম্বীহুল গাফেলীন, আরবী, বৈরুত, পৃ-৫৮

خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَقْرَؤُنَ كِتَابَ اللهِ وَلَا يَعْمَلُونَ রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, মি'রাজের রাতে আমি বহু লোককে দেখেছি যে, তাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিব্রাইল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতগণের মধ্যে বক্তাগণ, যারা লোকদেরকে ভালকাজের আদেশ করত কিন্তু নিজেদেরকে ভুলে যেতো অর্থ্যাৎ নিজেরা সৎকাজ করতোনা।

বায়হাকীর অপর বর্ণনায় আছে– জিবরাইল বলেছেন, এরা আপনার উম্মতের সেসব খতীব বা বক্তাগণ, যারা এমন সব কথা বলতো যা তারা নিজেরা আমল করতো না, তারা আল্লাহ তায়ালার কুরআন তিলাওয়াত করতো কিন্তু সে মতে আমল করতোনা।[১৫৪১]

قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন একদল লোককে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। সাথে সাথেই তার পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে পড়বে। সে নাড়িভুঁড়িকে কেন্দ্র করে সেটার চর্তুদিকে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেভাবে গাধা আটার চক্কিকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। এটা দেখে দোযখবাসীরা তার পাশে একত্রিত হয়ে বলবে, হে অমুক! তোমার একি অবস্থা? তুমি না আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে? লোকটি বলবে, আমি তোমাদেরকে ভালকাজের জন্য আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে সেটা করতাম না, আর তোমাদেরকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজে সেটা থেকে বিরত থাকতাম না।[১৫৪২]

অন্যায়কে ঘৃণা না করা সমর্থন করার আলামত

পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে কোন অন্যায় ও গর্হিত কাজ হচ্ছে দেখে বা শুনে প্রতিরোধ না করলে কিংবা মনে মনে হলেও ঘৃণা না করলে সেটার প্রতি সমর্থন আছে বুঝায়। ফলে সে পাপ না করেও পাপী হয়। কারণ অন্যায় যে করে ও যে সহে উভয় সমান অপরাধী। হযরত উরস ইবনে উমাইয়া (রা.) নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا – وَقَالَ مَرَّةً: «أَنْكَرَهَا» – كَانَ كَمَنْ غَابَ

[১৫৪১]. শরহে সুন্নাহ ও বায়হাকী, সূত্র- মিশকাত শরীফ, পৃ- ৩৩৮
[১৫৪২]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র- মিশকাত শরীফ, পৃ-৪৩৬

عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا، كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا পৃথিবীর বুকে যখন কোন পাপ করা হয় তখন যে ব্যক্তি সেটাকে মনে মনে খারাপ জানবে, সে ঐ স্থানে উপস্থিত থাকলেও সেখানে অনুপস্থিত ব্যক্তির ন্যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত নেই কিন্তু ঐসব পাপের প্রতি তার সমর্থন আছে, তখন সে সেখানে উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় অপরাধী সাব্যস্ত হবে।[১৫৪৩] আদেশ-নিষেধকারী ব্যক্তি অব্যশই আদেশ-নিষেধের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করতে হবে। অন্যথা তাকে লজ্জিত হতে হবে। তবে আমল নিজে করবেনা বলে অন্যকে আদেশ–নিষেধ করা থেকে বিরত থাকাও ঠিক নয়। যেমন কোন ব্যক্তি নিজে নামায না পড়লে অন্যকে পড়তে বলবেনা তা নয়। একটি পাপের কারণে অন্য একটি পূণ্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়। যেমন নামায পড়েনা বলে রোযা রাখা, হজ্ব করা ইত্যাদি পরিত্যাগ করা যাবেনা। বরং রোযা রেখে এবং হজ্ব করে নামাযও পড়ার চেষ্টা করতে হবে। কারণ সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ব্যক্তি পাওয়া যাবে কোথায়? ফলে দ্বীন প্রচারের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন مُرُوا بِالْمَعْرُوْفِ وَاِنْ لَمْ تَعْمَلُوْا بِه وَانْهُوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاِنْ لَمْ تَنْتَهُوْ عَنْهُ তোমরা সৎকাজের আদেশ কর যদিও তা নিজেরা আমল না কর এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ কর যদিও তা থেকে নিজেরা বিরত না থাক।[১৫৪৪]

পর্দা

পর্দা মুসলিম রমণীর সৌন্দর্য। পর্দা নারীর সতীত্বের রক্ষাকবচ। ইসলামে পর্দাকে নারীর সম্ভ্রম রক্ষার্থে ওয়াজিব করা হয়েছে। পর্দা হলো সতরের চেয়েও একটু বেশী। সতর হলো নারী তার শরীরের ঐসব অঙ্গ যা তার স্বামী ব্যতীত অন্য সকলের থেকে গোপন রাখা ওয়াজিব। আর তা হলো স্বাধীন নারীর চেহারা, হাত ও পা ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর। পক্ষান্তরে পর্দা নারীর পুরো শরীর ঢেকে রাখাকে বলা হয়। নারীর সতর সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা নুর এ এবং পর্দা সম্পর্কে সূরা আহযাবে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তায়ালা সতর সম্পর্কে বলেন– قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ

[১৫৪৩]. আবু দাউদ, সূত্র- মিশকাত শরীফ, পৃ-৪৩৬
[১৫৪৪]. ফকীহ আবুল লাইস সমরকান্দী (র.), (৩৭৩ হি.), তাম্বীহুল গাফেলীন, আরবী, বৈরুত, পৃ-৫৫

جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রর্দশন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে আবৃত রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপতি, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনা মুক্ত পুরুষ ও বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের ব্যতীত অন্য কারো নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[১৫৪৫] রাসূল ﷺ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)কে লক্ষ্য করে বলেছেন **يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ** হে আসমা! কোন মহিলা বালিগ হলে তখন তার এই অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ দেখা জায়েয নেই।[১৫৪৬] পর্দা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে **وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ** আর তোমরা নবীর পবিত্র স্ত্রীগণ থেকে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এটি তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।[১৫৪৭] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا** হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবেনা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৫৪৮]

উক্ত আয়াতে **جَلَابِيب** তথা লম্বা ও প্রশস্ত চাদর দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর কারণ সর্ম্পকে বলা হয়েছে যে, এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। অর্থাৎ এরা যে স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত মহিলা তা সহজে বুঝা যাবে। ফলে দুষ্ট ও উত্যক্তকারীদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। সুতরাং আজো নারী জাতি যদি পর্দা অবলম্বন করে তা হলে অবশ্যই তাদের মান-সম্মান ও ইজ্জত-আবরু হিফাযত থাকবে। সম্মানিত

[১৫৪৫]. সূরা নূর, আয়াত, ৩১
[১৫৪৬]. ইমাম আবু দাউদ (র.), (২৭৫ হি.), আবু দাউদ শরীফ, খণ্ড-২, পৃ-২১১
[১৫৪৭]. সূরা আহযাব, আয়াত-৫৩
[১৫৪৮]. সূরা আহযাব, আয়াত-৫৯

নারীজাতি বেপর্দা চলা-ফেরা করার কারণেই আজ তাদের ইজ্জত-সম্মান ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষার্থে এবং সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বেপর্দা বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে **وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى** এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে। প্রাচীন জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রর্দশন করে বের হইওনা।[১৫৪৯] হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন **الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا أَقْرَبَ مَا تَكُوْنُ إِلَى اللَّهِ وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا** নারী গোপনযোগ্য, যখন সে ঘর থেকে বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে তাকিয়ে থাকে। নারী আল্লাহর রহমতের অধিক নিকটবর্তী থাকে যখন সে নিজ ঘরে অবস্থান করে।[১৫৫০]

হযরত আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন **كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً** প্রত্যেক চোখ যিনাকারী। আর যখন কোন নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে কোন পুরুষের সমাগম দিয়ে অতিক্রম করে তখন সে ব্যবিচারিণী।[১৫৫১] হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, **«أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»** কোন মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে পুরুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তার সুগন্ধি পুরুষরা পাওয়ার উদ্দেশ্যে, তবে সে যিনাকারিণী।[১৫৫২] গায়রে মুহরিম তথা অপরিচিত নারী-পুরুষ একজন অপরজনের দিকে তাকানো নিষেধ। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে **قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ** হে নবী! মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। আর ঈমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে, এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে।[১৫৫৩] এ প্রসঙ্গে নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন **«إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ**

[১৫৪৯]. সূরা আহযাব, আয়াত-৩৩
[১৫৫০]. ইমাম তিরমিযী (র.),(২৭৯ হি.), তিরমিযী শরীফ, পৃ-১৮৯
[১৫৫১]. ইমাম তিরমিযী (র.), (২৭৯ হি.), জামে তিরমিযী, পৃ-৩৯৬
[১৫৫২]. ইমাম নাসাঈ(র.), (৩০৩ হি.), সুনানে নাসাঈ, খণ্ড-২, পৃ-৩৪৩
[১৫৫৩]. সূরা নূর, আয়াত, ৩০-৩১

الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ» নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা বনী আদমের জন্য যিনার একটা অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবে। চোখের যিনা হলো তাকানো, জিহ্বার যিনা হলো কথা বলা, কুপ্রবৃত্তি কামনা ও খাহেশ সৃষ্টি করে এবং যৌনাঙ্গ তা সত্য মিথ্যা প্রমাণ করে।[১৫৫৪] অর্থাৎ অপরিচিত বা গায়রে মুহরিম নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের প্রতি দেখা হলো চোখের যিনা। কারণ চোখ শরীরের এমন অঙ্গ যার প্রভাব অন্তরে বেশী পতিত হয়। তাছাড়া চোখের যিনা হলো মূল যিনার আহবায়ক। চোখের যিনা থেকেই ধীরে ধীরে বাস্তব যিনা সংঘটিত হয়। তাই শরীয়তে এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে হঠাৎ কোন নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়লে এবং সাথে সাথে দৃষ্টি ফিরে নিলে তাতে কোন গুনাহ নেই। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ হাদিসে কুদসাতে এরশাদ করেন النظرة سهم مسموم من سهام ابليس من تركها من مخافتى ابدلته ايمانًا يجدله حلاوته فى قلبه দৃষ্টি হলো শয়তানের বিষাক্ত তীরসমূহের একটি তীর। যে আমার (আল্লাহর) ভয়ে (অপরিচিত মহিলাকে) দেখা থেকে বিরত থাকবে, এর বিনিময়ে তাকে এমন ঈমান দান করবো যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করবে।[১৫৫৫]

হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ'র কাছে হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে দ্রুত দৃষ্টি ফিরাতে নির্দেশ প্রদান করেন।[১৫৫৬] রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.) কে বললেন يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ হে আলী! একবার দৃষ্টি পড়ার পর দ্বিতীয় বার দৃষ্টি দিওনা। কেননা, তোমার প্রথম দৃষ্টি মাফ কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি মাফযোগ্য নয়।[১৫৫৭] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, বিদায় হজ্বের সময় হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূল ﷺ'র পিছে একই সওয়ারীতে ছিলেন। খাসয়াম গোত্রের এক মহিলা এসে রাসূল ﷺ থেকে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করল। হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা.) মহিলার দিকে দেখতে লাগলেন এবং ঐ মহিলাও তার দিকে দেখতে লাগল। وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ তখন নবী করিম ﷺ ফযল (রা.)'র

[১৫৫৪]. ইমাম বুখারী (র.), (২৫৬ হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পৃ-৯২২-২৩, হাদিস নং-৫৮০৯
[১৫৫৫]. ইমাম হায়সামী (র.), (৮০৭ হি.), মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড-৮, পৃ-৬৩
[১৫৫৬]. ইমাম মুসলিম(র.), (২৬১ হি.), সহীহ মুসলিম শরীফ, খণ্ড-২, পৃ-২১২
[১৫৫৭]. ইমাম তিরমিযী (র.), (২৭৯ হি.), জামে তিরমিযী, পৃ-৩৯৫

চেহারাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন।[১৫৫৮] হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ'র নিকট তিনি এবং হযরত মাইমুনা (রা.) উপস্থিত ছিলেন। এ সময় (অন্ধ সাহাবী) আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মকতুম (রা.) আগমন করলেন فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجِبَا مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ তখন রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা তাঁর থেকে পর্দা কর। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ইনি কি অন্ধ নন? ইনিতো আমাদেরকে দেখছেন না এবং চিনছেন না। তখন তিনি বললেন, তোমরা দু'জনই কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতেছ না? হাদিসটি বিশুদ্ধ।[১৫৫৯] উক্ত হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যেভাবে পুরুষ নারীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া নিষেধ অনুরূপভাবে মহিলারাও পুরুষের দিকে তাকানো নিষেধ।

ইস্তেগফার ও তাওবা

ইস্তেগফার অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাওবা অর্থ ফিরে আসা। তাওবা ক্রিয়ার কর্তা যদি বান্দা হয়, তখন অর্থ হবে গুনাহের কাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করা, গুনাহ পরিত্যাগ করা। তাওবা ক্রিয়ার কর্তা যদি আল্লাহ হয়, তখন অর্থ হবে তাওবা কবুল করা ও অনুগ্রহ করা। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে তাওবার পূর্বে ইস্তেগফারের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন– وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তার নিকট তাওবা কর। তাহলে তিনি তোমাদেরকে নির্দ্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন এবং প্রত্যেক অধিক আমলকারীকে বেশী করে দেবেন।[১৫৬০] হযরত হুদ (আ.) তার জাতিকে উদ্দেশ্যে করে বলেন وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তারই নিকট তাওবা কর। তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন।[১৫৬১]

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন- وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا আর সেসব লোক নিজেদের উপর অনিষ্ট করে যদি আপনার কাছে আসত, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও

[১৫৫৮]. ইমাম বুখারী (র.), (২৫৬ হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পৃ-৯২০ ও খণ্ড-১, পৃ-২০৫ ও ২৫০
[১৫৫৯]. ইমাম তিরমিযী (র.), (২৭৯ হি.) জামে তিরমিযী, পৃ-৩৯৫
[১৫৬০]. সূরা হুদ, আয়াত, ৩
[১৫৬১]. সূরা হূদ, আয়াত, ৫২

তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন, তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত।[১৫৬২] উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা প্রার্থনা করাকে তাওবার পূর্বে উল্লেখ করেছেন। কারণ ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমেই তাওবা করতে হয়। বান্দা যখন কৃত গুনাহের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তায়ালা ঐ বান্দার প্রতি অত্যন্ত দয়াবান হন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ। তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, দয়ালু।[১৫৬৩] হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً» আমি রাসূল ﷺ'কে বলতে শুনেছি- আল্লাহর কসম! আমি দৈনিক সত্তর বারের বেশী আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করি।[১৫৬৪] ইস্তেগফারের ফযিলত সর্ম্পকে বুখারী শরীফে হযরত শাদ্দাদ বিন উস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- সর্বোত্তম ইস্তেগফার হলো বান্দার এই দোয়া পড়া اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ! হে আল্লাহ! আপনিই আমার প্রতিপালক। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার গোলাম। আমি যথাসাধ্য আপনার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি। আপনি আমার প্রতি আপনার যে নিয়ামত দিয়েছেন তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। কারণ আপনি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবেনা।

যে ব্যক্তি দিনের (সকাল) বেলায় দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে এ ইস্তেগফার পড়বে আর সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই সে মারা যায়, তবে সে জান্নাতী হবে। আর যে ব্যক্তি রাতের (প্রথম) বেলায় দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে এ দোয়া পড়বে আর ভোর হওয়ার পূর্বেই সে মারা যায়, তবে সে জান্নাতী হবে।[১৫৬৫] হযরত গাউসুল আযম দস্তগীর আব্দুল কাদের জিলানী (র.) বলেন - প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তাওবা ফরযে আইন। কারণ কোন ব্যক্তি গুনাহ থেকে মুক্ত নয়।

[১৫৬২]. সূরা নিসা, আয়াত, ৬৪
[১৫৬৩]. সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত, ২০
[১৫৬৪]. ইমাম বুখারী (রা.) (২৫৬ হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পৃ-৯৩৩, হাদিস নং-৫৮৬৮
[১৫৬৫]. ইমাম বুখারী (র.), (২৫৬ হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পৃ-৯৩৩, হাদিস নং-৫৮৬৭

আল্লামা ইমাম নববী (র.) বলেন, ওলামাগণের মতে সব ধরণের গুনাহ থেকে তাওবা করা ওয়াজিব। গুনাহ যদি আল্লাহর হক সর্ম্পকিত হয় তাহলে তিনটি শর্ত রয়েছে। প্রথমত, গুনাহ পরিত্যাগ করা, দ্বিতীয়তঃ কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং তৃতীয়ত, ঐ গুনাহের কাজে পুনরাবৃত্তি না ঘটার প্রতিজ্ঞা করা। এ তিনটি থেকে কোন একটি পাওয়া না গেলে তাওবা শুদ্ধ হবে না। আর যদি গুনাহ বান্দার হক সর্ম্পকীয় হয়, তবে হকদার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।[১৫৬৬]

ইমাম গাযযালী (র.) বলেন, তাওবার রোকন হলো চারটি। প্রথমত, সংঘটিত গুনাহের কারণে লজ্জিত হওয়া, দ্বিতীয়ত, ঐ গুনাহ তাৎক্ষণিক ভাবে পরিত্যাগ করা, তৃতীয়ত, ভবিষ্যতে ঐ গুনাহ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা এবং চতুর্থত, যথাসম্ভব ঐ গুনাহের তদারকী ও ক্ষতিপূরণ করা। যেমন নামায ছুটে গেলে তাড়াতাড়ি কাযা করা। কারো সম্পদ ছুরি করলে, তা তাড়াতাড়ি ফেরত দেওয়া এবং কাউকে গালি দিলে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।[১৫৬৭] নবীগণ ব্যতীত সকলেই গুনাহ করে, গুনাহ ছোট হোক বড় হোক। তবে কোন গুনাহকেই ছোট ও তুচ্ছ মনে করা উচিত নয় বরং প্রত্যেক গুনাহকে মহাপাপ মনে করে সাথে সাথে তাওবা করা উচিত। বান্দাহ কোন গুনাহকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করলে আল্লাহর নিকট তা বড় গুনাহে পরিণত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বান্দা গুনাহকে বড় মনে করলে আল্লাহর নিকট তা ছোট ও তুচ্ছ হয়ে যায়। সাধারণত মু'মিন ব্যক্তিরা ছোট গুনাহকেও বড় মনে করে আর পাপিষ্ট ব্যক্তিরা বড় গুনাহকেও ছোট মনে করে। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন– «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ» মু'মিন ব্যক্তি তার গুনাহ গুলোকে এত বিরাট মনে করে যেন সে একটা পাহাড়ের নিচে বসে আছে। আর সে আশংকা করছে যে, সম্ভবত: পাহাড়টা তার উপর ধ্বসে পড়বে। আর পাপিষ্ট ব্যক্তি তার গুনাহ গুলোকে মাছির মত (তুচ্ছ) মনে করে, যা তার নাকে বসে চলে যায়।[১৫৬৮]

তাওবা ও তাওবাকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– «اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ، سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ» আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তাওবার কারণে সেই লোকটির চেয়ে বেশী খুশী হন, যে মরুভূমিতে তার উট হারিয়ে পরে তা পেয়ে যায়।[১৫৬৯] আল্লাহ

[১৫৬৬]. ইয়াহিয়া ইবনে শরফ নববী (র.), (৬৭৬ হি.), রিয়াযুস সালেহীন, বৈরুত, পৃ–১৫
[১৫৬৭]. ইমাম গাযযালী (র.) (৫০৫ হি), এয়াহিয়াউল উলুম, সার সংক্ষেপ, খণ্ড-৮, পৃ-৫০০
[১৫৬৮]. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পৃ-৯৩৩, হাদিস নং-৫৮৬৯
[১৫৬৯]. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পৃ-৯৩৩, হাদিস নং-৫৮৭০

তায়ালা বলেন–إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবাকারী ও অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন।[১৫৭০] রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ العَبْد المُؤمن من المفتَّنِ التواب নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ঐ মু'মিন বান্দাকে ভালবাসেন, যে গুনাহে লিপ্ত হয়ে অধিক পরিমাণে তাওবা করে।[১৫৭১] কিয়ামত পর্যন্ত তাওবার দরজা উন্মুক্ত থাকবে। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে ব্যক্তি গুনাহ মাফের জন্য তাওবা করবে, আল্লাহ তায়ালা তার তাওবা কবুল করবেন।[১৫৭২] তাওবা হলো সফলতার চাবিকাঠি। আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[১৫৭৩] তাওবা দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ আর তিনি (আল্লাহ) তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, পাপ সমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।[১৫৭৪] আল্লাহ তায়ালা বলেন– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে তাওবা কর– আন্তরিক তাওবা। আশা করা যায় তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের গুনাহগুলো মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নদী প্রবাহিত।[১৫৭৫] উপরোক্ত আয়াতে তাওবাকারীর জন্যে দু'টি পুরষ্কারের কথা বলা হয়েছে। প্রথমটি হলো গুনাহ মার্জনা আর দ্বিতীয়টি হলো সকল মু'মিনের একান্ত কাম্য জান্নাতে প্রবেশ। তাওবা দ্বারা বান্দা গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়ে যায়। সুতরাং তাওবা করার পর পুনরায় গুনাহ করা অনুচিত। যদি পুনরায় গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায় তবে পুনরায় তাওবা করতে হবে। এ ব্যাপারে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে– হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– নিশ্চয় বান্দা একটি গুনাহ করার পর আল্লাহর নিকট আরয করে, হে প্রভু! আমি গুনাহ করেছি, আপনি তা ক্ষমা করে দিন। তখন তার প্রভু বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তার প্রভু গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং

[১৫৭০]. সূরা বাকারা, আয়াত-১২২
[১৫৭১]. বায়হাকী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-২০৬
[১৫৭২]. বুখারী শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-২০৩
[১৫৭৩]. সূরা নূর, আয়াত-৩১
[১৫৭৪]. সূরা আশ শুরা, আয়াত-২৫
[১৫৭৫]. সূরা আত্ তাহরীম, আয়াত-৮

এজন্যে তাকে পাকড়াও করবেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর বান্দা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী অবস্থান করেন। তারপর সে পুনরায় গুনাহ করে আর আরয করে হে প্রভু! আমি গুনাহ করে ফেলেছি। আপনি তা ক্ষমা করে দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তার প্রভু গুনাহ ক্ষমা করেন এবং এ জন্যে তাকে পাকড়াও করবেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। তারপর যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা অবস্থান করেন। অতঃপর পুনরায় গুনাহ করে ফেলে। আর আরয করে, হে প্রভু! আমি গুনাহ করে ফেলেছি। আপনি তা ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তার প্রভু গুনাহ ক্ষমা করেন এবং এ জন্যে তাকে পাকড়াও করবেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। সুতরাং সে যা চায় তা করতে পারবে।[১৫৭৬]

তবে এরূপ ইচ্ছাকৃত বারংবার গুনাহ করে তাওবা করা আল্লাহর সাথে উপহাস করার সমতুল্য। তাওবার মূল উদ্দেশ্যই হলো গুনাহ পরিত্যাগ করা এবং কৃত গুনাহের কারণে লজ্জিত হওয়া। তবে শয়তানের প্ররোচনায় পরে অনিচ্ছাকৃতভাবে বার বার গুনাহ সংঘটিত হলে বার বার তাওবা করা যাবে এবং আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করবেন। হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, শয়তান বলেছে হে প্রভু! তোমার ইজ্জতের শপথ, আমি তোমার বান্দাকে পথভ্রষ্ট করব যতক্ষণ তাদের শরীরে প্রাণ থাকবে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার ইজ্জতের, আমার জালালিয়তের এবং উচ্চ মর্যাদার শপথ! আমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব, যতক্ষণ তারা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।[১৫৭৭]

আল্লাহ তায়ালা বলেন- أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ তোমাদের যে কেউ অজ্ঞতাবশত কোন মন্দ কাজ করে, অতঃপর তাওবা করে নেয় এবং সৎ ও সংশোধন হয়ে যায়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়।[১৫৭৮]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ অব্যশই আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে। অতঃপর অনতিবিলম্বে তাওবা করে, এরাই হলো সেসব লোক, যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।[১৫৭৯]

[১৫৭৬]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-২০৩
[১৫৭৭]. ইমাম আহমদ(রা.), সূত্র- মিশকাত শরীফ, পৃ-২০৪
[১৫৭৮]. সূরা আল আনআম, আয়াত-৫৪০
[১৫৭৯]. সূরা নিসা, আয়াত-১৭

উপরোক্ত আয়াতে প্রতীয়মান হয় যে, গুনাহের সাথে সাথেই কাল বিলম্ব না করে দ্রুত তাওবা করে নেওয়া উচিত। এতে তাওবা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। হযরত আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ গুনাহ থেকে তাওবাকারী সে ব্যক্তির ন্যায় যার কোন গুনাহই নেই।[১৫৮০]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» প্রত্যেক আদম সন্তান পাপ করে থাকে, আর পাপীদের মধ্যে তারাই অধিক ভাল যারা তাওবা করে।[১৫৮১]

তাওবার সবচেয়ে বড় উপকারীতা হলো খালিস অন্তরে তাওবা করে ঈমান আনলে এবং সৎকাজ করলে আল্লাহ তায়ালা তাদের গুনাহসমূহকে নেকীতে রূপান্তর করে দেবেন। পবিত্র কুরআনে কারীমে আছে- إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا কিন্তু যারা তাওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের গুনাসমূহকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন।[১৫৮২]

বান্দার গুনাহ যত বেশী হোকনা কেন তা আল্লাহর রহমতের সামনে অতি নগণ্য ও তুচ্ছ। তাই কোন অবস্থাতেই আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হতে নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন- لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হইওনা। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।[১৫৮৩] রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, বনী ইস্রাঈলের এক ব্যক্তি নিরান্নবই জন মানুষকে হত্যা করার পর তাওবার উদ্দেশ্যে বের হলো। একজন যাহেদ ও আবেদ ব্যক্তির নিকট গিয়ে নিজের অবস্থা বর্ণনা করে এবং তাওবা কবূল হওয়ার কোন পদ্ধতি আছে কিনা জানতে চাইল। আবেদ বললেন, তোমার তাওবা কবুল হবে না। সে আবেদকেও হত্যা করে একশটি পূর্ণ করল। তারপর কোন আল্ল-াহওয়ালাকে তালাশ শুরু করল। তখন একব্যক্তি তাকে বলল, তুমি অমুক গ্রামে চলে যাও। সেখানে একজন বুযূর্গ আলিম আছেন, যিনি তোমাকে তাওবার পদ্ধতি বলে দেবেন। অতঃপর সে ঐ গ্রামের দিকে যাত্রা করল। কিছু পথ অতিক্রম করার পর সে মৃত্যু বরণ করল এবং সে তার বক্ষ ঐ গ্রামের দিকে কিছুটা ঝুঁকে দিল। এসময় রহমতের

[১৫৮০]. ইবনে মাজাহ, সূত্র-মিশকাত শরীফ, পৃ-২০৬
[১৫৮১]. তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, সূত্র-মিশকাত শরীফ, পৃ-২০৪
[১৫৮২]. সূরা আল ফুরকান, আয়াত-৭০
[১৫৮৩]. সূরা যুমার, আয়াত-৫৩

ফেরেশ্‌তা ও আযাবের ফেরেশ্‌তা এসে ঝগড়ায় লিপ্ত হল। আযাবের ফেরেশ্‌তা লোকটাকে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন আর রহমতের ফেরেশ্‌তা তাকে তাওবাকারী সাব্যস্ত করে নেককার বলে দাবী করলেন। তখন তার এলাকা ও ঐ গ্রামের মধ্যেবর্তী স্থানকে মেপে দেখার হুকুম দেওয়া হল। আর আল্লাহ তায়ালা ঐ আলিমের গ্রামকে সেই ব্যক্তির নিকটবর্তী হয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন। ফেরেশ্‌তাদ্বয় যখন মেপে দেখলেন তখন লোকটিকে ঐ আলিমের গ্রামের দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী পেলেন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাওবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন।[১৫৮৪]

একদিন হযরত মুসা (আ.)'র সময়কালে বনী ইস্রাঈলের এলাকায় অনাবৃষ্টি হয়েছিল। হযরত মুসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজন নিয়ে বৃষ্টিপাতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন কিন্তু কোথাও কোন বৃষ্টিপাতের আলামত দেখা যাচ্ছিল না। তখন তিনি হযরত মুহাম্মদ ﷺ'র উসিলায় দোয়া করলেন- এভাবে হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমার কোন সম্মান না থাকলেও হযরত মুহাম্মদ ﷺ'র সম্মানের উসিলায় আমাদের দোয়া কবুল করুন। তখন আল্লাহ তায়ালা অহী প্রেরণ করে বলেন, হে মুসা! তোমার সম্মানও আছে আমার নিকট। তবে তোমাদের উপস্থিত লোকদের মধ্যে একব্যক্তি চল্লিশ বছর যাবৎ আমার অবাধ্যতা করছে অর্থাৎ গুনাহ করছে। তার কারণে তোমাদের দোয়া কবুল হচ্ছেনা। তখন হযরত মুসা (আ.) লোকদের সম্বোধন করে বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে আছ, যে বিগত চল্লিশ বছর যাবৎ আল্লাহর নাফরমানী করছ? সে আমাদের মজলিস হতে উঠে চলে যাও। নতুবা আমাদের দোয়া কবুল হবেনা। লোকটি মনে মনে বললো এখন যদি আমি মজলিস থেকে উঠে যাই, তাহলে সকলের কাছে আমি পাপী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাবো। তখন লোকটি মাথায় কাপড় ঢেকে দিয়ে মনে মনে আল্লাহর কাছে তাওবা করল এবং কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হলো। এরপর বৃষ্টিপাত আরম্ভ হলো। মুসা (আ.) আল্লাহকে বললেন, হে আল্লাহ! একটু আগে বলেছিলেন সে গুনাহগারের কারণে দোয়া কবুল হচ্ছেনা ফলে বৃষ্টিপাত বন্ধ রয়েছে। এখন কি কারণে বৃষ্টিপাত হচ্ছে? আল্লাহ তায়ালা বললেন সেই গুনাহগারের কারণেই বৃষ্টিপাত হচ্ছে। কারণ সে মনে মনে খালিস নিয়্যতে তাওবা করেছে। তখন মুসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ! সে ভাগ্যবান ব্যক্তি কে? আমাকে পরিচয় করিয়ে দিন। আল্লাহ বলেন, হে মুসা! যাকে গুনাহগার অবস্থায় আমি লজ্জিত করিনি এখন যখন সে তাওবা করে আমার বন্ধু হয়ে গেছে এখন কিভাবে তাকে পরিচয় করিয়ে লজ্জিত করবো? [১৫৮৫]

[১৫৮৪]. বুখারী ও মুসলিম, সুত্র: মিশকাত শরীফ ,পৃ-২০৩
[১৫৮৫]. আব্দুর রহমান সফূরী (রা.), (৮৯৪ হি.), নুযহাতুল মাজালিস, খণ্ড-২, পৃ-৪৩

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, সূরা নিসার চারটি আয়াত মুসলমানদের জন্য সারা দুনিয়ার চেয়ে উত্তম। (১) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তার সাথে শরীক করে। এছাড়া বাকী সব পাপ তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন। আর যে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল সে যেন অপবাদ আরোপ করল।[১৫৮৬]

(২) وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

আর সেসব লোক যখন নিজেদের উপর অত্যাচার (গুনাহ) করে যদি আপনার কাছে আসত, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও যদি তাদের ক্ষমা করে দিতেন, তাহলে অব্যশই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী মেহেরবানরূপে পেত।[১৫৮৭]

(৩) إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

তোমরা যদি তোমাদের নিষিদ্ধ কাজগুলোর মধ্যে গুরুতরগুলো (কবীরা গুনাহসমূহ) পরিহার কর, তাহলে আমি তোমাদের অন্যান্য গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদেরকে সম্মানিত স্থানে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবো।[১৫৮৮]

(৪) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

কোন ব্যক্তি অপর্কম করে কিংবা নিজের উপর অত্যাচার করে অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল অতি দয়ালু পাবে।[১৫৮৯]

এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ

▪ ইমাম গুনদর (র.)	১ যিলকদ	১৯৩ হিজরি
▪ মুফতি আমজাদ আলী (র.)	২ যিলকদ	
▪ সৈয়দ আহমদ সিরিকোটি (র.)	১১ যিলকদ	১৩৮০ হিজরি
▪ হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.)	১৯ যিলকদ	
▪ হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (র.)	২০ যিলকদ	৭৪৬ হিজরি
▪ আল্লামা শামী (র.)	২৩ যিলকদ	১৩০৬ হিজরি
▪ হযরত আমীর হামযা (রা.)	২৭ যিলকদ	৩ হিজরি
▪ হযরত আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (র.)	২৭ যিলকদ	১৩২৩ হিজরি

[১৫৮৬]. সূরা নিসা, আয়াত-৪৮
[১৫৮৭]. সূরা নিসা, আয়াত-৬৪
[১৫৮৮]. সূরা নিসা, আয়াত-৩১
[১৫৮৯]. সূরা নিসা, আয়াত-১১০, ফকীহ আবূল লাইস সমরকন্দী (র.), তাম্বীহুল গাফেলীন, আরবী, বৈরুত, পৃ-৫২

যিলহজ্জ

'যিলহজ্জ' মাস হজ্জের মাস। এ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি চন্দ্র মাসের সর্বশেষ মাস। বিশেষত এ মাসের প্রথম দশদিনের ফযিলত সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– وَالْفَجْرِ ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ ফজরের শপথ! দশরাত্রির শপথ।[১৫৯০]

ইবনে আব্বাস (রা.) মুজাহিদ ও ইকরামা (র.)'র মতে وَلَيَالٍ عَشْرٍ দ্বারা যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ রাত উদ্দেশ্য। আল্লাহর বাণী وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ দ্বারা যিলহজ্জ মাসের দশদিন বুঝানো হয়েছে আর أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ দ্বারা আইয়্যামে তাশরীককে বুঝানো হয়েছে।[১৫৯১] আল্লাহর বাণী وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ দ্বারা জমহুর ওলামাদের মতে, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন।[১৫৯২] বুখারী শরীফে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– قَالَ: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟» قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلاَ الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের আমল অন্যান্য দিনের আমলের তুলনায় উত্তম। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, জিহাদও কি (উত্তম) নয়? নবী করিম ﷺ এরশাদ করলেন– জিহাদও উত্তম নয়। তবে সে ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র, যে নিজের জান ও মালের ঝুকিঁ নিয়েও জিহাদ করে কিছুই নিয়ে ফিরে আসেনা অর্থাৎ শাহাদাত বরণ করে।[১৫৯৩]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের ইবাদতের চেয়ে আল্লাহর কাছে অন্য কোন ইবাদত অতি প্রিয় নয়। এ দিনগুলোতে রোযা রাখলে পুরো বছর রোযা রাখার সমান সওয়াব পাওয়া যায় এবং এ রাতগুলোতে কিয়ামুল লাইল করলে লাইলাতুল কদরে কিয়ামুল লাইলের সমান সওয়াব পাওয়া যায়।[১৫৯৪] হযরত

[১৫৯০]. সূরা ফজর, আয়াত: ১-২
[১৫৯১]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬ হি) বুখারী শরীফ, অনুচ্ছেদ নং-৬১২
[১৫৯২]. সূরা হাজ্জ, আয়াত-২৮
[১৫৯৩]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬ হি) বুখারী শরীফ, অনুচ্ছেদ নং-৬১২
[১৫৯৪]. আবু ঈসা তিরমিযী (র.), তিরমিযী শরীফ, ৩/১২২/৭৫৮ ও ইবনে মাজাহ (র.), ইবনে মাজাহ শরীফ, সিয়াম, ১/৫৫১/৭২৮)

আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, যিলহজ্জ মাসের প্রতিটি দিন অন্য মাসের এক হাজার দিনের সমান আর আরাফার দিন হলো অন্য মাসের ফযিলতের দিক দিয়ে দশ হাজার দিনের সমান।[১৫৯৫]

হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের মধ্যে একদিনের রোযা অন্য সময়ের দু'মাস রোযা রাখার সমান। নবী করিম ﷺএর কোন কোন স্ত্রী থেকে বর্ণিত আছে যে, ان النبى صلى الله عليه وسلم كان لايدع صيام تسع ذي الحجَّة নবী করিম ﷺ যিলহজ্জ মাসের প্রথম নয় দিনের রোযা তরক করতেন না।[১৫৯৬]

যিলহজ্জের প্রথম দশদিন রোযা রাখা বলতে প্রথম নয় দিন উদ্দেশ্য। কেননা দশ তারিখ হলো কুরবানী। এদিন রোযা রাখা সম্পূর্ণ নিষেধ। ইমাম আহমদ (র.) ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন– عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ من التهليل والتكبرو الحميد নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের আমলের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক প্রিয় কোন আমল আল্লাহর নিকট নেই। অর্থাৎ এই দিনগুলোর আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।[১৫৯৭]

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– مَا مِنْ اَيَامٍ اَفضل عندَ الله من ايام عشر ذي الحجَّة আল্লাহর নিকট যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের ফযিলত সবচেয়ে বেশী।[১৫৯৮]

হযরত কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা কালের মধ্যে শাহরুল হারামকে পছন্দ করেছেন, শাহরুল হারামের মধ্যে যিলহজ্জকে পছন্দ করেছেন এবং যিলহজ্জ মাসের মধ্যে প্রথম দশদিনকে পছন্দ করেছেন[১৫৯৯]

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, مَا مِنْ الشهور شهر اعظم حرمة من ذي الحجَّة মাসসমূহের মধ্যে সম্মানের দিক দিয়ে যিলহজ্জ মাস উত্তম।[১৬০০]

আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন– سيد الشهور رمضان واعظمها حرمة ذو الحجة রমযান মাস হলো সকল মাসের সর্দার তথা শ্রেষ্ঠ আর সম্মানের দিক দিয়ে যিলহজ্জ মাস হলো সর্বোত্তম।[১৬০১] হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) বলেন–

[১৫৯৫]. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫ হি), লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ-৪২৯
[১৫৯৬]. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫ হি), লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ-৪২৯
[১৫৯৭]. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি) আল মুসনাদ, ২/৭৫, ১৩১
[১৫৯৮]. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫ হি), লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ-৪৩৬
[১৫৯৯]. ইমাম নাসাঈ (র.) (৩০৩ হি), নাসাঈ শরীফ, ৬/২১১
[১৬০০]. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫ হি), লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ-৪৩৮
[১৬০১]. ইমাম বায়হাকী (র.), শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৫৫

যিলহজ্জের প্রথম দশরাতে তোমরা রাত্রি বেলায় চেরাগ নিভাইওনা অর্থাৎ ইবাদতের জন্য জাগ্রত থাক। এই দশদিন ও রাতে ইবাদত করা খুবই পছন্দনীয় ছিল তাঁর। তিনি তাঁর খাদেমগণকেও রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করতে আদেশ করতেন।[১৬০২] গাউসে পাক (র.) বলেন, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনকে সম্মান করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে দশটি বস্তু দান করবেন। ১. হায়াতের বরকত, ২. সম্পদে বরকত, ৩. পরিবার পরিজনের হেফাজত, ৪. গুনাহের কাফ্ফারা, ৫. নেক আমল বৃদ্ধি, ৬. মৃত্যুকালীন সাকারাত সহজ, ৭. অন্ধকারে আলো, ৮. মীযানে নেকীর পাল্লা ভারী, ৯. দোযখ থেকে নাজাত এবং ১০. জান্নাতে উচুঁ মর্যাদা লাভ ইত্যাদি। যে ব্যক্তি এই দশ দিনে কোন মিসকিনকে খাবার দিল সে যেন স্বীয় পয়গম্বরের সুন্নতের উপর সদকা করল, যে এই দিন সমূহে কোন রোগীর সেবা করল, সে যেন আউলিয়া আল্লাহ ও আবদালের সেবা করল, যে কোন জানাযায় অংশগ্রহণ করল সে যেন শহীদদের জানাযায় অংশগ্রহণ করল। যে কোন মু'মিনকে কাপড় পরিধান করালো, আল্লাহ তায়ালা তাকে নিজের পক্ষ থেকে খিলআত পরিধান করাবেন। যে কোন ইয়াতীমের প্রতি দয়া প্রর্দশন করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে আরশের নিচে দয়া প্রর্দশন করবেন। যে ব্যক্তি কোন আলিমের মজলিসে এই দশদিনে অংশগ্রহণ করবে, সে যেন আম্বিয়ায়ে কিরামের মজলিসে অংশগ্রহণ করলো।[১৬০৩]

আরফা দিবস

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।[১৬০৪]

এ আয়াতটি হিজরতের দশম বছর বিদায় হজ্জের আরফার দিন অবতীর্ণ হয়। এদিনটি পুরো বছরের মধ্যে সর্বোত্তম দিন। ঐ দিনটি ছিল শুক্রবার, স্থানটি হচ্ছে ময়দানে আরাফা, জবলে রহমতের সন্নিকটে আর সময়টি ছিল আসরের পর যা দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ সময়। এ আয়াত অবতীর্ণের পর আর কোন বিধি-বিধান সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়নি। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ মাত্র একাশি দিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। কেননা দশম হিজরির ৯ তারিখে এ আয়াত নাযিল হয় আর একাদশ হিজরির ১২ই রবিউল আউয়াল তিনি ইন্তেকাল করেন।

'আরফা' শব্দের অর্থ হলো পরিচিতি। হযরত দ্বাহ্হাক (র.) বলেন, হযরত আদম (আ.)কে হিন্দুস্থানে এবং হাওয়া (আ.)কে জিদ্দায় অবতরণ করা হয়েছিল। তারা পরস্পর পরস্পরকে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে একদিন উভয়ে আরফার ময়দানে আরফার দিনে

[১৬০২]. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দু, পৃ-৩৮২
[১৬০৩]. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দু, পৃ-৩৮৫
[১৬০৪]. সূরা মায়িদা, আয়াত-৩

মিলিত হলেন এবং একে অপরের মধ্যে পরিচয় ঘটল। এ কারণে ঐ স্থানের নাম হলো আরফা আর ঐ দিনের নাম হলো আরফার দিন। আরফা নামকরণ সম্পর্কে 'গুনিয়াতুত তালেবীন' গ্রন্থে আরো বহু কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই দিনের ফযিলত সম্পর্কে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে- قَالَت اليَهُودُ لعُمَرَ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِينَا لاَتَّخَذْنَاهَا عِيدًا، فَقَالَ عُمَرُ: " إِنِّي لَأَعْلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتْ، وَأَيْنَ أُنْزِلَتْ، وَأَيْنَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَتْ: يَوْمَ عَرَفَةَ وَإِنَّا وَاللَّه بِعَرَفَةَ – قَالَ سُفْيَانُ: وَأَشُكُّ – كَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَمْ لاَ " {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} ইহুদিগণ হযরত ওমর (রা.)কে বলল যে, আপনারা এমন একটি আয়াত পড়ে থাকেন তা যদি আমাদের উপর নাযিল হতো, তবে আমরা সেটাকে ঈদ করে রাখতাম। হযরত ওমর (রা.) বললেন, এটা কখন এবং কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে আর নাযিলের সময় রাসূল ﷺ কোথায় ছিলেন তা আমি জানি। আল্লাহর শপথ! আমরা সবাই এ সময় আরাফাতে ছিলাম। সেই আয়াতটি হলো- {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}[১৬০৫] অন্য বর্ণনায় আছে হযরত ওমর (রা.) বলেন, এ আয়াত আরাফার ময়দানে জুমার দিন নাযিল হয়েছিল। আল্লাহর শোকর যে এ উভয় দিন (জুমা ও আরফা) আমাদের জন্য ঈদের দিন। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমানও পৃথিবীতে থাকবে এ দিন দু'টি মুসলমানের জন্য ঈদের দিন হিসেবেই থাকবে।[১৬০৬] হযরত শায়খ হেবাতুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আরফা দিবসের চেয়ে উত্তম কোন দিন নেই। এই দিনে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীবাসীকে নিয়ে আসমানবাসীদের উপর গর্ব করে বলেন, তোমরা আমার ঐসব বান্দাদেরকে দেখ, যারা বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো চুল নিয়ে অনেক দূর-দুরান্ত থেকে আমার রহমতের আশা নিয়ে এবং শাস্তির ভয় নিয়ে আমার কাছে এসেছে। সুতরাং আরফা দিবসের চেয়ে বেশী দোযখ থেকে মুক্তির আর কোন দিন নেই। এই দিন যে পরিমাণ লোক দোযখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে অন্য কোন দিন করবে না।[১৬০৭]

হযরত নাফে (রা.) হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা আরফার দিন স্বীয় বান্দার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। যার অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমান থাকবে তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেয়া হয়। নাফে বলেন, আমি ইবনে ওমর (রা.)কে জিজ্ঞাসা করলাম, এই ক্ষমা কি সকল ঈমানদারদের জন্য নাকি শুধু আরফাবাসীদের জন্য খাস? উত্তরে তিনি বলেন, এই ক্ষমা সকল ঈমানদারদের জন্য।[১৬০৮]

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আরফার দিন আল্লাহ তায়ালা নীচের আসমানে এসে হাজীদেরকে নিয়ে ফেরেশ্‌তাদের

[১৬০৫]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬ হি) বুখারী শরীফ, হাদিস নং-৪২৫১
[১৬০৬]. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দু, পৃ-৩৯৫
[১৬০৭]. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দু, পৃ-৩৯৭
[১৬০৮]. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দু, পৃ-৩৯৭

উপর গর্ব করেন আর বলেন, হে আমার ফেরেশ্‌তারা! তোমরা আমার ঐসব বান্দাদেরকে দেখ, কিভাবে তারা দূর-দূরান্ত থেকে হয়রান-পেরেশান হয়ে এসেছে। এরা আমার নেয়ামতের ও আযাব থেকে মুক্তির আশা পোষণ করে। যার সাক্ষাতে কেউ আসলে তার উপর কর্তব্য হয়ে যায় যে, আগন্তুককে সম্মান করা এবং মেজবানের উপর কর্তব্য হলো মেহেমানকে সম্মান করা। অতএব তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম, তাদের মেহমানদারীর খাবার জান্নাতে নির্ধারণ করে দিলাম। এতে ফেরেশ্‌তারা আরয করবেন- হে পরওয়ারদিগার! এদের মধ্যে তো অহংকারী মহিলাও রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি তাদেরকেও ক্ষমা করে দিলাম। দোযখ থেকে মুক্তির জন্য আরফার দিনের চেয়ে উত্তম কোন দিন নেই।[১৬০৯]

আল্লাহর বাণী- الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ শপথ! প্রতিশ্রুতি দিবসের আর সেই দিবসের, যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত হয়।[১৬১০]

মুসনদে ইমাম আ'যম এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে- الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ দ্বারা কিয়ামতের দিন الشاهد দ্বারা আরফার দিন এবং المشهود দ্বারা জুমার দিন উদ্দেশ্য।[১৬১১]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, قَالَ النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, আরফার দিবসের চেয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের জন্য অন্য কোন দিন নেই। সহীহ মুসলিম শরীফে আবু কাতাদা (রা.) নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ الَّتِي بَعْدَهُ নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, আরফা দিবসে রোযা রাখলে আশা করি আল্লাহ তায়ালা রোযাদারের এক বছর আগের ও এক বছর পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।[১৬১২]

অনেকেই হাজী সাহেবদের জন্য এই দিনে রোযা রাখা মাকরূহ বলেছেন। কারণ এদিনে তাদেরকে অধিকহারে যিকর, দোয়া ও মুনাজাতে লিপ্ত থাকতে হয়। রোযার কারণে যাতে তারা দুর্বল হয়ে না যায় তবে যারা সামর্থবান তথা রোযার কারণে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে না তাদের জন্য রোযা রাখাই উত্তম।

[১৬০৯]. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দু, পৃ-৩৯৮
[১৬১০]. সূরা বুরুজ, আয়াত; ২-৩
[১৬১১]. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি) আল-মুসনাদ, ২/২৯৮ এবং ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি) তিরমিযী শরীফ, ফি আত্-তাফসীর, ৫/৪৩৬
[১৬১২]. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫ হি) লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ-৪৬৩ এবং আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দু, পৃ-৪০০

হজ্ব

হজ্ব ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ। এর শাব্দিক অর্থ হল সংকল্প করা। আর পারিভাষিক অর্থ হল زِيارة مكان مخصوصٍ بفعل مخصوص بزمانٍ مخصوص او هو قصد بيت الله تعالى بصفات مخصوصة في وصفٍ بشرائط مخصوصه নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাদির মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্থান তথা বাইতুল্লাহ্ শরীফ যিয়ারত করা অথবা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে বাইতুল্লাহ যাওয়ার সংকল্প করাকে হজ্ব বলা হয়।[১৬১৩]

হজ্ব স্বাধীন সামর্থবান নারী-পুরুষদের জন্য জীবনে একবার ফরয। সামর্থবান বলতে আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ উভয় বুঝায়। হজ্ব ফরয হয় নবম হিজরিতে সূরা আলে ইমরানের ৯৭ নং আয়াত وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا দ্বারা। আয়াতের অর্থ হল-মানুষের মধ্যে যার পাথেয়'র সামর্থ আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘরের হজ্ব করা অবশ্য কতর্ব্য।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- يَا أَيُّهَا النَّاسُ انَّ الله كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ اَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوْ قُلْتُهَا نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا لَمْ تَسْتَطِيعُوا وَالحجُّ مَرَّه فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ হে লোকসকল! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্ব ফরয করেছেন। হযরত আকরা ইবনে হাবিস (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি প্রত্যেক বছর ফরয? উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম তবে ফরয হয়ে যেত। আর যদি প্রতি বছর হজ্ব ফরয হয়ে যেত তবে তা তোমরা সম্পাদন করতে সক্ষম হতে না। হজ্ব জীবনে একবারই ফরয। কেউ যদি একাধিক করে তবে তা হবে নফল হজ্ব।[১৬১৪]

উপরোক্ত হাদিস শরীফ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল ﷺ হ্যাঁ বললে উম্মতের উপর প্রতি বছর ফরয হয়ে যেত। কিন্তু তা উম্মতের উপর কঠিন হবে বলে হ্যাঁ বলেন নি। আরো প্রতীয়মান হয় যে, কোন কাজ ফরয হওয়া না হওয়া তাঁর ইচ্ছাধীন।

হজ্বের ফযিলত

ইবাদত সাধারণত তিন ধরণের। ১. ইবাদতে বদনী তথা দৈহিক ইবাদত যেমন সালাত, রোযা। ২. ইবাদতে মালী তথা কেবল শারিরীক ইবাদত। যেমন যাকাত। ৩. ইবাদতে মুশতারিকাহ তথা দৈহিক ও আর্থিক উভয়ের সমষ্টি। যেমন-হজ্ব। হজ্বে শরীরের

[১৬১৩]. মুফতি আমীমুল ইহসান (র:) কাওয়ায়েদুল ফিকহ, পৃ: ২৫

[১৬১৪]. আহমদ, নাসাঈ ও দারেমী, সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃ: ২০১, হাদিস নং-২৩৯৭

সুস্থতা যেমন প্রয়োজন তেমনি আর্থিক স্বচ্ছলতারও প্রয়োজন। সুতরাং হজ্বের মধ্যে দৈহিক ও আর্থিক উভয় প্রকারের ইবাদত বিদ্যমান। তাই এর গুরুত্বও অপরিসীম।

নামায পড়লে নামাযী এবং রোযা রাখলে রোযাদার আখ্যায়িত করা হয়না কিন্তু কেউ জীবনে মাত্র একবার হজ্ব করলে তাকে হাজী সাহেব কিংবা নামের পূর্বে সারাজীবনের জন্য আলহাজ্ব শব্দটি যোগ হয়ে যায়।

হজ্ব সর্বোত্তম আমল

সাধারণত নিয়ম হলো যে কাজে কষ্ট বেশি সে কাজের সওয়াব ও ফযিলতও বেশি। তাই নবী করিম ﷺ'র প্রতি ঈমান আনার পর জিহাদ ও হজ্বকে সর্বোত্তম আমল বলেছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ সর্বোত্তম আমল কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। প্রশ্ন করা হল- তারপর কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। পুনরায় প্রশ্ন করা হল, এরপর কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন, হজ্বে মাবরুর তথা মকবুল হজ্ব।[১৬১৫]

হজ্বে মাবরুর তথা মকবুল হজ্বের প্রতিদান হল একমাত্র জান্নাত। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ মকবুল হজ্বের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়।[১৬১৬]

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি বস্তুর উপর। ১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা, ২. সালাত প্রতিষ্ঠা করা, ৩. যাকাত প্রদান করা, ৪. বাইতুল্লাহর হজ্ব করা এবং ৫. রমযান মাসে রোযা রাখা।[১৬১৭]

হজ্ব দ্বারা গুনাহ মাফ হয়

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, مَنْ حَجَّ لِلّه وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্ব করল এবং এ সময় অশ্লীল কাজ ও গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকল সে মাতৃগর্ভ হতে নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে।[১৬১৮]

[১৬১৫]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ: ২২১, হাদিস নং-২৩৮৩

[১৬১৬]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃ: ২২১, হাদিস নং : ২৩৮৫

[১৬১৭]. বুখারী ও মুসলিম সূত্র : রিয়াদুস সালেহীন, পৃ: ৪৮৪, হাদিস নং-১৬৭১

[১৬১৮]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃ: ২২১, হাদিস নং- ২৩৮৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ তোমরা হজ্ব ও উমরা সাথে সাথে কর, কেননা এ দু'টি দারিদ্র ও গুনাহ এভাবে দূর করে- যেভাবে হাঁপর লোহা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ময়লা দূর করে। আর মকবুল হজ্বের বিনিময় জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়।[১৬১৯]

হুজ্জাজে কিরামগণ হলেন আল্লাহর মেহমান। মেহমানের চাহিদা পূরণ করা, মেহমানের দোয়া কবুল করা মেজবানের কতর্ব্য। হাদিস শরীফে হাজীগণকে আল্লাহর প্রতিনিধি দল বলা হয়েছে এবং তাদের দোয়া কবুল ও মাগফিরাতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, الْحَاجُّ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ، إِنْ دَعَوْهُ أَجَابُوهُمْ، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ হজ্ব ও উমরাকারীগণ হলেন আল্লাহর প্রতিনিধি দল। তারা যদি তাঁর কাছে প্রার্থনা করে তিনি তা কবুল করেন আর তারা যদি তাঁর কাছে ক্ষমা চান তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।[১৬২০]

রাসূল ﷺ হযরত উমর (রা.) কে বললেন, اَمَا عَلِمْتَ يَا عُمَرُ وَاَنَّ الاِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَاَنَّ الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَاَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ হে উমর! তুমি কি জাননা? নিশ্চয় ইসলাম গ্রহণ মুসলমানদের পূর্বে কৃত সব গুনাহ মিটিয়ে দেয়, হিজরত মুহাজিরের পূববর্তী গুনাহ মুছে দেয় এবং হজ্ব হাজীর পূর্ববর্তী গুনাহ ঝেড়ে ফেলে।[১৬২১] যেহেতু হজ্ব দ্বারা হাজীগণ গুনাহ মুক্ত নিষ্পাপ হয়ে বাড়ী ফিরেন তাই তাদের সাথে সাক্ষাত ও মুসাফাহ করে তাদের কাছে দোয়া চাইতে হাদিস শরীফে উৎসাহিত করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ যখন তুমি কোন হাজীর সাক্ষাত পাবে তাকে সালাম করবে, তার সাথে করমর্দন করবে এবং তাকে অনুরোধ করবে যেন তোমার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চায়, তার ঘরে প্রবেশের পূর্বে। কেননা হাজীকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।[১৬২২]

হাজীগণের কাছে গুনাহ মাফের জন্য দোয়া চাইতে বলার কারণ হল আল্লাহ তায়ালা অনেক আগেই হযরত আদম (আ.)'র মাধ্যমে বাইতুল্লাহ'র তাওয়াফকারীদের দোয়া কবুল করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। 'কাশফুল গুম্মাহ' গ্রন্থের ২১৫ পৃষ্ঠার বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত আদম (আ.) আল্লাহর নির্দেশে বাইতুল্লাহ নির্মাণ করার পর আল্লাহর দরবারে আবেদন করলেন, হে প্রভু! প্রত্যেক শ্রমিকের পারিশ্রমিক আছে, আমার পারিশ্রমিক কি? আল্লাহ তায়ালা বললেন, اِذَا طُفْتَ بِهِ غَفَرْتُ لَكَ যখন তুমি বাইতুল্লাহ

[১৬১৯]. তিরমিযী ও নাসাঈ, সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃ : ২২২, হাদিস নং- ২৪০০
[১৬২০]. ইবনে মাজাহ, সূত্র : মিশকাত শরীফ, ২২২ হাদিস নং-২৪১১
[১৬২১]. মাওলানা নুর মুহাম্মদ, মাওয়ায়েযে রেজভীয়্যাহ, খণ্ড: ১, পৃ: ৩৪২ ও ইবনে খোসাইয়া
[১৬২২]. আহমদ সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃ: ২২৩, হাদিস নং-২৪১৩

তাওয়াফ করেছ তখনই তোমার গুনাহ আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। হযরত আদম (আ.) আরয করলেন, হে প্রভু! আরো বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ তায়ালা বললেন, اَغْفِرُ لِاَوْدِكَ اِذَا طَافُوا بِهِ যখন তোমার সন্তানরা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে তাদেরকেও ক্ষমা করে দেবো। আদম (আ.) নিবেদন করলেন, হে প্রভু! আরো একটু বাড়িয়ে দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, اَغْفِرُ لِمَنْ اَسْتَغْفَرَلَهُ الطَائِفُونَ বাইতুল্লাহর তাওয়াফকারীরা যাদের জন্য মাগফিরাত চাইবে আমি তাদেরকেও ক্ষমা করে দেবো। তখন হযরত আদম (আ.) বললেন, হে আল্লাহ! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।[১৬২৩]

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, اَلْحَاجُّ يَشْفَعُ فِيْ اَرْبَعِ مِأَةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتٍ اَوْ قَالَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ وَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ একজন হাজীর সুপারিশ চারশত পরিবারের হকে কবুল হবে অথবা পরিবারের চারশতজনের হকে কবুল হবে।[১৬২৪]

সাধারণত নিয়ম আছে যে, যে কাজে কষ্ট বেশি হয় সে কাজে সাওয়াবও বেশি। হজ্ব একটি কষ্টসাধ্য ইবাদত। সুতরাং অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে এতে সাওয়াব বেশি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, مَنْ حَجَّ اِلى مَكَّةَ مَاشِيًا حَتَّى رَجَعَ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُمِأةِ حَسَنَةٍ مِنَ حَسَنَاتِ الحَرَمِ قِيْلَ وَمَا حَسَنَاتُ الحَرَمِ قَالَ كُلُّ حَسَنَةٍ بِمِأةِ اَلْفِ حَسَنَةٍ যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে হজ্বে যাবে এবং আসবে তার জন্য প্রতি পদক্ষেপে হেরেমের নেকী সমূহ থেকে সাতশত নেকী লিখা হবে। কেউ জিজ্ঞাসা করল- হেরেমের নেকী দ্বারা কী উদ্দেশ্য? রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন, প্রত্যেক নেকী এক লক্ষ নেকীর সমান।[১৬২৫]

এখানে পায়ে হেঁটে হজ্ব করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল হেরেম শরীফ থেকে মীনা, মুযদালিফা, আরাফাত, কংকর নিক্ষেপ এবং তাওয়াফে যিয়ারত ইত্যাদি পায়ে হেঁটে করা উত্তম। এর জন্য রাস্তা নিরাপদ থাকা এবং পায়ে হাঁটার সামর্থ থাকা শর্ত। পূর্ববর্তী অনেক বুর্যুগানে দীন শত সহস্র মাইল হেঁটে অনেক রিয়ায়তের মাধ্যমে শতবারের কাছাকাছি হজ্ব করেছেন।

তাড়াতাড়ি হজ্ব করার তাগিদ

যাদের উপর হজ্ব ফরয হয়েছে যত দ্রুত সম্ভব হজ্ব আদায় করা উত্তম। কারণ হজ্ব বছরে নির্দিষ্ট সময়ে একবার আদায় করতে হয়। যেখানে মানুষের হায়াত মওতের এক সেকেণ্ডে'র বিশ্বাস নেই সেখানে দীর্ঘ এক বছর অনেক লম্বা সময়। রাসূল ﷺ এরশাদ

[১৬২৩]. মাওলানা নুর মোহাম্মদ, মাওয়ায়েযে রেজভীয়্যাহ, খণ্ড ১ম, পৃ : ৩২১
[১৬২৪]. ইমাম বাযযারও আত তারগীব
[১৬২৫]. হাকেম, মুস্তাদরাক, আইনী ও কানযুল উম্মাল

করেন, مَنْ اَرَادَ الحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ যে ব্যক্তি হজ্বের ইচ্ছে করেছে সে যেন তাড়াতাড়ি হজ্ব করে নেয়।[১৬২৬]

হজ্বে বদল

ইবাদতে বদনী তথা কেবল দৈহিক ইবাদত যেমন নামায ও রোযা এগুলোতে একজনের পক্ষে অপরজনে আদায় করার অনুমতি কোন অবস্থাতেই নেই। ইবাদত মালী তথা আর্থিক ইবাদত যেমন যাকাত। এটি একজনের পক্ষে অপরজনে আদায় করতে পারে। কিন্তু হজ্ব দৈহিক ও আর্থিক উভয়ের সমষ্টি ইবাদত। এতে বিনা কারণে প্রতিনিধিত্ব জায়েয নেই তবে ওযর বশত জায়েয আছে। আর ওযরটি স্থায়ী হতে হবে। যেমন যার উপর হজ্ব ফরয হয়েছে সে যদি স্থায়ী রোগে আক্রান্ত হয় কিংবা মৃত্যুবরণ করে এমতাবস্থায় তার পক্ষে অন্য কেউ হজ্ব আদায় করতে পারবে।

এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, اِنَّ اِمْرَاَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَثْبُتُ عَلى الرَّاحِلَةِ اَفَا حُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَالِكَ فِي حَجَّةِ الوِدَاعِ। খাসআম গোত্রের এক মহিলা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বৃদ্ধ পিতার উপর হজ্ব ফরয হয়েছে। বাহনের উপর বসার ক্ষমতা তার নেই। আমি কি তার পক্ষে হজ্ব করতে পারবো? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, পারবে। এ ঘটনা বিদায় হজ্বের সময়।[১৬২৭]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর কাছে এসে বলল, আমার বোন হজ্ব করার মানত করেছিল। কিন্তু হজ্ব করার পূর্বে ইন্তে কাল করেছে। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তার উপর যদি ঋণ থাকতো তুমি কি তা আদায় করতে? সে বলল, হ্যাঁ, আদায় করতাম। রাসূল ﷺ বললেন, তাহলে আল্লাহর ঋণ আদায় কর। কারণ তাঁর হক আদায় করা অধিক প্রয়োজন।[১৬২৮]

হযরত আবু রযীন উকাইলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন নবী করিম ﷺ 'র নিকট এসে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ হজ্ব ও ওমরা করতে অক্ষম এবং বাহনে বসতে পারে না। রাসূল ﷺ বললেন, حُجُّ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্ব ও ওমরা কর।[১৬২৯]

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তি তার পিতামাতার ইন্তেকালের পর তাদের পক্ষ থেকে হজ্ব করে, সে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে এবং পিতামাতার জন্যও

[১৬২৬]. আবু দাউদ ও দারেমী, সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃ : ২২২, হাদিস নং - ২৩৯৯
[১৬২৭]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃ : ২২১, হাদিস নং- ২৩৮৮
[১৬২৮]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃ : ২২১, হাদিস নং - ২৩৮৯
[১৬২৯]. তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ, সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃ : ২২২, হাদিস নং - ২৪০৩

পূর্ণ হজ্ব লিপিবদ্ধ করা হবে আর তার সাওয়াব থেকে বিন্দুমাত্রও কমবে না। কোন নিকট আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে হজ্ব করে এর সাওয়াব তাদের কবরে পৌঁছানোর চেয়ে উত্তম সদাচরণ আর কী হতে পারে?[১৬৩০]

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, اِنَّ اللهَ لَيُدْخِلُ بِالْحَجَّةِ الوَاحِدَةِ ثَلثَةُ نَفَرِ الجَنَّةَ اَلْمَيِّتَ وَالْحَاجَّ عَنْهُ وَالْمُنْفِذَ لِذَالك। আল্লাহ তায়ালা (হজ্বে বদলে) একটি হজ্বের বিনিময়ে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করবেন। এক. মৃতব্যক্তি (যার পক্ষে হজ্ব করা হয়েছে), দুই. হজ্ব আদায়কারী তিন. যে হজ্বের ব্যয় বহন করে।[১৬৩১]

ইবনে মুয়াফফিক (র.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ'র পক্ষ থেকে কয়েকবার হজ্ব করেছি। একদিন স্বপ্নে তাঁর সাক্ষাত নসীব হল। রাসূল ﷺ বললেন, হে ইবনে মুয়াফফিক! তুমি আমার পক্ষ থেকে হজ্ব করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি আমার পক্ষ থেকে লাব্বায়েক বলেছ? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি কিয়ামত দিবসে তোমার প্রতিদান দেবো। হাশর ময়দানে আমি তোমার হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো আর লোকেরা হিসাব-নিকাশে লিপ্ত থাকবে।[১৬৩২]

হজ্ব পরিত্যাগ করার পরিণাম

হজ্ব ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। বিনা কারণে ইহা পরিত্যাগ করা মারাত্মক গুনাহ। হজ্ব পরিত্যাগকারী সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ। আর যে ব্যক্তি হজ্বকে অস্বীকার করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীবাসী থেকে বিমুখ।[১৬৩৩]

উক্ত আয়াতে হজ্ব অস্বীকারকারীর জন্য কুফুরী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ কারণে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি সুস্থ ও ধনী হওয়া সত্ত্বেও হজ্ব না করে মৃত্যুবরণ করবে কিয়ামত দিবসে তার কপালে 'কাফির' শব্দ লিখা থাকবে। এরপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।[১৬৩৪]

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } যে ব্যক্তি বাইতুল্লায়

[১৬৩০]. আলাউদ্দিন আলী ইবনে হুসসাতুদ্দিন (রা:), (৯৭৫ হি:) কানযুল উম্মাল
[১৬৩১]. প্রাগুক্ত
[১৬৩২]. ইত্তেহাফ
[১৬৩৩]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৯৭
[১৬৩৪]. জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র:), (৯১১ হি:) দুররে মনসূর

পৌঁছার পথ খরচের মালিক হয়েছে, অথচ হজ্ব করল না, সে ইহুদী হয়ে মৃত্যুবরণ করুক অথবা নাসারা হয়ে এতে কিছু আসে যায় না। আর এটা একারণেই যে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বাইতুল্লাহর'র হজ্ব ফরয যে সেখানে পৌঁছার সক্ষম।[১৬৩৫]

হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا যাকে কোন প্রকাশ্য অভাব অথবা অত্যাচারী বাদশা কিংবা মারাত্মক রোগে হজ্ব করতে বাঁধা দেয়নি। অথচ সে হজ্ব না করে মারা গেল, তবে সে যদি চায় ইহুদী হয়ে মরুক আর যদি চায় নাসারা হয়ে মরুক।[১৬৩৬]

অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে দেখা যায় তারা বিভিন্ন অযুহাতে হজ্বে বিলম্ব করে কিংবা হজ্ব থেকে বিরত থাকে। কেউ বলে আগে একটা বাড়ী করি তারপরে হজ্ব করবো। কেউ বলে ছেলেমেয়েকে বিবাহ দিয়ে পরে হজ্ব করবো আবার কেউ বলে এত তাড়াতাড়ী হজ্ব করলে রাখতে পারবো না বয়স হোক তারপর হজ্ব করবো ইত্যাদি। কিন্তু ওসব অযুহাত শরীয়তে গ্রহনযোগ্য নহে। বরং ধন, স্বাস্থ্য ও হায়াত চিরস্থায়ী নয় বিধায় যথাসম্ভব হজ্ব তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম। হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (দাদা) বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে কোন পুরুষ ও নারী এমন বিষয়ে ব্যয় করতে কৃপণতা করে যে বিষয়টি আল্লাহর সন্তুষ্টির উপলক্ষ, তবে সে এমন বিষয়ে এর চেয়ে বেশি ব্যয় করবে যেটি আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়। আর যে ব্যক্তি কোন পার্থিব কারণে হজ্বে যাওয়া মুলতবী করে, সে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই দেখবে যে, হাজী সাহেবগণ হজ্ব করে ফিরে এসেছে।[১৬৩৭]

অর্থাৎ দুনিয়াবী কোন কাজের অজুহাতে যদি কেউ হজ্ব থেকে বিরত থাকে তবে হাজী সাহেবগণ হজ্ব সমাপন করে চলে আসবে, কিন্তু দেখা যাবে যে তার দুনিয়াবী কাজটি এখনো অসমাপ্ত রয়ে গেছে। সুতরাং কোন পার্থিব বিষয়ের জন্য যেন হজ্ব পরিত্যাগ করা না হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ হজ্বের যাবতীয় আহকাম সম্পর্কে প্রত্যেক হাজী সাহেবকে অন্তত একটি করে হজ্ব গাইড প্রদান করা হয়। তাই এই বিষয়ে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করা হল।

[১৬৩৫]. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃ : ২২২, হাদিস নং -২৩৯৭
[১৬৩৬]. দারেমী, সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃ : ২২২, হাদিস নং- ২৪১০
[১৬৩৭]. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, তাবরানী কবীর ও আত তারগীব

কুরবানীর দিনের ফযিলত

যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখকে ইয়ামুন নাহর তথা কুরবানীর দিন বলা হয়। এটি মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ঈদ উৎসব। ইবনে রজব হাম্বলী (র.) স্বীয় কিতাব লাতায়েফুল মাআরিফ গ্রন্থে বলেন– والعيد الثانى عيد النحر وهو اكبر العيدين وافضلهما وهو مرتب على اكمال الحج وهو ركن الرابع من اركان الاسلام দ্বিতীয় ঈদ হলো ঈদুন নহর, দু ঈদের মধ্যে এটি বড় ঈদ। এটি ইসলামের চতুর্থ রোকন হজ্জ সমাপনের পর করতে হয়। তিনি আরো বলেন– والصلوة والنحر الذى يجتمع فى عيد النحر افضل من الصلوة والصدقة الذى فى عيد الفطر অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের নামায ও সাদকার চেয়ে ঈদুল আযহার নামায ও কুরবানী উত্তম।[১৬৩৮]

তাই আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেন– فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন আর কুরবানী করুন।[১৬৩৯] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন– قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।[১৬৪০]

কুরবানীর বিধান যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে অবতীর্ণ সমস্ত শরীয়তেই বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে চতুষ্পদ জন্তু দান করেছি সে গুলোর উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।[১৬৪১] পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কুরবানী করেছিলেন হযরত আদম (আ.)'র দুই পুত্র কাবিল ও হাবিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের অবস্থা পাঠ করে শুনান। যখন তারা উভয়েই কিছু কুরবানী করেছিল। তখন তাদের একজনের কুরবানী গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের কুরবানী গৃহীত হয়নি। সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো। অপর ভাই বলল, আল্লাহ ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন।[১৬৪২]

[১৬৩৮]. ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫ হি) লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ- ৪৫২ ও ৪৫৩
[১৬৩৯]. সূরা কাউসার, আয়াত-২
[১৬৪০]. সূরা মায়িদা, আয়াত- ১৬২
[১৬৪১]. সূরা হজ্জ, আয়াত-৩৪
[১৬৪২]. সূরা মায়িদা, আয়াত-২৭

আদম (আ.)'র দুই পুত্রের কুরবানীর ঘটনা

যখন হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) পৃথিবীতে আগমন করেন এবং সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন প্রতি গর্ভ থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান জময জন্মগ্রহণ করত। তখন ভাই বোন ছাড়া হযরত আদম (আ.)'র আর কোন সন্তান ছিলনা। অথচ সহোদর ভাই-বোন পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেনা। তাই আল্লাহ তায়ালা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে আদম (আ.)'র শরীয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভে যে পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভাইবোন বলে গন্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্যে প্রথম গর্ভে জন্মগ্রহণকারীনী কন্যা সহোদর ভাই-বোন বলে গন্য হবে না। ফলে তাদের পরস্পর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে। ঘটনাক্রমে কাবিলের সহজাত বোনটি ছিল পরমা সুন্দরী এবং হাবিলের সহজাত বোনটি ছিল কুশ্রী ও কদাকার। বিবাহের সময় হলে নিয়মানুযায়ী হাবিলের সহজাত কুশ্রী বোন কাবিলের ভাগে পড়ল। এতে কাবিল অসন্তুষ্ট হয়ে হাবিলের শত্রু হয়ে গেল। সে জেদ ধরল যে, আমার সহজাত বোনকেই আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। হযরত আদম (আ.) তাঁর শরীয়তের আইনের পরিপেক্ষিতে কাবিলের দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর তিনি হাবিল ও কাবিলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা উভয়েই আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী পেশ কর। যার কুরবানী গৃহিত হবে, সেই কন্যার পানি গ্রহণ করবে। তৎকালে কুরবানী গৃহিত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে কুরবানীকে ভস্মিভূত করে আবার অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানীকে অগ্নি ভস্মিভূত করতনা, তা প্রত্যাখ্যান বলে মনে করা হত। হাবিল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি পশু পালন করতো। সে একটি উৎকৃষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। কাবিল কৃষিকাজ করত। সে কিছু শস্য,গম ইত্যাদি কুরবানীর জন্য পেশ করল। অতঃপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা এসে হাবিলের কুরবানীটি ভস্মিভূত করে দিল এবং কাবিলের কুরবানী যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইল। এ অকৃতকার্যতায় কাবিলের দুঃখ ও ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে নিজেকে আত্মসংবরণ করতে পারলনা এবং প্রকাশ্যে ভাইকে বলে দিল অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। হাবিল তখন ক্রোধের জওয়াবে ক্রোধ প্রর্দশন না করে একটি মার্জিত ও নীতিগত কাজ উচ্চারণ করে বলল– আল্লাহ তায়ালা কেবল খোদাভীরু পরহেজগারের কর্মই গ্রহণ করে থাকেন। যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত কর, তবে আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হস্ত প্রসারিত করবো না। কেননা আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি। অতঃপর কাবিল তার ভাই হাবিলকে হত্যা করল।

কুরবানীর ইতিহাস যদিও আদিকালের তবে আমরা যে কুরবানী করি মূলত তা হযরত ইব্রাহিম (আ.)'র সুন্নত ও তাঁর আত্মত্যাগের অবিস্মরণীয় ঘটনাকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের জন্য চিরস্মরণীয় ও প্রাণবন্ত করে রাখার জন্য উম্মতে মুহাম্মদীর উপর তা ওয়াজিব করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজাহ (র.) যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ، حَسَنَةٌ» قَالُوا: " فَالصُّوفُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ، حَسَنَةٌ» রাসূল ﷺ এর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ কুরবানী কী? উত্তরে তিনি বললেন, ইহা তোমাদের পিতা ইব্রাহিম (আ.)'র সুন্নত। তাঁরা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এতে আমাদের জন্য কি কল্যাণ নিহিত আছে? তিনি বললেন, এর প্রত্যেকটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে। তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, বকরীর পশমও কি তাই? জবাবে তিনি বললেন, বকরীর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে নেকী আছে।[১৬৪৩]

ইব্রাহিম (আ.) কর্তৃক স্বীয় প্রাণপ্রিয় পুত্র কুরবানীটি মূলত ছিল একটি মহাপরীক্ষা। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছিলেন। সাধারণত মানুষের নিকট দু'টি বস্তু সবচেয়ে প্রিয়ভাজন হয়। একটি হল নিজের প্রাণ আর অপরটি হলো প্রাণপ্রিয় নিজের সন্তান। নমরুদের আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রাণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি। অবশেষে বৃদ্ধাবস্থায় আল্লাহর কাছ থেকে দোয়া করে প্রাপ্ত একমাত্র ছেলেকে কুরবানী দেওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করে উত্তীর্ণ হন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন– رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الصَّابِرِينَ ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ الْمُحْسِنِينَ ইব্রাহিম (আ.) দোয়া করলেন– হে আমার প্রভু! আমাকে এক নেককার পুত্র সন্তান দান করুন। সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহিম তাকে বলল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি। এখন তোমার অভিমত কি? সে বলল, পিতা! আপনাকে যা আদেশ দেয়া হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল হিসেবে পাবেন। যখন পিতা-পুত্র উভয়ই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহিম তাকে যবেহ করার জন্যে শায়িত করল, তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইব্রাহিম! তুমিতো স্বপ্ন সত্যে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ

[১৬৪৩]. শায়খ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) (৭৪০ হি) মিশকাত শরীফ, পৃ-১২৯

করার জন্যে এক মহানজন্তু। আমি তার জন্য এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি।[১৬৪৪]

কুরবানীর সংক্ষেপ ঘটনা হলো হযরত ইব্রাহিম (আ.)'র স্ত্রী হযরত সারার গর্ভে যখন কোন সন্তান হচ্ছে না তখন তিনি নিজেকে বন্ধ্যা মনে করলেন। মিশরের সম্রাট ফেরাউন তার হাজেরা নাম্মী কন্যাকে হযরত সারার খেদমতের জন্য দান করেছিল। তিনি হাজেরাকে ইব্রাহিম (আ.)'র খেদমতে দিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি তাকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করে নিলেন। এ হাজেরার গর্ভেই হযরত ইসমাঈল (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের বয়স যখন ১৩ বা ১৫ বছরে উপনীত হলো তখন হযরত ইব্রাহিম (আ.)কে উপর্যুপরি তিন রাত স্বপ্ন দেখানো হলো যে, তুমি তোমার প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী কর। একথা স্বীকৃত সত্য যে, নবীগণের স্বপ্নও ওহীহ বটে। স্বপ্নের মাধ্যমে প্রদত্ত আদেশে মানব মনের পক্ষে ভিন্ন অর্থ করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। কিন্তু ইব্রাহিম (আ.) ভিন্ন অর্থের পথ অবলম্বন না করে বরং আল্লাহর আদেশের সামনে মাথানত করে আদেশ পালনে ব্রত হলেন। অতঃপর তিনি ১০ই যিলহজ্জ সকালে স্ত্রী হাজেরাকে বললেন, তোমার ছেলেকে সেজে-গুছে দাও– আমরা একটি দাওয়াতে যাবো। কোন কোন বর্ণনায় আছে তিনি হাজেরাকে বলেছেন চুরি ও রশি দাও। পুত্রকে নিয়ে শিকারে যাব। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে আমরা আল্লাহর রাস্তায় দুম্বা কুরবানী দিতে যাবো। যা হোক মা ছেলেকে গোসল করায়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করায়ে, সুগন্ধি লাগিয়ে এবং চোখে সুরমা দিয়ে ও মাথায় তেল দিয়ে চিরুনী করে দিয়ে পিতার কাছে অর্পন করে দিলেন। হযরত ইব্রাহিম (আ.) ছেলের হাত ধরে জাবলে আরফার দিকে রওয়ানা হলেন। এদিকে ইবলিস শয়তান এক বৃদ্ধের আকৃতি ধারণ করে হযরত হাজেরাকে গিয়ে বলল, তুমি কি জান তোমার ছেলেকে তার পিতা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। হাজেরা ঘটনা খুলে বললে, শয়তান বলল, আল্লাহ তায়ালা নাকি তাকে তার পুত্রকে যবেহ করতে আদেশ দিয়েছেন তাই তাকে যবেহ করতে নিয়ে যাচ্ছে? হাজেরা বললেন, যদি আল্লাহর আদেশ হয়ে থাকে তাহলে এক ইসমাঈল কেন হাজার ইসমাঈল আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী দিতে পারি। এতে শয়তান ব্যর্থ হয়ে হযরত ইসমাঈল (আ.)'র নিকট এসে বলল, তোমাকে তোমার পিতা যবেহ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কেন? শয়তান বলল, তার ধারণা হল যে, তাকে আল্লাহ এর আদেশ দিয়েছেন। তখন ইসমাঈল (আ.) বললেন, আল্লাহ যদি আমার কুরবানী কবুল করেন তাহলে এর চেয়ে বড় ভাগ্যের ব্যাপার আর কি হতে পারে? এরপর শয়তান হযরত ইব্রাহিম (আ.) কেও অনুরূপ ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা চালালে তিনি তিনবার শয়তানের দিকে সাতটি করে

[১৬৪৪]. সূরা আস্ সাফফাত, আয়াত; ১০০-১০৮

কংকর নিক্ষেপ করে তাড়িয়ে দেন। এ কাজটি আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দ হয়েছিল বলেই কিয়ামত পর্যন্ত সকল হাজীগণের উপর এই সুন্নাতকে আবশ্যক করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর মিনায় কুরবানগাহে পৌঁছে তিনি পুত্রকে স্বপ্নের কথা বললে পুত্র সাথে সাথে বললেন, হে পিতা! আপনি আদেশ পালন করুন। তিনি পুত্রের কাছে স্বপ্নের কথা বলেছেন কিন্তু পুত্র বুঝে নিলেন যে, নবীগণের স্বপ্ন ওহী। তাই পুত্র উত্তরে আপনি স্বপ্ন বাস্তবায়ন করুন না বলে বলেছেন আপনি আদেশ পালন করুন। পুত্র পিতাকে বললেন, আপনি আমাকে শক্ত করে বেঁধে নিন, যাতে আমি বেশী ছটপট করতে না পারি। আপনার পরিধেয় বস্ত্রও সামলে নিন, যাতে আমার রক্তের ছিটা তাতে না পড়ে। এতে আমার সওয়াব হ্রাস পেতে পারে। তাছাড়া রক্ত দেখলে আমার মা অধিক ব্যাকুল হবেন। আপনি ছুরিটাও ধার করে নিন এবং তা আমার গলায় দ্রুত চালাবেন যাতে আমার প্রাণ সহজে বের হয়ে যায়। কারণ মৃত্যু বড় কঠিন। আপনি আমার মায়ের কাছে পৌঁছে আমার সালাম বলবেন। যদি আমার জামা তার কাছে নিয়ে যেতে চান, তবে নিয়ে যাবেন। হয়তো এতে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন। ইব্রাহিম (আ.) পুত্রের কথা শুনে বললেন, বৎস! আল্লাহর নির্দেশ পালনে তুমি আমার চমৎকার সহায়ক হয়েছ। অতঃপর তার কপালে চুমু খেয়ে তাকে শক্ত করে বেঁধে ফেললেন। তাকে কাত করে শুয়ায়ে গলার উপর ধারাল চুরি চালাতে লাগলেন। তিনি কয়েকবার এরূপ করলেন কিন্তু চুরি কাজ করছে না এবং গলাও কাটা যাচ্ছে না। এসময় ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সকল ফেরেশ্তা, পশু-পাখি, জীব-জন্তু, এমনকি পানির ভিতরে মাছ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে লাগল আর বলতে লাগল হে পরওয়ারদিগার! ارحم هذا الشيخ الكبير وافد هذا الطفل الصغير এই বৃদ্ধের উপর দয়া করুন এবং এই ছোট বাচ্চার প্রাণ রক্ষা করুন। তখন পুত্র বললেন, হে পিতা! চুরিকে পুনরায় ধার দিয়ে নিন এবং আমাকে কাত করে শুইয়ে দিন। কেননা আপনি আমার চেহারা দেখলে আপনার মধ্যে হয়তো পৈতৃক স্নেহ উতলে উঠবে। তারপর তিনি পুত্রকে কাত করে শুয়াইয়ে ছুরি চালালেন কিন্তু এবারও ছুরি কোন কাজ করল না। এতে তিনি রাগ করে ছুরিকে হাত থেকে নিক্ষেপ করলে চুরি একটি পাথরে পড়লে পাথর দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তায়ালা চুরিকে বাকশক্তি দান করলেন। চুরি বলে উঠল– يا ابراهيم انا بين امرين فالخليل يقول اقطعى والجليل يقول لا تقطعى وانى من قبل الجليل لامن قبل الخليل وكيف اقطع فى نحر اسماعيل ونور محمد صلى الله عليه وسلم فى جبهته يلمع হে ইব্রাহিম, আমি দুই আদেশের মধ্যবর্তীতে অবস্থান করছি। খলীল বলছেন তুমি যবেহ কর আর জলীল (আল্লাহ) বলছেন তুমি যবেহ করিওনা। আর

আমি জলিলের পক্ষে খলীলের পক্ষে নই। আর কিভাবেই আমি ইসমাঈলের গলা কাটব? নূরে মুহাম্মদী ﷺ তার চেহারায় সমুজ্জল হয়ে আছেন।[১৬৪৫]

হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) যবেহের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইসমাঈল (আ.)'র পরিবর্তে জান্নাত থেকে একটি দুম্বা বা ভেড়া দিয়ে তাদের কুরবানী কবুল করলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি জবেহ করার জন্য এক মহান জীব দান করলাম। গাউসে পাক (র.) গুনিয়াতুত তালেবীন গ্রন্থে বলেন ঐ দুম্বার নাম ছিল ওয়াযীর। এটি জান্নাতে চল্লিশ বছর যাবৎ চরণকারী ছিল। কেউ কেউ বলেছেন এটি ছিল সেই দুম্বা যেটি হযরত আদম (আ.)'র পুত্র হাবিল কুরবানী দিয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে ডাক দিয়ে বলছেন– হে ইব্রাহিম! তুমি তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছ এবং এতে কোন ত্রুটি করনি। আমি সৎকর্মশীলদের এভাবেই বিনিময় দিয়ে থাকি। পিতা কর্তৃক পুত্র কুরবানী করা আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিলনা বরং এর পিছনে রয়েছে অন্য একটি উদ্দেশ্য। ফেরেশ্তারা আল্লাহর কাছে জানতে চাইলেন যে, এর মূল উদ্দেশ্য কি? উত্তরে আল্লাহ বলেন, খলীলের অন্তরে আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ভালবাসা যেন না থাকে। কারণ আমার ভালবাসায় অন্য কারো শরীক থাকা আমি পছন্দ করিনা। হযরত ইব্রাহিম (আ.) পুত্রকে ভালবেসেছে তাই তাকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। হযরত ইয়াকুব (আ.) হযরত ইউসূফ (আ.) কে ভালবেসেছে তাই চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাকে পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে এবং ইয়াকুব (আ.)কে ইউসূফের পৃথক হওয়ার কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। আমাদের নবী করিম ﷺ হযরত হাসান ও হোসাইন (রা.)কে মহব্বত করেছেন তাই জিব্রাইল (আ.) এসে আরয করলেন এদের একজনকে বিষ পান করানো হবে আর অপরজনকে শহীদ করা হবে। উদ্দেশ্য হলো মাহবুবের সাথে অন্যের মুহাব্বত যেন শরীক না হয়।[১৬৪৬]

আকিল, বালিগ, মুকীম ব্যক্তি ১০ই যিলহজ্জ ফজর হতে ১২ই যিলহজ্জ সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব। সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানী বর্জনকারী ব্যক্তির প্রতি রাসূল ﷺএর সতর্কবানী উচ্চারণ করে বলেন– من كان له سعة ولم يُضَحّ فلا يقربنّ مصلّانا যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।[১৬৪৭]

[১৬৪৫]. শেখ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আয়াস (র.) বাদায়েউয যহুর, আরবী, পৃ-৯২
[১৬৪৬]. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দু, পৃ-৪১৫
[১৬৪৭]. ইবনে মাজাহ, মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, সূত্র: হিদায়া, খণ্ড-৪, পৃ-৪২৭

কুরবানীর উদ্দেশ্য

বড় গরু, বেশী দামের গরু কিংবা সুন্দর জানোয়ার দিয়ে গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরবানী করলে তা আল্লাহর দরবারে প্রত্যাখ্যান হবে। বরং সম্পূর্ণ আবেগ, অনুভূতি, প্রেম-ভালবাস নিয়ে কুরবানী করলে কেবল তাই আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে। বস্তুত কুরবানী দাতা কেবল গরুর গলায় চুরি চালায় না বরং সেতো চুরি চালায় সকল প্রবৃত্তির গলায় আল্লাহর প্রেমে পাগল পারা হয়ে। এটি কুরবানীর মূল নিয়ামক। এ অনুভূতি ব্যতিরেকে কুরবানী করলে প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না বরং এটা এক রকম প্রথা মাত্র যাতে গোশতের ছড়াছড়ি হয় বটে কিন্তু ঐ তাকওয়া হাসিল হয়না যা কুরবানীর প্রাণ শক্তি। কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন– لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ। আল্লাহর নিকট পৌঁছেনা এর গোশত ও রক্ত, পৌঁছে কেবল তোমাদের তাকওয়া।[১৬৪৮] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ। আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন।[১৬৪৯]

আইয়্যামে তাশরীক

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ। তোমরা নির্দিষ্ট কয়েকদিন বেশী করে আল্লাহর যিকর কর।[১৬৫০] নির্দিষ্ট দিন দ্বারা আইয়্যামে তাশরীক আর তা হলো যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২, ১৩ তারিখ। এটা হযরত ইবনে ওমর (রা.)'র মত। ইবনে আব্বাস (রা.)'র মতে আইয়্যামে তাশরীক হলো চারদিন। আর তা হলো যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ। তবে প্রথম মতটিই অধিকাংশ ওলামায়ে কিরাম গ্রহণ করেছেন।

নামকরণ

তাশরীক শব্দের অর্থ হলো রওশন বা আলোকিত হওয়া। জাহেলী যুগে মুশরিকরা সূর্য উদিত হবার পূর্বে মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হতনা। এসময় তারা বলত– أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نَغِيرُ হে সাবীর পর্বত! আলোকিত হয়ে যাও, যাতে আমার রওয়ানা হতে পারি। একারণে ঐ দিনকে يوم تشريق বলা হতো। অথবা কোন কোন ওলামা বলেছেন যে, تشريق শব্দের অর্থ হলো কুরবানীর গোশত টুকরা টুকরা করে শুকিয়ে নেয়ার দিন। এইদিনগুলোতে জাহেলী যুগে কুরবানীর গোশত শুকিয়ে নিত। তাই এই দিনগুলোকে

[১৬৪৮]. সূরা হাজ্জ, আয়াত-৩৭
[১৬৪৯]. সূরা মায়িদা, আয়াত-২৭
[১৬৫০]. সূরা বাকারা, আয়াত-২০৩

আইয়্যামে তাশরীক বলা হতো।[১৬৫১] এই দিনগুলোতে রোযা রাখা হারাম। কেননা এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে যিয়াফতের দিন। এদিন গুলোতে রোযা রাখার অর্থ হলো আল্লাহর দেয়া যিয়াফত প্রত্যাখ্যান করা যা মারাত্মক অপরাধ। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– أَيَّامِ التشريق ايام اكل وشرب আইয়্যামে তাশরীক হলো পানাহারের দিন।[১৬৫২]

সুনানে আরবার হাদিসে উক্ত ইবারতের সাথে যোগ হয়েছে وذكر الله عزَّ وجل অর্থাৎ ঐ দিনসমূহে বেশী করে আল্লাহর যিকর করতে হয়। হানাফী মাযহাব মতে যিলহজ্জের নয় তারিখ তথা আরফার দিনের ফজর থেকে ১৩ তারিখ তথা আইয়্যামে তাশরীকের আসর নামায পর্যন্ত প্রত্যেক ফজর নামাযের পর উচ্চস্বরে তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব। আর আহনাফের মতে এই তাকবীর হলো– الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد।

[১৬৫১]. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দু, পৃ-৪২২

[১৬৫২]. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি) মুসলিম শরীফ, কিতাবুস সিয়াম, হাদিস নং-২৫৭৩ ও ইমাম নাসাঈ (র.) (৩০৩ হি) নাসাঈ শরীফ, কিতাবুল হজ্জ, ৪/৪৬৩)

পরিশিষ্ট

নফল নামাযের ফযিলত

نفل নফল শব্দটি আরবী। এর অর্থ– অতিরিক্ত। ফরয-ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদা ব্যতীত বান্দা নিজের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় যে অতিরিক্ত নামায পড়ে তাকে নফল নামায বলা হয়। ফরয-ওয়াজিব ইত্যাদি আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কতর্ব্য। এগুলো পরিত্যাগ করলে জবাবদিহি ও শাস্তিভোগ করতে হয়। সুতরাং বান্দা অনেক সময় শাস্তির ভয়েও তা আদায় করে। কিন্তু নফল নামায না পড়লে কোন গুনাহ বা শাস্তি নেই বরং তা সম্পূর্ণ স্রষ্টার রেজামন্দি লাভের জন্যই আদায় করে। ফলে আল্লাহ তাতেই খুশী হন বেশী। এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে– وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِه، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِه، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ আর আমার কতিপয় বান্দা সর্বদা ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, ফলে আমি তাদেরকে ভালবাসি। আমি যখন তাকে ভালবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই,যা দিয়ে সে শ্রবণ করে। আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে পথ চলে। সে প্রিয়বান্দা যদি আমার কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করে আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। যদি আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দান করি।[১৬৫৩]

নফল নামায দিয়ে ফরযের ক্ষতিপূরণ করা হবে কিয়ামত দিবসে। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ থেকে শুনেছি– إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ به العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِه صَلاَتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِه شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِه عَلَى ذَلِكَ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার আমলের মধ্যে নামাযের হিসাব গ্রহণ করা হবে। নামায যদি ঠিক হয় তবে সে কৃতকার্য ও সফল হবে। আর নামায যদি বিনষ্ট হয় তবে সে নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যদি তার ফরয নামাযের মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে তবে আল্লাহ বলবেন, (ফেরেশ্তাদেরকে) তোমরা দেখ বান্দার কোন নফল নামায আছে কিনা? (যদি থাকে) তা দিয়ে ফরযের ঘাটতি-বিচ্যুতি পূরণ করা হবে। এভাবে অন্যান্য আমল সম্পর্কেও এরূপ করা হবে।[১৬৫৪] বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে অনেক প্রকারের নফল নামায রয়েছে।

[১৬৫৩]. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি) সহীহ বুখারী, পৃ-৯৬৩

[১৬৫৪]. আবু দাউদ ও আহমদ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-১১৭, হাদিস নং-১২৪৯

নিম্নে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হচ্ছে যা আউলিয়ায়ে কিরাম ও সূফীয়ায়ে ইজামগণ প্রায় নিয়মিত আদায় করতেন এবং এর দ্বারা উভয় জগতের সফলতা লাভ করেছেন।

১. صلوة التوبة তথা তাওবার নামায। কোন গুনাহ করার পর বান্দা তাওবা ও ইস্তেগফারের নিয়্যতে কয়েক রাকাত নফল নামায আদায় করা। হাদিস শরীফে হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে হযরত আবু বকর (রা.) বলেছেন, আর তিনি সত্য বলেছেন। আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি– مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} যে ব্যক্তি কোন গুনাহ করবে তারপর উঠে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং কিছু নফল নামায পড়বে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তবে আল্লাহ নিশ্চয় তার গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন। "আর যখন তারা কোন গুনাহের কাজ করে অথবা নিজেদের উপর যুলুম করে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।"[১৬৫৫]

হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি গুনাহ করলে উত্তম ভাবে উযূ করে দু'রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে মাগফিরাত চাইলে তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[১৬৫৬] এই নামাযের নিয়্যত করবে এভাবে– نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلوةِ التَّوبَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ لِلّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا الٰى جِهَةِ الكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

২. صلوة تحية الوضوء তাহিইয়্যাতুল উযূর নামায

সর্বদা পাক পবিত্র থাকা প্রকৃত মু'মিন ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য। নামায, কুরআন স্পর্শ ও বায়তুল্লাহ তাওয়াফের জন্য উযূ শর্ত। উযূ করার পর অন্য কোন ইবাদত করার পূর্বে দু'রাকাত নফল নামায পড়াকে তাহিইয়্যাতুল উযূর নামায বলা হয়। এই নামাযের ফযিলত সম্পর্কে বিশুদ্ধ হাদিসে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ لِبِلَالٍ «يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ» ، قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ রাসূল ﷺ বিলাল (রা.) কে বলেছেন, হে বিলাল! তুমি ইসলাম গ্রহণের পর সবচেয়ে বেশী আশাপ্রদ যে আমলটি করেছ তা আমাকে বল। কারণ জান্নাতে আমার সম্মুখে আমি

[১৬৫৫]. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত, পৃ-১১৭, হাদিস নং-১২৪৪

[১৬৫৬]. আত তারগীবু ফি ফাযায়েলুল আ'মল, ইবনে শাহীন, খণ্ড-১, পৃ-৬৩, হাদিস নং-১৮৬

তোমার পাদুকার আওয়ায শুনেছি। বিলাল (রা.) বললেন, আমার কাছে এর চেয়ে বেশী আশাপ্রদ আর কোন আমল নেই তা হল– যখনই রাতে-দিনে আমি উযূ করি তখনই তা দিয়ে আমি নামায পড়েছি। যে পরিমাণ আল্লাহ আমার জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৬৫৭]

عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِلَالاً فَقَالَ: بِمَا سَبَقْتَنِي إِلَى الجَنَّةِ؟ مَا دَخَلْتُ الجَنَّةَ قَطُّ إِلاَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا اَذَّنْتُ قَطُّ إِلاَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ عِنْدَهُ وَرَأَيْتُ انَّ لِلّٰهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا .

হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল ﷺ সকালে হযরত বিলাল (রা.)কে ডেকে বললেন, কোন আমলের দ্বারা তুমি আমার পূর্বে জান্নাতে পৌঁছলে? আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করেছি তখনই আমার সামনে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি। তখন বিলাল (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দু'রাকাত নফল নামায পড়েছি এবং যখনই আমার উযূ ভঙ্গ হয়েছে আমি তখনই উযূ করেছি আর মনে করেছি আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু'রাকাত নামায পড়তে হবে। রাসূল ﷺ বললেন, এ দু'কাজের জন্যই তোমার এই মর্যাদা।[১৬৫৮]

নিয়্যত:

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلوةِ تَحِيَّةِ الوُضُوءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ لِلّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا الٰى جِهَةِ الكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

৩. তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায

মসজিদে প্রবেশ করে মসজিদের সম্মানার্থে বসার পূর্বে দু'রাকাত নফল নামায পড়াকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায বলা হয়। এটি সুন্নাত। হযরত আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন দু'রাকাত (নফল) নামায পড়ার পূর্বে না বসে।[১৬৫৯]

[১৬৫৭]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৪৫০, হাদিস নং-১১৪৬ ও মিশকাত শরীফ, পৃ-১১৬, হাদিস নং-১২৪২)

[১৬৫৮]. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-১১৭, হাদিস নং-১২৪৬

[১৬৫৯]. মুসলিম, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৪৪৯, হাদিস নং-১১৪৪

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– اَتَيْتُ النَبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ আমি নবী করিম ﷺ এর কাছে এলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। তিনি বললেন, দু'রাকাত নামায পড়ে নাও।[১৬৬০]

রাসূল ﷺ এর সাহাবী হযরত আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম আর রাসূল ﷺ লোকদের মধ্যখানে বসা ছিলেন। আমিও বসে গেলাম। রাসূল ﷺ বললেন, বসার পূর্বে দু'রাকাত নামায পড়তে তোমাকে কিসে নিষেধ করল? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে এবং লোকদেরকে বসা দেখেছি তাই বসে গিয়েছি। রাসূল ﷺ বললেন– فَاِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ যখনই তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, সে যেন দু'রাকাত নামায পড়া ব্যতীত না বসে।[১৬৬১]

নিয়্যত:

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالى رَكْعَتَيْ صَلوةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ سُنَّةُ رَسُوْلِ لِلّٰهِ تَعَالى مُتَوَجِّهًا اِلى جِهَةِ الكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

৪. চাশতের ও ইশরাকের নামায

ফজরের নামাযের পরে সূর্য উদয়ের পর থেকে অর্ধ দিবসের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দুই থেকে বার রাকাত নামায পড়াকে صلوة الضُّحى বা চাশতের নামায বলা হয়। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– أَوْصَانِي خَلِيلِي «بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ» আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু রাসূল ﷺ আমাকে ওয়াসীয়ত করেছেন প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতে, চাশতের দু'রাকাত নামায পড়তে এবং শয়নের পূর্বে বিতর নামায পড়ে নিতে।[১৬৬২]

হযরত আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» প্রভাত হওয়া মাত্রই তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের গ্রন্থিগুলোর উপর সাদকা ওয়াজিব হয়ে যায়। কাজেই প্রত্যেক 'সুবাহান্নাল্লাহ' বলা সাদকা স্বরূপ,

[১৬৬০]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৪৪৯, হাদিস নং-১১৪৫
[১৬৬১]. ইমাম মুসলিম, সূত্র: সহীহ মুসলিম, হাদিস নং-১৫৫২
[১৬৬২]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৪৪৮, হাদিস নং-১১৩৯

প্রত্যেক আলহামদুলিল্লাহ বলা সদকা স্বরূপ, প্রত্যেক 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা সদকা স্বরূপ। আর সৎকাজের আদেশ করা সদকা এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা সদকা স্বরূপ। আর কেউ এসবের বিকল্প হিসাবে চাশতের দু'রাকাত পড়লে তা যথেষ্ট হবে।[১৬৬৩] অর্থাৎ মানুষের শরীরে তিনশত ষাটটি জোড়া রয়েছে। এগুলো প্রতিটির উপর সদকা ওয়াজিব। হাদিসে বর্ণিত যিকর ও ভাল কাজসমূহ দ্বারা এই সদকা আদায় হয়ে যায়। যদি কেউ ঐ সব যিকর ও ভাল কাজসমূহ করতে অক্ষম হয় তবে যদি সে দু'রাকাত চাশতের নামায পড়ে তাহলে ঐসব আমল ও সদকা আদায় হয়ে যাবে। عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ» হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ চার রাকাত চাশতের নামায পড়তেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় আরো বেশী পড়তেন।[১৬৬৪] হযরত উম্মে হানী ফাখিতা বিনতে আবু তালেব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ فَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِه صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ ضُحًى আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূল ﷺ এর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে গোসলরত অবস্থায় পেলাম। তিনি গোসল শেষে আট রাকাত (নফল) নামায পড়লেন। এটা ছিল চাশতের নামায।[১৬৬৫] সূর্য উদয়ের পর পর পড়লে ইশরাক বলে আর বিলম্বে পড়লে চাশতের নামায বলে। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– যে ব্যক্তি জামাত সহকারে ফজরের নামায পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকরে রত থাকে অতপর দু'রাকাত নফল নামায পড়ে সে পূর্ণ হজ্জ ও উমরার সাওয়াব লাভ করবে।[১৬৬৬] ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন– যে ব্যক্তি চাশতের বার রাকাত পড়বে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের বালাখানা নির্মাণ করবেন।[১৬৬৭]

তাবরানী শরীফে হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি চাশতের দু'রাকাত পড়ল, তার নাম অলসদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হবে না। যে ব্যক্তি ছয় রাকাত পড়বে, ঐ দিন তার জন্য যথেষ্ট হবে। যে আট রাকাত পড়বে, আল্লাহ তার নাম বিনয়ীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করবেন। যে বার রাকাত পড়বে, আল্লাহ জান্নাতে তার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরি করবেন।[১৬৬৮] ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ (র.) হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, যে চাশতের দু'রাকাত নিয়মিত পড়বে, তার গুনাহ ক্ষমা করা

[১৬৬৩]. মুসলিম, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৪৪৮, হাদিস নং-১১৪০, বৈরুত ও মিশকাত, পৃ-১১৬, হাদিস নং-১২৩৩
[১৬৬৪]. মুসলিম, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৪৪৮, হাদিস নং-১১৪১
[১৬৬৫]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: রিয়াদুস সালেহীন, পৃ-৪৪৮, হাদিস নং-১১৪২
[১৬৬৬]. মুফতি আমজাদ আলী (র.) বাহারে শরীয়ত, খণ্ড-৪, পৃ-২০
[১৬৬৭]. তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-১১৬, হাদিস নং-১২৩৭ ও মুফতি আমজাদ আলী (র.) বাহারে শরীয়ত, খণ্ড-৪, পৃ-২১
[১৬৬৮]. মুফতি আমজাদ আলী (র.) বাহারে শরীয়ত, খণ্ড-৪, পৃ-২২

হবে, যদিও সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।[১৬৬৯] হযরত আবু দারদা ও আবু যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূল ﷺ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বলেছেন, আল্লাহ বলেন– يَا ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ হে আদম সন্তান! তুমি আমার জন্য চার রাকাত (নফল) নামায পড় দিনের প্রথমাংশে আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হবো দিনের শেষাংশে।[১৬৭০]

ইশরাকের নামাযের নিয়্যত:

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الاِشْرَاقِ سُنَّةُ رَسُوْلِ لِلّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

চাশতের নামাযের নিয়্যত:

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الضُّحٰى سُنَّةُ رَسُوْلِ لِلّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

৪. صلواة الحاجة তথা হাজতের নামায:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ، أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللهِ، وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لِيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لاَ تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ، وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ، وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তির প্রয়োজন আছে আল্লাহ কিংবা কোন মানুষের কাছে, সে যেন উত্তমরূপে উযূ করে দু'রাকাত নামায পড়ে। অতঃপর মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং নবী করিম ﷺ এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তারপর বলবে– আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি ধৈর্যশীল, মহামহিম, আমি মহান আরশের প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র পৃথিবীর মালিক। আমি তোমার

[১৬৬৯]. মুফতি আমজাদ আলী (র.) বাহারে শরীয়ত, খণ্ড-৪, পৃ-২২

[১৬৭০]. তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী (র.) হাদিস খানা নুআঈম ইবনে হাম্মার থেকে আর ইমাম আহমদ (র.) উপরোক্ত সকলের থেকে বর্ণনা করেছেন। সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-১১৬, হাদিস নং-১২৩৫

আবশ্যকীয় রহমতের এবং তোমার দৃঢ় ক্ষমা প্রার্থনা করছি। প্রত্যেক সৎকাজের প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক অসৎকাজ থেকে মুক্তি কামনা করছি। তুমি আমার সব অপরাধ মার্জনা করে দিও, সব বিপদ দূরীভূত করে দিও এবং সকল হাজত যা দিয়ে তোমার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় পূর্ণ করে দিও।[১৬৭১]

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَزَنَه اَمْرٌ صَلِّي হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এর যখন কোন কিছুর প্রয়োজন হত কিংবা তিনি চিন্তিত হতেন তখন তিনি নফল নামায পড়তেন।[১৬৭২] হাজত পূরণের নামায দু'রাকাত অথবা চার রাকাত পড়বে। হাদিস শরীফে আছে প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা ও তিনবার আয়তুল কুরসী এবং অবশিষ্ট তিন রাকাতে সূরা ফাতিহা ও কুল হুআল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বি রাব্বিন নাস একবার করে পড়বে। এ নামায যেন শবে কদরে চার রাকাত পড়ল। অর্থাৎ শবে কদরের নামাযের ন্যায় সাওয়াব প্রাপ্ত হবে। মাশায়েখগণ বলেন, এ নামায আমরা পড়েছি এবং আমাদের হাজত পূরণ হয়েছে।[১৬৭৩]

ইমাম তিরমিযী হাসান ও সহীহ সূত্রে, ইবনে মাজাহ ও তাবরানী হযরত ওসমান ইবনে হানিফ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন এক অন্ধ ব্যক্তি নবী করিম ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, আমার আরোগ্যের জন্য দোয়া করুন। তিনি বললেন, তুমি চাইলে দোয়া করব, আর যদি ধৈর্যধারণ কর তবে সেটিই হবে তোমার জন্য উত্তম। লোকটি আরয করলেন, দোয়া করুন। রাসূল ﷺ নির্দেশ দিলেন, উযূ কর, উত্তম রূপে কর এবং দু'রাকাত নামায পড়ে এ দোয়া পাঠ কর। اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ اَتَوَسَّلُ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّى تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فِى حَاجَتِىْ هذه لِتُقْضٰى لِىْ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, উসীলা ধারণ করছি এবং তোমার নবীর উসীলায় তোমার প্রতি মনোনিবেশ করছি যিনি রহমতের নবী। হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার মাধ্যমে আমার এ প্রয়োজন পূরণার্থে আমার প্রভুর দিকে মনোনিবেশ করছি। যেন আমার উদ্দেশ্য পূরণ হয়। হে আল্লাহ! আমার অনুকূলে তাঁর সুপারিশ কবুল কর। ওসমান ইবনে হানিফ (রা.) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা

[১৬৭১]. তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-১১৭, হাদিস নং-১২৪৭

[১৬৭২]. আবু দাউদ, সূত্র: মিশকাত, পৃ-১১৭, হাদিস নং-১২৪৫

[১৬৭৩]. মুফতি আমজাদ আলী (র.) বাহারে শরীয়ত, খণ্ড-৪, পৃ-২৯

এখনো উঠিনি, আলোচনায় রত আছি, অন্ধ লোকটি আমাদের সামনে আসলেন যেন কখনো অন্ধই ছিলেননা। অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফেরত পেয়েছেন।[১৬৭৪]

এভাবে হাজত পূরণের জন্য একটি পরীক্ষিত নামায আছে, যা ওলামাগণ সর্বদা পড়ে আসছেন। তা হল– ইমাম আ'যম আবু হানিফা (র.)'র মাযারে গিয়ে দু'রাকাত নামায পড়বে এবং ইমাম আ'যম (র.)'র উসীলা নিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন, আমি এরূপ করতাম আর দ্রুত আমার হাজত পূরণ হয়ে যেত।[১৬৭৫]

হাজত পূরণের আর এক প্রকারের পরীক্ষিত নামায আছে যাকে সালাতুল আসরার বলা হয়। ইমাম আবুল হাসান নুরুদ্দীন আলী ইবনে জারীর শাতনূফী (র.) বাহজাতুল আসরার গ্রন্থে এবং মোল্লা আলী ক্বারী (র.) ও শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) হযরত গাউসূল আ'যম (র.) থেকে বর্ণনা করেন। এর নিয়ম হল– মাগরীবের নামাযের পর সুন্নাতসমূহ পড়ে দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। উত্তম হল– সূরা ফাতিহার পর প্রত্যেক রাকাতে এগার বার সূরা ইখলাস পড়বে এবং সালাম ফিরানোর পর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করবে তারপর নবী করিম ﷺ এর উপর দুরূদ সালাম পাঠ করবে। অতঃপর এগারবার বলবে– يَا رَسُوْلَ اللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ اَغِثْنِىْ وَامْدُدْنِى فِى قَضَاءِ حَاجَتِي يَا قَاضِىَ الحَاجَات হে আল্লাহর রাসূল! হে আল্লাহর নবী! আমার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আমাকে সাহায্য করুন, হে উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকারী! অতঃপর ইরাকের দিকে এগার কদম অগ্রসর হবে এবং প্রতি কদমে এ দোয়া পাঠ করবে– يَا غَوْثَ الثَقَلَيْنِ وَيَا كَرِيْمَ الطَرْفَيْنِ اَغِثْنِىْ وَامْدُدْنِىْ فِى قَضَاءِ حَاجَتِي يَا قَاضِىَ الحَاجَات হে জ্বিন-ইনসানের সাহায্যকারী! হে পিতা-মাতা উভয় দিক থেকে সম্মানিত! আমার উদ্দেশ্য পূরণে আমাকে সাহায্য করুন। হে উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকারী! তারপর রাসূল ﷺএর উসীলায় আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবে।[১৬৭৬]

নিয়্যত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الحَاجَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ لِلّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللهُ اَكْبَرُ

[১৬৭৪]. মুফতি আমজাদ আলী (র.) বাহারে শরীয়ত, খণ্ড-৪, পৃ-৩০

[১৬৭৫]. আল্লামা শামী (র.) (১৩০৬ হি), রদ্দুল মুহতার, খণ্ড-১, পৃ-১৩৪ ও ইবনে হাজর মক্কী (র.) (৯৭৩ হি) আল খায়রাতুল হিসান, সূত্র: বাহারে শরীয়ত, খণ্ড-৪, পৃ-৩১

[১৬৭৬]. মুফতি আমজাদ আলী (র.) বাহারে শরীয়ত, খণ্ড-৪, পৃ-৩১

ইস্তিখারার নামায

ইস্তিখারা অর্থ কল্যাণ অন্বেষণ করা। এই নামাযের দ্বারা যেহেতু আল্লাহর কছে কল্যাণকর কাজের প্রার্থনা করা হয় এবং অকল্যাণজনক কাজ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় তাই এটাকে ইস্তিখারার নামায বলে। এটি কোন গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী কাজের জন্য পড়া হয়। যেসব কাজের ভাল-মন্দ ও লাভ-লোকসান সম্পর্কে মনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি কোন একটিকে প্রাধান্য দিতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত হয়। এসব বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়া হয়। এই নামায ও দোয়ার বরকতে আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে স্বপ্নের মাধ্যমে কিংবা মনের আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তের প্রতি ইঙ্গিত করেন অথবা মনের মধ্যে অনাগ্রহ সৃষ্টি করে ভুল সিদ্ধান্ত থেকে মনকে ফিরিয়ে রাখেন। তবে সর্বদা সাধারণ মানুষ আল্লাহর ইঙ্গিত সমূহ বুঝতে সক্ষম হয়না বিধায় কোন আল্লাহর মকবুল ও অভিজ্ঞ বান্দার সাহায্য নিলে এতে সঠিক ফল পাওয়া যায়।

ইমাম আবু হানিফা স্বীয় সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, يَعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ القُرْاٰن রাসূল ﷺ আমাদেরকে এমনভাবে ইস্তিখারা শিক্ষা দিতেন যেভাবে পবিত্র কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন।[১৬৭৭]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ" إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ وَبَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِيْنِيْ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ اَمْرِي اَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ اَمْرِيْ وَاٰجِلِهِ فَاَحْرِفْهُ عَنِّى وَاَصْرِفْنِى عَنْهُ وَاقْدِرِ الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِى بِهِ قَالَ وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ .

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে বিশেষ কাজে আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা করার নিয়ম শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছে করবে, তখন সে যেন ফরয ব্যতীত দু'রাকাত নামায পড়ে। অতপর বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমারই জ্ঞানের সাহায্যে এ বিষয়ে ভাল দিক প্রার্থনা করছি এবং

[১৬৭৭]. ইমাম আ'যম আবু হানিফা (র.) (১৮০ হি), মুসনাদে ইমাম আ'যম ও ইমাম আবু দাউদ (র.) আবু দাউদ শরীফ, খণ্ড-২, পৃ-৮৯ হাদিস নং-১৫৩৮

তোমারই ক্ষমতার সাহায্যে তোমার কাছে ক্ষমতা প্রার্থনা করছি। কেননা তুমি ক্ষমতা রাখ, আর আমি ক্ষমতা রাখিনা। তুমি এটার ভাল মন্দের জ্ঞান রাখ আর আমি রাখিনা। তুমি অদৃশ্যের বিষয়ে জ্ঞাত। হে আল্লাহ! তুমি যদি জান যে, এ বিষয়ে আমার জন্য ভাল হবে– আমার দ্বীনের ব্যাপারে আমার জীবন ধারণের ব্যাপারে ও আমার পরিণামে অথবা তিনি বলেছেন– আমার ইহ ও পরকালের তা হলে তুমি এটা আমার জন্য নির্ধারণ কর এবং এটা আমার জন্য সহজ করে দাও। তারপর আমার জন্য বরকত দান কর। আর তুমি যদি জান যে বিষয়টি আমার জন্য অকল্যাণকর আমার দ্বীনের ব্যাপারে, আমার জীবনযাপনের ব্যাপারে ও আমার পরিণামের ব্যাপারে অথবা তিনি বলেছেন– আমার ইহ ও পরকালে তা হলে তুমি একাজ আমার থেকে ফিরিয়ে রাখ এবং আমাকেও সে কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখ। আর আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ কর তা যেথায় আছে। তারপর তুমি আমাকে সে ব্যাপারে সন্তুষ্ট রাখ। তারপর তিনি বলেন, এসব শব্দের স্থলে প্রার্থনাকারী যেন নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়ের নাম উল্লেখ করে।[১৬৭৮]

নিয়্যত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الاِسْتِخَارَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ لِلّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আওয়াবীন নামায

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মাগরীবের নামাযের পর ছয় রাকাত নামায পড়বে ঐ সময় সে কোন মন্দ কথা বলবেনা, তবে তার সেই নামায বার বছরের ইবাদতের সমান গণ্য করা হবে।[১৬৭৯]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى، بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মাগরীব ও এশার মধ্যখানে বিশ রাকাত নামায পড়বে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।[১৬৮০]

[১৬৭৮]. বুখারী,সূত্রঃ মিশকাত,পৃ-১১৬, হাদিস নং-১২৪৩ ও ইমাম আবু হানিফা (র.), মুসনাদে ইমাম আ'যম (র.) হাদিস নং-১৬৯

[১৬৭৯]. তিরমিযী, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ-১০৪, হাদিস নং-১১০২ ও ইবনে শাহীন (র.) (২৮৫ হি) আত তারগীবু ফি ফাযায়েলুল আ'মাল, খণ্ড-১, পৃ-৩২, হাদিস নং-৭৮

[১৬৮০]. তিরমিযী, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ-১০৪, হাদিস নং-১১০৩ ও ইবনে শাহীন (র.) (২৮৫ হি) আত তারগীবু ফি ফাযায়েলুল আ'মাল, খণ্ড-১, পৃ-৩১, হাদিস নং-৭৮

عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَصَلَّى مِنْ بَعْدِهَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، أَسْكَنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ» ، قُلْتُ: فَإِنْ صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا؟ قَالَ: «كَمَنْ حَجَّ حَجَّةً بَعْدَ حَجَّةٍ» . قُلْتُ: فَإِنْ صَلَّى بَعْدَهَا سِتًّا؟ قَالَ: «يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ خَمْسِينَ عَامًا»

হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মাগরীবের নামায পড়বে এবং এরপর দু'রাকাত নামায পড়বে কোন কথা বলার পূর্বে তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে পবিত্রময় সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করার সুযোগ করে দেবেন। আমি বললাম, যদি কেউ মাগরীবের পর চার রাকাত পড়ে? তিনি বললেন, সে যেন একবার হজ্জ করার পর দ্বিতীয়বার হজ্ব করল। অর্থাৎ নফল হজ্জের সাওয়াব পাবে। আমি বললাম, যদি কেউ মাগরীবের পর ছয় রাকাত নামায পড়ে? তিনি বললেন, তবে আল্লাহ তায়ালা তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।[১৬৮১]

নিয়্যত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الاَوَّابِيْنَ سُنَّةُ رَسُوْلِ لِلّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

সালাতুত তাসবীহ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ আমার পিতা আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালিব (রা.) কে বললেন, হে আব্বাস! হে আমার চাচা! আমি কি আপনাকে দিব না, আমি কি আপনাকে দান করবনা, আমি কি আপনাকে বলবনা, আমি কি করবনা আপনার সাথে দশটি কাজ? إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ যখন আপনি তা করবেন, আল্লাহ আপনার পূর্বের গুনাহ, পরের গুনাহ, পুরাতন গুনাহ, নতুন গুনাহ, ইচ্ছাকৃত গুনাহ, ছোট গুনাহ এবং গোপন গুনাহ ও প্রকাশ্য গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। কাজটি হল আপনি চার রাকাত নামায পড়বেন। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন। প্রথম রাকাতে সূরা পড়ার পর দাঁড়ানো অবস্থায় "সুবাহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর" পনের বার পড়বেন। অতঃপর রুকুতে (নির্দিষ্ট তাসবীহের পর) পড়বেন দশবার। তারপর রুকু থেকে মাথা তুলে পড়বেন দশবার। তারপর সিজদায় গিয়ে (নির্দিষ্ট তাসবীহ'র পর) পড়বেন দশবার। তারপর সিজদা থেকে উঠে বসে পড়বেন দশবার। তারপর দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে পূর্বের ন্যায় পড়বেন দশবার। তারপর মাথা উঠাবেন এবং পড়বেন দশবার। সুতরাং প্রত্যেক

[১৬৮১]. ইবনে শাহীন (র.) (২৮৫ হি) আত তারগীবু ফি ফাযায়েলুল আ'মাল, খণ্ড-১, পৃ-৩১, হাদিস নং-৭৭

রাকাতে এই দোয়াটি পড়তে হবে পঁচাত্তর বার। এভাবে আপনি চার রাকাত নামায পড়বেন। সম্ভব হলে প্রতিদিন একবার এই নামায পড়বেন। যদি তা সম্ভব না হয় তবে অন্তত প্রতি জুমায় একবার পড়বেন। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে অন্তত প্রতি বছরে একবার পড়বেন। আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে সারা জীবনে অন্তত একবার পড়বেন।[১৬৮২]

উল্লেখ্য যে হাদিস শরীফে কিরাতের পর পনেরবার পড়তে বলা হয়েছে। তবে অন্যন্য কিতাবে বলা হয়েছে তাকবীরে তাহরীমার পর সানা পড়ার পর উক্ত দোয়া পড়বে পনের বার এবং কিরাতের পর পড়বে দশবার। অতএব দ্বিতীয় সিজদার পর উক্ত দোয়া আর পড়তে হবে না। মোটকথা হল– সানা পড়ার পর পনের বার, কিরাতের পর রুকুর পূর্বে দশবার, রুকুতে দশবার, রুকু থেকে উঠে দশবার, প্রথম সিজদায় দশবার, সিজদা থেকে উঠে দশবার, দ্বিতীয় সিজদায় দশবার। এভাবে এক রাকাতে পঁচাত্তর বার করে চার রাকাতে মোট তিনশত বার উক্ত দোয়া পড়তে হয়।[১৬৮৩]

নিয়্যত:

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَاتِ صَلٰوةِ التسبيح سُنَّةُ رَسُوْلِ لِلّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

তাহাজ্জুদের নামায

তাহাজ্জুদ আরবী শব্দ, অর্থ রাত জাগা, ঘুম থেকে উঠা। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا হে রাসূল! আপনি রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ পড়ুন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব। আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।[১৬৮৪]

পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পূর্বে সূরা মুযযাম্মিলের প্রথম আয়াতাংশ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا দ্বারা তাহাজ্জুদের নামায ফরয ছিল। পরবর্তীতে যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয় তখন তাহাজ্জুদের ফরযিয়ত বিলুপ্ত হয় তবে অতিরিক্ত সুন্নত হিসাবে বহাল রয়েছে। ফরয নামায যেমন পাঁচওয়াক্ত পড়ে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সাওয়াব পাওয়া যায় অনুরূপ তাহাজ্জুদ নফল বা সুন্নাত হলেও এতে ফরযের সমতুল্য সাওয়াব পাওয়া যায়। সাধারণত দিনের

[১৬৮২]. আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং অনুরূপ আবু রাফে থেকে ইমাম বায়হাকী, দাওয়াতে কবীর গ্রন্থে ও ইমাম তিরমিযী (র.) সূত্র: মিশকাত, পৃ-১১৭, হাদিস নং-১২৪৮

[১৬৮৩]. গুনিয়াতুত তালেবীন, সূত্র: বাহারে শরীয়ত, খণ্ড-৪, পৃ-২৮ ও দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, বা.ই.ফা, পৃ-২৭৯

[১৬৮৪]. সূরা বনী ইস্রাঈল, আয়াত-৭৯

নফল নামাযের চেয়ে রাতের নফল নামাযের সাওয়াব বেশী। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি اَفْضَلُ الصَّلٰوة بَعْدَ المفرُضَةِ صَلٰوةٌ فِى جَوْفِ اللّيْلِ ফরয নামাযের পর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নামায হল রাতের নামায।[১৬৮৫] এর অনেক কারণ আছে। তম্মধ্যে অন্যতম কারণ হল– রাতের নামাযে লোক দেখানো থাকেনা। একাগ্রতা থাকে বেশী। আরাম ত্যাগ করে নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয় এবং বিশেষ করে শেষ রাতে আল্লাহ নিকটবর্তী আসমানে এসে বান্দাহকে আহবান করেন। তাই প্রায় সকল মুত্তাকী, পরহেযগার, সূফি সাধকগণ সর্বদা এই নামায আদায় করতেন। বিশেষ করে নবী করিম ﷺ নিয়মতিভাবে এই নামায আদায় করতেন। কোন কারণে তাঁর এই নামায অনাদায় থেকে গেলে তিনি ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে এর পরিবর্তে বার রাকাত নামায পড়ে নিতেন। মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ، أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» রাসূল ﷺ ব্যাথা বা অন্য কোন কারণে যদি রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায পড়তে না পারতেন, তবে তিনি দিনে বার রাকাত নামায পড়ে নিতেন।[১৬৮৬]

শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে হয়। এ নামায দু'রাকাত করে চার, আট এবং বার রাকাত পড়া যায়। রাসূল ﷺ ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক ও উযূ করে তাহাজ্জুদ পড়তেন। তিনি তাহাজ্জুদ নামাযে দীর্ঘক্ষণ সময় অতিবাহিত করতেন। হযরত মুগীরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: «أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» নবী করিম ﷺ তাহাজ্জুদের নামাযে এত দীর্ঘক্ষণ যাবৎ দাঁড়ালেন তাঁর পাদ্বয় ফুলে গেল। যখন তাঁকে বলা হল আপনি এরূপ কেন করেন? আল্লাহ তো আপনাকে পূর্বাপর গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?[১৬৮৭]

হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ তোমরা রাতের (তাহাজ্জুদের) নামাযকে আবশ্যক করে নেবে। কেননা এটা হচ্ছে তোমাদের পূর্বেকার সৎ লোকদের নিয়ম। তোমাদের জন্য প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের

[১৬৮৫]. আহমদ, সূত্র: মিশকাত, পৃ-১১০, হাদিস নং-১১৬৪

[১৬৮৬]. মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ১৬৪০

[১৬৮৭]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত পৃ; ১০৮-৯, হাদিস নং-১১৪৯

পন্থা, গুনাহ মাফের উপায় এবং অপরাধ থেকে বাধাদানকারী।[১৬৮৮] হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ তায়ালা খুশী হন, (১) যখন সে রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ার জন্য উঠে, (২) মুসল্লিরা যখন নামাযের জন্য কাতার বাধে এবং (৩) সৈন্যদল যখন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার জন্য সারিবদ্ধ হয়।[১৬৮৯] হযরত আবু মালিক আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا اَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ اَلَانَ الكَلَامَ وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَتَابِعُ الصِّيَامَ وَصَلّى بِاللّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ জান্নাতে এমন উন্নত মানের বালাখানা রয়েছে যার ভিতর থেকে বাইরে এবং বাহির থেকে ভিতরে দেখা যায়। আল্লাহ তায়ালা তা নির্মাণ করেছেন ঐ ব্যক্তির জন্য যে নম্র কথা বলে, যে ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়, যে নিয়মিত রোযা রাখে এবং যে রাতে নামায পড়ে যখন মানুষ ঘুমে থাকে।[১৬৯০]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا الْعَبْدُ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ الاخرِ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلى اُمَّتِى لَفَرَضْتُهُمَا عَلَيْهِمْ .

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– বান্দা শেষ রাতে দু'রাকাত নামায পড়া পার্থিব সবকিছুর চেয়ে উত্তম। যদি এটা আমার উম্মতের উপর আমি ভারী মনে না করতাম তাহলে তাদের উপর ঐ দু'রাকাত নামায ফরয করে দিতাম।[১৬৯১]

নিয়্যতঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالى رَكْعَتَيْ صَلوةِ التَهَجُّدِ سُنَّةُ رَسُوْلِ لِلّٰهِ تَعَالى مُتَوَجِّهًا اِلى جِهَةِ الكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللهُ اَكْبَرُ

আইয়্যামে বীযের রোযার ফযিলত

عَنْ عَلى بن ابي طالب رَضِى الله تعَالى عَنْه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصَّوْمُ يَوْمَ ثَالِثِ عَشَرَ يَعْدِلُ صِيَامَ ثَلثَةِ اَلافِ سَنَةٍ وَالصَّوْمُ رَابِعِ عَشَرَ يَعْدِلُ صَوْمَ عَشَرَ الافِ سَنَةٍ وَمَنْ صَامَ يَوْمَ خَامِسِ عَشَرَ يَعْدِلُ صَوْمَ مِأئَةِ اَلفِ سَنَةٍ .

[১৬৮৮]. তিরমিযী, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ-১০৯, হাদিস নং-১১৫৬
[১৬৮৯]. শরহুস সুন্নাহ, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ-১০৯, হাদিস নং-১১৫৭
[১৬৯০]. বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, তিরমিযী, হযরত আলী (রা.) হতে, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ-১০৯, হাদিস নং-১১৬১
[১৬৯১]. ইবনে শাহীন (র.) (২৮৫ হি), আত তারগীবু ফি ফাযায়েলুল আ'মাল, খণ্ড-১, পৃ-১২০, হাদিস নং-৫৫৯

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তের তারিখের রোযা তিন হাজার বছর রোযা রাখার সমান, চৌদ্দ তারিখের রোযা দশ হাজার বছর রোযা রাখার সমান এবং যে ব্যক্তি রোযা রাখবে পনের তারিখে সে একশ হাজার বছর রোযা রাখার সমান সাওয়াব পাবে।[১৬৯২]

عَنْ جريرة قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ صِيَامُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ اَيْ ثَالِثِ عَشَرَ وَرَابِعِ عَشَرَ وَخَامِسِ عَشَرَ يَعْدِلُ صَوْمَ الدَّهْرِ كُلِّه .

হযরত জারীররা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, প্রতি মাসের তিন দিনের রোযা তথা তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের রোযা সারা জীবনের রোযার সমান।[১৬৯৩]

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ فَصَامَ الدَّهْرِ

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মাসের মধ্যে তিন দিন রোযা রাখবে, সে যেন সারা জীবন রোযা রাখল।[১৬৯৪]

عَنْ بن عَبَاس قَالَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَا يَدَعْ صِيَامَ الايَامِ البِيْضِ فِى سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ আইয়্যামে বীযের তথা চান্দ্র মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের রোযা কখনো পরিত্যাগ করতেন না, সফর অবস্থায় হোক বা মুকীম অবস্থায় হোক।[১৬৯৫]

عَنْ عمر بن الخطاب رضى الله عَنْه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ثَلاثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلّى رَكْعَتَى الفَجْرِ وَلَمْ يَنْزِلِ الوِترَ فِى سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ كُتِبَ لَه اَجْرُ شَهِيْدٍ

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখবে, ফজরের দু'রাকাত নামায আদায় করবে এবং সফরে কিংবা হাজরে বিতর নামায বাদ দেবে না তার জন্য শহীদের সাওয়াব লিখা হবে।[১৬৯৬]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে তিনটি কাজের ওসীয়ত করেছেন, যা আমি আমার জীবনে কখনো ছাড়ব না। সাহাবায়ে কিরামগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ তিনটি কাজ কি কি? উত্তরে আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা, ঘুমানোর পূর্বে বিতর আদায় করা এবং এশরাকের নামায পড়া। রাসূল ﷺ বলেছেন, হে আবু হোরায়রা এই তিনটি কাজ ছেড়ে দিওনা, এইগুলো বড় নেয়ামত।[১৬৯৭]

[১৬৯২]. মাওলানা রমযান ইবনে মুহাম্মদ, ফাযায়েলুশ শুহুরে ওয়াস সিয়াম, পৃ. ৫৮, লাহোর।
[১৬৯৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
[১৬৯৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
[১৬৯৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
[১৬৯৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
[১৬৯৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬০

হযরত আলী (রা.) বলেন, একদিন আমি রাসূল ﷺ'র কাছে গেলাম এবং তাঁর পাশে বসা ব্যক্তিকে সালাম করলাম। রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, হে আলী! ইনি জিব্রাইল (আ.), তুমি কাছে এসো। জিব্রাইল তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। অতঃপর আমি রাসূল ﷺ ও জিব্রাইল (আ.)কে সালাম দিলাম। এরপর রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, হে আলী! জিব্রাইল তোমাকে বলছেন যে, তুমি যেন প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখ। প্রথম রোযায় তোমার জন্য দশ হাজার রোযার সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে। দ্বিতীয় রোযায় বিশ হাজার এবং তৃতীয় রোযায় একশ হাজার রোযার সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে।

হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺকে জিজ্ঞাসা করলাম এই সাওয়াব কি শুধু আমার জন্য নাকি সকলের জন্য? উত্তরে তিনি বললেন, হে আলী! আল্লাহ তায়ালা এই সাওয়াব দিচ্ছেন তোমাকে এবং যে কেউ তোমার ন্যায় এই আমল করবে তাকেও এই প্রতিদান দেয়া হবে। তখন হযরত আলী (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ রোযাসমূহ কখন রাখব? উত্তরে তিনি বললেন, আইয়্যামে বীযে তথা প্রতি চান্দ্র মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখ রাখবে।[১৬৯৮]

আইয়্যামে বীযের নামকরণ

'বীয' শব্দটি بِيض থেকে উৎপত্তি। এর অর্থ শুভ্র। সাধারণত চান্দ্র মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে চাঁদের পূর্ণতা প্রকাশ পায় এবং এ সময় চাঁদের আলো উজ্জ্বল থাকে। তাই এই তারিখ সমূহকে আইয়্যামে বীয তথা শুভ্রদিন সমূহ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল মালিক (র.)'র পিতা বলেন, আমি হযরত আলী (রা.) কে এই দিনসমূহকে আইয়্যামে বীয রাখার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.)কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন তখন সূর্যের তাপে তার পুরো শরীর কালো হয়ে গেল। অতঃপর হযরত জিব্রাইল (আ.) এসে বলেন, হে আদম! আপনি কি চান আপনার শরীর শুভ্র হোক। উত্তরে আদম (আ.) বললেন, হ্যাঁ। তখন জিব্রাইল (আ.) বলেন, তাহলে আপনি প্রতি মাসে তিনটি তথা তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখুন। হযরত আদম (আ) প্রথম দিন তের তারিখে রোযা রাখলে তাঁর শরীরের এক তৃতীয়াংশ সাদা হয়ে যায়। তারপর চৌদ্দ তারিখে দ্বিতীয় রোযা রাখলে তাঁর শরীরের দুই তৃতীয়াংশ সাদা হয়ে যায়। অতঃপর পনের তারিখে তৃতীয় রোযা রাখলে তাঁর শরীরের পুরো অংশ সাদা হয়ে গেল। তাই এই দিনগুলোর নাম রাখা হয়েছে আইয়্যামে বীয।

[১৬৯৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺকে জিজ্ঞাসা করলাম আইয়্যামে বীয সম্পর্কে। উত্তরে তিনি বললেন, যখন হযরত আদম (আ) অবাধ্য হয়ে নিষিদ্ধ বৃক্ষের গন্দম গোটা খেয়েছেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসল যে, হে আদম! তুমি আমার নিকট থেকে নিচে নেমে যাও। আমার ইজ্জত ও জালালিয়তের শপথ! যে আমার অবাধ্য হবে সে কখনো আমার দয়াপ্রাপ্ত হয় না। অতঃপর আদম (আ.) পৃথিবীতে আসলেন আর তার সারা শরীর কালো বর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ফলে সকল ফেরেশতা এই বলে কান্না করতে লাগলেন যে, হে পরওয়ার দিগার। আপনি নিজের কুদরতী হাতে হযরত আদম (আ.)কে সৃজন করেছেন এবং স্থান দিয়েছেন তাঁকে জান্নাতে আর সকল ফেরেশতা দিয়ে তাকে সিজদা করায়েছেন। কিন্তু একটি মাত্র ভুলের বিনিময়ে তাঁর শুভ্রতাকে কালো রং দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। হযরত আদম (আ.)ও লজ্জিত হয়ে সিজদায় গিয়ে কান্নাকাটি করছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ওহী পাঠালেন যে, হে আদম! তুমি চাঁদের তের তারিখ রোযা রাখ। তিনি ঐদিন রোযা রাখার ফলে তাঁর শরীরের প্রথমাংশ সাদা হয়ে গেল। পুনরায় আল্লাহ ওহী পাঠালেন যে, হে আদম! চৌদ্দ তারিখও রোযা রাখ। তিনি সেই দিন রোযা রাখলেন ফলে সেই দিন তাঁর শরীরের মধ্যভাগ সাদা হয়ে গেল। তারপর আল্লাহ ওহী পাঠালেন, হে আদম! পনের তারিখও রোযা রাখ। তিনি পনের তারিখ রোযা রাখলেন। সেই দিনই শরীরের নিম্নভাগ সাদা হয়ে গেল আর এ কারণেই এই দিনগুলোর নাম রাখা হয়েছে আইয়্যামে বীয করে। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আইয়্যামে বীযের রোযাসমূহ রাখতে পারবে না সে যেন প্রতি মাসে অন্তত তিনটি রোযা অবশ্যই রাখে। তিনি আরো বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمَ الاَرْبَعَاءِ وَالخَمِيْسِ وَالجُمُعَة بَنَى اللّٰهُ تَعَالى لَه قَصْرًا فِى الجَنَّةِ مِنْ لُؤْلُوْةٍ يَأتُوْنٍ وَزُمُرَّدٍ وَكَتَبَ اللّٰهُ تَعَالى لَه بَرَأَةً مِنَ النَّارِ অর্থাৎ যে কেউ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার রোযা রাখবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে এমন অট্টালিকা তৈরী করে রাখবেন যা ইয়াকুত ও জমরদ অতি মূল্যবান পাথর দ্বারা নির্মিত এবং আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তিপত্র লিখে রাখবেন।[১৬৯৯]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ عَنْ كُلِّ شَهْرَ الخمس والجُمُعَة والسَّبْتِ كَتَبَ الله لَه عِبَادَة تِسْعَ مِائَةٍ سَنَةٍ অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতি মাসে বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার তিনদিন রোযা রাখবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য নয়শ বছর ইবাদতের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন।[১৭০০]

[১৬৯৯]. মাওলানা রমযান ইবনে মুহাম্মদ, ফাযায়েলুশ শুহুর ও ওয়াস সিয়াম, পৃ. ৬২, লাহোর
[১৭০০]. প্রাগুক্ত

সাপ্তাহিক দিন-রাতের নফল নামায

শনিবার দিনের নামায

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى يَوْمَ السَّبْتِ اَرْبَعْ رَكَعَاتٍ يَقْرَأ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الكِتَابِ مَرَّةً وَقُلْ يَا اَيُّهَا الكَافِرُونَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَاذا فَرَغَ مِنْ صَلوتِه وَسَلَّمَ فَقَرَأ بَعْدَه ايَةُ الكُرْسِىّ كَتَبَ اللهُ تَعالى لَه بِكُلِّ حَرْفٍ حَجَّةً وَعُمْرَةً وَدُفِعَ لَه بِكُلِّ حَرْفٍ اَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُ نَهَارِهَا وَقِيَامُ لَيَالِهَا وَاَعْطَاه اللهُ بِكُلِّ حَرْفٍ ثَوَابَ شَهِيْدٍ فَهُوَ كَانَ تَحْتَ ظِلِّ العَرْشِ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالشُّهَدَاءِ .

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি শনিবারে চার রাকাত নামায এভাবে পড়বে- প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার এবং সূরা কাফিরুন তিনবার। অতঃপর নামায শেষে সালাম দেবে এরপর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য প্রতি হরফের বিনিময়ে একটি হজ্ব ও ওমরার সমপরিমাণ সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন। প্রতি হরফের বিনিময়ে এক বছর দিনে রোযা রাখার এবং এক বছর রাতে নামায পড়ার সাওয়াব প্রদান করবেন। আর আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রতি হরফের বিনিময়ে একজন শহীদের মর্যাদা দান করবেন। কিয়ামত দিবসে সে নবী ও শহীদগণের সাথে আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে।[১৭০১]

শনিবার রাতের নামায

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ الله عَنْه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ السَّبْتِ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ اِثْنى عَشَرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ تَعَالى لَه قَصْرًا فِى الجَنَّةِ وَكَانَّمَا تَصَدَّقَ وَعَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ مُؤْمِنَةٍ وَتَبْرٌ مِنَ اليَهُوْدِيَّةِ وَكَانَ حَقًّا عَلى اللهِ تَعَالى اَنْ يَغْفِرلَه .

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি শনিবার মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে বার রাকাত নফল নামায পড়বে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি মহল নির্মাণ করবেন আর যেন সকল মু'মিন নর-নারীকে সাদকা করল এবং ইহুদীয়তের প্রতি অসন্তোষ হলো। তাছাড়া তাকে ক্ষমা করে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়।[১৭০২]

[১৭০১]. মাওলানা রমযান ইবনে মুহাম্মদ, ফাযায়েলুশ শুহুদ ওয়াসসিয়াম, উর্দু, লাহোর, পৃ. ৬৪
[১৭০২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

রবিবার দিনের নামায

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ مَنْ صَلَّ يَوْمَ الاَحَدِ اَرْبَعَ رَكْعَةٍ يَقْرأَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَامَنَ الرَسُوْلُ مَرَّةً كَتَبَ اللهُ تَعالى له بِعَدَدِ كُلِّ نَصْرَ انِيٍّ وَنَصْرَانِيَّةٍ حَسَنَاتٍ وَاَعْطَاهَا ثَوَابَ نَبِيٍّ وَكَتَبَ لَه حَجَّةً وَعُمْرَةً وَكَتَبَ لَه بِكُلِّ رَكْعَةٍ اَلْفَ صَلوةٍ الى اخر الحديث .

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রবিবারে চার রাকাত নামায এভাবে পড়বে প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা ও আমানার রাসূলু... পড়বে আল্লাহ তার জন্য সকল খৃস্টান নারী পুরুষের সমান নেকী লিপিবদ্ধ করবেন এবং আল্লাহ তাকে নবীর সাওয়াব দান করবেন। তার জন্য হজ্জ ও ওমরার সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন এবং প্রতি রাকাতের বিনিময়ে তার জন্য এক হাজার রাকাতের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন-----।

নবী করীম ﷺ আরো এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রবিবারে যোহরের পর (ফরয ও সুন্নাতের) চার রাকাত নামায পড়বে এভাবে- প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা আলিফ লাম মীম সিজদা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা মূলক পড়ে তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। অতঃপর দাঁড়িয়ে পুনরায় দুই রাকাত পড়বে। এতে উভয় রাকাতে আলহামদু'র সাথে সূরা জুমা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করে যে কোন উদ্দেশ্যে দোয়া করবে আল্লাহর তার উদ্দেশ্যপূর্ণ করবেন এবং তার দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন।[১৭০৩] অন্য বর্ণনায় আছে আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের বালা মুছিবত থেকে তাকে রক্ষা করবেন এবং শত্রু ও হিংসুকদের অনিষ্ট থেকেও মুক্ত রাখবেন।[১৭০৪]

রবিবার রাতের নামায

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلّى لَيْلَةَ الاحَدَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً يَقْرأ فى كُلِّ رَكْعَةٍ اَلْحَمْدُ لله مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ خَمْسِيْنَ مَرَّةً وَالمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً الخ .

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রবিবারে বিশ রাকাত নামায পড়বে- প্রতি রাকাতে আলহামদু একবার, কুলহু আল্লাহু আহাদ পঞ্চাশবার এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস একবার করে পড়বে আর সালাম ফিরানোর পর নিজের এবং নিজের পিতা-মাতার জন্য একশবার ইস্তেগফার পড়বে অতঃপর রাসূল ﷺ'র উপর দুরূদ প্রেরণ করবে এরপর নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ

[১৭০৩]. গুনিয়াতুত তালেবীন
[১৭০৪]. প্রাগুক্ত পৃ. ৬৫

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ এরপর পাঠ করবে لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ করবে اَنَّ اٰدَمَ صَفْوَةَ اللّٰهِ وَفِطْرَتِه وَاِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمُوْسٰى كَلِيْمُ اللّٰهِ وَعِيْسٰى رُوْحُ اللّٰهِ وَمُحَمَّد حَبِيْبُ اللّٰهِ অতপর আল্লাহর দরবারে দোয়া করবে, তবে নিশ্চয় তার দোয়া কবুল করা হবে। অসংখ্য সাওয়াবের অধিকারী হবে এবং তাকে নবীগণের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করা হবে।[১৭০৫]

সোমবার দিনের নামায

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الاِثْنَتَيْنِ عِنْدَ اِرْتِفَاعِ النَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرأ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الكِتَابِ مَرَّةً وَايةُ الكُراسِيِّ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ مَرَّةً وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً فَاِذَا اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ عَشَرَ مَرَّاتٍ وَصَلىّ عَلى النَبِيّ ﷺ عَشَرَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللّٰهُ ذُنُوْبَهُ كُلَّهُ .

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সোমবারে দিনের বেলায় (সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর) দুই রাকাত নফল নামায এভাবে পড়বে- প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার, আয়াতুল কুরসি ও সূরা ইখলাস একবার এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস একবার করে পড়বে। সালাম ফিরানোর পর استغفرالله رَبِّى مِن كُلِّ ذَنْبٍ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ দশবার পড়বে এরপর নবী করিম ﷺ'র উপর দুরূদ শরীফ প্রেরণ করবে, আল্লাহু তায়ালা তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।[১৭০৬]

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সোমবারে যে কোন সময়ে কিংবা সূর্য কিছুটা উপরে উঠার পর দু'রাকাত নামায এভাবে পড়বে- প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা শরীফের পর আয়াতুল কুরসী একবার পাঠ করবে। নামায শেষে বার বার সূরা ইখলাস, বার বার ইস্তেগফার পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাকে এভাবে আহবান করবে- অমুকের ছেলে আমার বান্দা কোথায়? আমার কাছে এসো। আমি তাকে অশেষ নিয়ামত দান করব। ফলে সে আল্লাহর নিকটে যাবে এবং আল্লাহ তাকে জান্নাতের হাজার পোশাকও হাজার জান্নাতী মুকুট পরিধান করাবেন। তার সাথে অসংখ্য ফেরেশতা থাকবে, যারা তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন এবং জান্নাতে তাকে সুউচ্চ স্থান দান করবেন।[১৭০৭]

১৭০৫. মাওলানা রমযান ইবনে মুহাম্মদ, ফাযায়েলুশ শুহুর ওয়াস নিয়াম, লাহোর, পৃ. ৭১

১৭০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

১৭০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

সোমবার রাতের নামায

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله تعالى عَنْه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّي فِى لَيْلَةَ الاِثْنَيْنِ اَرْبَعَ رَكْعَةٍ يَقْرأُ فِى الرَّكْعَةِ الاُولى اَلْحَمْدُ للهِ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ عَشَرَ مَرَّةٍ وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الحَمْدُ لِلّٰهِ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ عِشْرِيْنَ مَرَّةً وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَة بَعْدَ الحَمْدِللهِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ثَلاَثِيْنَ مَرَّةً وَفِى الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ اَلحَمْدُ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَرْبَعِيْنَ مَرَّةً ثُمَّ تَشْهُدُ وَسَلَّمَ وَبَعْدَ قَرأ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ خَمْسًا وَسَبْعِيْنَ مَرَّةً وَاشْتَغْفِرُ اللّٰهُ تَعَالى لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ خَمْسًا وَّسَبْعِيْنَ مَرَّةً سَأَلَ حَاجَتَه فَكَانَ حَقَّه عَلى اللّٰهِ تَعَالى اَنْ يُعْطِيْهِ سُوَالِهِ .

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সোমবার রাতে চার রাকাত নামায পড়বে, প্রথম রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা। দশবার সূরা ইখলাস। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা ইখলাস বিশ বার, তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা ইখলাস ত্রিশবার এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা ইখলাস চল্লিশবার পড়বে। অতঃপর তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। এরপর সূরা ইখলাস পঁচাত্তর বার, ইস্তেগফার পঁচাত্তর বার পাঠ করবে নিজের ও নিজের পিতা-মাতার জন্য। অতঃপর পঁচাত্তর বার দুরূদ শরীফ প্রেরণে করবে রাসূল ﷺ'র উপর এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। তাহলে তার প্রার্থনা কবুল করা এবং তার চাহিদাপূর্ণ করা আল্লাহ তায়ালার দায়িত্ব হয়ে যায়।[১৭০৮]

عَنْ اَبِى اُمَامَةَ رَضِي اللّٰهُ عَنْه قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلى لَيْلَةَ الاِثْنَيْنِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرأ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الكِتَابِ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ خَمْسُ عَشَرَ مَرَّةً وَيَقْرَأُ بَعْدَ التَّسْلِيمْ خَمْسَ عَشَرَ مَرَّةً ايَةُ الكُرْسِيّ وَاسْتَغْفِرُاللّٰه خَمْسَ عَشَرَ مَرَّةً جَعَلَ اللّٰهُ تَعَالَى اِسْمُه فِىْ اَصْحَابِ الجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ وَغُفِرَلَه ذُنُوبَ العَلاَنِيّةِ وَكُتِبَ لَه بِكُلِّ ايَةٍ قَرأَهَا حَجَّةً وَعُمْرَةً وَاِنْ مَاتَ مَا بَيْنَ الاِثْنَيْنِ اَلى الاِثْنَيْنِ مَاتَ شَهِيْدًا .

হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সোমবার রাতে দু'রাকাত নামায এভাবে পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার এবং সূরা ইখলাস পনের বার পাঠ করবে আর সালাম ফিরানোর পর আয়াতুল কুরসী পনের বার এবং ইস্তেগফার পনের বার। আল্লাহ তায়ালা তার নাম জান্নাতীদের তালিকাভুক্ত করে দেবেন যদিও সে জাহান্নামী হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তায়ালা তার

১৭০৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৭২

সমস্ত প্রকাশ্য গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তার পঠিত প্রতি আয়াতের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে একটি হজ্ব ও একটি ওমরার সমপরিমাণ সাওয়াব দান করবেন। আর যদি সে ব্যক্তি এই সোমবার থেকে পরবর্তী সোমবারের মধ্যে মৃত্যু বরণ করে তবে সে শহীদ হিসেবে মৃত্যু বরণ করবে।[১৭০৯]

মঙ্গলবার দিনের নামায

عَنْ انسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلّى يَوْمَ الثَّلَثَآءِ عَشَرَ رَكْعَاتٍ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ يَقْرَأُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الكِتَابِ مَرَّةً وَايَةَ الكُرْسِيِّ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ثَلاَثَ مَرَّةٍ لَمْ يَكْتُبْ عَلَيهِ خَطِيْئَةً الى سَبِعِيْنَ يَوْمًا فَاِنْ مَاتَ الى سَبْعِيْنَ يَوْمً مَاتَ شَهِيْدًا وَغُفِرَلَهُ ذُنُوْبُ سَبْعِيْنَ سَنَةً .

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মঙ্গলবারে দিনের বেলায় দশ রাকাত নামায এভাবে পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা, একবার আয়াতুল কুরসী এবং তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করবে। তাহলে সত্তর দিন পর্যন্ত তার কোন গুনাহ লিপিবদ্ধ করা হবে না। যদি সে ব্যক্তি ঐ সত্তর দিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে এবং সত্তর বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।[১৭১০]

মঙ্গলবার রাতের নামায

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلىّ لَيْلَةَ الثَّلَثّاَءِ اِثْنى عَشَرَ رَكْعَةٍ يَقْرَأ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الكِتَابِ مَرَّةً وَاِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ خَمْسَ مَرَّةٍ بَنِيَ اللّٰهُ تَعَالَى له فِى الجَنَّةِ بَيْتًا عَرْضُه وَطُوْلُه وَسِعَ الدُّنْيَا سَبْعَ مَرَّةً .

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মঙ্গলবার রাতে বার রাকাত নামায পড়বে, প্রতি রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা, পাঁচ বার সূরা নসর পড়বে। আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে এমন একটি ঘর নির্মাণ করবেন, যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পৃথিবীর সাতগুণ সমান হবে।[১৭১১]

বুধবার দিনের নামায

عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِي اللّٰهُ عَنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلّى يَوْم الارْبَعَاءِ اِثْنَا عَشَرَ رَكْعَةً عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهارِ يَقْرَأُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَايَةُ الكُرْسِيِّ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتِ الخ .

[১৭০৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
[১৭১০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
[১৭১১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

হযরত মুয়াব ইবনে জাবল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বুধবারে দিনের বেলায় বার রাকাত নামায পড়বে। প্রতি রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা ও আয়াতুল কুরসী পড়বে এবং তিনবার সূরা ইখলাস, তিনবার সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়বে। তাকে আরশের নিকটে অবস্থানরত ফেরেশতারা এই বলে আহবান করবে– হে আল্লাহর বান্দা! তুমি সেই আমলকে ভালভাবে পালন করেছ, ফলে আল্লাহ তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তোমার কবর আযাবও ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তায়ালা তোমার অন্ধকার কবরকে আলোকিত করে দেবেন।[১৭১২]

বুধবার রাতের নামায

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الاَرْبَعَاءِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِى اَوَّلِ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الكِتَابِ مَرَّةً وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الفَلَقِ عَشَرَ مَرَّةً وَفِى الرّكْعَةِ الثَانِيَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ مَرَّةً وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ عَشَرَةَ مَرَّةً يُنَزّلُ مِنْ كُلِّ السَّماءِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَائِكَةِ يَكْتُبُوْنَ له الثَّوَابَ اِلى يَوْمِ القِيَامَةِ

নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বুধবার রাতে দু'রাকাত নামায পড়বে। প্রথম রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা ও দশবার সূরা ফালাক এবং দ্বিতীয় রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা এবং দশবার সূরা নাস পড়বে। তাহলে প্রত্যেক আসমান থেকে সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতীর্ণ করবে এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার জন্য সাওয়াব লিপিবদ্ধ করতে থাকবে।[১৭১৩]

বৃহস্পতিবার দিনের নামায

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الخَمِيْسِ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ رَكْعَتْنِ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَةِ الاُولى فَاتِحَةُ الكِتَابِ مَرَّةً وَايَةُ الكُرْسِيِّ مِائَةَ مَرَّةً وَفِى الرَّكْعَةِ الثَانِيَةِ فَاتِحَةَ الكِتَابِ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةً وَبَعْدَ الفِرَاغِ يُصَلِىّ عَلَيَّ مِائَةَ مَرَّةً اَعْطَاهُ اللّٰهُ تَعَالى ثَوَابَ مَنْ صَامَ رَجَبَ وَشَعْبَانِ وَرَمَضَانَ وَكَانَ لَه مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ حَاجَّ البَيْتِ الخ .

যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার যোহর ও আসরের মধ্যখানে দু'রাকাত নামায পড়বে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার, আয়াতুল কুরসী একশবার এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস একশবার পড়বে। নামায শেষে আমার উপর একশ বার দুরূদ প্রেরণ করবে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে রজব, শাবান ও রমযান মাসে রোযা রাখার সাওয়াব দান করবেন এবং বায়তুল্লাহ এ হজ্ব করার সাওয়াব দান করবেন।

[১৭১২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
[১৭১৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

আল্লাহর নিকট তার নাম ঈমানদার হিসাবে লিখা হয় এবং সকল মু'মিনের সংখ্যা পরিমাণ নেকী তাকে প্রদান করা হবে আর আল্লাহর কাছে তার নাম তাওয়াক্কুলকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১৭১৪]

বৃহস্পতিবার রাতের নামায

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الخَمِيْسِ مَا بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِى كُلِّ فَاتِحَةَ الكِتَابِ مَرَّةً وَايَةُ الكُرْسَيِّ خَمْسَ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَالمُعَوِّذَتَيْنِ خَمْسَ مَرَّةٍ فَاذا فَرَغَ مِنْ صَلواته اَسْتَغْفِرُ اللهَ خَمْسٌ عَشَرَ مَرَّةً وَجَعَلَ ثَوَابَهَ لِوَالِدَيْهِ فَقَدْ اَدَّي حَقَّهُمَا وَاِنْ كَانَ عَاقًّالَهُمَا وَاَعْطَاهُ اللهُ تَعَالى مَا يُعْطى الصدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءَ .

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার মাগরিব ও এশার মধ্যখানে দু'রাকাত নামায এভাবে আদায় করবে, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার, আয়াতুল কুরসী পাঁচবার, সূরা ইখলাস পাঁচবার এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঁচবার করে পড়বে। নামায শেষে ইস্তেগফার পনের বার পড়ে এর সাওয়াব তার পিতা-মাতাকে বখশিশ করবে। তাহলে নিশ্চয় সে তার পিতা-মাতার হক আদায় করল। যদিও তার পিতা-মাতা দুনিয়াতে থাকাকালীন তার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। আর তাকে আল্লাহ তায়ালা এমন নিয়ামত দান করবেন যা কেবল সিদ্দীক ও শহীদগণকে দেওয়া হয়।[১৭১৫]

জুমাবার দিনের নামায

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কোন মু'মিন বান্দা যদি জুমার দিন সূর্য এক তীর পরিমাণ উপরে উঠার পরে কিংবা পূর্বে উযূ করে দু'রাকাত অথবা চার রাকাত দোহার নামায আদায় করবে সাওয়াবের বিশ্বাস রেখে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য দুইশত নেকী লিপিবদ্ধ করেন এবং দুইশত বদী দূরীভূত করে দেবেন।

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন চার রাকাত নফল নামায পড়বে সূর্য উপরে উঠার পর তাহলে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাকে জান্নাতে চারশত দরজা বুলন্দ করবেন। আর যে ঐ সময় আট রাকাত পড়বে, তাকে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে বহু দরজার বুলন্দ করবেন এবং তার সমস্ত পাপ মার্জনা করে দেবেন।

আর যদি কেউ ঐ সময় বাররাকাত নফল নামায পড়বে। আল্লাহ তায়ালা তার জন্য দু'হাজার নেকী দান করবেন এবং ঐ পরিমাণ গুনাহ ক্ষমা করবেন। আর এই নামায পড়বে প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করবে।[১৭১৬]

[১৭১৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮
[১৭১৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
[১৭১৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الجُمُعَةِ مَا بَيْنَ الظهر وَالعصْرِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِى اَوَّلِ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَايَةُ الكُرْسَيِّ خَمْس وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الفَلَقِ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَرَّةً وَفِىْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الكِتَابِ مَرَّةً وَقُلْ هَوَ اللهُ اَحَدٌ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الفَلَقِ عِشْرِين مَرَّةً وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَرَّةً فَاذَا سَلَّمَ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ الاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ خَمْسُوْنَ مَرَّةً فَلا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرى رَبَّه عَزَّ وَجَلَّ فِى المَنَامِ وَيَرى مَكَانَهَ فِى الجَنَّةِ .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে দু'রাকাত নামায পড়বে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার এবং আয়াতুল কুরসী পঁচিশবার আর সূরা ফালাক ও নাস একবার করে পাঠ করবে। দ্বিতীয় রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস এবং সূরা ফালাক বিশবার ও সূরা নাস একবার পাঠ করবে। সালাম ফিরানোর পর পঞ্চাশ বার 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম, পাঠ করবে। সে দুনিয়া থেকে মৃত্যুবরণ করবে না যেই পর্যন্ত আল্লাহ তাঁকে স্বপ্নে জান্নাতে তার স্থান দেখাবেন। হাদিসখানা গুনিয়াতুত তালেবীন গ্রন্থেও বিদ্যমান আছে।[১৭১৭]

জুমাবার রাতের নামায

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بَيْنِ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ اثْنَى عَشَرَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الكِتَابِ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ عَشَرَ مَرَّةً فَكَاَنَّمَا عَبَدَ اللهَ تَعَالى اثْنَى عَشَرَ سنَةٍ وَصَامَ نَهَارَهَا وَقَامَ لَيَالِهَا .

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমার রাতে মাগরিব ও এশার মাঝখানে বার রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা ইখলাস দশবার পাঠ করবে। সে যেন বারবছর আল্লাহর ইবাদত করল এবং বারবছর যাবৎ দিনে রোযা রাখল ও সারা রাতে নামায পড়ল।[১৭১৮]

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ سَلْمَةَ وَاَنسِ بْنِ مَالِك قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الجُمُعَةِ صَلوة العشَاءِ الاخِرَةِ فِى جَمَاعَةٍ وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ سُنَّةً ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا عَشَرَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ الحَمْدُلله مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللهُ مَرَّةً وَالمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً ثُمَّ اَوْتَرَ بِثَلَاث رَكْعَةٍ وَنَامَ عَلى جَنْبِه الاَيْمَنِ وَجْهَه اِلى القِبْلَةِ فَكَاَنَّمَا اَحْيَا لَيْلَةَ القَدْرِ.

[১৭১৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
[১৭১৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

হযরত কাসীর ইবনে সালমা ও আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমার রাতে এশার নামায জামাতে আদায় করার পর দু'রাকাত সুন্নত পড়বে। অতঃপর দশ রাকাত নামায পড়বে। প্রতি রাকাতে সুরা ফাতিহা একবার, সূরা ইখলাস একবার এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস একবার করে পড়বে এরপর তিন রাকাত বিতর পড়বে। তারপর ডান পাশ হয়ে কিবলামুখী হয়ে শুয়ে পড়বে, সে যেন লাইলাতুল কদরকে জীবিত করল। অর্থাৎ কদর রাতে সারা রাত ইবাদত করলে যে সাওয়াব পাওয়া যাবে, সেও তত পরিমাণ সাওয়াব প্রাপ্ত হবে।[১৭১৯]

এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত মনীষীগণ

▪ হযরত খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী (র.)	১ যিলহজ্ব	১৩৪২ হিজরি
▪ হযরত শাহ আমানত (র.)	১ যিলহজ্ব	
▪ হযরত ইমাম মুসলিম ইবনে আকীল (র.)	৩ যিলহজ্ব	৬০ হিজরি
▪ হযরত ইমাম বাকের (র.)	৭ যিলহজ্ব	
▪ হযরত আবু যর গিফারী (র.)	৮ যিলহজ্ব	২৩ হিজরি
▪ ইমাম দারেমী সমরকন্দী (র.)	৮ যিলহজ্ব	
▪ আবুল হোসাইন আলী ইবনে আবু বকর (র)	১৪ যিলহজ্ব	৫৯৩/৫৯৬ হিজরি
▪ আল্লামা তৈয়্যব শাহ (র.)	১৫ যিলহজ্ব	১৪১৩ হিজরি
▪ হযরত আবু বকর শিবলী (র.)	১৭/২৭ যিলহজ্ব	২৫৫ হিজরি
▪ হযরত ওসমান (র.)	১৮ যিলহজ্ব	৩৫ হিজরি
▪ হযরত নঈম উদ্দীন মোরাদাবাদী (র.)	১৮ যিলহজ্ব	১৩৬৭ হিজরি
▪ হযরত মারুফ কারখী (র.)	১৯ যিলহজ্ব	
▪ হযরত খান জাহান আলী (র.)	২৬ যিলহজ্ব	৮৬৩ হিজরি
▪ হযরত ওমর (রা.)	৩০ যিলহজ্ব	২৩ হিজরি

সমাপ্ত

[১৭১৯]. প্রাগুক্ত, পৃ, ৭৫।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল কুরআন	
২. সহীহ বুখারী শরীফ	মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬ হি.)
৩. সহীহ মুসলিম শরীফ	ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১ হি.)
৪. জামে তিরমিযী শরীফ	ইমাম তিরমিযী (র.) (২৭৯ হি.)
৫. সুনানে আবু দাউদ শরীফ	ইমাম আবু দাউদ (র.) (২৭৫ হি.)
৬. সুনানে নাসাঈ শরীফ	ইমাম নাসাঈ (র.) (৩০৩ হি.)
৭. সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ	ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) (২৭৩ হি.)
৮. মুসনাদে ইমাম আযম (র.)	ইমাম আবু হানিফা (র.) (১৫০ হি.)
৯. মুসনাদে ইমাম মালিক	ইমাম মালিক (র.) (১৭৯ হি.)
১০. মুসনাদে আহমদ	ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি.)
১১. মিশকাতুল মাসাবীহ	শায়খ ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) (৭৪৯ হি.)
১২. ফাযায়েলুস সাহাবা	ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি.)
১৩. লাতায়েফুল মাআরিফ	ইবনে রজব হাম্বলী (র.) (৭৯৫ হি.)
১৪. গুনিয়াতুত তালেবীন	আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.)
১৫. আদ্-দুররুল মনসূর	জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.)
১৬. আল্-খাসায়েসুল কুবরা	জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) ,,
১৭. আল্ ইতকান	জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) ,,
১৮. শরহুস সুদূর	জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) ,,
১৯. তারীখুল খোলাফা	জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.)
২০. আস সাওয়ায়েকুল মুহরাকা	ইবনে হাজর মক্কী (র.) (৯৭৪ হি.)
২১. যুরকানী শরহে মুয়াহিবুল লাদুনী	ইমাম যুরকানী (র.) (১১২২ হি.)
২২. আল্-মুস্তাদরাক	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ হাকেম (র.) (৪০৫ হি.)
২৩. শেফা শরীফ	কাযী আয়ায (র.) (৫৪৪ হি.)
২৪. তাফসীরে কবীর	ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (র.) (৬০৬ হি.)
২৫. শাওয়াহেদুন্নবুয়ত	আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি.)
২৬. নুযাহতুল মাজালীস	আব্দুর রহমান সফূরী (র.) (৮৯৪ হি.)
২৭. সফীনায়ে নূহ (আ:)	আল্লামা শফী উকাড়ভী (র.)
২৮. শামে কারবালা	আল্লামা শফী উকাড়ভী (র.)
২৯. খুৎবাতে মহররম	মুফতি জালালউদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.)
৩০. মাছাবাতা বিস সুন্নাহ	আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), (১০৫২ হি.)
৩১. মাদারিজুন নবুয়্যত	আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), (১০৫২ হি.)
৩২. আশআতুল লুমআত	আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), (১০৫২ হি.)
৩৩. তাকমীলুল ঈমান	আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), (১০৫২ হি.)
৩৪. শরহে সহীহ মুসলিম	গোলাম রাসূল সাঈদী
৩৫. আশ্-শরফুল মুআব্বাদ	আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.)
৩৬. বারাকাতে আলে রাসূল	আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.)
৩৭. সীরাতে শাফেঈ (র.)	আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.)

৩৮. নুরুল আবসার	আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.)
৩৯. মাকতুবাত শরীফ	মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.)
৪০. সাঁওয়ানেখে কারবালা	আল্লামা নঈমউদ্দিন মোরাদাবাদী (র.) (১৩৬৭ হি.)
৪১. রওজাতুশ শোহাদা	
৪২. তাবারী	ইমাম তাবারী (র.) (৩১০ হি.)
৪৩. ফাতোয়ায়ে রেজভীয়্যা	ইমাম আহমদ রেযা (র.) (১৩৪০ হি.)
৪৪. তাম্বীহুল গাফেলীন	ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দি (র.) (৩৭৩ হি.)
৪৫. তাফসীরে জিয়াউল কুরআন	আল্লামা পীর করম শাহ আল আজহারী (র.)
৪৬. কিমিয়ায়ে সা'দাত	ইমাম গাজ্জালী (র.) (৫০৫ হি.)
৪৭. দাকায়েকুল আখাবার	ইমাম গাজ্জালী (র.) (৫০৫ হি.)
৪৮. শুয়াবুল ঈমান	ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি.)
৪৯. সুনানে দারেমী	ইমাম দারেমী (র.) (২৫৫ হি.)
৫০. বাহারে শরীয়ত	মুফতি আমজাদ আলী খান (র.)
৫১. আল আওসাত	ইমাম তাবরানী (র.)
৫২. দারে কুতনী	ইমাম দারে কুতনী (র.) (৩৮৫হি.)
৫৩. শরহে শিফা	মোল্লা আলী ক্বারী (র.) (১০১৪ হি.)
৫৪. মিরকাত শরহে মিশকাত	মোল্লা আলী ক্বারী (র.) (১০১৪ হি.)
৫৫. মাজমাউয যাওয়ায়েদ	নুরুদ্দিন আলী ইবনে আবু বকর (র.) (৮০৮ হি.)
৫৬. উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী	আল্লামা বদরউদ্দিন আইনী (র.) (৫৮৮ হি.)
৫৭. হাশীয়ায়ে তাহতাভী	আহমদ ইবনে মুহাম্মদ তাহতাভী (১২৩১ হি.)
৫৮. আল বাহরুর রায়েক	যাইনুদ্দিন ইবনে নুজাইম মিশরী (র.) (৯৭০ হি.)
৫৯. মারাকিউল ফালাহ	হাসান ইবনে আম্মার (র.) (১০৬৯ হি.)
৬০. ফাযায়েলে আ'মাল	যাকারিয়া কন্দুলভী
৬১. রওযুর রাইয়্যাহীন	আল্লামা ইয়াফেঈ (র.) (৭৬৮ হি.)
৬২. শরহে আকায়েদে নসফিয়া	সা'দ উদ্দিন তাফতাযানী (র.) (৭৯১ হি.)
৬৩. নিবরাস	আব্দুল আযীম ফারহারী (র.)
৬৪. কাওয়ায়েদুল আকায়েদ	ইমাম গাজ্জালী (র.) (৫০৫ হি.)
৬৫. আল মুয়াহিবুল লাদুনিয়্যা	ইমাম আহমদ কাস্তলানী (র.) (৯২৩ হি.)
৬৬. সীরাতে হালবীয়্যাহ	আলী ইবনে বুরহান উদ্দিন হালভী (র.) (১৪০৪ হি.)
৬৭. খাশফুল খিফা	আল্লামা আজলূনী (র.) (১১৬২ হি.)
৬৮. নশরুত তীব	আশরাফ আলী থানভী
৬৯. মাতালিউল মুসাররাত	আল্লামা ফাসী মুহাম্মদ মেহেদী ইবনে আহমদ (র.) (১১০৯ হি.)
৭০. ফাতাওয়ায়ে হাদিসীয়্যাহ	শাহাবুদ্দিন ইবনে হাজর হাইতামী মক্কী (র.) (৯৭৪ হি.)
৭১. হাশীয়ায়ে মাকামাত	ইদ্রিস কানদেহলভী দেওবন্দী
৭২. আল্-বিদায়া ওয়ান নিহায়া	আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) (৭৭৪ হি.)
৭৩. আল্-মু'জামুল কবীর	ইমাম তিবরানী (র.) (৩৬০ হি.)
৭৪. আল্-মু'জামুল আওসাত	ইমাম তিবরানী (র.) (৩৬০ হি.)
৭৫. আস্-সিকাত	ইবনে হিব্বান (র.) (৫৭১ হি.)
৭৬. তারীখে দামেস্ক আল কবীর	ইবনে আসাকের (র.) (৫৭১ হি.)

৭৭. তারীখে বাগদাদ	খতীব বাগদাদী (র.) (৪৬৩ হি.)
৭৮. আত্ তাবকাতুল কুবরা	ইবনে সা'দ (র.) (২৩০ হি.)
৭৯. আল্-ফেরদৌস	আল্লামা দায়লামী (র.) (৫০৯ হি.)
৮০. মুয়ালিমাতুত তানযীল	ইমাম বগভী (র.) (৫১৬ হি.)
৮১. তাফসীরে ইবনে কাসীর	আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) (৭৭৪ হি.)
৮২. ফাতহুল কাদীর	আল্লামা শওকানী (র.) (১২৫০ হি.)
৮৩. তাফসীরে রূহুল মায়ানী	আল্লামা আলূসী (র.) (১২৭০ হি.)
৮৪. উরফুশ শাযিয	আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (১৩৫২ হি.)
৮৫. আনোয়ারে মুহাম্মদীয়া	আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.)
৮৬. আল ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তাফা	ইবনে জওযী (র.) (৫৭৯ হি.)
৮৭. তারীখুল খামীস	ইমাম হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ দিয়ারে বকরী (র.)
৮৮. জাওয়াহিরুল বিহার	আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.)
৮৯. আস সুনানুল কুবরা	ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি.)
৯০. আস সুনানুল কুবরা	ইমাম নাসাঈ (র.) (৩০৩ হি.)
৯১. আল মুসান্নিফ	ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (র.) (২১১ হি.)
৯২. তাফসীরে রূহুল বয়ান	ইসমাঈল হক্কী (র.) (১১৩৭ হি.)
৯৩. ফতহুল বারী	ইবনে হাজর আসকালানী (র.) (৮৫২ হি.)
৯৪. তাহযীবুত তাহযীব	ইবনে হাজর আসকালানী (র.) (৮৫২ হি.)
৯৫. আল হাভী লিল ফাত্ওয়া	জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.)
৯৬. হুসনুল মাকাসেদ ফী আমলিল মাওলাদ	জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.)
৯৭. হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন	আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.)
৯৮. আহসানুল ফাতাওয়া	মুফতি রশিদ আহমদ
৯৯. আলমিলাদুন নববী	ইবনে জওযী (র.) (৫৭৯ হি.)
১০০. আল মওরদুর রবি ফি মওলদুন্নবী	মোল্লা আলী ক্বারী (র.) (১০১৪ হি.)
১০১. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ	ইউসুফ সালেহী (র.) (৯৪২ হি.)
১০২. আদ দুররুছ ছামীন	শাহওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) (১১৭৪ হি.)
১০৩. তাওয়ারীখে হাবীবে ইলাহ	মুফতি এনায়েত আহমদ কাকুরী (র.)
১০৪. শামায়েলে এমদাদীয়া	এমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (র.) (১৩১৭ হি.)
১০৫. ফায়সালায়ে হাফতাহ মাসয়ালা	এমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (র.) (১৩১৭ হি.)
১০৬. মাজুমায়ে ফাতাওয়া	আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (১৩০৪ হি.)
১০৭. আন্ নি'মাতুল কুবরা	ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী (র.) (৯৭৪ হি.)
১০৮. আল ইলাম বি ইলামে বায়তুল্লাহিল হারাম	ইমাম কুতুবদ্দিন হানাফী (র.)
১০৯. আল জামেউল লতীফ ফী ফযলে মককা	মুহাম্মদ ইবনে জারুল্লাহ ইবনে জহির (র.)
১১০. মাগনাল মুহতাজ	হযরত শারবীনী (র.)
১১১. ইয়ানাতুত তালেবীন	ইমাম দিময়াতী (র.)
১১২. মিরাতুয যামান	সীবতে ইবনে জওযী (র.)
১১৩. নুরুল ইরফান	মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) (১৩৯১ হি.)
১১৪. ফযলুস সালাত আলান নবীয়্যি	কাযী আবু ইসহাক মালেকী (র.) (২৮২ হি.)

১১৫. কিতাবুস সালাত আলান নবীয়্যি	আবু বকর ইবনে আবি আসেম (র.) (২৮৭ হি.)
১১৬. জিলাউল ইফহাম	আল্লামা ইবনে কাইয়্যুম (৭৫১ হি.)
১১৭. কাশফুল গুম্মাহ	আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী (৯৭৩ হি.)
১১৮. আফযালুস সালাত	
১১৯. জযবুল কুলুব	আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) (১০৫২ হি.)
১২০. হাশীয়ায়ে দালায়েলুল খায়রাত	
১২১. তাযকেরাতুল ওয়ায়েজীন	
১২২. মাআরেজুন নবুয়্যাত	আল্লামা মুঈন কাশেফী (র.)
১২৩. দালায়েলুল খায়রাত	মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান জযূলী (র.) (৮৭০ হি.)
১২৪. কিতাবুত তা'রীফাত	আল্লামা মীর সৈয়দ শরীফ (র.)
১২৫. রিয়াদুস সালেহীন	ইমাম নববী (র.) (৬৭৭ হি.)
১২৬. আদদাওয়াতুল কবীর	ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি.)
১২৭. আহকামুল কুরআন	ইমাম কুরতুবী (র.) (৬৭১ হি.)
১২৮. আল মুনাব্বিহাত	ইবনে হাজর আসকালানী (র.) (৮৫২ হি.)
১২৯. শরহে শামায়েল	ইমাম মুনাদি (র.) (১০০৩ হি.)
১৩০. শরহুস সুন্নাহ	ইমাম বগভী (র.) (৫১৬ হি.)
১৩১. ইয়াহিয়াউল উলুমুদ্দিন	ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী (র.) (৫০৫ হি.)
১৩২. কাওয়ায়েদুল ফিকহ	মুফতি আমীমুল ইহসান (র.) (১৯৭৪ হি.)
১৩৩. তারীখে হাদিস ওয়া মুহাদ্দিসীন	হাকীম সৈয়দ আহমদুল্লাহ নদভী
১৩৪. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম	ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
১৩৫. আল ইসাবা	ইবনে হাজর আসকালানী (র.) (৮৫২ হি.)
১৩৬. ফাযায়েলুল খোলাফায়ের রাশেদীন	আবু নুআঈস ইস্পাহানী (র.) (৪৩০ হি.)
১৩৭. আল ইস্তিয়াব	হাফিয ইবনে আব্দুল বার (র.) (৪৬৩ হি.)
১৩৮. উসদুল গাবাহ	ইমাম ইবনুল আসীর জযরী (র.) (৬৩০হি.)
১৩৯. মুয়াত্তা	ইমাম মুহাম্মদ (র.) (১৮৯ হি.)
১৪০. দালায়েলুন নবুয়্যাত	ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি.)
১৪১. খোলাফায়ে রাশেদীন	ড. মুহাম্মদ আসেম আ'যমী
১৪২. মিলাদুন্নবী ﷺ	ড. তাহের আল কাদেরী
১৪৩. আশরায়ে মুবাশশারা	
১৪৪. আস সীরাতুন নববীয়্যাহ	ইবনে খলদুন (র.) (৮০৮ হি.)
১৪৫. খুৎবাতে মুহররম	মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.)
১৪৬. লুমুআত শরহে মিশকাত	আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি.)
১৪৭. তোহফায়ে ইসনা আশারা	আব্দুস আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (র.)
১৪৮. কানযুল উম্মাল	আলাউদ্দিন আলী ইবনে হুসসামুদ্দিন (র.) (৯৭৫ হি.)
১৪৯. হুলিয়াতুল আউলিয়া	অবু নুআঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০ হি.)
১৫০. আস্ সিরাজুল মুনির শরহে আল্-জামেউস সগীর	

১৫১. কাশফুয যুনূন	হাজী খলীফা (১০৬৭ হি.)
১৫২. খালিসুল ই'তিকাদ	
১৫৩. আর রিয়াদুন নাদরাহ	মুহিব্বু তাবারী (৬৯৪ হি.)
১৫৪. ফাযায়েলুল আওকাত	ইমাম বায়হাকী (র.) (৪৫৮ হি.)
১৫৫. ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ	খাজা নিজাম উদ্দিন দেহলভী (র.) (৭২৫ হি.)
১৫৬. তাফসীরে নিশাপুরী	আল্লামা নিজামউদ্দিন হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ (র.) (৭২৮ হি.)
১৫৭. আল্-ইয়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির	আব্দুল ওহাব শা'রানী (র.) (৯৭৩ হি.)
১৫৮. আওয়ারিফুল মাআরিফ	
১৫৯. আসরারুল আহকাম	মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) (১৩৯১ হি.)
১৬০. বাদায়েউস সানায়ে	আল্লামা কাসানী (র.) (৫৮৭ হি.)
১৬১. শরহে মুনিয়্যাতুল মুসাল্লী	ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ হালবী (র.) (৯৫৬ হি.)
১৬২. নামাযের হাকীকত	মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ সোলায়মান আল হাছানী
১৬৩. জামেউস সগীর	জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.)
১৬৪. আল্-মানার	আবুল বারাকাত নসফী (র.) (৭১০ হি.)
১৬৫. নুরুল আন্ওয়ার	মোল্লা জিওন (র.) (১১৩০ হি.)
১৬৬. বাহজাতুল আন্ওয়ার	
১৬৭. জাওয়াযির	ইবনে হাজর মক্কী (র.) (৯৭৪ হি.)
১৬৮. আল মুসনাদ	আবু ইয়ালা (র.) (৩০৭ হি.)
১৬৯. মিনহাযুল আবেদীন	ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী (র.) (৫০৫ হি.)
১৭০. তাশকীলে কিরদার	ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী (র.) (৫০৫ হি.)
১৭১. মুকাশিফাতুল কুলুব	ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী (র.) (৫০৫ হি.)
১৭২. গীবত	আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী
১৭৩. আত তারগীব ওয়াত তারহীব	ইমাম মানযরী (র.) (৬৫৬ হি.)
১৭৪. মাওয়ায়েজে রেজভীয়্যাহ	মাওলানা নুর মুহাম্মদ কাদেরী
১৭৫. জাআল হক	মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) (১৩৯১ হি.)
১৭৬. কানযুদ দাকায়েক	আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমুদ (র.)
১৭৭. খোতবায়ে দোয়াযদাহ মাহী	ইবনে নাবাতা (র.)
১৭৮. আল্-মু'জামুল ওয়াসীত, আরবী অভিধান	
১৭৯. মুফরাদুল লুগাত	ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (র.)
১৮০. তাফসীরে জালালাইন	ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.)
১৮১. তাফসীরে নঈমী	মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) (১৩৯১ হি.)
১৮২. বাদায়েউয যহুর	শেখ মুহাম্মদ ইবনে আয়াস (র.)
১৮৩. আত্-তারগীবু ফি ফাযায়েলুল আ'মাল	ইবনে শাহীন (র.)